মধ্যযুগের বাঙলা নাট

সেলিম আল দীন

মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য

সেলিম আল দীন

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪০৩
জুন ১৯৯৬

বাএ ৩৩৭৭
পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
সমাজ বিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রণ
যমুনা প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং কোং
৮/২-৩ নীলক্ষেত বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫
ফোনঃ ৫০ ৫৩ ৪০

প্রচ্ছদ
আনোয়ার ফারুক

MADHYAYUGER BANGLA NATYA : The Medieval Era of Bangla-Drama, by Dr. SELIM AL DEEN. Published by Gholam Moyenuddin, Director, Textbook Division. June 1996. Dhaka. Bangladesh. First Edition: December 1995.

ISBN-984-07-3386-8

আমার শিক্ষক

অধ্যাপক আহ্‌মদ শরীফ

অধ্যাপক আবদুল কাইউম

ও

সমকালীন বাঙলা নাট্যমঞ্চে যুগ প্রবর্তক

বন্ধুবর নাসির উদ্দিন ইউসুফ!—

আপনাদের নামের সম্মান বহন করুক

এই সামান্য গ্রন্থ।।

সেলিম আল দীন

১লা মে ১৯৯৫

ভ্রম সংশোধনী

মুদ্রিত গ্রন্থের দু একটি স্থলে প্যারা বিপর্যয়সহ নানা ধরনের মুদ্রণপ্রমাদ দৃষ্ট হয়। ১৬ সংখ্যক পৃষ্ঠায় শিব বিষয়ক পালার নিচে বেশ কিছু অংশ যন্ত্রবিভ্রাটের ফলে শূন্য রয়ে গেছে। এ স্থলে ১৬ পৃষ্ঠায় 'পালাটির প্রাচীনত্ব স্বীকার করলেও এর ভাষা যে একালের তাতে সন্দেহ নেই' লাইনের পর ১৭ সংখ্যক পৃষ্ঠা থেকে পড়তে হবে।

ছত্রিশ সংখ্যক পৃষ্ঠায় নবম লাইনে 'গাঙ্গোনট তদীয় স্ত্রী'র স্থলে হবে গাঙ্গোনট, তদীয় পুত্র জয়ানটের স্ত্রী।....

এতদ্ব্যতীত কোথাও কোথাও দন্ত্য'ন' স্থলে মূর্ধ্য 'ণ' এবং 'ণ' এর স্থলে দন্ত্য 'ন' দেখা যায়। দু একটি বাক্যের গঠনে ত্রুটি থাকতে পারে। মধ্যযুগের নানা কাব্যের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে দু একটি স্থলে বানান বিভ্রাট দেখা যায়।

পরবর্তী সংস্করণে এ সকল ত্রুটি যথাসম্ভব দূর করা হবে।

ভূমিকা

বাঙলা নাটক সম্পর্কে একটি সাধারণ বিশ্বাস এই যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনামলে, অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তে এবং উনবিংশ শতাব্দীতে উক্ত শিল্পমাধ্যমের উদ্ভব ও বিস্তার। সচরাচর কোনো কোনো নাট্য-ইতিহাস গ্রন্থেও এ ধারণা ব্যক্ত হতে দেখা যায় যে, বাঙলা সাহিত্যের ধারায় নাটকের প্রারম্ভকাল উনবিংশ শতাব্দী।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এ ধারণা ভ্রান্ত। পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙলা নাট্যসাহিত্যের আঙ্গিক ও উপস্থাপনারীতি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল মাত্র, কিন্তু তৎপূর্বে প্রায় সহস্র বৎসর ধরে এদেশে, বিভিন্ন ধারার নাট্যের প্রচলন ছিল। এমনকি সংস্কৃত নাট্যের নন্দনতাত্ত্বিক প্রভাবও মধ্যযুগে বাঙলা নাটকে ছায়াপাত করতে সক্ষম হয় নি। বাঙালির নাট্যরসপিপাসা চিরকালই স্ব-উদ্ভাবিত দেশজ শিল্পরুচির ধারায় নিবৃত্ত হয়েছে।

তবে একথাও সত্য যে, ইউরোপীয় থিয়েটারে প্রাচীনকালে নাটক যে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট আঙ্গিক লাভে সমর্থ হয়েছিল বাঙলা নাটকের ক্ষেত্রে তা দৃষ্ট হয় না। মধ্যযুগের বাঙলা নাট্যধারা, কাব্য, সঙ্গীত ও নৃত্যের মিশ্রণে আসরকেন্দ্রিক উপস্থাপনা এবং তা নিঃসন্দেহে নাট্যমূলক।

আমরা মনে করি, ভিন্ন ভূগোল ভিন্ন ভাষার সাহিত্য ও শিল্পরীতি সম্ভূত নন্দনতত্ত্বের একান্ত আদর্শে অন্য দেশ-কালের বাস্তবতায় গড়ে ওঠা শিল্পরীতির বিচার সমীচীন নয়। কারণ তা হলে, স্বভাষী ও স্বদেশী শিল্পরীতির ইতিহাস বিচারে বিভ্রান্তি উপজাত হবে। প্রাচীন গ্রীসের আদর্শে রোমক শিল্পধারা গড়ে উঠলেও দেখা যায়, শিল্পকর্ম বিচারে এ্যারিস্টটলের পন্থায় হোরেস অগ্রসর হন নি। হোরেসীয় শিল্পরীতি মূল্যায়ন পন্থা লঙ্গিনাস থেকে বহুদূরবর্তী একথা সকলেই স্বীকার করবেন।

বাঙলা নাটকের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে, প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ধারাবাহিকতা অনুসন্ধান অপরিহার্য। আমরা মনে করি নাটকের মতো একটি জননন্দিত শিল্পমাধ্যম শুদ্ধ উনিশ শতকের আকস্মিক উদ্ভাবনা নয়। নানা রূপে ও রীতিতে, আমাদের এই জনপদে সহস্র বছর ধরে এর ধারা বহমান ছিল।

তবে সে ইতিহাস লুপ্ত প্রায়। কিন্তু লুপ্ত হলেই ইতিহাসের দায় ফুরায় না। এসত্য মনে রেখেই বক্ষ্যমাণ গবেষণায় ব্রতী হয়েছি।

বাঙলা নাটকের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস যে নেই একথা অনেক পণ্ডিত, গবেষক ও ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের রচিত কোনো কোনো গ্রন্থে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীপূর্ব বাঙলা নাট্যরীতির কিছু কিছু নমুনা ও লক্ষণ সম্পর্কে আভাস দিয়েছেন। তবে স্বতন্ত্রভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা নাটকের রূপ ও রীতি সম্পর্কিত কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ আজও রচিত হয় নি।

'মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য' মূলত বাঙলা নাটকের আঙ্গিক ও পরিবেশনারীতি বিষয়ক গবেষণা।

মধ্যযুগের সময়সীমা ধরা হয়েছে চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। তবে মধ্যযুগের পূর্ব পটভূমিরূপে চতুর্দশ শতাব্দী-পূর্বকালের সুবিস্তৃত নাট্যপরিচয়ও এ-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত (দ্রঃ ১ম অধ্যায়)।

বক্ষ্যমাণ গবেষণা 'মধ্যযুগের বাঙলা নাট্যে', বিভিন্ন অধ্যায়ের সার সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

প্রথম অধ্যায় মধ্যযুগের পূর্বপটভূমি। এ অধ্যায়ে প্রাচীন বাঙলার নাট্যসংক্রান্ত নিদর্শন ও বিভিন্ন উপস্থাপনামূলক কাব্য ও রীতি আলোচিত হয়েছে। 'ভরতনাট্যশাস্ত্র' দৃষ্টে প্রাচীন বাঙলার নাট্যরীতি বিচার, চর্যাপদে প্রাপ্ত নাট্যপ্রসঙ্গ, 'গীতগোবিন্দে'র পরিবেশনারীতি, 'সেখ শুভোদয়া' ও 'শূন্যপুরাণ,' ধর্মপূজার নাট্যমূলক উপস্থাপনা। পীরপূজা, রূপকথা, লোককথা ও ছৌনৃত্য।

দ্বিতীয় অধ্যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পরিবেশনারীতি, রামকথা, ভারতকথা, মনসামঙ্গলের আদি উপস্থাপনারীতি, চণ্ডীমঙ্গলের প্রাচীন কবি এবং বিভিন্ন কাব্যের নাট্যমূলক উপস্থাপনাপদ্ধতি ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হলো, পাঁচালির নাট্যবৈশিষ্ট্য নির্ণয়, পাঁচালির উদ্ভব, বাঙলা 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'র উপস্থাপনা এবং কাব্যমধ্যে প্রাপ্ত নাট্যপ্রসঙ্গ, কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', অন্যান্য রামায়ণ রচয়িতাগণ, চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ'।

চতুর্থ অধ্যায় ভাগবতপুরাণের অনুসৃতিমূলক গেয়কাব্য, মালাধর-বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', মাধবাচার্য্যের 'কৃষ্ণমঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যের পরিবেশনারীতি ও কাব্যমধ্যে প্রাপ্ত নাট্যপ্রসঙ্গ আলোচনা।

পঞ্চম অধ্যায় চৈতন্যচরিতাখ্যান কাব্যের পরিবেশনারীতি, বৃন্দাবনদাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', লোচনদাসের 'শ্রী শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি কাব্যের পরিবেশনারীতি ও সেকালের নাট্যপ্রসঙ্গ।

ষষ্ঠ অধ্যায় প্রধান ও অপ্রধান মঙ্গলকাব্য, (ক) বিভিন্ন কবি রচিত মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল; (খ) অপ্রধান মঙ্গলকাব্য; ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', 'শিবমঙ্গল' প্রভৃতি পাঁচালি।

সপ্তম অধ্যায় প্রণয়মূলক পাঁচালি। 'ইউসুফ-জোলেখা', নাটগীত 'বিদ্যা-সুন্দর', 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী', 'লাইলী-মজনু', 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি কাব্যের পরিবেশনারীতি।

অষ্টম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হলো পীরপাঁচালি, সত্যনারায়ণ ও সত্যপীর, গাজীপীর সংক্রান্ত আখ্যান, কাব্য ও মৌখিকরীতিতে পরিবেশনাপদ্ধতি। 'রায়-মঙ্গল', খোয়াজখিজিরের জারি, মাদারপীরের জারি ইত্যাদি।

নবম অধ্যায়ে আছে, পূর্ববঙ্গ গীতিকার নাট্যমূলক উপস্থাপনা 'মহুয়া', 'কাঞ্চনকন্যা', 'দেওয়ানা-মদিনা' প্রভৃতি গীতিকা-সংক্রান্ত আলোচনা। নাট্যরূপে যাত্রার উদ্ভব, ঢপকীর্তন প্রভৃতি লোকনাট্য সংক্রান্ত আলোচনা। মধ্যযুগের ধারায় বাংলাদেশের উপজাতীয় নাট্য।

দশম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হলো মধ্যযুগে বাঙলা সীমান্তবর্তী অঞ্চলের নাট্যরীতি। অঞ্চলসমূহ—নেপাল, মিথিলা, উড়িষ্যা ও আসাম। এই অধ্যায় যোজনার উদ্দেশ্য মধ্যযুগের বাঙলা নাট্যরীতির সঙ্গে ঐ সকল অঞ্চলের সম্পর্ক বিচার।

পরিশিষ্টে আছে মৎকর্তৃক সংগৃহীত ও মৌখিকরীতিতে রচিত মনসামঙ্গল ও গাজীরগানের ধারায় প্রচলিত দুটি লোকনাট্য।

বক্ষ্যমাণ গবেষণাকর্মে শ্রদ্ধেয় পূর্বসূরী, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতাগণের দ্বারা নির্ণীত সন-তারিখের ক্ষেত্রে আচার্য মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডক্টর আহমদ শরীফ প্রদত্ত সন তারিখই বেশিরভাগ গ্রহণ করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, বিভিন্ন পরিবেশনমূলক কাব্যরচনার সন-তারিখ সম্পর্কে সচরাচর কোনোরূপ বিতর্কের সৃষ্টি করা হয় নি। কারণ আমাদের লক্ষ্য ছিল, বাঙলা নাটকের রূপ ও রীতির বিচার।

সেক্ষেত্রে স্বীকার করছি যে, শ্রেণীকরণ ও বিভিন্ন প্রামাণ্য সংগ্রহের নিমিত্তে বাঙলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান ইতিহাস রচয়িতাগণের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধযোগ্য। তাঁদের সঞ্চয় ও সংগ্রহ, বিচার-বিশ্লেষণ এ গবেষণার প্রধান অবলম্বন।

এখানে একটা কথা উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগের প্রায় সকল কাব্যই পরিবেশনমূলক। পাঁচালির একটা সুবিস্তৃতধারা মৌখিকরীতিতে রচিত হয়েছিল। এ ধরনের পরিবেশনমূলক পাঁচালি বা গেয়কাব্য নিঃসন্দেহে নাট্যমূলক।

মধ্যযুগে বাঙলা গেয়কাব্য বাঙলা নাট্যরীতির ইতিহাসের অপরিহার্য অঙ্গরূপেই বিবেচ্য। এ সকল গেয়-পাঁচালি বা কথকতারীতির আখ্যান সম্পূর্ণত আসরকেন্দ্রিক। কাজেই তা নিছক কাব্যমূল্যে বা কাব্যরূপে বিচার্য নয়। উল্লেখ্য যে, এই দৃষ্টিভঙ্গি শ্রদ্ধেয় পূর্বসূরী পণ্ডিত ও গবেষকগণের। এঁদের মধ্যে রয়েছেন মন্মথমোহন বসু, আচার্য শশিভূষণ দাসগুপ্ত, আচার্য সুকুমার সেন, শ্রদ্ধেয় অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

এ-গ্রন্থে উদ্ধৃতিগুলো বিস্তৃত আকারে দেবার চেষ্টা করেছি। এর ফলে পাঠক মূলকাব্য সম্পর্কে অধিকতর ঔৎসুক্য বোধ করবেন বলে মনে করি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্যে পরিবেশনামূলক শব্দ ও পদসমূহ, আমাদের নাট্যপরিভাষায় গৃহীত হবার যোগ্য। এজন্য ঐসকল শব্দ-পদ চলতি ভাষামধ্যে ব্যবহার করেছি। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাঙলা নাট্য সংক্রান্ত নানা ব্যাখ্যা, নামকরণ এবং নাট্যের বিশেষ রূপ ও রীতি চিহ্নিতকরণের নিমিত্তে বহুস্থলে নতুন নতুন পরিভাষার উদ্ভাবন করতে হয়েছে। এরূপ দু একটি পারিভাষিক শব্দ এস্থলে উল্লেখ করা যায়, যথা-লীলানাট্য, কথানাট্য, জলনাটক, কৃত্য-নাটক, কৃত্য-পাঁচালি, আখ্যানমূলক গেয়-কাব্য, নাট্যমূলক গেয়-কাব্য, পরিবেশনমূলক নাট্য, লঘু নৃ-গোষ্ঠী নাট্য, জাতিগত থিয়েটার, গৃহাঙ্গন নাট্য, ডঙ্কনাট্য, ভূমিসমতল বৃত্ত মঞ্চ, কসরতমূলক নাট্য ইত্যাদি। বিশেষ অর্থদ্যোতক এই সকল শব্দ রচনা কালে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাস্তবতা এবং সমকালের প্রয়োজন অদ্বৈতরূপে বিবেচনাধৃত ছিল।

বানানের বেলায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরনো রীতি বজায় রেখেছি যেমন- 'খ্রীষ্টাব্দ'। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংলাপের রীতি বিচারের জন্য পদমধ্যে উক্তিমূলক চিহ্ন দিয়েছি।

অনেকক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় পূর্বসূরী পণ্ডিতদের মত যুক্তিদ্বারা খণ্ডনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা মনে রেখেছি যে আমার গবেষণা তাঁদেরই সুমহৎ চিন্তা ও দিকনির্দেশনার পথিকমাত্র।

পিতৃপ্রতিম শিক্ষক, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আহমদ শরীফ বক্ষ্যমাণ গবেষণাগ্রন্থ রচনার সর্বপ্রধান অনুপ্রেরণা স্থল। তাঁর অতুলনীয় ইতিহাস চেতনা, অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের আকাশস্পর্শী ব্যাপ্তি ছাত্রজীবনেই আমার মনে এক অমোচ্য প্রভাব ফেলে। এ গবেষণার নেপথ্যভূমিতে প্রধান পুরুষ রূপে তিনি নিত্যই বিদ্যমান।

'মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য' মূলে পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আবদুল কাইউম মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে মৎকৃত 'মধ্যযুগের বাঙলা নাট্যরীতি' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের পরিবর্তিত রূপ।

আমার শিক্ষক পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এ গ্রন্থ প্রকাশকালে নানা মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, গ্রন্থটি তাঁরই আগ্রহে প্রকাশের নিমিত্ত উৎসাহ বোধ করেছি।

শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম এ গ্রন্থের নামকরণে সাহায্য করেছেন।

বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মনসুর মুসা মহোদয়, পাঠ্যপুস্তক বিভাগের প্রধান জনাব গোলাম মঈনউদ্দিন মহোদয়ের কাছে এ গ্রন্থ প্রকাশ উপলক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পাঠ্যপুস্তক বিভাগের জনাব হান্নান ঠাকুর গ্রন্থমধ্যে নানান বিষয়ে প্রভূত সহায়তা দান করেছেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের বর্তমান সভাপতি কল্যাণীয় আফসার আহমদ, লুৎফর রহমান ও রশীদ হারুন ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় গ্রন্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। বিশেষত আফসার আহমদ ও লুৎফর রহমান বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান মতামত দিয়ে নানা অধ্যায়ে আমার সন্দেহ ও সঙ্কট দূরীভূত করেছেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক আতাউর রহমান খান, বাঙলা বিভাগের প্রফেসর মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলী, জনাব মুহম্মদ শামসুল হক, কল্যাণীয় আ. খ. ম. আশরাফ উদ্দিন, খন্দকার মুজাম্মিল হক, সিদ্দিকুর রহমান

ও কল্যাণীয় খালেদ হোসাইন বক্ষ্যমাণ গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে মূল্যবান সহায়তা এবং উৎসাহ প্রদান করেছেন।

বন্ধুবর প্রফেসর এনামুল হক খান গবেষণাকালে বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক প্রিয়বন্ধু আব্দুল বায়েস বক্ষ্যমাণ গবেষণার জন্য উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় আমাকে অভিষিক্ত করেছেন।

প্রখ্যাত নাট্য পরিচালক বন্ধুবর নাসিরউদ্দিন ইউসুফ ও তদীয় পত্নী শিমূল ইউসুফ এ গবেষণাকর্মে আমাকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছেন।

নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক স্নেহভাজন সাজ্জাদ আহসান সাজু গবেষণাকালে আমাকে বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এ কাজে তাঁর যে শ্রম ও ধৈর্য প্রত্যক্ষ করেছি তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

আমার স্ত্রী বেগমজাদী মেহেরুন্নেসা এ গবেষণার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করেছেন।

কল্যাণীয় আহমেদ সানি, এ গবেষণার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার কাজে আদ্যোপান্ত শ্রম স্বীকার করেছে। তার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

২৫ এপ্রিল ১৯৯৪

ডঃ সেলিম আল দীন

নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার ঢাকা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

দশম অধ্যায়

মধ্যযুগে বাঙলা সীমান্তবর্তী বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার নাটক ও নাট্যরীতি—নেপাল, মিথিলা, উড়িষ্যা ও আসাম অঞ্চলের নাটক—উল্লেখযোগ্য নাটকসমূহ ও পরিবেশনারীতি, মধ্যযুগের বাঙলা নাট্যরীতির সঙ্গে ঐ সকল প্রাদেশিক নাট্যের সম্পর্ক বিচার।

পরিশিষ্ট ১

বেহুলা লখিন্দারের হাস্তর,

পরিশিষ্ট ২

গাজীর গান ঃ জামাল কামালের পালা,

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

নির্ঘণ্টঃ

প্রথম অধ্যায়

[মধ্যযুগের বাঙলা নাট্যরীতির পূর্বপটভূমি ঃ 'ভরত নাট্যশাস্ত্র' দৃষ্টে প্রাচীন বাঙলা নাট্যরীতির স্বরূপ উদঘাটন, বাঙলা নাট্যরীতির স্বাতন্ত্র্য, চর্যাপদে বিবৃত বুদ্ধনাটক ও অভিনয়রীতি, তিব্বত থেকে সংগৃহীত সিদ্ধাচার্যদের রেখাচিত্র বিচার, প্রাচীন বাঙলার চিত্রকলা প্রভৃতি দৃষ্টে বাঙলা নাট্যরীতির স্বরূপ বিচার, নাথ গীতিকার ধারা ও পরিবেশনারীতি, শিব বিষয়ক নাট্য, গম্ভীরা, ভাদু, তুসু, ধামালি, ধর্মপূজা, 'শূন্যপুরাণে'র পরিবেশনারীতি ও কাব্যে প্রাপ্ত প্রাচীনকালের নাট্যনমুনা, ধর্মমঙ্গলের পরিবেশনারীতি, বাঙলা নাট্যরীতির আলোকে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'। 'সেখ শুভোদয়া' ও পীরপূজা, বিভিন্ন রূপকথা ও লোককথা, ছৌ-নৃত্য, নেটো।]

প্রাচীন বাঙলার নাট্যপ্রবৃত্তি সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ভরতকৃত 'নাট্যশাস্ত্রে'। এ গ্রন্থের প্রবৃত্তি-ব্যঞ্জক অধ্যায়ে অঞ্চলভেদে চতুর্বিধ 'বৃত্তি-আশ্রিত' নাট্যের কথা বলা হয়েছে।

'প্রবৃত্তি' শব্দের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভরত। 'নানাদেশবেষভাষাচারাবার্তাঃ' হচ্ছে প্রবৃত্তি। দেশ-বেশ-ভাষা ও রীতি অনুসারে চার-ধরনের প্রবৃত্তি নির্ণীত হয়েছে। এগুলো যথাক্রমে-আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী এবং ওড্র-মাগধী।[১] ওড্রমাগধী নাট্যপ্রবৃত্তি যে-সকল অঞ্চলে সেকালে প্রচলিত ছিল বলে ভরত উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে 'বঙ্গ'ও রয়েছে।[২] ওড্রমাগধীরীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 'নাট্যশাস্ত্রে' বলা হয়েছে যে, এই প্রবৃত্তি ভারতী ও কৈশিকী প্রবৃত্তির আশ্রয়ে রচিত হয়েছে।[৩] অর্থাৎ ওড্রমাগধীরীতি এই দুইটি বৃত্তি অবলম্বনে প্রযুক্ত হয়। কৈশিকী বৃত্তির নিমিত্তে ব্রহ্মা স্বতন্ত্রভাবে ত্রয়োবিংশ অপ্সরা সৃজন করেছিলেন।[৪] এ বৃত্তি শিবের শৃঙ্গার নৃত্য থেকে উদ্ভূত।[৫] নারীর অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে কৈশিকীর প্রয়োগ সম্ভব নয়। নাট্যশাস্ত্রে এর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বসন-ভূষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। শাস্ত্রমতে কৈশিকী বৃত্তিতে আহার্য হবে মনোরম, এর আত্মা হচ্ছে 'ক্রিয়া' এবং 'রস'। এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভরত বলেছেন যে, এ বৃত্তি 'বহুনৃত্তগীতবাদ্য' সংযুক্ত ললিত-অঙ্গাভিনয়।[৬]

এখানে ভরত-প্রোক্ত 'নৃত্ত' শব্দটির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'নৃত্য' ও 'নৃত্ত' রীতি ও প্রয়োগ বিচারে ভিন্ন। 'নৃত্ত' হলো ছন্দে তালে সাধারণ অঙ্গভঙ্গি।[৭] এ হচ্ছে জননন্দিত লৌকিক নাট্যাভিনয়। এতে নাট্যশাস্ত্র নির্দেশিত মার্গীয় মুদ্রারীতি অনুসৃত হয় না। 'নৃত্ত' শব্দটি কৈশিকী প্রসঙ্গে উল্লিখিত হওয়ায় প্রাচীনকালের ওড্র-মাগধী নাট্যরীতির বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যায়। প্রাচীন বাঙলার যে ক'টি নাট্যরীতি এ যাবত আবিষ্কৃত হয়েছে, দেখা যায় যে, সেগুলো লৌকিক নাট্যাভিনয়রীতি অর্থাৎ 'নৃত্তে'র আশ্রয়ী।

কালের দিক থেকে বিচার করে বলা যায়, ওড্রমাগধী-রীতি ভরত এবং তৎপূর্ব কালেও প্রচলিত ছিল। নাট্যশাস্ত্রের 'প্রচলিত রূপটি'র নিম্নতর সীমারেখা অষ্টম শতকের শেষভাগ বলে অনুমিত হয়েছে।[৮] সুতরাং প্রাচীন বাঙলার নিজস্ব নাট্যরীতির অস্তিত্ব অষ্টম শতকের পূর্বেও বিদ্যমান ছিল, একথা বলা যায়।

প্রারম্ভে মনে রাখা দরকার যে দেশকালের বাস্তবতা অনুসারে নানা শিল্প মাধ্যমের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে গ্রীসে কোরাস ও একজন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে কাহিনী উপস্থাপনার রীতি প্রচলিত ছিল। পরে তা পরিবেশনরীতির ক্রমবিবর্তনে একাধিক চরিত্র ও নাট্যমূলক উপস্থাপনায় পরিণতি লাভ করে।

গ্রীক নাটক অরিয়ন ও থেসপিস প্রবর্তিত নাট্যধারায় বাহিত হয়ে এস্কিলাসের ট্র্যাজেডির মধ্যে সম্পূর্ণতা পেয়েছিল। বাঙলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশে এরকম রূপান্তরের দৃষ্টান্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগে খুব বেশি নেই। আমাদের লোকজীবনের কৃত্য ও রুচিকে অবলম্বন করেই নাটকের এক একটি বিষয় ও নাট্যরীতির জন্ম হয়েছে। এবং তা বহুক্ষেত্রে কালের রূপান্তরের স্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। গ্রীক দিওনিসুস উৎসবে (১৩শত খ্রীস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি)[৯] পরিবেশিত সঙ্গীত ও নৃত্য; ক্রমবিবর্তনের ধারায় গ্রীক ট্র্যাজেডিতে রূপান্তরিত হলো। কিন্তু নৃত্য-গীত-বাদ্যের যে ধারা সহস্র বৎসর পূর্বে ওড্রমাগধী-রীতিতে প্রত্যক্ষ করি, তা প্রাচীন ও মধ্যযুগ অতিক্রম করে আজও বাঙলা নাট্যের মুখ্য অবলম্বন হিসেবে টিকে আছে। কাজেই গ্রীক বা ইউরোপীয় নাট্যের বিবর্তনের আলোকে বাঙলা নাট্যরীতিকে বিচার করলে আমাদের নাটকের উদ্ভব ও বিকাশের প্রকৃত পরিচয় অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

বাঙলা নাটকের কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নেই। যেটুকু ইতিহাস রচিত হয়েছে তা প্রকৃত ইতিহাসের ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। যে-কোন শিল্প-মাধ্যমের ইতিহাস সে

মাধ্যমের রূপ-রীতির ক্রম-সৃজ্যমান এমন এক স্থানিক ও কালিক ধারাবাহিকতা যা অতীতের সঙ্গে বর্তমানের বিশ্বাসযোগ্য ও অনিবার্য সেতুবন্ধ রচনা করে। কিন্তু দু'একটি বিক্ষিপ্ত প্রয়াস ছাড়া আজ পর্যন্ত রচিত অধিকাংশ বাঙলা নাট্য-ইতিহাস গ্রন্থে আমাদের নাটকের উদ্ভবের ইতিহাসকে সে-কালে অর্থাৎ উনিশ শতকে পাশ্চাত্য প্রভাবিত অন্যান্য আধুনিক শিল্প মাধ্যমের প্রায় আকস্মিক উদ্ভবের উত্তেজনার সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে। কোন কোন ইতিহাসকার প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা নাট্যের সঙ্গে আধুনিককালের নাট্য ইতিহাসের একটি ক্ষীণ সেতুবন্ধনে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সে-প্রয়াস যুক্তি-প্রামাণ্য ও পারম্পর্যসিদ্ধ নয়, ফলে ঔপনিবেশিককালের ইতিহাস চেতনার বিপুল ও অভিব্যাপ্ত ধারার মুখে তা সামগ্রিক সত্যে দৃঢ়মূল দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি।

বাঙলা নাটকের ইতিহাস রচনার উপাত্ত সংগৃহীত হওয়ার দরকার। প্রাচীন ও মধ্যযুগের নাট্যরূপ ও রীতি বাঙলা নাট্য-নন্দনতত্ত্বের একটি সাধারণীকৃত রুচি বা বিচারের আলোকে প্রত্যক্ষ করলে আমরা দেখবো যে, আমাদের দেশের নাটক এই জনপদের চিরায়ত শিল্পরীতির স্বাভাবিকতায় বিবর্তিত হয়েছে। সচরাচর দেখা যায় আমরা 'নাটক' কথাটাকে এক পূর্বনির্ধারিত ইউরোপীয় ধারণার অমোঘ রূপ ও রীতির আলোকে বিচারের পক্ষপাতী। বিশেষত দিওনিসুস উৎসব থেকে ইউরোপীয় নাটকের ক্রমবিবর্তন ও সম্পূর্ণ ভিন্ন শিল্পমাধ্যম হিসেবে যে অনিবার্য আত্মপ্রকাশ, তারই বিভাপ্রসৃত দৃষ্টিতে বাঙলা নাটকের রূপ ও গঠন বিচার 'এক সুনিশ্চিত ভ্রান্তির দিকে এযাবতকাল' আমাদের নাট্যভাবনাকে চালিত করেছে।[১০] বাঙলা নাটকের অজস্র আঙ্গিক সহস্র বৎসরের ধারায় বাহিত হয়েছে কিন্তু আদ্যন্ত তার দেহমনে অদ্বৈতের ঝঙ্কার বিদ্যমান। নাটক হয়েও আমাদের নাটক গান থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে নি, নৃত্যকে করেছে তার ধমনী, কাব্যের গড়নটাকে প্রায় সর্বত্র করেছে আপন অঙ্গাভরণ—তার প্রাণের নিখিল লোকায়ত জীবন ও ধর্মকে অবলম্বনপূর্বক আসর থেকে আসরে পরিপুষ্ট হয়েছে। যেখানে কাব্য বা উপাখ্যানটা গেয় সেখানেই বাঙলা নাটকের রূপ ও রস স্পর্শ করা গেছে। আমাদের জনপদে নাটক এসেছে কৃত্যের ছদ্মবেশে। শিব, ধর্ম, চণ্ডী, মনসা, গাজী, মানিকপীরের কৃত্যের অবলম্বন যখন আখ্যান তখন তার উপস্থাপনা, আসর ও দর্শক অবলম্বন করেই বিস্তারিত হয়। কৃত্যকে বাদ দিয়ে বাঙলা নাটকের রূপ-রীতি অন্বেষণ নিরর্থক বলেই প্রতীয়মান হবে। এমনকি প্রাচীন পূর্ববঙ্গ বা মৈমনসিংহ গীতিকা যা সচরাচর-আত্মপ্রবুদ্ধ মানব-মানবীর

পালা রূপে পরিচিত, তার মধ্যে কোনো কোনোটি, আজও বৃষ্টি নামাবার উপায় হিসেবে খরাকালীন লোকজ-কৃত্যের আশ্রয়ে পরিবেশিত হয়। বাঙলা নাটকের প্রাচীন ও মধ্যযুগে 'নাটক' কথাটা প্রায় দুর্লভ। 'বুদ্ধনাটক'কে নাটক বলা হলেও তা নৃত্যগীতেরই আঙ্গিক। আমাদের নাটক পাশ্চাত্যের মতো 'ন্যারেটিভ' ও 'রিচুয়্যাল' থেকে পৃথকীকৃত সুনির্দিষ্ট চরিত্রাভিনয় রীতির সীমায় আবদ্ধ নয়। তা গান, পাঁচালি, লীলা, গীত, গীতনাট, পালা, পাট, যাত্রা, গম্ভীরা, আলকাপ, ঘাটু, হাস্তর, মঙ্গলনাট, গাজীর গান ইত্যাদি বিষয় ও রীতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে।

বাঙলা নাট্যরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর আঙ্গিক ও অভিনয়ের বর্ণনাধর্মিতা। শুদ্ধ সংলাপ ও চরিত্রাভিনয়ের ধারা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এদেশের নাটকে প্রায় দুর্লভ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের নাটক, পাঁচালি, লীলানাট, গীতনাট, নাটগীতপালা প্রভৃতি প্রধানত মৌখিক রীতিতে সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে, বাঙলা নাটকের অভিনয়রীতিও পাশ্চাত্যের অনুকরণ সম্ভূত অভিনয়রীতি থেকে পৃথক। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ভারতীয় অভিনয়রীতি কাব্যিক সুষমাপূর্ণ (Poetic art) এবং তা জীবনের ব্যাখ্যা (An interpretation of life). অন্যদিকে ইউরোপীয় অভিনয় 'প্রশ্নাতীতভাবে গদ্য' অথবা শুধু 'অনুকৃতি' (Prose or imitation)[১১] কথাটা বাঙলা-অভিনয়রীতি সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

বাঙলা ভাষার নিদর্শন চর্যাপদে 'বুদ্ধনাটক'-এর উল্লেখ আছে। 'বীণা পা' (নবম খ্রীস্টাব্দ) রচিত ১৭ সংখ্যক চর্যায় আছে-

ঃ নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই।।[১২]

অর্থাৎ 'বজ্রধর নৃত্যপর এবং দেবী সঙ্গীত পরিবেশন করছেন, বুদ্ধনাটকের পরিবেশনা এজন্য হল কষ্টসাধ্য'। প্রাচীন বাঙলার নাট্যরীতি কিরূপ ছিল, তা এই পদ থেকে অনুধাবন করা য়ায়। 'বুদ্ধনাটক' নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে পরিবেশিত হতো। এতে নারী-পুরুষের মিলিত অংশগ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। একই চর্যায় প্রাচীনকালের নাটকে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখও রয়েছে।

১০ সংখ্যক চর্যায় বিবৃত হয়েছে নৃত্যপটিয়সী ডোম্বীর নৃত্যকলা—

ঃ এক সো পদমা চউসট্‌ঠী পাখুড়ী।
তঁহি চড়ি নাচই ডোম্বী বাপুড়ি।।[১৩]

চর্যায় বাদ্যযন্ত্রের নাম এবং নাট্যাভিনয়ে আহার্যের অনুষঙ্গ 'নেউর' বা নূপুর এবং 'ডমরু'র উল্লেখ পাওয়া যায়। 'ডমরু' শিবের প্রতীক বাদ্যযন্ত্র।

১০ সংখ্যক চর্যায় 'নড়পেড়া' শব্দের অর্থ যদি 'নটপেটিকা' হয় তবে দেখা যায় যে, সে-কালে 'ছোট পেটিকা' বা 'পেটরা'য় 'নটনটীর সকল সাজ পোষাক' থাকত।[১৪] পেটরায় সাজপোশাক রক্ষণাবেক্ষণ পেশাজীবীদের পক্ষেই সঙ্গত। উল্লিখিত চর্যায় বিভিন্ন নৌকায় ডোমনীর আসা যাওয়ার প্রসঙ্গ আছে—

ঃ আলো ডোম্বি তু পুছমি সদভাবে।
আইসসি যাসি ডোম্বি কাহেরি নাবেঁ।।

এ থেকে দেখা য়ায় সেকালে নিম্নবর্ণের নারীপুরুষেরা নৃত্যগীতাভিনয় প্রদর্শনের জন্য নানা স্থানে আসা যাওয়া করত।

তিব্বত থেকে সংগৃহীত সিদ্ধাচার্যদের রেখাচিত্রগুলো অবলম্বনে প্রাচীন বাঙলার অভিনয়ের সূত্র অনুসন্ধান করা যেতে পারে।[১৫] বুদ্ধ নাটকে নারীপুরুষের যে নৃত্য ও সঙ্গীতের কথা বিবৃত হয়েছে এ চিত্রগুলোতে যেন তারই সংকেত বিদ্যমান।

প্রাপ্ত রেখাচিত্রে অষ্টাদশ সিদ্ধাচার্যের সাক্ষাৎ মেলে। এঁরা হচ্ছেন- (১) মীনপা (২) জালন্ধর (৩)কাহ্নপা (৪) দাড়িকপা (৫) ডোম্বীপা (৬) লুঈপা (৭) শান্তিপা (৮) বিরূপা (৯) জয়নন্দ (১০) গুণ্ডারিপা (১১) তিলোপা (১২) কংকণপা (১৩) ভুসুকুপা (১৪) বীণাপা (১৫) ভদ্রপা (১৬) তন্তিপা (১৭) কর্ণরিপা (১৮) সরহপা।[১৬]

রেখাচিত্রে দেখা যায়, মীনপা বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পদদ্বয় আড়াআড়িভাবে ন্যস্ত। ডান হাত বাম হাতের উপর, বৃদ্ধাঙ্গুল স্বাভাবিক, অন্য চারটি আঙ্গুল ইষৎ বাঁকানো, সামনে দু'টি মূর্তি, একটি ক্ষুদ্রাকৃতির নারীর এবং অন্যটির মুখমণ্ডল ঠিক মানুষের আকৃতির নয়। এই নারী উর্ধ্বমুখী, হস্তদ্বয়ের বিশেষ মুদ্রায় সে যেন মীনপা'র কাছে কিছু চাইছে।

জালন্ধর দাঁড়িয়ে আছেন ত্রিভঙ্গ, বামপায়ের উপরে, পায়ের ভঙ্গি কৌণিক, ডানপায়ের গোড়ালি কাঁধের উপর। তাঁর পায়ের পাতার উল্টোদিক ডানহাতের ভাঁজে, দুই হাত মস্তকের উপরে পরস্পর সংবদ্ধ। এখানেও ডান দিকে এক নারী,

তার দু'হাতে পাত্রের মতো কিছু একটা ধরা। কাহ্নপা দু'পা বিভক্ত নৃত্যের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো, বামহাতে কিছু একটা ধরা। তালু উর্ধ্বমুখী, ডান হাতের ভঙ্গিটি অস্পষ্টতার কারণে বোঝা যায় না কিন্তু এ হাতের নিচে জল থেকে উত্থিত সেই একই রকম নারী; প্রণামধৃত হাত। সম্ভবত এই তিন নারী নৈরামণী দেবী। ডোম্বীপা বসে আছেন বাঘের পিঠে। তাঁরও বাম পা কৌণিক এবং বিশেষ জ্যামিতিক ভঙ্গীর মতো, হস্তেধৃত বিশাল পাইথন। ডানহাত উর্ধ্বমুখী, বাম হাতে সাপের নিম্নাংশ ধৃত, কিন্তু দুই স্থলেই তর্জনী সংযুক্ত হস্ত 'পাশ'-এর মত তবে তা বিচ্ছিন্নভাবে, পরস্পর সংবদ্ধ নয়।

শান্তিপা'র রেখাচিত্রে দেখা যায় ডান হাত উত্তোলিত এবং খানিকটা পতাকমুদ্রার মতো। বিরূপা মহার্ঘ আসনে সমাসীন, বাম হাত কোলের কাছে ন্যস্ত, হাতে কঙ্কণ আছে। ডান হাতের তর্জনী উত্থিত, বৃদ্ধাঙ্গুল স্বাভাবিক, কিন্তু অন্য তিনটি আঙ্গুল ঈষৎ বাঁকানো। কঙ্কণপা'র পদদ্বয় আড়াআড়িভাবে ন্যস্ত, বাম পায়ের গোড়ালির উপরে ডান পা রাখা, ডান হাতের সবগুলো আঙ্গুল আনমিত, কিন্তু হাত দেখে মুষ্টিবদ্ধ বলে মনে হয় না। বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল মুক্ত, অন্য আঙ্গুলগুলোর অগ্রভাগ হাতের তালুর উপর আনমিত। স্পষ্টতই মনে হয় এটি অসংযুক্ত হস্তের শিখরমুদ্রা।[১৭]

চর্যাকারদের কেউ কেউ প্রাচীন বাঙলার নাট্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। ১৭ ও ১০ সংখ্যক চর্যায় উল্লিখিত (এই অধ্যায়ে পূর্বে উদ্ধৃত) 'বুদ্ধনাটক' ও ডোম্বীর প্রতি কৃষ্ণাপাদানাম্-এর উক্তি থেকে এই অনুমানের সমর্থন মেলে।

'লোচন পণ্ডিতে'র 'রাগতরঙ্গিণী'তে 'তুম্বুরু নাটক' নামে একখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। এ গ্রন্থ নাট্যশাস্ত্র বিষয়ক। গ্রন্থনাম থেকে ধারণা করা যায় সেকালে 'তুম্বুরু' নামে বিশেষ ধরনের নাট্য প্রচলিত ছিল।

প্রাচীনকালে নাট্যমাত্রই নৃত্যের আঙ্গিকে পরিবেশিত হতো। বুদ্ধনাটক বা তুম্বুরু নাট্যে 'নৃত্য ছিলই, বাদ্যও ছিল এই অনুমানে বাধা নেই'।[১৮]

সেকালের নৃত্য বা নাট্যের অভিনয়, আহার্য প্রভৃতি 'লোকায়ত ধারা'র পরিচয় পাওয়া যায় 'পাহাড়পুর ও ময়নামতিতে প্রাপ্ত পোড়া মাটির ফলকে'। আবার মার্গীয় বা উচ্চশ্রেণীর নাট্যরীতির পরিচয় মেলে সমসাময়িক কালের প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ 'দেব-দেবী অপ্সরা গন্ধর্ব-নারী', সেবাদাসী নর্তকীদের 'নৃত্যের' গতিতে ও ভঙ্গিমায়।[১৯]

পাল আমলের বৌদ্ধ দেবদেবীদের চিত্র সম্বলিত পুঁথি দৃষ্টেও প্রাচীনকালের বাঙলা নাটকে ব্যবহৃত পোশাক, অলঙ্কার, কেশ-সজ্জা, মস্তকাভরণ ও নৃত্যের মুদ্রা, দৃষ্টি, আসন ও পদন্যাসের পরিচয়-সংকেত পাওয়া যায়।[২০]

বৌদ্ধধর্মের লোকায়ত রূপ নাথপন্থা। নাথপন্থী সাধকগণের যোগ সাধনা বা কায়া সাধনার যে সকল কাহিনী কাব্যের আকারে রচিত হয়েছে সেগুলো প্রাচীনকালে মৌখিকরূপেই পরিবেশিত হতো। পরবর্তীকালে নাথসিদ্ধাদের এই 'অর্ধ-ঐতিহাসিক কাহিনী' অবলম্বনে নাথ গীতিকার উদ্ভব ঘটে।[২১]

ফয়জুল্লা রচিত 'গোরক্ষবিজয়ে' গোরক্ষনাথ একজন নাটগীতসিদ্ধ পুরুষ রূপেও চিত্রিত হয়েছেন। সঙ্গীত ও নৃত্যের যুগল সম্মিলনে যে নাট্যরীতি বুদ্ধ-নাটকে প্রত্যক্ষ করা যায় গোরক্ষনাথের নাটে তারই ধারাবাহিকতা আছে।—

ঃ "নাচেন্ত গোর্খনাথ তালে করি ভর।
মাটিতে না লাগে পদ আলগ উপর।।
নাচেন্ত যে গোর্খনাথ ঘাঘরীর রোলে।
কায় সাধ কায় সাধ মাদল হেন বোলে।।
হাতের ঠমকে নাচে পদ নাহি লড়ে।
গগণ মণ্ডলে যেন বিজুলী সঞ্চরে।।"

বাঙলা লোকনাট্যের বহুস্থলে পুরুষ রমণীর আহার্য বা রূপসজ্জা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে তা লক্ষ্য করা যায়। গোরক্ষনাথের 'ঘাঘরী'র সজ্জা থেকে ধারণা করা যায় সেকালের কোনো কোনো 'নাটে' এ ধরনের পোশাকের প্রচলন ছিল। ঘাঘরী রাজপুতনার রমণীদের পোশাক। 'ঘাঘরীর রোলে' কথাটা থেকে বোঝা যায়, নৃত্যকালে এই পোশাক থেকে কিঙ্কিণীর ধ্বনি উত্থিত হতো। মাদল 'অনদ্ধ'শ্রেণীর বাদ্য। উপজাতীয়দের মধ্যে এর প্রচলন রয়েছে। অন্যদিক থেকেও ফয়জুল্লার এই বিবরণ বিচার্য। মাদলের বোল পৌনপুনিক 'কায়সাধ' নিনাদিত হওয়াতে এই বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে নাথপন্থীদের কায়াসাধনার সম্পর্ক প্রমাণিত হয়। মীননাথ মাদলের 'গুরু' নাদে বিস্ময়াবিষ্ট-

ঃ মাদলের তাল শুনি ভোলে মীন রায়ে।
মাদলের রাএ কেন গুরু মোরে কহে।।
নাট কর নাটুয়া তাল বাহ্ ছলে।
তোক্ষার মাদলে কেন গুরু গুরু বোলে।।

এক শিষ্য আছে তোর যদি গোরখাই।
আর শিষ্য আছে মোর গাভুর সিদ্ধাই।।
দুই শিষ্য আছে মোর আক্ষি জানি ভালে।[২২]....

গোরক্ষনাথ অভিনয়ের নিমিত্তেই ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন। সেজন্য 'নাট কর' অর্থাৎ নাটক কর কথাটা বলা হচ্ছে। অন্যদিকে সেকালে অভিনয় যদি বৃত্তি হিসেবে চালু না থাকত তবে 'নাটুয়া' এ বৃত্তি বা পেশামূলক কথাটা বলা হতো না।

নাথ সম্প্রদায়ের সঙ্গে নৃত্য-বাদ্য-নাটের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য, তার প্রমাণ 'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাসে'ও লব্ধ। শুকুর মাহমুদের 'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাসে' (১৭০৫) কাহিনীর অংশ হিসেবে নটী, নৃত্য ও নাটের প্রসঙ্গ আছে।

'গুপিচন্দ্রের' 'বিভা' উপলক্ষে যে সকল বাদ্যযন্ত্রের সম্মিলিত আনন্দ-ঝংকার বেজে উঠে তার সংখ্যা কম নয়। এ সকল বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে—ঢাক, ঢোল, ধাঙসা, নাকারা, দাক্ষিণাত্যের জোরখাই, কাড়া, টিকারা, রণশিঙ্গা, ভেউর, কাকল, শিঙ্গা। ধ্যান-বিমোচনে ক্ষিপ্ত গুপিচন্দ্রকে বিবাহ দিতে দেয়া হবে না বলে সংকল্প করলে তখন আবার নতুন ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজে যেমন—খোল, মৃদঙ্গ, নারদী-মন্দিরা, মোহনমুরারী, সারিন্দা, দোতারা ইত্যাদি।

গুপিচন্দ্রের বিবাহের আয়োজনে 'নৃত্য করে নর্তকী গাইনে গায় গীত'। প্রাচীন বাঙলার নাটক এই গান আর নাচেরই সম্মিলন। মীননাথ ভবানী কর্তৃক শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন—'নটী লইয়া মীননাথ থাকিব কদলীতে'।[২৩] সেকালের নৃত্যগীতকুশল রূপাজীবী নারী 'নটী' হিসেবেও আখ্যাত হতো।

'গুপিচন্দের সন্ন্যাসে' আছে যে, 'নৈরাকার' মৃতরূপে ভেসে যেতে থাকলে শিব সেই দেহ নিয়ে নৃত্যে মেতে উঠেন—

ঃ পরিচয় পাইয়া হরি মাথে নিরঞ্জন করি
গাএ শিব নানান রঙ্গের গীত।
খটক ডমরু বাজে থমকে থমকে নাচে
বিষ্ণুদেব হইল পুলকিত।।
বিষ্ণুর রঙ্গমনে ব্রহ্মা থুইল কমণ্ডলে
তাতে হইল মকর বাহিনী।[২৪]

এ হচ্ছে থমক-নৃত্য, এবং এতে ব্যবহৃত বাদ্য হল 'খটক ডমরু'। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলায় নৃত্যের বিশেষ এক ধরনের রীতিকে 'থমক' (বা 'ঠমক') বলা হতো।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, শৈবতন্ত্র ও বৌদ্ধ সহজিয়া পন্থার সঙ্গে প্রাচীনকালেই একটি পারস্পরিক সংযোগ সাধিত হয়েছিল। হাড়িপা এতদঞ্চলে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও পশ্চিমে শৈবতান্ত্রিকদের পূজ্য সিদ্ধায় রূপান্তরিত হন। এ কারণেও নাথপন্থী কাব্যে শিবের উল্লেখ লভ্য।

গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাসগমন বর্ণনায় নৃত্যস্থল, নর্তকীদের বসন-ভূষণ ও আখ্যান প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

হাড়িফা হনুমানকে নৃত্যস্থল প্রস্তুত করতে বললেন—

ঃ হাড়ি বলে হনুমান, শীঘ্র কর এহি কাম
এথা আজ বঞ্চিব রজনী।
বাক্য কর অবধান নির্মল করহ স্থান
এথাতে নাচিবে নাচনী।।

হনুমান বন কেটে জায়গা করে দিল—

ঃ যত গাছ ছিল মুড়া পদঘাতে কর্লগুড়া
দণ্ডেক মধ্যে করিল পরিস্কার।।
ঝোঁপ ঝাঁপ সব মারি স্থান নির্মল করি
বিদাএ হইল হনুমান।[২৫]

এই বর্ণনায় ভূমিসমতল-বৃত্ত-মঞ্চের ইঙ্গিত আছে। এরপর 'হাড়ি জলেন্দর' শঙ্করের নাম জপতে জপতে 'ইন্দ্রের অপ্সরি' স্মরণ করলেন—

ঃ বাম হস্তে চন্দনের বাটা দক্ষিণে সুবর্ণ ঝাটা
আইল এক বিদ্যাধরি।।
পরিধানে পাটের শাড়ি আগে ছিল ছড়া ঝাড়ি
আমোদিত করিল চন্দনে।
হস্তেতে তৈলের খুরী দিউটি জ্বলে সারি (সোরি)
সূর্য যেন উদিত গগনে।।
সন্ধ্যা রজনী গতে বিদ্যাধরি শতে শতে
আইল প্লাবিয়া কান্তাপুর।
অধর অরুণ আভা মুখ যেন পুষ্প জবা
হীরা যেন দন্ত মতীচুর।।[২৬]

এই নৃত্যনাটে আলোক-সজ্জারও বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। সারি সারি প্রদীপের আলোয় মঞ্চ সূর্যালোকিত দিনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মধ্যযুগে অসমীয় 'ভাবনা-নাটে' 'মহতা' বা 'মতা' নামক মশাল জ্বালিয়ে মঞ্চ আলোকিত করা হতো।

'বিদ্যাধরি' গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব-রাত্রিতে প্রাসঙ্গিকভাবে যোগান্ত-ভেদান্ত গান অর্থাৎ নাথ-গীতিকা পরিবেশন করেছিল—

ঃ যোগান্ত ভেদান্ত গান পঞ্চম রসের তান
যেন কেওয়া চম্পকের বাসে
ফকির যুগি রহমত অতি বড় বুধ্যিহত
আবদুল শুকুরে যোগভাশে।।

এর পাঠান্তরে নাথ গীতিকা পরিবেশনের আরও সুস্পষ্ট চিত্র লভ্য—

ঃ কেওয়া গোলাপ বাসে ফকির যুগীর বেশে কবি সুকুর মামুদ ভুলে।।
যোগ পাঁচালীতে গায়, নাচনী নাচিয়া যায় বাজে খোল মৃদঙ্গ পাখোয়াজ।
কিঙ্কিণি কঙ্কণ বাজে যেন তারাগণ সাজে নর্ত্তকী করিল নানান সাজ।।[২৭]

এ থেকে অনুমিত হতে পারে যে একালে নাথগীতিকা নর্তকী কর্তৃক পরিবেশিত হতো ; এ শ্রেণীর গীতিকা 'যোগান্ত' ও 'ভেদান্ত' গানরূপেও পরিচিত ছিল।

'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাসে' বিদ্যাধরীর (অর্থাৎ নটী) আখ্যান পরিবেশনরীতির বিবরণ পাওয়া যায়—

ঃ তাল ঝুনাঝুনি খোল মৃদঙ্গ শুনি
করে কত কত তাল।
শতেক নাচনে নির্ত্ত সর্ব্ব জনে
পদের সাথে সাথে তাল।।
পাএর নেপুর ঝুমুর ঝুমুর
চলিতে সুনাদ শুনি।
চলিতে চাপালি চম্পকের কলি
ছটকে যেন দামিনী।।

নৃত্যের এই ধারায় নর্তকী সংলাপ ও কাহিনী বিবৃত করে—

ঃ রসের নাগরী গুণের সাগরি
থমকে থমকে চলে

ইন্দ্রের রূপসী পূর্ণিমার শশী
মধু মধু বচন বলে।।
কটিতে কিঙ্কিণি বাজে সুরধনি
রসে রসে তোলে পাও।
কাঁচলীর তরঙ্গে আঁখির মটকে
করে কত কত ভাও।।
দিয়া বাহু নাড়া সাহেবি হাবাড়িয়া
গাএ বিয়াল্লিশ সুরে।
গাঞেন গাহিনি ছত্রিশের রাগিনী
ছয় রাগ লইয়া পুরে।।[২৮]

নর্তকী নৃত্যমধ্যে 'মধু মধু বচন' বলেছে, এবং নানারূপ ভাবভঙ্গী অর্থাৎ 'ভাও' প্রদর্শন করেছে। কাজেই গীত, নৃত্য, আখ্যান মিলে এ হচ্ছে 'নাট' বা নাটক। এই পরিবেশনার সঙ্গে মনসামঙ্গল-পাঁচালিতে 'বেউলার' স্বর্গসভায় নৃত্য পরিবেশনরীতির বেশ খানিকটা মিল আছে।

উনিশ শতকের নাথগীতিকা পালা দেখে গ্রীয়ারসন এর উপস্থাপনারীতির বর্ণনা দিয়েছেন। চার জন গায়েন পালাক্রমে নাথগীতিকা উপস্থাপন করে। তারা তা যৌথভাবে নয় '(Not in union)' পালা ভিত্তিক বা আলাদা আলাদা '(in parts)' ভাবে উপস্থাপনা করে থাকে। এই পালা পরিবেশনায় হে রাজা '(He Raja)' হে ময়না '(He Mayana)' অথবা হে যম '(Or He yame)' ইত্যাদি ধূয়া ব্যবহৃত হয়।[২৯] উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সচরাচর চারজন '(Usually four people)' কেন? চারসিদ্ধার জন্ম, শিবের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে—এরূপ একটি পুরাণকল্প কাহিনী পাওয়া যায়। চার পালাগায়েন কি এই চার সিদ্ধার প্রতীক? অবশ্য চার গায়েন পরিবেশিত পালার যে তথ্য আমরা পাই, তা উনিশ শতকের। স্থান উত্তরবঙ্গের রংপুর।

প্রাচীন বাঙলার নাট্যগীতির ধারায় যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপাল প্রভৃতি পাল রাজাদের গাথাও অন্তর্ভুক্ত। 'রংপুর রাজবংশীয়' তদঞ্চলের 'নিম্নশ্রেণীর' মধ্যে মহীপালের গান ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তেও প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩০]

নাথসিদ্ধাদের উপখ্যানগুলো এখনও আমাদের লোকায়ত সমাজে জনপ্রিয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বাঙলায় লোকনাট্য হিসাবে 'গোর্খের পালা' অদ্যাবধি আপন অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।[৩১]

গোরক্ষনাথ প্রাচীনকালে গো-রক্ষক দেবতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পরে তিনি বৌদ্ধ তান্ত্রিকপন্থী নাথ সিদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত হন।[৩২] বাঙলার লোক সমাজে তিনি বরাবরই গো-সম্পদের প্রতিপালনকারী দেবতা রূপে বন্দিত হয়ে আসছেন। একালেও বাংলাদেশ ও 'ত্রিপুরা'য় গোরক্ষনাথের 'সেবা' প্রচলিত আছে।[৩৩] এই সেবার অন্যতম অঙ্গ হলো 'রণাগায়ক' ও 'বালকগণ' কর্তৃক পাঁচালির আকারে ছড়া-প্রতিম মন্ত্র পরিবেশন। ময়মনসিংহ অঞ্চলে অনুরূপ একটি ছড়ায় গোরক্ষনাথ সংক্রান্ত কাহিনীর ক্ষীণ আভাস মেলে—

ঃ	রণাগায়ক।	থুব বনা থুব বাজে, —বালকগণ।	হাঙ্চো
		কাইচ কড়িটি ঝুমুর বাজে	,,
		বাজে ঝুমুর বাজে তাল	,,
		আমার গুরুখ জগৎমাল	,,
		জগৎমাল নিমি ঝিমি	,,
		সোনার বান্ধুম পাঁচ টিমি	,,
		ও পাড়ায় ডাক শুয়া	,,
		আমার গুরুখে খায় গুয়া	,,
		গুয়া খাওয়া বড় গুণ	,,
		পান্তা ভাতে ঢাল লুণ	,,
		পান্তা ভাতে ছল ছলায়	,,
		আমার গুরুখে খেইল খেলায়	,,
		খেইল খেলাইতে লাগলো জোর	,,
		কে কে যাইবা বিক্রমপুর	,,
		বিক্রমপুরিয়া কালাগানি	,,
		বাপ থইয়া তার পুত হানি	,,
		বাপ মরিল তার আলে ঝালে	,,
		পুত মরিল তার মরিচের ঝালে	,,
		মরিচ গাছটি আউল ঝাউল	,,
		তার মধ্যে গুরুখ বাউল	,,
		গোরক্ষ বাড়ী বাদ্যি বাজে	,,
		তা শুনিয়া হাসায় সাজে	,,
		ও হাসা বড় মনিষা	,,

ভাই ছিল ছিল তর দের মনিষা ,,
বিয়া করলাম মাধবের বেটী ,,
মাধব বর দেও- ,,
সোনার লাঙ্গল জুড়িয়া দেও ,,
সোনার লাঙ্গল রূপার ফাল ,,
ঘর জামাইয়ে জুরছে হাল ,,
হাল চাষ হইলে পরে
গোরু রাখিয়া দিল গোয়াল ঘরে ,,
কাটিয়া আন মানের পাত ,,
বাড়িয়া লও আম্বল ভাত—ইত্যাদি। ,,
... ...
থুব থুব।[৩৪]

রংপুর থেকে সংগৃহীত 'মোনাই তোনাই'র পালায় নাথ, ধর্ম ও সুফীবাদের মিশ্র প্রভাব দেখা যায়। নাথধর্মের সন্ন্যাসব্রতই যেন এ নাট্যের প্রতিপাদ্য (ওগো শাইজীতে হইলে হামি এ-ঘর ভাঙ্গিম, এ ঘর আঁকিয়া (রেখে) কোন কাজ নাই) অন্যদিকে 'মঞ্জিল' 'মোকাম' (কোন জাগাত ধ্বনি ওঠে)—প্রভৃতি প্রসঙ্গে নাথপন্থা ও সুফীতত্ত্বের সাধনাপন্থা এবং কায়াসাধনার যুগল-মিশ্রণ রয়েছে। ধর্মপূজার সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে এ নাট্যে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের অপূর্ব মিল আছে, যেমন—

ঃ 'নিশরদোতে হইল ধন্ধকার'

কিংবা,

তকোন জলের ওপরেতে আচিল হরি শয়ন করি।
তকোন আচিল পিতিবি শূন্নো নৈরাকার।[৩৫] ইত্যাদি।

এমন কি এ নাটকে খোদা ও জিবরাইলের চরিত্রও আছে। অবশ্য খোদা এখানে শূন্যপুরাণের 'নিরঞ্জন' নামেই অভিহিত।

'মোনাই তোনাই'র পরিবেশনারীতি 'আলকাপ গানের ন্যায়' অর্থাৎ এতে 'খেমটাওয়ালী-কাইপ্যা' ও প্রধান প্রধান চরিত্রে রূপদানকারী অভিনেতারা

'সামান্য রঙের প্রলেপ' ব্যবহার করে।[৩৬] খেমটাওয়ালী চরিত্রে ছেলেরাও অভিনয় করে। 'কাইপ্যা' ও 'খেমটানৃত্য'ই এর প্রাণ। 'কাইপ্যা' হচ্ছে কৌতুককারী।

গোরক্ষনাথ, মীননাথ, গুপীচন্দ্র; ময়নামতি, হাড়িফা, কাহ্নপা, মানিক চাঁদের আখ্যান, পালগীতি, শূন্যপুরাণ ও ধর্মপূজা-বিধানের ভাষা যত অর্বাচীন কালেরই হোকনা কেন, মৌখিক রীতিতে রচিত এই সকল উপাখ্যান 'হাজার বছরের পুরানো'। বিশেষজ্ঞের মতে, 'এগুলো যে-বৌদ্ধযুগের ও বৌদ্ধ সমাজের তাতে সন্দেহ নেই'।[৩৭]

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা নাট্যাভিনয় বিভিন্ন লোকাচার ব্রত-উৎসব ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের কৃত্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই রীতিটা সর্বভারতীয় লোকনাট্যের প্রেক্ষাপটে বিচার্য। সমগ্র ভারতে আজও বহুক্ষেত্রে কৃত্য-থেকে নাটক স্বতন্ত্র নয়। সেজন্য এতদঞ্চলের নাট্য পরিবেশনায় 'Ceremony' ও 'Performance'-এর মধ্যে কোনোরূপ সুস্পষ্ট বিভাজন দুঃসাধ্য।[৩৮]

কারো কারো মতে প্রাচীনকালে দ্রাবিড়দের শিব বিষয়ক উৎসব ও কৃত্যের ধারায় নাট্যের উদ্ভব ঘটেছিল।

মোহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত শিবের পশুপতি ও অন্যবিধ শক্তিদ্যোতক মূর্তি দৃষ্টে গবেষকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে শিব মূলত ভারতীয় অনার্যদের দেবতা এবং প্রাপ্ত মূর্তিগুলো 'নৃত্যশীল নটরাজের মূর্তি'।[৩৯] শিবের অজস্র গুণবাচক নামের মধ্যে আছে 'নটেশ' 'নটরাজ' 'মহানট' 'নটনাথ' প্রভৃতি।

ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্রের নমস্ক্রিয়ায় 'পিতামহ মহেশ্বরৌ' অর্থাৎ ব্রহ্মা ও শিব যুগ্মভাবে বন্দিত হয়েছেন। চতুর্বেদ রচিত হবার পর ব্রহ্মা শিবের কাছে নাট্যশাস্ত্রের পাঠগ্রহণপূর্বক পঞ্চমবেদ রচনা করেন। নন্দিকেশ্বরের 'অভিনয়-'দর্পণে'র নমস্ক্রিয়ায় শুধু শিবের প্রশস্তি বিদ্যমান। কোনো কোনো নাট্য-বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে 'নাট্যবিষয়ে আর্য্যেরা প্রাচীন অনার্য্যদের নিকট ঋণী'। গ্রীক নাটকের উদ্ভবের ক্ষেত্রে দিওনিসুস উৎসবের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, 'শিবোৎসব' থেকে নাটকের জন্ম।[৪০]

শিব লৌকিক অনার্য দেবতা হিসেবেই প্রাচীনবঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। জাতি, উপজাতি, ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে এই লৌকিক দেবতার সর্বব্যাপকতা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। প্রাচীন বাঙলার নাথ সম্প্রদায়, ধর্মপূজক সম্প্রদায়,

কৃষিজীবী কোচ উপজাতি ও পরবর্তীকালে নানান আঞ্চলিক দেবতার রূপকল্পে, ব্রত, আচার, কৃষি-কৃত্য সর্বত্র শিবের প্রভাব বিদ্যমান।

শিবের ধ্যানমগ্নতা, প্রণয়, বিবাহ, অভিমান, ক্রোধ, ভিক্ষাপ্রবণরূপ, কৃষিকর্ম, তন্তুবায়ীরূপ, ধ্বংসাত্মক শক্তি, আত্মমগ্ন-ঔদাসীন্য, নৃত্য ও নাট্যপ্রিয়তা প্রাচীনকাল থেকে বাঙালি মানসে অদ্বিতীয় প্রভাব বিস্তার করে আছে। শিবোৎসব বা শিবের গাজনে অনুষ্ঠিত নানারূপ কৃত্যে নাট্যাভিনয়ের অঙ্কুর পরিদৃষ্ট হয়। এতে 'কোনো কোনো বিষয় অভিনীতও হয়'। গাজনে কৃষি বিষয়ক নাট্যে অভিনেতারা হালের বলদ, জমি-কর্ষণ, বীজ ছড়ানো এবং শস্য কর্তনের অভিনয় করে থাকে। একজন 'মূল-সন্ন্যাসী' অভিনেতাদের ফসলের ভবিতব্য সম্পর্কে প্রশ্ন করে। এর উত্তরে অন্য একজন অভিনেতা যা বলে তা থেকে 'সকলে সেই বৎসরের ধান্য উৎপাদনের পরিমাণ' অনুমান করে।

শিব-পত্নী গৌরীর শঙ্খ পরিধান ও শিবের শাঁখারী সাজা নিয়েও নানা ধরনের গীতাভিনয় গাজন উপলক্ষে প্রচলিত রয়েছে। গাজন উৎসবের তৃতীয় অর্থাৎ সর্বশেষদিন 'সন্ন্যাসীগণ শিব, গৌরী, ভূত, পিশাচে'র রূপসজ্জায় 'মন্দির প্রাঙ্গণে নৃত্য করে'।[৪১]

নোয়াখালী অঞ্চলে চৈত্র-সংক্রান্তি উপলক্ষে যে গাজন হয় তাতে শিব-পার্বতীর বেশধারীগণ শোভাগমনের অগ্রে অবস্থান করে। পুরো গ্রামে তারা ঢাকের তালে তালে নৃত্যগীতসহকারে অভিনয় প্রদর্শনপূর্বক চড়কতলায় উপস্থিত হয়। এই বিশেষ ধরনের নাট্যরীতি সে অঞ্চলে 'ঢাকী' বা 'ঢাঈ' নৃত্য নামে পরিচিত। (ঢাক+ঈ প্রত্যয়) = ঢাকী)। এই নৃত্যে ঢাকের ব্যবহার থেকে 'ঢাঈ' নামের উদ্ভব।[৪২] শিব-পার্বতীর চরিত্রে অভিনয়কারীদেরও 'ঢাঈ' নামে অভিহিত করা হয়। শিবের 'মৌলিক অর্থ রক্তবর্ণ'।[৪৩] কিন্তু পরিক্রমার কালে তিনি শুভ্রকরোজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। সে কারণে শিব পরবর্তীকালে ধর্মপূজায় শ্বেতবর্ণরূপে কল্পিত হয়েছেন। আমাদের লোকসাহিত্যে বা মঙ্গলগানে শিব অর্থে 'সূর্যাই' ব্যবহৃত হয়।

বরিশালে প্রাপ্ত শিব বিষয়ক একটি ছোট্ট পালাগানে সূর্যের উদয় থেকে মধ্য আকাশে উত্থানের পরোক্ষ-রূপকে সূর্যাই বা শিবাই ঠাকুরের বিবাহ এবং পত্নী গৌরীর সঙ্গে আপন গৃহে যাত্রার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। গৌরী অশ্রুসজল চোখে পতিগৃহে যাত্রা করছেন। সেই মুহূর্তে সূর্যাই সম্পর্কে নববধূ গৌরীর

অবিশ্বাস এবং পিতৃগৃহ ত্যাগের যে বেদনা তা এতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ধৃত হয়েছে। সংগৃহীত পালাটি 'অতি প্রাচীন'-বলে উল্লিখিত—

গৌরী । - তোমার দেশে যামুরে সূর্যাই আমি কাপড়ে দুঃখ পামু।
সূর্যাই । - নগরে নগরে আমি তাঁতিয়া বসামু।
গৌরী । - তোমার দেশে যামুরে সূর্যাই আমি শঙ্খের দুঃখ পামু।
সূর্যাই । - নগরে নগরে আমি শাঁখারি বসামু।
গৌরী । - তোমার দেশে যামুরে সূর্যাই আমি সিন্দুরের দুঃখ পামু।
সূর্যাই । - নগরে নগরে আমি বাণিয়া বসামু।

... ...

গৌরী । - তোমার দেশে যামুরে সূর্যাই আমি মা বলিব কারে?
সূর্যাই । - আমার যে মা আছে মা বলিবা তারে।
গৌরী । - তোমার দেশে যামুরে সূর্যাই আমি বাপ বলিমু কারে?
সূর্যাই । - আমার যে বাপ আছে বাপ বলিবা তারে।[৪৪] ইত্যাদি।

পালাটি প্রাচীন বলে স্বীকার করলেও এর ভাষা যে একালের তাতে সন্দেহ নেই।

এ ধরনের পালাগান চরিত্রাভিনয়-রীতি থেকে ভিন্ন পন্থায় পরিবেশিত হয়। পালাগায়ক এককভাবে কাহিনীটি বর্ণনা করে এবং উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক অংশ-গুলোতে দোহার বা দোহার মধ্যস্থিত বায়েন অংশগ্রহণ করে থাকে। আধুনিককালে পরিবেশনার এই রীতিকে বলা হয় 'বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতি'।[৪৫]

শিবোৎসবের অন্যতম অনুষ্ঠান 'গম্ভীরা'। নানা প্রসঙ্গে 'গম্ভীরা' কথাটার ব্যবহার দেখা যায়। ধর্মঠাকুরের আসন 'গম্ভীরা-কাঠ' নামে অভিহিত। ওড়িয়া ভাষায় নির্জন প্রকোষ্ঠকে বলা হয় 'গম্ভীরা'।[৪৬] অন্যদিকে শিবের আরেক নাম 'গম্ভীর'।[৪৭] শিব ও ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে গম্ভীরার দুটি স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান বিদ্যমান। মালদহে এই অনুষ্ঠানকে 'আদ্যের গম্ভীরা' বলা হয়। গম্ভীরা উৎসবে বিভিন্ন ধরনের দেবদেবীর 'মুখা' বা মুখোশ ব্যবহৃত হয়। মুখোশগুলো নানা চরিত্রজ্ঞাপক। যেমন—

ঃ কালিকা, চামুণ্ডা, নরসিংহ, বাসুলী, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, বুড়া-বুড়ি, শিব। এর সঙ্গে আছে ভূত, প্রেত, কার্তিক, খোঁড়া, চালী।[৪৮] এসব মুখোশ পরে গম্ভীরায় ভক্তগণ নৃত্য পরিবেশন করে থাকেন। এই অনুষ্ঠানের নৃত্যগীতাদিতে 'নারসিংহী' নামে বিশেষ ধরনের নৃত্য পরিবেশিত হয়।[৪৯]

গম্ভীরায় ময়ূর ও ভল্লুকের বেশ ধারণ করার রীতিও আছে। অভিনেতারা এ উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের পৌরাণিক দেবদেবীর অভিনয় করে থাকে। যেমন-শিব, পার্বতী, কালী, হনুমান। গম্ভীরা মূলত শিব বিষয়ক নাট্য। দিনাজপুর-রাজশাহী অঞ্চলে বর্তমানে প্রচলিত গম্ভীরা দুই চরিত্রবিশিষ্ট এবং তা মালদহের মতো কোনো বিশেষ উৎসবের অঙ্গ নয়।। প্রধানত মুসলমানরা নানা-নাতি'র চরিত্র অবলম্বনপূর্বক নৃত্যগীতের মাধ্যমে গম্ভীরা অভিনয় করে।

এই অনুষ্ঠানের সামগ্রিক পরিকল্পনা নিম্নরূপ ঃ

১. চৈত্র-সংক্রান্তি উপলক্ষে বা বছরের অন্য কোনো সময়ে গম্ভীরা অনুষ্ঠানের শুরু।

২. তৃতীয় দিনে মুখোশ নৃত্য।

৩. চতুর্থ দিনে প্রেত-প্রেতিনীর সাজে অভিনয়, ভোজপর্ব, আগুনের উপর ভক্তদের সাতবার দোল খাওয়া এবং 'ঢেকী চুমানো'। 'ঢেকী চুমানো'তে আছে নারদের রূপসজ্জা গ্রহণ।[৫০]

গম্ভীরার সাথে, কৃত্য ও নৃত্যের সম্পর্ক কিরূপ তা 'দ্বারমুক্ত' 'নিদ্রাভঙ্গ বা যোগভঙ্গ' 'নিদ্রা বন্দনা' প্রভৃতি অনুষ্ঠান দৃষ্টে বোঝা যায়। নিম্নে রাঢ়ীয় অঞ্চলে প্রচলিত 'নিদ্রা বা যোগভঙ্গ' উপলক্ষে নৃত্যগীতের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো—

।। নিদ্রাভঙ্গ বা যোগভঙ্গ।।

১

নিদ্রাভঙ্গ, প্রভু যোগনিদ্রা কর ভঙ্গ সেবকের দেখ রঙ্গ,
পরিহার তোমার চরণে।।

২

কার্ত্তিক গণেশ কোলে, শয়ন আছে নিদ্রা-ভোলে,
আমরা তোমায় প্রণাম করিব কেমনে।।
(নৃত্য-ইত্যাদি)

৩

নিদ্রা ত্যেজ দেবরাজ, রহমা খট্টার মাঝ,
নিরন্তর গৌরী রাখহ বাম ভাগে।।
(নৃত্য-ইত্যাদি)

৪

প্রভু তুমি দেব অধিপতি, হরি ব্রহ্মা করে স্তুতি,
অন্য দিব কোন খানে লাগে।।
(নৃত্য-ইত্যাদি)

৫

প্রভু ত্যেজহ নিদ্রার মায়া, সেবকেরে কর দয়া,
পুরা মর্ত্ত দেব ত্রিপুরারি।।

৬

শিঙ্গা ডম্বুর হাতে, বৃষভ রাখহ বামভাগে,
বাসুকি রহুক ধরি ফণা।
শিরে ধরি স্নিগ্ধ গঙ্গা, কপালে চাঁদ বেরি।
তথি মধ্যে শোভে ফৌটা, হাড় মালা যোগ-পাটা।
গায়ে শোভে বিভূতিভূষণ।।[৫১]
(নৃত্য-ইত্যাদি)

গম্ভীরার পরিবেশনা, গীত-নৃত্য ও রূপসজ্জার বিচিত্র আয়োজনে নাট্যেরই নামান্তর। এ জন্য কেউ কেউ এর মধ্যে আধুনিককালের 'বঙ্গ নাট্যের উন্নতির বীজ' 'নিহিত' আছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ কালের যাত্রা ও থিয়েটারের কৃত্রিম অভিনয়ের সঙ্গে তুলনাপূর্বক গম্ভীরার অভিনয়রীতিকে সরল হৃদয়ের 'অকৃত্রিম আমোদ-উচ্ছ্বাস' রূপে অভিহিত করা হয়েছে।[৫২]

প্রাচীন বাঙলার গার্হস্থ্য উৎসবের মধ্যে ভাদুপরব অন্যতম। 'ভাদ্র মাসের উৎসব' ইঁদ-পূজা বা বাস্তুপূজার সঙ্গে মিলিত হয়ে 'ভাদু পরবে'র সৃষ্টি।[৫৩] ভাদু গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান। এতে কুমারী নারীদের দুটি দল সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। এই উৎসব সারা ভাদ্রমাসব্যাপী চলে।[৫৪] 'সেক-শুভোদয়া' গ্রন্থে একটি প্রাচীন ভাদু গানের নমুনা পাওয়া যায়। ব্রত উপলক্ষে নদীতে 'মালসা-সরা' ভাসিয়ে সঙ্গীতমুখর মেয়েরা যখন ফিরে আসছিল তখন সেই দলে আত্ম-গোপনকারী দুই ডাকিনীর পথরোধ করেন 'সেক' দরবেশ। ডাকিনীদ্বয় তখন 'সেকের' মহত্ব ঘোষণাপূর্বক মুক্তি প্রার্থনা করে—

ঃ ... তারপর স্ত্রীলোকগণ ব্রতাচরণ করিয়া গঙ্গাতে স্নান করিয়া পুনরায় আসিয়াছিল। তারপর ডাকিনী দুইটি গান করিতে করিতে আসিয়াছিল। আসিয়া পথে দেখিয়াছিল একটি লোহার শিকল আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহা দেখিয়া ডাকিনী দুইটি ছলের দ্বারা সেককে অভ্যর্থনা করিয়াছিল।

ভাটিয়ালি রাগে গাহিয়াছিল।[৫৫]

ঃ হঙ যুবতী পতিয়ে হীন।
গঙ্গা সিনায়িবাক জাইয়ে দিন।।
দৈব নিয়োজিত হইল অকাজ।
বায়ু না ভাঙ্গ ছোট গাছ।।
ছাড়ি দেহ কাজু মুঞি জাঙ ঘর।
সাগর মধ্যে লোহার গড়।। ধ্রু।।
হাত যোর করিঞা মাঙ্গোদান।
বারেক মহাত্মা রাখ সম্মান।।
বড় সে বিপাক আছে উপায়।
সাজিয়া গেইলে বাঘে না খায়।।
পুনঃ পুনঃ পায়ে পড়িয়া মাঙ্গোদান।
মধ্যে বহে সুরেশ্বরী গাঙ্গ।।
শ্রীখণ্ড চন্দন হৃদয়ে শীতল।
রাত্রি হইলে বহে অনল।
পীন পয়োধর বাড়ে আগ।
প্রাণ যায় না গেল বাহিঞা ভার।
নয়ন্ বহিঞা পড়ে নীড়
জীয়ে না প্রাণী পলায়নে ভীতি।।

ইহাদের স্তুতি বাক্য শুনিয়া পরম দয়ালু সেক হুঙ্কারের সহিত বলিয়াছিলেন-

ঃ আশপাশে শ্বাস করে উপহাস
বিনা বায়ুতে ভাঙ্গে তালের গাছ।।
ভাঙ্গিল তাল লুম্বিস রেখা।
চল জাহ্ সখি পলাইল শঙ্কা।।

তারপর ডাকিনী দুইটি গান করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছিল"।[৫৬]

'ছলের দ্বারা' সেককে অভ্যর্থনার উল্লেখ থেকে ভাদু গানে অভিনয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

'মানভূমে' পৌষমাসের পার্বণ হিসেবে 'তুসু' পরবের উদ্ভব।[৫৭] প্রাচীনকালে মেয়েদের নৃত্য ও সঙ্গীতের আরেকটি রীতি 'চাঁচরী'। চাঁচরী বর্তমানে 'লুপ্ত গ্রাম্য উৎসবের নামেই' বিদ্যমান। অন্যদিকে 'জম্ভালিকা' নৃত্য থেকে রাজস্থানী 'ঝমাল' গানের উদ্ভব। এই ঝমাল গান থেকে বাঙলা লোকনাট্য 'ধামালী' ও 'ঝুমুরে'র উৎপত্তি।[৫৮] ধামালি শব্দের আভিধানিক অর্থ দুরন্তপনা, কৌতুক বা চাতুরী। ধামালি নৃত্য ও সঙ্গীত সহযোগে পরিবেশিত হয়। মূলত এই অনুষ্ঠান 'স্ত্রী সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ'। অনেক সময় 'দশ-পনের কি বিশ-পঁচিশজন স্ত্রীলোক' বৃত্তাকারে 'করতালি' ও নৃত্য সহযোগে এই গান পরিবেশন করে।[৫৯] পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের ভক্তিধর্মের প্রভাবে কৃষ্ণধামালির উদ্ভব। কৃষ্ণধামালিতে 'কৃষ্ণ বা চৈতন্যে'র কাহিনীও গীত হয়। সেকালে নবান্ন বা বিবাহ উৎসবে ধামালি পরিবেশনের রীতি ছিল। মধ্যযুগে ধামালির অনুসরণে 'গোপিনী কীর্তন' বা 'গোপিনী খেলা'র উৎপত্তি।[৬০] ধামালি প্রাচীনকালে বাঙলা থেকে আসামেও বিস্তৃত হয়। সিলেট সীমান্তবর্তী কাছাড় অঞ্চলে এর প্রচলন রয়েছে।

ধর্মপূজা ও ধর্মমঙ্গল ধারায় প্রাচীনকালে কৃত্য ও কাহিনী অবলম্বনপূর্বক বাঙলা নাট্যরীতির একটি বিশেষ দিক গড়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, 'ধর্মসাহিত্য রাঢ় অঞ্চলের দান'।[৬১] ধর্মপূজা মূলত সূর্যপূজা। কালক্রমে এতে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের ছায়াপাত ঘটে। এককালে এই পূজা আদি-অধিবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বর্তমানে এতে ব্রাহ্মণরাও অংশগ্রহণ করে থাকে।

ধর্মপূজায় মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রতীক শুক্লবর্ণের প্রভাব বিদ্যমান। ধর্মঠাকুরের 'সর্বশুক্ল' রূপ থেকে এই পূজ্য দেবতার উদ্ভবের সূত্র লভ্য।[৬২] ধর্ম-পূজায় এক সময়ে সাদা রঙের পাঁঠা বলি দেওয়া হতো। এতদ্ব্যতীত ধর্মপূজায় সাদা ফুল ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, হুগলী, বাঁকুড়া থেকে বিহার সীমান্ত অবধি ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচলিত। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে বৈদিক 'যজ্ঞকাণ্ডের' সঙ্গে ধর্মঠাকুরের 'পূজাকাণ্ডের' এবং বৈদিক নবীন ও প্রবীণ দেবতার সঙ্গে ধর্মঠাকুরের মিল আছে।[৬৩] শাস্ত্র, কৃত্য ও আচার এবং পালা এই তিন ধারায় ধর্মঠাকুরের পূজা সুবিস্তৃত। ধর্মপূজার আদি প্রবর্তক রামাই পণ্ডিতের নামে 'আগম পুরাণ' অর্থাৎ 'শূন্যপুরাণ' গ্রন্থটি, প্রচলিত।[৬৪] এতে ধর্মপূজার বিভিন্ন বিধান ছাড়াও; মুসলমানদের বঙ্গদেশ বিজয়ের প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। অবশ্য নানান পরীক্ষার পর 'শূন্যপুরাণ' যে, 'একটি মাত্র রামাই পণ্ডিতের লেখা' নয় এরূপ মতও কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন।[৬৫]

'শূন্যপুরাণ' আদ্যন্ত 'পাঁচালি সঙ্গীত'; অর্থাৎ ধর্মপূজার আচার ও কৃত্য অনুষ্ঠানকালে সমগ্র 'শূন্যপুরাণ' গীত ও পরিবেশিত হতো।

'শূন্যপুরাণ' বাঙলা পাঁচালি ধারার প্রথম কাব্য। রামাই পণ্ডিত একে বলেছেন 'পাঁচালী সঙ্গীত'। দ্বারমোচন গীতের ভণিতায় আছে—

ঃ পরভুর চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীযুত রামাই রচিল পাঁচালী সঙ্গীত।।[৬৬]

এ কাব্য 'গীত' রূপেও আখ্যাত হয়েছে—

ঃ শ্রী ধর্ম্ম চরণে গীত পণ্ডিত রামাই গাঅ।
কলুস নাসিব ভজ নিরঞ্জন পায়।।[৬৭]

শূন্যপুরাণের অধ্যায়গুলি নিম্নরূপ—

সৃষ্টি-[illegible]ত্তন, জলপাবন, টীকা-পাবন, পুষ্প-তোলন, দ্বারমোচন, ঘর দেখা, দানপতির ঘর দেখা, দ্বার মোচন, চনা-পাবন, নিয়মভাঙ্গা, বাটী জোগান, হোম, টীকা-প্রতিষ্ঠা, মন্দির নির্ম্মাণ, যম-পুরাণ, যমদুতসংবাদ, যমরাজ-সংবাদ, বৈতরণী, ধর্ম্মস্থান, রাজা হরিচন্দ্রের ধর্ম্মপূজা, অধিবাস, বেড়ামনুই, ধুনাজ্বালা, ঘোড়া সাজান, বারমাসি, সন্ধ্যাপাবন, মনুই, ঢেঁকী-মঙ্গলা, গাম্ভারী মঙ্গলা, ঘাট-মুক্তা, ধর্ম্মস্থান, তীর্থ-আবাহন, ধর্ম্মস্নান, ধর্ম্ম-সাজন, পুষ্পাঞ্জলি,

দেবস্থান, মুক্তা মঙ্গলা , ধর্ম্মপূজা, মুক্তিস্নান, চাস, নিঅম-ভঙ্গ, চনা-পাবন, টীকা-প্রতিষ্ঠা, হোমযজ্ঞ, ধর্ম্মের হাট, বৈতরণী, মুখশুদ্ধি কপুর পাণ, দেবীর মনঞি, ধর্ম্মের উদয়, ধর্ম্মস্থান, যজ্ঞ, তাম্রধারণ, ধর্ম্মরাজ প্রণাম, ছাগজন্ম ও শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা।

এ কাব্যে দু'একটি অধ্যায় কথকতার ঢঙে ও বাকি অধ্যায়গুলি গীত রূপে পরিবেশিত হতো। এই গীত কৃত্যমূলক অর্থাৎ তা মূল ধর্মপূজার নানা অনুষ্ঠানের অঙ্গ। এ কাব্যে গীতগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে একত্রে গ্রন্থিত হয়েছে মাত্র, কোনো ধারাবাহিক কাহিনী সূত্রে নয়। এ থেকে, প্রাচীন বাঙলার পাঁচালি-রীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। অধ্যায়গুলি সেকালে পাঁচালি ধারারই নমুনা রূপে গৃহীত হতে পারে। পাঁচালি তখনও কৃত্যমূলক পরিবেশনা। তা আখ্যান বা সুসম্পূর্ণ কাহিনী সংযোগে অভিনয়মূলক গেয়কাব্য হিসেবে পূর্ণতা লাভ করে নি।

শূন্যপুরাণের কোনো কোনো অধ্যায়ে গদ্য ও গদ্য-পদ্যের মিশ্রণ দেখা যায়। এই গদ্যের ভাষা প্রাচীনকালের কথকতারীতির—এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়—

।। অথ বারমাসি ।।

ঃ কোন মাসে কোন রাসি। চৈত্র মাসে মীন রাসি। হে কালিন্দিজল বার ভাই বার আদিত্ত। হস্তপাতি লহ সেবকের অর্ঘ পুষ্পপানি। সেবক হব আমনি ধামাৎকন্নি। গুরু পণ্ডিত দেউল্যা দানপতি। সাংসুর ভোক্তা আমনি। সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন। দুআরি দুআর পাল ভাণ্ডারী ভাণ্ডারীপাল রাজদূত কোমি কোটাল পরে সুখ মুকতি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার। দাতার দানপতির বিঘ্ন জাব নাস। কোন মাসে কোন রাসি। বৈশাখ মাস মেস রাসি। হে বসুদেব! বার ভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি লেহ সেবকর পুষ্প পানি। সেবক হব সুখী আমনি ধামাৎকন্নি। গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংসুর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী, গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারী ভাণ্ডারপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাবেক সুখ মুকতি। এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার। দাতা দানপতির বিঘ্ন জাব নাস। কোন মাসে কোন রাসি। বৈশাখ গেলে জ্যৈষ্ঠ মাস বৃস রাসি। হে হরিহর বার ভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি নেহ সেবকর অর্ঘ পুষ্প পানি সেবকহব সুখী আমনি ধামাৎকন্নি গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংসুর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল। ভাণ্ডারি ভাণ্ডার পাল।

রাজদূত কোমি কোটাল পাব সুখ মুকতি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার। দাতা দানপতির বিঘ্ন হব নাশ।[৬৮]

এ হচ্ছে প্রার্থনার ভাষা। গদ্য হলেও এর মধ্যে যমক অনুপ্রাসের ব্যবহার ও অন্ত্যমিল রচনার প্রবণতা লক্ষণীয়। এই গদ্য গীতল ও সুরেলা। নাট্যমধ্যে এ ধরনের গদ্যের নমুনা, শঙ্করদেব রচিত 'কালিয়দমননাটে' দেখা যায়। এ কালেও গাজীর গান প্রভৃতি লোকনাট্যে, গায়েন কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে রচিত গদ্য অনুরূপ। শূন্যপুরাণ যে পাঁচালি-রীতিতে পরিবেশিত হতো তার প্রমাণ উদ্ধৃত গদ্যাংশে সুখ মুকতি লাভের প্রসঙ্গে 'গায়েন বায়েনে'র উল্লেখ।

এ কাব্যে নারদ চরিত্রের বর্ণনার সঙ্গে পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণিত ও চৈতন্যদেব অভিনীত নাটকের 'নারদ' চরিত্রের মিল আছে—

ঃ সুনিআ মুনিরাজ বাহন করিল সাজ
ঢেঁকী-পিঠে করি আরোহন।
ভাবি জুগেসর চলিল মনিবর
সুনিআ বারমতি ভরণ।।
তেঠঙ্গ হইআ জাঅ ভেকর সঙ্গীত গাঅ
উড়িল দেব বিদ্দমানে।[৬৯]

এই কাব্যের 'টীকা-প্রতিষ্ঠা'য় 'নাটগীত' এর উল্লেখ দেখা যায়—

ঃ নাটগীত করে গতি এ চারি চৌপর রাতি
তামর অঙ্গুরী লইআ করে।।[৭০]

ঘর-দেখা অধ্যায়ে 'নাট' এর প্রসঙ্গ আছে—

ঃ ধবল আসনে ধর্ম্ম হোইল কৌতুক।
জত নাটে বাদ্য বাজে হৈল্য মহাসুখ।।[৭১]

'দেবস্থানে' শিব কর্তৃক নাট্য পরিবেশনের বর্ণনা পাওয়া যায়—

ঃ উদ্ধ পদ হেট মাথা করিএ পসুপতি।
সিঙ্গা ডুম্বুর সিব করিআ সংগতি।।
সিঙ্গ এত গান গীত ডম্বুরে ধরএ তাল।
ধর্ম্ম ধিআইআ সিব বাজাইছে গাল।।[৭২]

শিব পরিবেশিত এই নৃত্য-গীতই প্রাচীন বাঙলার নাটগীত। এতে শিবের নৃত্য-ভঙ্গির উল্লেখ থেকে দেখা যায় যে, সেকালে 'ধর্মপূজা'য় পা ঊর্ধ্বে ও মাথা নিচে

দিয়ে বিচিত্র ধরনের নৃত্য পরিবেশিত হতো। এতদ্ব্যতীত, এ নৃত্য একান্তভাবেই শিবের পরিবেশনা বলে তা সেকালে প্রচলিত শিব-বিষয়ক নাটগীতের রীতিরূপে বিবেচ্য।

'নাটগীত' ও 'গীতনাট' দু'ধরনের নাট্যরূপে বিবেচ্য। 'শূন্যপুরাণে'র 'অথ ধর্ম্মের হাট' গীতে আছে—

ঃ অপরূপ ধম্মর বাজার।
কেহ বেচে কেহ কিনে গীতনাট কেহ শুনে
কেহ দূরে করএ পসার।।[৭৩]

এ থেকে সেকালের মেলার চিত্রও লভ্য।

'শূন্যপুরাণে' 'যমদূত-সংবাদ' অধ্যায়ে 'নাটসাল' (নাটশাল)-এর পৌনপুনিক উল্লেখ পাওয়া যায়—

প্রথমে ঃ সুনার খেড় মন্দির সুনার নাটসাল।
চন্দ্রহাস খাঁড়া হাথত চন্দ্র কোটাল।।[৭৪]

তারপর

ঃ রূপার খেড় মন্দির রূপার নাটসাল।
গাছ পাথর হাথে হনুমন্ত কোটাল।।[৭৫]

এবং

ঃ হীরকর খেড় মন্দির হীরার নাটসাল।
জীবনাস চূড় হাথ উল্লুক কটাল।।[৭৬]

এই ধর্মপূজা বিধানের অঙ্গ হিসেবে 'দ্বারভেট' নামে এক শ্রেণীর উক্তি-প্রত্যুক্তি বা প্রশ্নোত্তরমূলক প্রথা প্রচলিত ছিল। দ্বারভেট 'হিন্দু-বৌদ্ধ বিরোধের যুগে শত্রু-মিত্র আপন-পর এবং স্বধর্মীর পরিচয় জ্ঞাত হবার উপায় হিসেবে উদ্ভাবিত হয়'।[৭৭] এ সময় মুসলমান পীর-ফকির-দরবেশদের নিয়ে রচিত হয় সংলাপমূলক কাব্য। 'শূন্যপুরাণে'র 'ছোট জালালী'[৭৮] অংশে হিন্দু-মুসলমানের ভেদ নিয়ে খোন্দকারের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর নাট্যসংলাপের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

এধরনের উক্তি-প্রত্যুক্তি সপ্তদশ শতকে রচিত 'ছওয়াল সাহিত্যে'র কথা মনে করিয়ে দেয়।

'শূন্যপুরাণে' 'রাজা হরিচন্দ্রের ধর্মপূজা' অধ্যায়ে আছে—

ঃ সূন্যে পূজএ হরিচন্দ্র বিসাদ ভাবিআ মতি।

নূতন মণ্ডপে পাদুকা নাই কামিন্যা পাইব কথি।।
করহ ইহা হরিচন্দ্র মানুস পাঠাও জন দস।
আচম্বিত বিসাই ঠেকিল রাজার সম্মুখে।।
সুক্রবার দিনে নিঅমে থাকিব আতপ তণ্ডুল খাইএ।
সনিবার ধর্ম্মপাদুকায় দিব জে গড়িএ।।
চারি দুআরে আলাম পুতিয়া দুআরে দুআরি আগে।
বেদমন্ত্র পড়িআ রামাই পণ্ডিত স্থাপিত সে পাদুকা।।
কান্দন্তি কামিন্যা ভাই কাজর ভাস্‌স নাই।
থাকুক পাদুকার দাএ ছলিল গোসাঞি।।
ধর্ম্মর চরণে গীত পণ্ডিত রামাই গাএ।
কলুস নাসিব ভজ নিরঞ্জনর পাএ।।[৭৯]

এই পূজায় কৃত্য হিসেবে হরিশ্চন্দ্রের পালা পরিবেশিত হতো—এরূপ অনুমান সঙ্গত।

ধর্ম ঠাকুরের পূজা-পদ্ধতিতে কৃত্য ও নাট্য অভিন্ন রূপেই বিদ্যমান। পূজ্যদেবতা এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও, পূজা-পদ্ধতির উপকরণ ও আচার অঞ্চলভেদে একরূপ নয়। যেমন—'কোন অঞ্চলে সাদা রঙের পশু' কিংবা 'কবুতর বলি দেওয়াই একমাত্র রীতি'।[৮০] আবার কোনো অঞ্চলে 'সাদা রঙের ছাগের অভাবে কালো রঙের ছাগ বলি দেয়া হয়'।[৮১]

এই পূজা-পদ্ধতি দুই রকমের—নিত্যপূজা ও বার্ষিক পূজা। আবার বারোয়ারী পূজা-উৎসব চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়ের যে-কোনো পূর্ণিমায় হয়ে থাকে। এক এক অঞ্চলে এক এক মাসে বাৎসরিক পূজা হয়। ধর্মঠাকুর শিলারূপে পূজিত হন। এর নাম ধর্মশিলা। একটি মন্দিরে সচরাচর তিনটি শিলা থাকে।[৮২]

পূজার পূর্বে 'ভক্ত্যাকামান' হয়। যে কেউ যে কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায়ের লোক এই ব্রত পালন করতে পারে। বৈশাখ মাসে পূর্ণিমার তিথিতে 'প্রদীপোপহার' সহকারে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভক্তবৃন্দের আগমন ঘটে। সন্ধ্যার পূর্বেই বিভিন্ন ধরনের (তৈল ও সলিতাসহ মাটির প্রদীপও থাকে) প্রদীপ ধর্মঠাকুরের মন্দিরের অভ্যন্তরে জ্বালানো হয়। তখন 'আলোকময় মন্দিরের অভ্যন্তর ঝলমল' করে।[৮৩]

উৎসবের তিনচারদিন পূর্ব থেকেই 'ধর্মশিলা তিনটিকে' একবার মন্দির প্রাঙ্গণে ও একবার মন্দিরের অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। 'ঢাকের বাদ্য সহকারে' এই আসা যাওয়ার পদবিক্ষেপে দেবতা যেনবা মন্দির থেকে নিক্রমণ কামনা করেন না এমন একটি অভিনয় দেখান ভক্ত্যাগণ। এই অভিনয় বহুক্ষণ চলে।

এরপর আছে লাপড়া ভাঙ্গা। বাঁকুড়া ও মানভূমে ধর্মঠাকুরের পূজায় যুদ্ধের অভিনয়কে 'লাপড়া ভাঙ্গা' বলে। উক্ত অনুষ্ঠানে মন্দির প্রাঙ্গণে পূর্ব থেকে সংগ্রহকৃত কন্টকযুক্ত বৃক্ষ নিয়ে ভক্ত্যাগণ নৃত্য সহকারে পরস্পর 'MOCK-FIGHT' -এ লিপ্ত হন। এ কৃত্রিম যুদ্ধ অভিনয়েরই নামান্তর। অবশ্য এতে 'কন্টকারী'র আঘাতে 'ভক্ত্যাদের দেহ ক্ষতবিক্ষত' হয়।[৮৪] 'লাপড়া ভাঙ্গা'র এই কৃত্যাভিনয়ের রীতি প্রাচীন মিশরের 'ওসিরিসের' পালার অভিনয়ে, পক্ষ-প্রতিপক্ষের রক্তাক্ত সংঘর্ষের কথা মনে করিয়ে দেয়।

'পাট-ভক্ত্যা' 'নগ্নগাত্রে' মন্দির প্রাঙ্গণে কাঁটার উপর দিয়ে আবর্তিত হন—সঙ্গী ভক্ত্যারাও তাঁকে অনুসরণ করেন।

এরপর 'স্নানোৎসব'। স্নানদানের জন্য পুকুরে নীত ধর্মঠাকুরের শিলাধৌত পানির প্রথম বিন্দু মাথায় নেয়ার জন্য বন্ধ্যা নারীদের অনুষ্ঠান এটা। স্নান শেষে শিলাকে পুনরায় মন্দিরে আনা হয়।[৮৫] তারপর 'লোটন', শোভাযাত্রার অগ্রবর্তী ভক্ত্যাদের মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে মন্দির প্রাঙ্গণ পর্যন্ত আসা। পরবর্তী অনুষ্ঠান 'ফুল-খেলা'। দেবতাকে প্রণাম করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান ভক্ত্যাগণ। এরপর মন্দির প্রাঙ্গণে জ্বলন্ত অঙ্গার থেকে তাঁদের হাতে এক-একটি অঙ্গার তুলে দেয়া হয়। তাঁরা সেগুলো বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে এক হাত থেকে তৎক্ষণাৎ অন্যহাতের তালুতে ফেলে দেন, তারপর তা আবার তাঁদের হাতেই ঘুরে আসে। নিভে গেলে পুনরায় 'জ্বলন্ত অঙ্গারে' করতল পূর্ণ করা হয়। এতে একটি অর্ধবৃত্ত 'চলমান' অগ্নিরেখা তৈরী হতে থাকে।[৮৬] এরপর 'ফুল চাপানোর পালা' ও 'উতুরী খোলা'।

'চন্দ্রের তৃতীয় তিথিতে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যসূচক ধর্মমঙ্গল গান হয়'। মোট চব্বিশটি পালায় ধর্মমঙ্গলের কাহিনী বিভক্ত। বার দিন ধরে প্রত্যহ দুই পালা করে এই চব্বিশ পালা পরিবেশিত হয়। তবে পালারম্ভের প্রথমদিন এবং পূর্ণিমার পরের দিন একটি করে পালা গীত হয়। 'সর্বশেষ রাত্রির পালাটি দীর্ঘতম', সমগ্র রাত্রিব্যাপী এই পালাটি গীত হয় বলে এর নাম 'জাগরণপালা'।[৮৭]

ধর্মমঙ্গলে বিবৃত কাহিনীর নায়ক লাউসেনের কাল দ্বাদশ শতক বলে উল্লিখিত হয়েছে। এই কালেই 'ধর্মমঙ্গল' উপাখ্যানের উৎপত্তি। কিন্তু লাউসেনের নাম ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। কাজেই 'ঐতিহাসিক সূত্র' থেকে লাউসেনের পরিচয় উদঘাটন করা সম্ভব নয়। কেউ কেউ মনে করেন হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী ধর্মমঙ্গলের মূল উপজীব্য। পরে লাউসেনের কাহিনী এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। 'হরিশ্চন্দ্র পৌরাণিক ব্যক্তি' এবং তার পুত্র 'লুহিচন্দ্র' হচ্ছেন 'পৌরাণিক রোহিতাশ্ব'।[৮৮]

হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী ধর্মমঙ্গলের বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে উল্লিখিত হয়েছে।[৮৯] এ কাহিনী ধর্মমঙ্গলের অন্তর্গত হলেও, ধারণা করা যায় তা কাব্যে গৃহীত হবার পূর্বে স্বতন্ত্র পালারূপে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে হরিশ্চন্দ্রের পালা নাটকের আকারে সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে গৃহীত হয়েছিল তা থেকেও এ ধারণা সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। নেপালে 'হরিশ্চন্দ্র নৃত্য' নাটক রচিত হয়েছে, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী 'মারমা' নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যেও নাট্যরূপে 'হরিশ্চন্দ্রের' পালা প্রচলিত আছে।

ধর্মমঙ্গল বাঙলা নাট্যের আবহমান কালের রীতি অর্থাৎ গায়েন-দোহার রীতিতে পরিবেশিত হয়। এতে একজন মূল গায়েন থাকে। সঙ্গে দু'চারজন 'দোহার'। নৃত্যের জন্য গায়েনের পায়ে ঘুঙুর ব্যবহৃত হয় এবং তাঁর হাতে ধর্মের আশীর্বাদ ও আরোগ্যদানের প্রতীক 'চামর' থাকে। গায়েন নৃত্য ও 'অঙ্গভঙ্গিসহকারে' ধর্মমঙ্গলের 'আখ্যানমূলক পদগুলি' পরিবেশন করেন। এই সঙ্গে 'সামান্য কিছু বাদ্যের ব্যবস্থা থাকে।' গায়েনের পদে দোহারেরা 'ধুয়া করে'।[৯০]

প্রাচীন বাঙলা-নাট্যরীতির প্রামাণ্য হিসেবে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেবের (১২শতক) 'গীতগোবিন্দের' নাম উল্লেখ করা যায়। কবি জয়দেব বাঙলা প্রভৃতি আধুনিক আর্যভাষার আদি কবিও বটেন।[৯১] গীতগোবিন্দের সাধারণ গদ্য 'শৌরসেনী প্রাকৃতে' রচিত।[৯২]

এ কাব্যের সর্গ সংখ্যা বার, গান চব্বিশ আর শ্লোক সংখ্যা আশি।

'গীতগোবিন্দের' আঙ্গিক 'কাব্যের নয়, গেয়কাব্যের অর্থাৎ এ হচ্ছে আসরকেন্দ্রিক পরিবেশনমূলক কাব্য। গীতিনৃত্য ও বর্ণনার মাধ্যমে এ কাব্য আসরে পরিবেশিত হতো। বিশেষজ্ঞের মতে 'গীতগোবিন্দ' 'একটি নৃত্য সম্বলিত গীতিনাট্য'।[৯৩]

সামোদ-দামোদর সর্গে, জয়দেব তাঁর কাব্যকে বলেছেন 'শ্রীবাসুদেব-রতি-কেলি-কথা'। অর্থাৎ এ কৃষ্ণলীলা কাব্য। উল্লিখিত সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকে আছে—

ঃ বাগ্‌দেবতা-চরিত-চিত্রিত-চিত্ত-সদ্মা
পদ্মাবতী চরণ-চারণ-চক্রবর্তী ... ...।।

এ উক্তির 'সঙ্গত' অর্থ হচ্ছে—'যিনি পদ্মাবতীর অর্থাৎ সরস্বতীর চরণে গায়কদের 'অধ্যক্ষ'। এখানে 'অধ্যক্ষ' হচ্ছেন অধিকারী।[৯৪] পদ্মাবতী জয়দেবের পত্নী এবং মন্দিরের নৃত্য-পটিয়সী 'সেবাদাসী'। তিনি পুরীর মন্দিরে সমর্পিতা ছিলেন বলেও উল্লেখিত হয়েছে।[৯৫] গীতগোবিন্দ 'পালাগান' এবং 'পদ্মাবতী' এতে নৃত্য করতেন।[৯৬]

প্রথম সর্গের তৃতীয় সংখ্যক শ্লোকে জয়দেব তাঁর কাব্যকে-'মধুর-কোমলকান্ত-পদাবলী'রূপে আখ্যায়িত করেছেন। গীতগোবিন্দ সম্পর্কে কবির এই উক্তি নিঃসন্দেহে যথার্থ। এ সর্গের পঁচিশ সংখ্যক শ্লোকে কবি তাঁর কাব্যকে বলেছেন 'মঙ্গলমুজ্জ্বল গীতম'। কাজেই এ হচ্ছে মঙ্গল-গান।

দ্বাদশ সর্গে আটাশ সংখ্যক শ্লোকে জয়দেব নানা শাস্ত্রে নিপুণতা লাভে অভিলাষীদের সানন্দে এই কাব্য অধ্যয়ন করতে বলেছেন—

ঃ যদ গান্ধর্ব-কলাসু কৌশল মনুধ্যানঞ্চ যদবৈষ্ণবং
যচ্ছৃঙ্গার-বিবেকতত্ত্বমপি-যৎ কাব্যেষু লীলায়িতম্।
তৎসর্ব্বং জয়দেব-পণ্ডিতকরে ঃ কৃষ্ণৈকতানত্মন ঃ
সানন্দঃ পরিশোধয়ুন্ত শ্রীগীতগোবিন্দতঃ।।[৯৭]

('হে সুধীগণ, যদি গান্ধর্বকলাশাস্ত্র রাগরাগিণীতে থাকে অনুরাগ, সর্ববিশ্বে স্থিত বিষ্ণুর বন্দনায় ব্যাকুলতা যদি থাকে, যদি জাগে বাসনা, শৃঙ্গাররস বিবেকতত্ত্ব ললিত কাব্যলীলা নৈপুণ্যলাভে ; তবে সানন্দে কর পাঠ কৃষ্ণগতপ্রাণ পণ্ডিত কবি জয়দেব রচিত কান্তপদ শ্রীগীতগোবিন্দ'।)[৯৮]

গান্ধর্ব প্রভৃতি কলা সম্পর্কিত জ্ঞান লাভের নিমিত্তে গীতগোবিন্দ আয়ত্ত করার যে প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে তা এ কাব্য পরিবেশনের একটি বিশেষ পন্থাও

নির্দেশ করে। গান্ধর্ববিদ্যা হচ্ছে সঙ্গীতবিদ্যা। গীতগোবিন্দের প্রতিটি গীত, শাস্ত্রীয় রাগরাগিণী নির্ভর। প্রথম সর্গের চব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে আছে—

ঃ তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয়।
কুরু কুশলং প্রণতেষু
জয় জয় দেব হরে।।

এখানে 'বয়ম' শব্দটির অর্থ 'গীতনাট্যের গায়ক বাদক দল'।

দ্বাদশ সর্গের সর্বশেষ শ্লোকে আছে—

ঃ শ্রীভোজদেব প্রভবস্য বামাদেবীসুত-শ্রীজয়দেব কাব্য।
পরাশরাদি-প্রিয়বন্ধু-কণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দ-কবিত্বমস্তু।।

এ থেকে অনুমিত হয়েছে, 'পরাশর' প্রমুখ প্রিয় বন্ধু এই গীতনাট্যে 'দোহার ও বায়ন' হিসেবে অংশগ্রহণ করতেন।[৯৯]

দ্বাদশ সর্গের অন্তে, ভণিতায় জয়দেব তাঁর কাব্যকে 'শ্রীগীতগোবিন্দ মহাকাব্য' বলেছেন। সর্গ সংখ্যা বিচারে একে মহাকাব্য বলা যায়। কিন্তু তা অলঙ্কারশাস্ত্রের বাহ্যলক্ষণ মাত্র। গীতগোবিন্দ বৃহদায়তন গীতিনাট্য, মহাকাব্য নয়।

গীতগোবিন্দের সন্দর্ভগুলি 'অধিকারী স্তোত্রের মতো আবৃত্তি করতেন' এবং সে অনুসারে 'অভিনয়কালে পৃথক পৃথক কুশীলব' অংশগ্রহণ করত বলে অনুমিত হয়েছে। পরবর্তীকালে উড়িষ্যার কীর্তনীয়া ও অঙ্কীয়ানাট দৃষ্টে মনে করা হয় যে, সে-সকল নাটকে গীতগোবিন্দের উপস্থাপনারীতি বিদ্যমান। গীতগোবিন্দে সখী, রাধা ও কৃষ্ণ এই তিন চরিত্রে তিনজন কুশীলব অংশগ্রহণ করত। কাহিনীর সূত্র ধরিয়ে দিতেন 'স্বয়ং গ্রন্থাকার' অর্থাৎ সূত্রধার।[১০০]

কেউ কেউ বলেছেন, 'গীতগোবিন্দে' যাত্রার বৈশিষ্ট্য '(Substance of Yatra)' রয়েছে।[১০১] আবার এরূপ মতও আছে যে, জয়দেবের গীতগোবিন্দে 'রাধা ও কৃষ্ণে'র ভূমিকা 'পুতুল দ্বারা দেখান হত'-অর্থাৎ পুতুলনাচের মাধ্যমে এ কাব্য পরিবেশিত হতো।[১০২]

উল্লিখিত মতামত আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে এ কাব্য চরিত্রানুগ পৃথক পৃথক কুশীলবের দ্বারা পরিবেশিত হতো কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

'গীতগোবিন্দে'র কাব্যদেহ শ্লোক ও গীতের সমন্বয়ে রচিত। শ্লোকে কাহিনী, নাট্যপটভূমির বিবরণ দান এবং পাত্রপাত্রীর মনোভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর

প্রথম সর্গের প্রথম গীত, প্রারম্ভিক মঙ্গলাচরণ। অবশিষ্ট গীতসমূহ সহচরী, রাধা ও কৃষ্ণের বচন।

প্রথম সর্গে, চারটি শ্লোকে কুঞ্জদ্রুমে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার প্রস্তাবনা, পদ্মাবতীর স্তুতি, কাব্যের মনোহারিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কবির বিশ্বাসগত উচ্চারণ বিবৃত হয়েছে।

এরপর ধ্রুবপদসহ দুটি সমবেত মঙ্গলাচরণ গীত। দ্বিতীয় গীতের শেষে আছে কবির ভণিতা এবং নাট্যারম্ভের ইঙ্গিত। তৃতীয় সন্দর্ভের গীত পূর্বশ্লোকে আছে, প্রকৃতিতে বসন্তসমাগমে 'কন্দর্প-জ্বর-জনিত' চিন্তাকুলা রাধা বনে বনে কৃষ্ণের অন্বেষণে ফিরছেন। তখন রাধিকার এক সহচরী 'সরস' বচনে বসন্তবর্ণনা শুরু করে। সখীর এই বর্ণনা তৃতীয় সংখ্যক গীতে ধৃত হয়েছে। বসন্তে যখন প্রকৃতিতে 'ললিত-লবঙ্গলতার' স্পর্শে 'মলয়' সমীর কোমল হয়ে ওঠে, নীলমণি কৃষ্ণ 'সরস বসন্তে' 'যুবতী জনের' সঙ্গে নৃত্যরত। গীতের মনস্তাত্ত্বিক লক্ষ্য রাধার সন্তাপ বৃদ্ধিপূর্বক কৃষ্ণসমাগমে তার আগ্রহ দ্বিগুণ করা।

এই গীতের শেষে সখী, কেলিমুখর কৃষ্ণের 'অনেক নারী-পরিরম্ভ'নের দৃশ্য দেখিয়ে পুনরায় রাধাকে বলতে শুরু করে। এবার সখীর দ্বিতীয় গীত, অন্য নারীদের সঙ্গে ক্রীড়াশীল কৃষ্ণের দুই কানের মণিকুণ্ডলও অপরূপ শোভায় দুলছে। সখী অনুপুঙ্খ বর্ণনা উপস্থাপন করে কেলিদৃশ্যের। দশটি স্তবকে বিবৃত গীতের নবম স্তবকে আছে কবির ভণিতা, (সর্বশেষ শ্লোকের সঙ্গে পরবর্তী সর্গ অর্থাৎ দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত ঘটনার অসঙ্গতি আছে)।

দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভিক শ্লোকে আছে রাধার মানসিক প্রতিক্রিয়া। সখীকে তিনি 'দীন' কণ্ঠে আপন মনোভাব ব্যক্ত করলেন, এ হচ্ছে তার 'খেই' বা বচন-সূত্র (Cue)।

এরপর রাধার সংলাপ। এতে কৃষ্ণের অন্য নারীতে আসক্তির কারণে রাধার অন্তরবেদনা এবং পূর্বস্মৃতির আবিষ্টতা বিবৃত হয়েছে।

গীতের ৮ম শ্লোকে কবির ভণিতা, ৯ম শ্লোকে আছে রাধার উক্তির ধারাবাহিকতা। এরপর পুনরায় রাধার উক্তি। এর বিষয় স্মৃতিচারণা। কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের পূর্বসূত্র বর্ণিত হবার ফলে কাহিনী পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে। গীতের অষ্টম শ্লোকে কবির ভণিতা, এরপর আরও তিনটি স্তবকে, রাধার উক্তির ধারাবাহিকতা।

তৃতীয় সর্গের প্রারম্ভে পূর্ববর্তী সর্গের মতই শ্লোক আছে। এবার শ্লোকের বিষয়, রাধাকে না পেয়ে বিরহকাতর কৃষ্ণের অন্বেষণ। মানিনী রাধা কৃষ্ণকে অন্য গোপীতে আসক্ত দেখে মনোদুঃখে চলে গেছেন।

চতুর্থ সর্গে গায়েন বা সূত্রধারের শ্লোক। এবার প্রণয়বেদনা-কাতর কৃষ্ণকে দেখে, রাধার সহচরীর উক্তি। সহচরী রাধার বিরহদশা বর্ণনা করছে কৃষ্ণের কাছে। নবম পদে পুনরায় কবির ভণিতা, এরপর নবম সন্দর্ভ। এবার সখীর গীত, কৃষ্ণকে রাধার কাছে যাবার মিনতি জানায় সে। সমগ্র 'গীতগোবিন্দে' গীত ও শ্লোকের বিন্যাস এ ধরনেরই।

'গীতগোবিন্দের' চরিত্র সংখ্যা তিন—সখী, রাধা ও কৃষ্ণ। সমগ্র কাব্যে দেখা যায়, একই সময়ে একটি চরিত্র ক্রমাগত বলছে, অন্যজন তা শুনছে। প্রতিজনের উক্তির শেষে আছে শ্লোক। এ সকল শ্লোক চরিত্রের উক্তি নয়, মূলগায়েনের অর্থাৎ সমালোচকের মতে 'সূত্রধারে'র বা 'অধিকারী'র। এই গীতিনাট্যে দুই চরিত্রের উক্তির মধ্যবর্তী স্থলে আছে গায়েন। অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে সখী, রাধা ও কৃষ্ণচরিত্রে পৃথক পৃথক কুশীলবের অভিনয়ের সম্ভাবনাও নাকচ করা যায় না। দুই-সংলাপের মধ্যে সূত্রধারের উক্তি পরবর্তীকালে আসামে শঙ্করদেবের অঙ্কীয়া লীলানাটেও দৃষ্ট হয়। কিন্তু এ কাব্যে পৃথক পৃথক চরিত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রতি চরিত্রের উক্তিতেই কবির ভণিতা বিদ্যমান। শুদ্ধ চরিত্রাভিনয়ের পক্ষে তা নিঃসন্দেহে অন্তরায়স্বরূপ। আবার এই ভণিতা মূল গায়েনের নয়। সে ক্ষেত্রে এরূপ ধারণাই সঙ্গত যে, এই ভণিতা চরিত্র কর্তৃকই গীত হতো।

প্রতি গীতে ধ্রুবার উপস্থিতি থেকেও 'গীতগোবিন্দে'র পরিবেশনারীতি অনুধাবন করা যায়। সমগ্র 'গীতগোবিন্দে'র উক্তিরূপে পরিবেশিত গীতগুলি সংলাপ হিসেবে অনেক দীর্ঘ। এই গীত নৃত্যপর কোনো চরিত্রের পক্ষে আদ্যন্ত অখণ্ড রূপে গেয়ে শোনানো সম্ভব নয়। উপরন্তু একক কণ্ঠে সুবিস্তৃত একটি গীতমূলক সংলাপ একঘেঁয়ে ও বৈচিত্র্যহীন হয়ে উঠতে পারে। সেই জন্যে, গীতের প্রতি স্তবকে প্রথম স্তবকের ধুয়া দৃষ্ট হয়। ধুয়ার এই ব্যবহার পরবর্তীকালে প্রায় একই বিষয় নিয়ে রচিত রামানন্দরায়ের 'জগন্নাথবল্লভ নাটকে'ও আছে। একালের বাঙলা লীলানাটকও (যথা-কৃষ্ণলীলা) ত্রিচরিত্র বিশিষ্ট এবং চরিত্রাভিনয় সত্ত্বেও তাতে গীতমাত্রেই দোহার-সহায়তা বিদ্যমান ; কাজেই চরিত্রাভিনয়ের কথা স্বীকার করলেও দেখা যায় এ কাব্যের পরিবেশনায় দোহারের ভূমিকা ছিল।

দ্বাদশ সর্গের ত্রিশ সংখ্যক স্তবকে 'পরাশরাদি প্রিয় বন্ধু কণ্ঠে'র উল্লেখ থেকেও 'গীতগোবিন্দে' গায়ন ও দোহারের ভূমিকার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞের মতে এ কাব্য 'মঙ্গলগানে'র অনুরূপ দলীয়ভাবে পরিবেশিত হতো। এ কথা স্বীকার করলে এ কাব্যে তিনটি চরিত্রের পৃথক অভিনয় সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। কারণ মঙ্গলগানে একজন মাত্র মূল গায়েন, এবং বায়েনসহ দোহারের দল থাকে। জয়দেবের কাব্যে কৃষ্ণবন্দনার আধিক্য থেকে একথাও স্পষ্ট যে কাব্যটি কেবল রতিমূলক নয় আরতিমূলকও বটে। যদি তাই হয় তবে এর পরিবেশনায় কৃত্য-পাঁচালির রীতি অনুসৃত হওয়া স্বাভবিক।

চব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে উল্লিখিত 'বয়ম' শব্দটির নির্ণয় হয়েছে 'গীতিনাট্যের গায়কবাদক দল'—অর্থাৎ জয়দেব কাব্যমধ্যেই এর পরিবেশনরীতির ইঙ্গিত দিয়েছেন। অন্যদিকে গীতগোবিন্দের দ্বিতীয় সংখ্যক শ্লোকের যে অর্থ নির্ণীত হয়েছে তা থেকে এ পালায় নৃত্য ও অভিনয়ে শুধু 'পদ্মাবতী'র অস্তিত্বই স্বীকার করতে হয়। কবি জয়দেব নিজেকে 'পদ্মাবতী' 'চরণ-চারণ-চক্রবর্তী' রূপে উল্লেখ করেছেন। এখানে 'চক্রবর্তী' অর্থ দলের অধিকারী, 'চরণচারণ' হচ্ছে 'গায়ন ও বায়ন'। কাজেই পদ্মাবতী এ কাব্যের পরিবেশনায় মূল অভিনেত্রীরূপেই বিবেচ্য। ধারণা করা যায় গীতগুলি চরিত্রগত বলেই মঞ্চে একই সঙ্গে নৃত্য ও গীত পরিবেশন করতেন তিনি। এর সঙ্গে ছিল অধিকারী বা মূল গায়েনের শ্লোক ও দোহারদের ধ্রুবা।

অবশ্য এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সমগ্র গীতগোবিন্দ বর্ণনাত্মক-নাট্যকৌশলের আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে। সখী, রাধা বা কৃষ্ণের সংলাপ ভিন্ন ভিন্নভাবে নির্দেশিত হলেও, তা যে কেবল চরিত্রাভিনয়ের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য এরূপ ধারণার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। সমগ্র কাব্যটি কবিনন্দিত পদ্মাবতী (সেক শুভোদয়া দৃষ্টে বলা যায় তিনি জয়দেবের স্ত্রী) বা একজনের পক্ষেই নৃত্যগীতের মাধ্যমে পরিবেশন সম্ভব।

কারো কারো মতে 'গীতগোবিন্দ' 'দেব-মন্দিরে' পরিবেশিত হতো।[১০৩] এ থেকে ধারণা করা যায় যে, পদ্মাবতীর আহার্য দেববিগ্রহের সামনে নৃত্যোপযোগী করেই রচিত হতো। 'গীতগোবিন্দে' বর্ণিত রাধার সাজসজ্জায় পদ্মাবতীর রূপসজ্জার ইঙ্গিত রয়েছে। অন্যদিকে রাধার রূপবর্ণনা গীতগোবিন্দের সর্বত্র এমন একটি ধ্রুপদী সৌন্দর্য-বর্ণনারীতি অনুসরণ করেছে যে নৃত্যকালে পদ্মাবতীর পক্ষে, 'নৃত্ত'-এর 'সাধারণী' রীতি অনুসরণ করা অসঙ্গত বলেই মনে হয়। সে

ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে পাঁচালি রীতিতে পরিবেশিত হলেও গীতগোবিন্দের পরিবেশনায় ধ্রুপদী নৃত্যের মুদ্রা প্রযুক্ত হতো। এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় পদ্মাবতীর পুরীর মন্দিরে অবস্থানের উল্লেখ থেকে। পুরী মন্দিরে পরিবেশিত নৃত্য লৌকিক-রীতির অনুসারে না হয়ে মার্গীয় হওয়ারই কথা। উপরন্তু সেকালে বাঙলার উচ্চকোটি সমাজে প্রচলিত নৃত্যে ও গীতে দাক্ষিণাত্যের প্রভাব ছিল। প্রাচীন বাঙলার 'সঙ্গীত সাধনায় দক্ষিণী প্রভাব অস্বীকার করা যায় না' এবং 'নৃত্যেও সে প্রভাব ছিল, বিশেষত সেবাদাসী নৃত্যে'।[১০৪] এ জন্যে 'গীতগোবিন্দে'র পরিবেশনারীতি সম্পর্কে নতুন করে ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে।

'গীতগোবিন্দে' যাত্রার বৈশিষ্ট্য আছে, এরূপ অভিমত সম্পর্কে বলা যায় যে, নাটক হিসেবে 'যাত্রা' আঠার শতকের পূর্বে বিদ্যমান ছিল এরূপ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

'গীতগোবিন্দে' রাধাকৃষ্ণের অংশ পুতুল দ্বারা দেখানো হতো এরূপ মতও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আদি বা মধ্যযুগে পুতুলনাচের জন্য স্বতন্ত্র ও বিপুল বিস্তৃত কোনোরূপ নাট্যগীত রচিত হবার দৃষ্টান্ত নেই। উপরন্তু পুতুলনাচ একটি স্বতন্ত্র শিল্প মাধ্যম। এর পরিবেশনা প্রস্তুতি সব কিছুই নাটক থেকে ভিন্ন। এ কাব্যের উপস্থাপনায় পদ্মাবতী, পরাশর প্রমুখের অংশগ্রহণের সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে, কাজেই সমগ্র নাট্য পরিবেশনায় মাত্র দুটি চরিত্রের ক্ষেত্রে পুতুল ব্যবহার করা হতো, এরূপ মত স্বীকার করা যায় না। তবে স্বতন্ত্রভাবে গীতগোবিন্দের বিভিন্ন পালা কিংবা সেকালে প্রচলিত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক আখ্যান পুতুলনাচের মাধ্যমে প্রদর্শিত হতো, একথা স্বীকার করা যায়।

জয়দেবের গীতগোবিন্দের আঙ্গিক ও পরিবেশনা, গায়েন-দোহার অধ্যুষিত প্রাচীন বাঙলা নাট্যরীতিরই অংশ। তবে এই রীতির খানিকটা সেকালের উচ্চবিত্ত সমাজে নৃত্যগীতের রুচি দ্বারাও প্রভাবিত। 'আর্য্যাসপ্তশতী' দৃষ্টে বলা যায় দ্বাদশ শতকে গৌড়বঙ্গে 'নৃত্য ও অভিনয়ের প্রচলন ছিল'।[১০৫] সচরাচর পরিশীলিত গণিকা-কন্যাগণ হাব-ভাব-রস যুক্ত উচাঙ্গের নৃত্যাভিনয় পরিবেশন করত। সে-কালের গৌড়বঙ্গের এই নৃত্যাভিনয়ের ধারাও 'গীতগোবিন্দে'র পরিবেশনা-রীতির ক্ষেত্রে বিচার্য।

'গীতগোবিন্দ', পরবর্তীকালে বাঙলা সীমান্তবর্তী প্রাদেশিক নাট্যধারায় বিপুল প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিল। মিথিলার কীর্তনীয়া নাটক, উড়িষ্যার লীলানাটক,

অসমীয় অঙ্কীয়া নাট ও নেপালের বাঙলা-মৈথিলী নাটকে নানা মাত্রায় গীতগোবিন্দের অনুসৃতি বিদ্যমান।

লক্ষণসেনের সভাসদ হলায়ুধ মিশ্রকৃত 'সেক শুভোদয়া'[১০৬] পীর মাহাত্ম্যমূলক রচনার আদি নিদর্শন। এ গ্রন্থ সংস্কৃতে রচিত, তবে এতে বাঙলার কিছু 'আর্য্যা' ও ছড়া-প্রতিম মন্ত্র রয়েছে। শেখ জালালুদ্দিন তাবরিজি'র অলৌকিক মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যেই এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। অবশ্য কেউ কেউ জাল গ্রন্থ হিসেবে এর প্রাচীনত্ব নাকচ করে দিয়েছেন। কিন্তু নানা সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা গেছে গ্রন্থটি জাল নয়।[১০৭]

বিশেষজ্ঞের মতে 'সেখ শুভোদয়া' ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বের নয়। কিন্তু এতে বিধৃত ইতিহাস ও সংস্কৃতির যে পরিচয় বিদ্যমান তা যথেষ্ট পরিমাণ প্রাচীন ('Sufficiently old')।[১০৮] 'সেখ শুভোদয়া'য় আরব্য ও পারস্য-রোমান্সের ধারার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে-'কথাসরিৎসাগরে'র গল্প-কথনরীতি।

'সেখ শুভোদয়া'য় কথকতার ঢঙ বিদ্যমান। এবং এই গল্পকথায় বক্তা ও শ্রোতার সুস্পষ্ট ভূমিকা রয়েছে। বিঘ্ন-বিদূরণ ও ইহলৌকিক কল্যাণের উদ্দেশ্যেই এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। 'প্রাদুর্ভাব' নামক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, 'লোক সভাতে সেকের চরিত্র সম্যক শ্রবণ করিলে বিঘ্ন বা চৌরভয় সেখানে থাকে না'।[১০৯]

'লোকসভা' হচ্ছে শ্রোতা-দর্শক, সুতরাং সেখ শুভোদয়া আসরের সামগ্রী রূপেই গণ্য।

এ গ্রন্থে ধৃত 'মিশ্রোপাখ্যান' (ত্রয়োদশ অধ্যায়) নামক পরিচ্ছেদে, কবি জয়দেব তদীয় পত্নী পদ্মাবতী কর্তৃক 'কবীন্দ্র'রূপে আখ্যাত হয়েছেন। জয়দেব এখানে 'জয়দেব মিশ্র'। এই পরিচ্ছেদে আছে যে, রাজা ও সেকের সম্মুখে বুঢ়ন মিশ্রের সঙ্গে প্রথমে পদ্মাবতী ও পরে জয়দেব সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

ঃ তারপর সমস্ত জিনিস আনা হইলে জয়দেব মিশ্রের স্ত্রী পদ্মাবতী সেই শব্দ শুনিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গাস্নান করিতে যাইয়া এই শব্দ শুনিয়া দ্রুত রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "হে সভাসদগণ, আপনারা আমার বাক্যসকল শ্রবণ করুন। স্বামীর সহিত আমি বর্ত্তমান থাকিতে জয়পত্র লইতে

কাহার শক্তি আছে? আরও অবগত হউন যে আমাদিগকে সঙ্গীত রসে ও শাস্ত্রে জয় করিতে সমর্থ হইবে সেই জেতা, অন্যথায় নহে। অতএব আমার স্বামীকে আনা হউক। তাঁহার সহিত অথবা আমার সহিত সে আলাপ করুক।" অনন্তর সেখ তাহাকে বলিয়াছিলেন, "হে ব্রাহ্মণী, তুমি বলিলে আমার স্বামী কবীন্দ্র। তাহার গুণ পরে বুঝা যাইবে। সম্প্রতি তুমি আলাপ কর।" তখন জয়দেবের স্ত্রী পদ্মাবতী গান্ধার নামক রাগ আলাপ করিয়াছিলেন। সে গান করিতে আরম্ভ করিলে গঙ্গাতে যত নৌকা ছিল সমস্ত তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তাহাকে সমস্ত সভাসদগণ পূজা করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণী ধন্য। আমরা এরূপ দেখিও নাই শুনিও নাই ইহাদের উভয়ের যোগ্যতাতুল্য। ইনিও ধন্য। ইহাদের দুইজনের মধ্যে ব্রাহ্মণী শ্রেষ্ঠ। যেহেতু ইহার গান শুনিয়া নির্জীব নৌকাগুলি চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বৃক্ষ সজীব? তারপর সে বুঢ়ন মিশ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'হে ব্রাহ্মণ, তোমাদের দুইজনের মধ্যে কে জেতা কে অজেতা তাহা শাস্ত্রালাপের দ্বারা আমাকে প্রতিপন্ন কর'। তখন বুঢ়ন মিশ্র বলিয়াছিলেন, 'আমি স্ত্রীলোকের সহিত শাস্ত্রালাপ করিব না, যেহেতু এইদেশে স্ত্রী বহুগুণসম্পন্না এবং পুরুষ নির্গুণ'। এই কথা বলিলে সেই পদ্মাবতী জয়দেব মিশ্রকে আনিবার জন্য দাসী পাঠাইয়াছিলেন। তারপর মিশ্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে আসিলে তাহাকে বলিয়াছিল, 'আমার ব্রাহ্মণী জেতা, পুনরায় বলিবার অপেক্ষা করিতেছ কেন'? অনন্তর সেখ তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন, 'উভয়েরই গুণ আছে। এক্ষণে তোমার গুণ প্রদর্শন কর'। তখন জয়দেব মিশ্র বলিয়াছিলেন, 'ইহার গীতের দ্বারা বৃক্ষ পত্র শূন্য হইয়াছিল কিন্তু বসন্তকালে বৃক্ষের পত্র সামান্য-রূপে পতিত হয়, অধিক কেন? পুনরায় সেখ তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'হে মিশ্র শ্রবণ কর, বসন্তকালে পত্র-সকল পতিত হয় ইহা ঠিক কিন্তু একদিন সমস্ত পত্র-পতিত হয় না। দিনে দিনে পতিত হয়'। 'জয়দেব মিশ্রও পুনরায় বলিয়াছিলেন, 'পুনর্ব্বার গান করুক এবং পত্রশূন্য বৃক্ষ পত্রযুক্ত হউক'। বুঢ়ন মিশ্র বলিয়াছিলেন, 'আমি তাহা পারিব না। তুমি কি ইহাকে পত্রযুক্ত করিতে পার? তুমি কর লোকে দেখুক'। পুনরায় জয়দেব মিশ্র বলিয়াছিলেন, 'যে ইহাকে পত্রযুক্ত করিতে পারিবে সেই জেতা'। বুঢ়ন মিশ্র বলিয়াছিলেন, 'তাহাই হউক ইহার অন্যতা হইবে না'। সেখ তাহার উক্তিকে প্রশংসা করিয়াছিলেন। 'তাহাদের দুইজনেই ভাল কথা বলিয়াছিলেন'। তখন জয়দেব মিশ্র বসন্তরাগ আলাপ করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত রাগ আলাপ করিলে সেই বৃক্ষের নতুন কচিপাতা সকল বাহির হইয়াছিল। তখন চতুর্দ্দিক

সকল বাহির হইয়াছিল। তখন চতুর্দ্দিক জয়ধ্বনী উত্থিত হইয়াছিল। তারপর সেই বুঢ়ন মিশ্রও পূর্ব্বপ্রাপ্ত দ্রব্যসকল জয়দেব মিশ্রকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। রাজা তাহাকে বারণ করিয়া সেখের বাক্যে আর কিছু জিনিস আনিয়া বুঢ়ন মিশ্রকে দিয়া বিদায় করিয়াছিলেন'।[১১০]

এ গ্রন্থে উল্লিখিত 'জয়দেব মিশ্র' কবি জয়দেব ব্যতীত আর কেউ নন। সে ক্ষেত্রে এ কথা স্বীকার্য, 'সেখ শুভোদয়া' ও 'গীতগোবিন্দে' উল্লিখিত পদ্মাবতী অভিন্ন এবং 'কবীন্দ্র' জয়দেবের স্ত্রী পদ্মাবতী নৃত্য ব্যতিরেকে সঙ্গীতেও পারদর্শী ছিলেন।

'সেখ শুভোদয়া'য় জয়দেব—পদ্মাবতী ব্যতিরেকেও 'গাঙ্গোনট' তদীয় স্ত্রী নর্তকী বিদ্যুৎপ্রভা ও নর্তকী শশিকলার নাম উল্লিখিত হয়েছে। সেখ রাজসভায় পদ্মাবতী, বিদ্যুৎপ্রভা ও শশিকলাকে কঙ্কণ দান করেছিলেন—

ঃ "তারপর সেখ সমস্ত ধন আনিয়া অগ্রে জয়দেব মিশ্রের স্ত্রী পদ্মাবতীকে কঙ্কণ দুইটি প্রদান করিয়াছিলেন। তারপর হলায়ুধ মিশ্রকে কুণ্ডল দুইটি দিয়া নিজের গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন আচার্যকে দুইটি কুণ্ডল দিয়াছিলেন। বিদ্যুৎপ্রভাকে দুইটি কঙ্কণ দিয়াছিলেন। শশিকলাকে দুইটি কঙ্কণ দিয়াছিলেন"।[১১১]

সেখ জালালুদ্দিন তাবরিজি, নৃত্য ও সঙ্গীতকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—

ঃ "তারপর সেখের সভা ইন্দ্রের সভার ন্যায় শোভিত হইয়াছিল। তারপরও বিদ্যুৎপ্রভা গান আরম্ভ করিয়াছিল। সকলে সেই গানের প্রশংসা করিতে লাগিল কেবল মন্ত্রী প্রশংসা করিল না। সেখ তাহাকে বলিলেন, "হে মন্ত্রিন আপনি গানের প্রশংসা করিতেছেন না কেন? তখন বিদ্যুৎপ্রভা বলিল "মন্ত্রি ক্রোধাভিভূত হইয়াছেন।"[১১২]

এ গ্রন্থে বিদ্যুৎপ্রভা ও শশিকলা, বেশ্যারূপে চিহ্নিত হয়েছে। গাঙ্গোনটের যে ভূমিকা 'সেখ শুভোদয়া'য় দেখা যায়, তা নটের নয়, বরং কূটকৌশলসম্পন্ন ভাঁড়ের।

গাঙ্গোনট, তন্তুবায়ীদের (ছাগ মাংস ভক্ষণ সত্ত্বেও) কুকুরের মাংস ভক্ষণ করেছে, এ কথা প্রমাণের জন্য, মাংসের ভাণ্ডে কৌশলে একটি কুকুরের লেজ রেখে দেয়।

লক্ষণসেনের রাজ সভায় এই নটই সম্ভবত একসময় রাজা দশরথের অভিনয় করতে করতে ভাব-সমাধি লাভপূর্বক মৃত্যুমুখে পতিত হন। (পঞ্চম অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

গাঙ্গোনটের পুত্ররূপে 'জয়নটে'র নাম উল্লিখিত হয়েছে।[১১৩]

পরবর্তীকালে বাঙলায় পীর-মাহাত্ম্যসূচক কৃত্য শ্রেণীর যে লোকনাট্যের উদ্ভব ঘটে 'সেখ শুভোদয়া' তার পূর্বসূরী। এই ধারায় সত্যপীরের পাঁচালি, মানিক পীরের অলৌকিকতা ও গাজী কালু-চম্পাবতীর মতো লোককাহিনীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সেখ জালালুদ্দিনের মতই গাজী পীরকে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে স্বীকার করা হয়।[১১৪] 'সেখ শুভোদয়া' কথকতারীতির বিশেষ ধারায় বাঙলা নাটকে অনিবার্যভাবেই সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিল।

মানব সমাজে কাল পরম্পরায় লোকমুখে নানা ধরনের উপকথা, গল্পকথা ও আখ্যান প্রচলিত রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে এই গল্পকথা বা আখ্যান গীত ও বর্ণনার মাধ্যমে সচরাচর অন্তরঙ্গ আসরে পরিবেশিত হতো। আধুনিককালের নাট্যে এই ধরনের পরিবেশনাকে 'কথানাট্য' নামে অভিহিত করা হয়।[১১৫] নানা বিচিত্র ধারার বিপুল সমাবেশে ঘটেছে এই 'কথানাট্য' বা গল্পকথা পরিবেশনা। কালপরম্পরায় উপকথা বা লোককথা, শাস্ত্র বা কিস্‌সা, লৌকিক-পৌরাণিক ও রোমান্টিক আখ্যান প্রভৃতি নানাধারা এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ ধারায় পরিবেশিত ধর্মীয় বা অন্যবিধ আখ্যানকে কথকতা, কিস্‌সাকথন, শাস্ত্রগান, হাস্তরগান অথবা শুধু 'হাস্তর' বলা হয়। 'শাস্ত্র' বা 'হাস্তর' বলা হলেও এতে 'শঙ্খমালা', 'শীত-বসন্ত', 'লালমণি-সবুজমণির পালা'র পাশাপাশি 'মনসামঙ্গল', ফারসী কাব্য 'লাইলীমজনু', 'সয়ফুলমূলক', 'গুলে-বকৌলি'র প্রেমকথাও গীত হয়।

বাংলাদেশে প্রচলিত কোনো কোনো উপকথা 'অতিপ্রাচীন' এবং কিছু বা বৌদ্ধযুগের।[১১৬] মুখে মুখে প্রচলিত হওয়ায় এর ভাষাও সর্বকালেই সমকালের ভাষারূপে বিবৃত হয়ে আসছে।[১১৭] কাজেই এগুলোর চরিত্র ঘটনা বা পরিবেশনার রীতি প্রাচীনকাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় অবিকৃত থাকলেও ভাষার ক্ষেত্রে কোথাও

প্রাচীনত্ব পরিলক্ষিত হয় না। এই উপকথার ধারায় কথাসাহিত্য বা গল্পকথার রীতি অতি প্রাচীন।

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে উদয়নের 'Romantic Story' ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। পালি ভাষায় উদয়নের গল্পকথার সঙ্গে প্রাচীন ভারতে রাজকন্যা বাসবদত্তার কথা-কাহিনীও প্রচলিত ছিল। পালি ভাষায় 'JATAKATTA-KATHA' গ্রন্থে ধৃত গল্প খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী বলে অনুমিত হয়েছে।[১১৮] কালিদাসের 'মেঘদূতে' উজ্জয়িনীর কথাকোবিদের প্রসঙ্গ আছে।

একাদশ শতাব্দীতে পাই কাশ্মীরের কবি সোমদেবভট্ট রচিত 'কথাসরিৎসাগর'। এই ধারাটা প্রাচীনকাল থেকে ইরানে প্রচলিত ছিল। ইরানি রীতির শাস্ত্রকথনের পরিচয় পাওয়া যায় Dr. R Glpke-কৃত নিজামির 'হপ্ত-পয়করে'র ইংরেজি ভাষান্তর 'The Story of The Seven Princesses'-এ।[১১৯]

বাংলাদেশে বৌদ্ধযুগের উপকথা বা রূপকথাগুলোর মধ্যে রয়েছে কাঞ্চনমালা, শঙ্খমালা, শীত-বসন্ত প্রভৃতি। এই রূপকথাগুলো আজও বাংলাদেশের গৃহাঙ্গনে পরিবেশিত হয়। এ একেবারে গৃহাঙ্গনের পরিবেশনা, আসরের নয়। শ্রোতা সংখ্যা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে না থাকলে কথানাট্যের রস উপভোগ করা যে যায় না, সে বিষয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে।

এই রীতিতে কোনো কাহিনী, বর্ণনা ও গীতের আশ্রয়ে একজন প্রধান কথক বা গায়েন দ্বারা দোহার সহযোগে পরিবেশিত হয়। সচরাচর উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় গৃহস্থের অঙ্গনে কিসসা, শাস্ত্র বা লোককথার আসর বসে। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে খোল বা ঢোলক ও মন্দিরা। অনেক সময় মাটির পাত্র বা অনুরূপ বাদ্যযন্ত্রও এতে ব্যবহৃত হয়।

শাস্ত্র বা রূপকথাগুলোতে 'অনেক গীত' আছে।[১২০] আখ্যান মধ্যে প্রচুর গীত থাকাতে বলা যায় যে, এর পরিবেশনা কেবল দাদা-দিদিমার নাতি-নাতনিকে ঘুম পাড়ানোর সীমাতে আবদ্ধ ছিল না। বৈঠকী রীতিতে শ্রোতাদের সামনে গীতবাদ্য যোগে গল্প পরিবেশনা নিঃসন্দেহে প্রাচীনকালের। পরবর্তীকালে পাঁচালির দাঁড় রীতিতে কিসসা বা শাস্ত্র কথন পরিবেশিত হতে দেখা যায়।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো। এ গল্পকথাগুলোতে ধর্ম-সম্প্রদায়ের আচার বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটলেও এগুলো বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ নেই। শাস্ত্রকথাসমূহ সুনিশ্চিতভাবে অসাম্প্রদায়িক মনের সৃষ্টি।

প্রাচীনকালের শিকার যুগের কৃত্যচিহ্নবাহী নাট্যরীতি হিসেবে পুরুলিয়ার আদিবাসীদের 'ছৌ' বা 'ছো' নৃত্যের কথা উল্লেখ করা যায়। এতে নানা ধরনের মুখোশ পরে চৈত্রসংক্রান্তির দিনে 'ভোগতা'দের নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। আহার্য হিসেবে 'ছো' নাচের 'কাপ'-এ খড়ের পরিচ্ছদ, 'ছেঁড়াকাপড় কাদাবালি' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।[১২১] ছো বীররসের নাটক। এতে দূর্গানাচ, মহিষাসুর বধ, কিরাত-অর্জুন, বালীবধ প্রভৃতি পালা গীত ও অভিনীত হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠান জাগরণীমূলক অর্থাৎ সারারাত, এমনকি দিনের উজ্জ্বল আলোতেও চলে।

ছৌ-নাচে পৌরাণিক মুখোশ ছাড়াও 'বাঁদর' 'ভল্লুকনারী' 'করোটি' 'গোরুর মাথা' ইত্যাদি বেশ ও মুখোশের ব্যবহার আছে। পশুদের রূপ ধারণ করা থেকে সহজে বোঝা যায় ছৌ-নৃত্যের জন্ম শিকার যুগেই হয়েছিল।

ছৌ-নৃত্যের প্রস্তুতি ও পরিবেশনের বিভিন্ন পর্যায় বর্ণিত হলো— (১) সাজসজ্জা গ্রহণ (২) বিশেষ বোল সহকারে তিনবার মন্দির প্রদক্ষিণ (৩) জাগরণের রাত্রি শেষে ছৌ-নাচের আয়োজন (৪) নৃত্য সহকারে গণেশের বন্দনা (৫) 'গণেশ ও কার্তিকের নাচের পালা' অর্থাৎ কার্তিক ও গণেশের যৌথ-নৃত্য (৬) অতঃপর বিভিন্ন ধরনের ছৌ-নাচের পালার শুরু।[১২২]

প্রাচীনকালের বাঙলা নাট্যরীতির আরেকটি নমুনা 'নেটো'। বিশেষজ্ঞের মতে 'খ্রীস্টপূর্ব কাল থেকে' নেটোর ধারা একাল পর্যন্ত চলে এসেছে। 'নেটো' কথাটার অর্থ 'নাটুয়াবৃত্তি' বা 'নাট্যকর্ম'। এ নাট্যরীতি মধ্যযুগে ('ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত') ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ধারণা করা হয় যে, হিন্দু গায়েন-বায়েন সম্প্রদায় 'কীর্তন', 'পাঁচালি', ও 'যাত্রা'য় ঝুঁকে পড়লে, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই 'নেটো'র প্রচলন শুরু হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান গায়েনেরা কিছুকাল আগেও এ ধরনের নাট্য পরিবেশন করত।[১২৩]

নেটো মৌখিকরীতির নাট্য। গানগুলো পূর্ব নির্ধারিত। নেটোর পরিবেশনারীতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ উদ্ধৃত হলো—

ঃ নিবা বাউড়ি ওর মধ্যে লেখাপড়া জানা। সুরেন্দ্র মহাশয়ের পাঠশালায় প্রথম ভাগ ছেড়ে দ্বিতীয় ভাগ ধরেছিল। পাঠশালায় একধারে নিমতলায় একটুকরো চটের উপর বসে পড়া করত। দলের খাতাটি তার হাতে থাকত। চেহারাটাও তার ভালো ছিল। রঙ কালো হলে কি হবে, বেশ পুষ্ট গোলগাল হাত পা আর ফুলো ফুলো গাল। রাজার পাট করতো ভরাট গলায়। বাজনার মধ্যে বেহালা প্রধান। অধিকাংশ সময় আড়ালে থাকলেও উত্তেজনার মুহূর্তে উঠে দু'একটা ঝালার দেখাতেও আপত্তি নেই। লম্বা বেণী, লাল আলপাকা শাড়ি, আর সারা গায়ে লাল সাদা আবির আর সফেদা মেখে নাথু বাউড়ি মেয়ে সাজত। এক সময়ে রাণী অন্য সময়ে সেই আবার মেথরাণী। প্রেমের পালাতে নাপতিনীও আবার সে-ই। নাথুর সাধারণ অবস্থাতেও কথাবার্তা চলন বলন মেয়েদের মতন। তাকে হাত নেড়ে নেড়ে ঝুড়ি মাথায় সারের গাড়ি বোঝাই করতেও দেখালে আমরা হাসতুম। জাত-অভিনেতা হলো শশীডোম। তার কথাবার্তায় অসাধারণ সংযম। সব পালাগানে তার সমান আদর। মনসার ভাসানে নেড়া সাজে, এখন সেজেছে মন্ত্রী।[১২৪]

'নেটো' ক্ষুদ্রাকৃতির নাটক। বিচিত্র এর বিষয়। এ রীতির নাট্য 'সঙ' নামেও পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের 'নেটো' একাধিক চরিত্রবিশিষ্ট। 'নেটো' বাংলাদেশে 'লিটো' নামে পরিচিত। ('ন'এর স্থলে 'ল'-নেটো-লিটো)। লিটো এক চরিত্রবিশিষ্ট। এতে মূল গায়েন, শরীরের নিম্নাংশে লুঙ্গি ও ঊর্ধ্বাঙ্গে উড়নি বা শাড়ি পেঁচিয়ে, রাজা-রাণী, মন্ত্রী, রাজকুমারী ও রাজপুত্রের অভিনয় করে থাকে। সঙ্গে বায়েন ও দোহার। অবশ্য পূর্ববঙ্গীয় গীতিকার অভিনয় এই একই রীতিতে প্রদর্শিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের 'নেটো' হাস্যরসাত্মক কিন্তু, বাংলাদেশের 'নেটো' সচরাচর প্রণয়কথা ভিত্তিক পালা। এবং এর পরিবেশনের ব্যাপ্তিকাল দীর্ঘতর। ধারণা করা যায়, নেটো প্রাচীনকালে এক চরিত্র বিশিষ্ট ছিল।

প্রাচীনকালে বাঙলা নাট্যের যে সকল বিষয় ও রীতি সম্পর্কে বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে আলোচনা করা হলো তার কোনো কোনো রূপ ও রীতি মধ্যযুগে এমনকি সমকালীন লোকনাটকেও বিদ্যমান। প্রাচীনকালে উদ্ভূত অথচ 'পাঠ' বা রীতির সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দুর্লভ হওয়াতে পরবর্তীকালের পাঠ বা রীতি দৃষ্টে পূর্ববর্তীকালের প্রামাণ্য উপস্থাপন করা সম্ভব। এবং প্রাচীনকালের নাট্যরীতিসমূহের যে-যে ধারা

আজও আমাদের লোকায়ত নাট্যে বিদ্যমান সে সকল ধারা গুণগত বিচারের প্রাচীনকালেরই অভিজ্ঞানবাহী।

প্রশ্ন হলো, নাট্যরীতির যে সকল প্রসঙ্গ এখানে আলোচিত হয়েছে, প্রচলিত সংজ্ঞায় সেগুলো কতদূর নাট্য পদবাচ্য?

আধুনিককালের নাট্য বিশেষজ্ঞদের মতে এ-যাবৎকাল রক্তবর্ণ যবনিকা '(Red-Curtain)' স্পট লাইট '(Spot Light)' অমিত্রাক্ষর ছন্দ, অট্টহাসি '(Laughter)', অন্ধকার '(Darkness)' সব মিলিয়ে থিয়েটার '(Theatre)' সম্পর্কে একটি অস্পষ্ট এবং কৃত্রিম আড়ম্বরপূর্ণ ধারণার সমষ্টিকে নাটক নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রকৃত অর্থে নাটক তা নয়। একটি শূন্যস্থান '(Empty Space)' কেই খালি মঞ্চ '(Bare Stage)' নামে অভিহিত করা যায়। একজন অভিনেতা এই শূন্যমঞ্চে পদচারণা করল আর কেউ তা প্রত্যক্ষ করল—থিয়েটার নামে অভিহিত করার জন্য এটুকুই যথেষ্ট।[১২৫] নাট্য বিষয়ে এই অভিমত বিচারপূর্বক বলা যায়, প্রাচীন ও মধ্যযুগে আসর-দর্শক-গায়েন-দোহার অধ্যুষিত আখ্যান মাত্রই নাট্যরূপে বিবেচ্য।

মধ্যযুগের বাঙলা নাট্যরীতি এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই নির্ণীত হলো।

টীকা

১. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) *ভরত নাট্য শাস্ত্র (২য় খণ্ড)*, প্রথম প্রকাশ-১৫ই মার্চ, ১৯৮২, পৃ: ১১৬।

২. প্রাগুক্ত-পৃ: ১১৮।

৩. প্রাগুক্ত-পৃ: ১১৯।

৪. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) *ভরত নাট্যশাস্ত্র (১ম খণ্ড)*, প্রথম প্রকাশ-মার্চ ১৯৮০, পৃ: ৮।

৫. প্রাগুক্ত-পৃ: ৭।

৬. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) *ভরত নাট্যশাস্ত্র (২য় খণ্ড)*, প্রথম প্রকাশ-১৫ই মার্চ ১৯৯৮২, পৃ: ১১৬।

৭. Ananda Coomarswamy and Gopala Kristnayya Duggirala (Translated into English). *The Mirror of Gesture, Being the Abhinaya Darpana of Nandikeswara*, 1917, Page-16.

৮. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) *ভরত নাট্যশাস্ত্র (১ম খণ্ড)*, প্রথম প্রকাশ-১৪ই মার্চ ১৯৮০, পৃ: ১২।

৯. Oscar G. Brockett, *The Theatre Introduction*, Indiana University, Third Edition, 1974, Page-68.

১০. মৎ রচিত, *শ্রীচৈতন্যভাগবতে নাট্য প্রসঙ্গ*, মৎ সম্পাদিত থিয়েটার স্টাডিজ, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম খণ্ড, পৃ: ১০।

১১. Ananda Coomarswamy and Gopala Kristnayya Duggirala (Translated into English) *The Mirror of Gesture, Being the Abhinaya Darpana of Nandikeswara*, 1917, Page-5.

১২. Muhammad Shahidullah, *Buddhist Mystic Songs*, Bengali Academy, Revised and Enlarged Edition 1966, Page-53.

১৩. প্রাগুক্ত-পৃ: ৩০।

১৪. শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'নড়পেড়া' শব্দের অর্থ করেছেন 'নট পেটিকা', *বাংলা সাহিত্যের নবযুগ*, সপ্তম সংস্করণ, মাঘ-১৩৮৩, পৃ: ১৬৬।

১৫. মৎ সম্পাদিত ও অনূদিত, *নন্দিকেশ্বর-অভিনয় দর্পণ*, কথা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ-১লা ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ: ৩৮।

১৬. সৈয়দ আলী আহসান, *চর্যাগীতির পদকর্তাগণ*, ভাষা ও সাহিত্যপত্র, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, একাদশ সংখ্যা-১৩৯০।

১৭. মৎ সম্পাদিত ও অনূদিত, *নন্দিকেশ্বর-অভিনয় দর্পণ*, কথা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ-১লা ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ: ৩৭-৩৮।

১৮. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, অগ্রহায়ণ ১৩৮২, পৃ: ৪০১-৪০২।

১৯. প্রাগুক্ত-পৃ: ৪০৪।

২০. সরসীকুমার সরস্বতী, *পালযুগের চিত্রকলা*, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, উক্তগ্রন্থে ধৃত চিত্রগুলি দ্রষ্টব্য।

২১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা (প্রথম খণ্ড)*, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, আশ্বিন-১৩৮২, পৃ: ২১।

২২. প্রাগুক্ত- পৃ: ৩৩।

২৩. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (সম্পাদিত), কবি *শুকুর মাহমুদ বিরচিত, গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*, বাংলা একাডেমী-১৯৭৪, পৃ: ৩২।

২৪. প্রাগুক্ত- পৃ: ৬৮।

২৫. প্রাগুক্ত- পৃ: ১২৩।

২৬. প্রাগুক্ত-পৃ: ১২৪।

২৭. প্রাগুক্ত- পৃ: ১২৫।

২৮. প্রাগুক্ত- পৃ: ১২৬।

২৯. The song is usually sung by four men and in parts, not in Union. Grierson, *JASB, XIVII (1878.)* P-147.
আশরাফ সিদ্দিকী, *লোকসাহিত্য,* দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৮০, পৃ: ৫১ থেকে গৃহীত।

৩০. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম খণ্ড),* (সম্পাদনা) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, আগস্ট ১৯৮৬, পৃ: ৬০।

৩১. মোহাম্মদ সাইদুর (সম্পাদিত) *লোকসাহিত্য সংকলন-৪১* (লোকনাট্য) বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৫, পৃ: ১১।

৩২. রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় তিব্বতি পুস্তক *Pag Sam Jon Zang* -এর সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচীতে গোরক্ষনাথ সম্পর্কে বলেছেন 'Gauraksa-a Cowherd, who being initied into Tantric Buddhism became the well-known sage Gauraksa whose religious school survives in the yogee sect which goes under the designation of Nath' ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাংলা সাহিত্যের কথা* (১ম খণ্ড), ১৩৮২, পৃ: ২০।

৩৩. শ্রী কামিনী কুমার রায়, *বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার,* প্রথম প্রকাশ, কার্তিক-১৩৮৪, নভেম্বর-১৯৮০, পৃ: ২।

৩৪. প্রাগুক্ত-পৃ: ১০-১২।

৩৫. মোহাম্মদ সাইদুর সম্পাদিত, *লোকসাহিত্য সংকলন-৪১,* লোকনাট্য, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন-১৩৯১। ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫, পৃ: ৫০।

৩৬. প্রাগুক্ত- পৃ: আঠার।

৩৭. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (১ম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ-১৯৭৮, পৃ: ২০৩।

৩৮. Jean-Claude Carriere, *The Mahbharata,* Translated by Peter Brook, 1987, Page-XV.

৩৯. মন্মথমোহন বসু, *বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৯, পৃ: ১০।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ: ৮।

৪১. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস,* ষষ্ঠ সংস্করণ-১৯৭৫, পৃ: ১৯৫।

৪২. মৎ প্রণীত *হাতহদাই* (অপ্রকাশিত) নাটকে 'ঢাঈ' সম্পর্কে বিশদ বিবরণ আছে। হাতহদাই, নির্দেশনা-নাসির উদ্দিন ইউসুফ, প্রযোজনা-ঢাকা থিয়েটার, ১৯৯০।

৪৩. মন্মথমোহন বসু, *বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৫৯, পৃ: ৩৮।

৪৪. প্রাগুক্ত-পৃ: ৪১।

৪৫. মৎ প্রণীত, *হরগজ,* গ্রন্থিক প্রকাশনা-১৯৯২, কথাপুঞ্জ অধ্যায়।

৪৬. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য *মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস,* ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৭৫, পৃ: ১৯৪।
৪৭. পল্লব সেন গুপ্ত, *পূজা পার্বণের কথা,* ১১ই আগস্ট ১৯৮৪, পৃ: ১৫১।
৪৮. হরিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরা,* ১ম সং মাঘ-১৩২০, পৃ: ৪৭।
৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৯।
৫০. পল্লব সেন গুপ্ত, *পূজা পার্বণের কথা,* ১১ই আগস্ট ১৯৮৪, পৃ: ১৫১-১৫২।
৫১. হরিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরা* ১ম সং মাঘ ১৩২০, পৃ: ৫৫-৫৬।
৫২. প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৫।
৫৩. সুকুমার সেন *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), ১৯৯১, পৃ: ৮৫।
৫৪. 'ভদ্রেশ্বরী নামে এক অনূঢ়া রমণীর অকাল মৃত্যুর কাহিনী পরবর্তীকালে ভাদুগানে যুক্ত হয়। তা সত্ত্বেও এর প্রাচীনত্ব অনস্বীকার্য। পল্লব সেন গুপ্ত, *পূজা পার্বণের কথা,* ১১ই আগস্ট ১৯৮৪, পৃ: ১৫৩।
৫৫. স্বর্গীয় পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত (সম্পাদিত) *সেখ শুভোদয়া,* প্রথম সং আশ্বিন-১৩২০, পৃ: ১৫০।
৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫১-১৫২।
৫৭. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড) ১৯৯১, পৃ: ৮৫।
৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৬।
৫৯. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোক সাহিত্য* (৩য় খণ্ড গীত নৃত্য), ১৯৬৫, পৃ: ৬৭৩।
৬০. প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৮৯।
৬১. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খণ্ড), ১৯৭৮, পৃ: ২০৩।
৬২. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* ১৯৭৫, পৃ: ৬৮৯।
৬৩. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (২য় খণ্ড), ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১১১।
৬৪. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা* (প্রথম খণ্ড), ১৯৭৫, পৃ: ১২৫।
৬৫. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), ১৩৯৮ বাং, পৃ: ১১৪।
৬৬. চারু বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) *শূণ্যপুরাণ* ১৩৩৬, পৃ: ৭৫।
৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৫।
৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৬-১২৭।
৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৯।
৭০. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৭।
৭১. প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৭।
৭২. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৮।
৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৬।

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৫।

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৬।

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৭।

৭৭. আশা দাস, *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি,* ১৯৬৯, পৃ: ৭৭।

৭৮. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), ১৩৯৮ বাং, পৃ: ১১৬।

৭৯. চারু বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) *শূন্যপুরাণ* ১৩৩৬, পৃ: ১১১।

৮০. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* ১৯৭৫, ১৩৮১ বাং, পৃঃ ৬২৭।

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৩৩।

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৩৫।

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৩৬।

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৩৭।

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪১।

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪৫।

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৫৩।

৮৮. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাংলা সাহিত্যের কথা,* ১৩৮২ বাং, পৃ: ১৩১।

৮৯. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (২য় খণ্ড), ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৪৭।

৯০. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস,* ১৯৭৫, পৃ: ৬৫৩।

৯১. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), ১৯৯১, পৃ: ৩২।

৯২. A. Berriedala Keith, D. C. L: D. litt, *The Sanskrit Drama in its Origin: Development Theory and Practice,* Oxford. U. Press-1954. Page-40-41.

৯৩. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (১ম খণ্ড), ১৯৭৮ সাল, পৃ: ৯৩।

৯৪. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), ১৯৯১, পৃ: ৩৪।

৯৫. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* (১ম খণ্ড), ১৯৮৬, পৃ: ২৩৪।

৯৬. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), ১৯৯১, পৃ: ৩৪।

৯৭. প্রণব বাহুবলীন্দ্র (গ্রন্থনা ও গদ্য ভাষান্তর), *ওমর খৈয়াম-মেঘদূত-গীতগোবিন্দ,* ১৩৯১ বাং, পৃ: ৭৬।

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬।

৯৯. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), পৃ: ৩৪।

১০০. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *বাঙলা নাটকের বিবর্তন,* ১৯৭৩, পৃ: ২৮।

১০১. A. Berriedala Keith, D.C.L, D. litt, *The Sanskrit Drama in its Orogin: Development Theory and Practice,* Oxford. U. Press-1954, page 40-41.

১০২. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), ১৯৯১ সাল, পৃ: ৩৫।

১০৩. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *বাঙলা নাটকের বিবর্তন,* ১৯৭৩, পৃ: ২৮।

১০৪. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস,* ১৩৮২ সাল, পৃ: ৪০২।

বিশেষজ্ঞের মতে গীতগোবিন্দের শ্লোকেই এর নৃত্যাভিনয়ের ইঙ্গিত বিদ্যমান। কে. বাসুদেব শাস্ত্রী (সম্পাদিত) *(Gitagovinda With Abhinaya)* গ্রন্থে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটির অন্তর্গত নৃত্যমুদ্রার সঙ্কেত এভাবে নির্ণীত হয়েছে-

ঃ গীতম্-১

(মালবগৌড়-রাগেণ রূপক-তালেন চ গীয়তে)

প্রলয়-পয়োধি-জলে ধৃত বানসি বেদং

বিহিত- বহিত্র-চরিত্রমখেদম্।

কেশব-ধৃত মীনশরীর

জয় জগদীশ হরে।।

'প্রলয়-পতাকাপরিমর্দিত পতাকেন গগণদৃষ্টবা চ, পয়োধিজলে-অধঃ স্বস্তিনীকৃত-বিচ্যুতোর্ধ্ব তল পতাকাভ্যাম, ধৃতবানসি-অধোদেশাদুদ্ধতা দৃষ্টিনা, বেদং পুরস্তলনিকুঞ্চকেন, বিহিতশনেরধস্তলীকৃত পতাকেন, বহিত্র-চালিতাঙ্গুষ্ঠকর প্রসারিত পুষ্পপুটেন, চরিত্রং-প্রসারিতোর্দ্ধতল পতাকেন, অখেদং-হৃদ্গত পতাকেন মুকুলয়া দৃষ্টা চ, কেশব-কেশবন্ধেন, ধৃত-আবর্তনেন কৃতমুষ্টিনা, মীনশরীর মকরহস্তকেন, জয়-উদ্ধৃতহস্তকেন, জগদীশ-ললাটস্থাঞ্জলিনা, হরে-বৈষ্ণবস্থানকেন।' অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, চতুর্থ খণ্ড,* দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৫, পৃ: ৩৮১ থেকে গৃহীত।

১০৫. শ্রী জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ,* প্রথম প্রকাশ ১৩৭৮, পৃ: ৯৫।

১০৬. স্বর্গীয় পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত সম্পাদিত *সেখ শুভোদয়া,* আশ্বিন ১২৭৩, পৃ: ১৫০।

১০৭. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, (১ম খণ্ড)* প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮, পৃ: ১১৩।

১০৮. মতিলাল দাস কর্তৃক প্রদত্ত '*সেখ শুভোদয়া'র* ভূমিকায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই মত উদ্ধৃত হয়েছে। স্বর্গীয় পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত *সেখ শুভোদয়া,* প্রথম সং-আশ্বিন ১২৭৩।

১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩।

১১০. প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৩-১০৫।

১১১. প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৩-১২৪।

১১২. প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৬।

১১৩. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৩।

১১৪. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* ষষ্ঠ সং-১৯৭৫, পৃ: ৯২৯।

১১৫. মৎ প্রণীত *চাকা,* প্রথম প্রকাশ ১ ফাল্গুন ১৩৯৭, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯১; পৃ: ৪৩।

১১৬. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা, ১ম খণ্ড,* ১৯৭৫, পৃ: ১৪৬।

১১৭. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খণ্ড),* ১৯৭৮, পৃ: ২০২।

১১৮. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কৃত ভূমিকা, *কথা সরিৎসাগর,* সোমদেব ভট্ট, হীরেন্দ্রলাল রায় অনূদিত, ১৯৮৪, পৃ: ৮।

১১৯. NIZAMI, *The Story of the Seven Princesses,* Translated from the Persian and edited by Dr. R GELPKE English version by Elsie and George Hill 1976 Bruno Cassirer (Publisher) Ltd.

১২০. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১ম খণ্ড),* ১৯৮৬, পৃ: ৭৪।

১২১. বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি* (চতুর্থ খণ্ড), ১৯৮৬, পৃ: ৫৩।

১২২. প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৪-৫৫।

১২৩. সুকুমার সেন, *নট নাট্য নাটক,* প্রথম প্রকাশ- চৈত্র '৭২, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ভাদ্র '৯১, পৃ: ৯০-৯১।

১২৪. প্রাগুক্ত, পৃ: ৯২।

১২৫. Peter Brook, *The Empty Space,* First Published 1968, Page-11.

দ্বিতীয় অধ্যায়

['শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র আঙ্গিক ও পরিবেশনারীতি, বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মত বিচার, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কি পুতুলনাচ? আদি মধ্যযুগের অন্যান্য নাট্যরীতি—ধামালি, রামায়ণ ও মহাভারত পাঁচালি, ছড়া- ব্রতকথারূপে মনসামঙ্গল, মনসামঙ্গলের প্রাচীন কবি কানাহরিদত্ত, চণ্ডীমঙ্গলের সর্ব প্রাচীন কবি মানিকদত্তের 'চণ্ডীমঙ্গলে'র পরিবেশনারীতি, কাব্যমধ্যে দৃষ্ট বিভিন্ন নাট্য প্রসঙ্গ বিচার, পীরপূজা—সত্যনারায়ণের উদ্ভব।]

(ক) চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলা নাট্য পরিবেশনারীতির বিচারে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য বড়ু চণ্ডীদাস (আনুমানিক ১৩৭০-১৪৩৩ খ্রীঃ)-এর 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন'।[১] এতদ্ব্যতীত একালে ধামালি, রামপাঁচালি, ভারত-পাঁচালি, মঙ্গল-ব্রতগীত ও পীরপূজার সাক্ষাৎ মেলে। অন্যদিকে শিবকেন্দ্রিক পালা, নাথগীতি, লোককথা-রূপকথার প্রাচীন ধারা এই কালেও অব্যাহত ছিল। অবশ্য বাংলায় বৌদ্ধ প্রভাব অপসৃত হবার ফলে, সিদ্ধাচার্যদের কেন্দ্র করে বুদ্ধনাটকের যে ধারা বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল, চতুর্দশ শতকের পূর্বে তার বিলুপ্তি ঘটে। তবে বৌদ্ধধর্ম-পুরাণের প্রচ্ছন্ন প্রভাব নাথগীতি, পালগীতি, ধর্মমঙ্গল ও বিশেষক্ষেত্রে চণ্ডীমঙ্গলের ধারায় প্রত্যক্ষ করা যায়।

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ত্রয়োদশ খণ্ডে বিভক্ত সুবৃহৎ আখ্যান কাব্য। খণ্ডগুলি যথাক্রমে-জন্মখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধার বিরহখণ্ড। খণ্ডিত ও পূর্ণপদসহ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' পদসংখ্যা সর্বমোট চারশত পনের। শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক আবিষ্কৃত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র একটিমাত্র পুথি ছাড়া অদ্যাবধি এর 'দ্বিতীয় কোনো অনুলেখন' দৃষ্ট হয় নি। তবে এ গ্রন্থের কয়েকটি পদ তাল শিক্ষা বিষয়ক এক 'পুঁথিতে' পাওয়া গেছে।[২] উল্লেখ্য যে, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়ের পুথিও পূর্ণাঙ্গ নয়, অন্তে খণ্ডিত।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' দেবতাদের মন্ত্রণায় কংস-বিনাশের নিমিত্তে কৃষ্ণের জন্ম, কৃষ্ণকর্তৃক রাধার প্রণয়যাচনা, সম্ভোগ, মান-বিরহ ইত্যাদি এক সুগভীর জুগুপ্সার পথ বেয়ে ক্রম পরিণতি লাভ করেছে। এই আখ্যানের অভিনবত্ব, এর প্রায় প্রতিটি পদেই স্বতন্ত্রভাবে গীতিকবিতার ধাঁচ আছে। মূলত মিত-বর্ণনাকৌশল ও অনুপুঙ্খ সংলাপের আধার এই পদগুলির গঠন পরবর্তীকালের পাঁচালি কাব্যের পদ-রচনা কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণও বটে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পদভিত্তিক কাহিনী রচনার কৌশলের মধ্যেই এর আঙ্গিক ও পরিবেশনারীতির পরিচয় অন্বিষ্ট।

বর্ণনা ও সংলাপরীতির বিচারে একাব্যের পদগুলিকে সর্বমোট চারভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো যথাক্রমে— শুদ্ধ বর্ণনাত্মক পদ, সংলাপ ও বর্ণনার যুগল মিশ্রণে রচিত পদ, উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক পদ ও চরিত্রের একক সংলাপভিত্তিক পদ। আখ্যানের সর্বত্র নিরালম্ব বর্ণনামূলক পদগুলি সংক্ষিপ্ত ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে মিত-ভাষিত। বর্ণনামূলক পদগুলির বহুস্থলে বর্ণনা ও সংলাপের পারম্পর্যময় উপস্থিতি বর্ণনাকে জীবন্ত ও গতিশীল করে তুলেছে। অন্যদিকে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক পদগুলি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক উম্মোচন ও কাহিনীর অগ্রগতি সাধনের এক সূক্ষ্ম অথচ প্রাণবন্ত শিল্পকৌশলের দৃষ্টান্ত। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র একক সংলাপভিত্তিক পদগুলি ঘটনা ও চরিত্রের অন্তর্গত রহস্য উদঘাটন করে। শুদ্ধ বর্ণনাত্মক পদগুলির মিতভাষিতা কিরূপ, একটি পদের দৃষ্টান্তে তা অনুধাবন করা যায়—

ঃ গুজ্জুরীরাগ ঃ ।। একতালী ।।
দধিদুধেঁ পসার সজাআঁ
নেতা বাস ওহাড়ন দিআঁ।। ল রাধা
সব সখীজন মেলি রঙ্গে।
একচিত্তে বড়ায়ির সঙ্গে।। ল রাধা
নিতি জাএ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী
বনপথে মথুরা নগরী।। ল রাধা।। ধ্রু
একদিনে মনের উল্লাসে।
সখি সমে রস পরিহাসে।।
আগুগেলি সত্বর গমনে।
বড়ায়িক না বারী যতনে।।

বকুল তলাতে গোআলী।
বড়ায়ির পন্থ নেহালী।।
বসিলি মাথাত দিআ হাতে।
বড়ায়ি চলিলী আন পথে।।
রাধিকা গুনিআঁ মনে মনে।
বড়ায়ির বিলম্ব কারণে।।
বনমাঝে পাইল তরাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।।৩

রাধার ভ্রান্তির কারণে পথ হারানোর ঘটনাটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে এই পদে। এর ধ্রুবপদাংশে নিত্যকার কর্মের বর্ণনা ধৃত হয়েছে। বাকি অংশে মাত্র ছয়টি পংক্তিতে রাধার লীলা চঞ্চল রূপ, পথ হারানো, বকুল তলায় অপেক্ষা, বনমধ্যে ত্রাসিত হবার ঘটনা বিবৃত। বিমূঢ়া রাধার চিত্রকল্প একটি মুদ্রার ইঙ্গিতে সীমাবদ্ধ রাখেন কবি—

ঃ বসিলী মাথাত দিআঁ হাতে।

বর্ণনার এই মিতভাষিতা মধ্যযুগে প্রায় দুর্লভ। মনে হয় পুরো পদটি রচয়িতার পূর্ব পরিকল্পিত।

উল্লিখিত কৌশল যেন বক্ষ্যমাণ নাট্যগীতের আঙ্গিক ও পরিবেশনারীতির দিকে তাকিয়ে রচিত। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, সংলাপাত্মক পদের পরিসর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র সর্বত্রই বিস্তৃত আকারে লভ্য। সমগ্র আখ্যানকাব্য থেকে এ মন্তব্যের সপক্ষে যদৃচ্ছ উদাহরণও গ্রহণ করা চলে। তাম্বুল খণ্ডের তৃতীয় পদটিতে কৃষ্ণ ও বড়ায়ির সংলাপ নিম্নরূপ—

বর্ণনা ঃ আচম্বিত বুঢ়ী দেখি বৃন্দাবন মাঝে।
বিনয় করিয়া পুছন্তি দেবরাজে।।

কৃষ্ণ ঃ কথা হৈতেঁ তোহ্মে কিবা তোর কাজে।
একলী বুলসি কেহ্নে বৃন্দাবন মাঝে।।

বড়ায়ি ঃ গোঠে হৈতে আসি আহ্মি বুঢ়ী গোআলিনী।
আগুত চলিলী মোর সুন্দরী নাতিনী।।
পাছে পাছে জাইতেঁ পথ হারাইল আহ্মি।
মথুরার পথ পুতা কহিআঁ দেহ তুহ্মি।।

কৃষ্ণ ঃ সঙ্গেঁ কেহ্নে লআঁ ধুল নাতিনি খানি।
কথাঁ তাক হারাইলে কহ্ তত্ত্ববাণী।।
কিনাম তাহার কেহ্নে তার রূপ।
আহ্মার থনত বুঢ়ী কহিআর স্বরূপ।।

বড়ায়ি ঃ দধি বিকে জাইতেঁ সঙ্গে মথুরানগরী।
বৃন্দাবনে হারাইলোঁ ত্রৈলোক্য সুন্দরী।
নাতনী হারাইলোঁ নামে চন্দ্রাবলী।
কোঅলী পাতলী বালী সুন বনমালী।।

কৃষ্ণ ঃ সরূপ কহিবেঁ তবেঁ মথুরার পথ।
যে কাজে বলোঁ তোহ্মাক তাত কর সত।।
বোলা এক বলোঁ তোক ঘরেঁ ধর মনে।
তবেঁসি করিবোঁ তোর রাধা দরশনে।।

বড়ায়ি ঃ তোঁমোর নাতি যেহ্নে দুঅজ পরাণ।
তোহ্মার বোলত আহ্মে না করিব আন।।
সত্যেঁ সত্যেঁ করিব মো তোহ্মার বচন।
যবেঁ আন করোঁ তাক বধও বাহ্মণ।।

কৃষ্ণ ঃ উদ্দেশ বলিব যবেঁ রাধিকার আহ্মে।
তবে ভালমতেঁ তার রূপ কহ্ তোহ্মে।।

ভণিতা ঃ কাহ্নের বচনে বড়ায়ি পাইল আসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।।

লক্ষণীয় যে, বর্ণনা (যা মূলত দোহারগণের দিশা) ও ভণিতা অংশটুকু বাদ দিলে, সম্পূর্ণ পদই একটি 'অণুনাট্য'। এর পরের পদেই আছে বড়ায়ির মুখে রাধার রূপ বর্ণনা। কৃষ্ণ খুঁজে বের করবে রাধাকে, সুতরাং সে রাধার পূর্ণ-অবয়বের বিবরণ শুনতে চায়। এছাড়া কৃষ্ণ তাকে খুঁজে পাবে কি করে? ঠিক এই পরিস্থিতিতে রচয়িতা এক নিপুণ নাট্যকৌশলে বড়ায়ির মুখে রাধার রূপবর্ণনা অনিবার্য করে তুলেছেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' চরিত্র ও ঘটনাগত নাট্যকৌতূহল সংলাপের যে আবর্তনে রচিত হয়েছে তা একালের পাঠককে বিস্ময়াবিষ্ট করে। বিশেষজ্ঞগণও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' সংলাপের 'চমৎকারিত্ব' স্বীকার করেছেন।[৪] বস্তুত

এই কাব্য পাঠে এমত প্রতীতি জন্মে যে, সংলাপাত্মক পদ রচনাতেই বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব।

('শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র আঙ্গিক ও পরিবেশনারীতি সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মতামতসমূহ নিচে উদ্ধৃত হল—

১. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' 'কৃষ্ণধামালীরই সংশোধিত সংস্করণ'।[৫]
২. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' 'চিত্রনাটগীত' অর্থাৎ তা পুতুলনাচের মাধ্যমে প্রদর্শিত হত।[৬] আবার, এ হচ্ছে 'চিত্রগীত'।[৭]
৩. এ হচ্ছে 'নাটগীত শ্রেণীর রচনা'।[৮]
৪. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র 'বাহ্যলক্ষণে'র সঙ্গে 'বীথি' নামক ত্রিচরিত্রবিশিষ্ট সংস্কৃত নাট্যের মিল আছে। এতে ধামালি বা 'জাগের গান' ও ঝুমুরের প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। আবার 'নাট্যরসাশ্রয়ী নানা ঘটনা ও সংলাপ' থাকা সত্ত্বেও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মূলত 'বর্ণনামূলক কাব্য'।[৯]

এ সকল মত যুক্তি সহকারে যাচাই করা যেতে পারে।

১. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' 'কৃষ্ণধামালীরই সংশোধিত সংস্করণ' এই মন্তব্যের পক্ষে বলা যায় যে উত্তরকালে, গবেষকগণ শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় প্রদত্ত (বর্তমানে প্রচলিত) নামের পরিবর্তে এ কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' বা 'রাধাকৃষ্ণের ধামালী' রাখার পক্ষপাতী।[১০] ধামালি মূলত আদি রসাত্মক নাট্য, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'ও আদি রসাত্মক আখ্যান, কাজেই প্রাথমিকভাবে রসগত বিচারে উভয়ের মধ্যে মিল প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু এই মন্তব্য শুধুমাত্র 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রসগতদিক নির্দেশ করে—এর আঙ্গিক বা পরিবেশনারীতির পরিচয় এ থেকে খুঁজে পাওয়া যায় না। উপরন্তু এ আখ্যানকাব্য কেন 'ধামালীর সংশোধিত সংস্করণ' তার পক্ষে কোনো যুক্তি বা প্রমাণ উপস্থাপন করা হয় নি। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' 'ধামালী' কথাটার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তা ভর্ৎসনা অর্থে। প্রাচীনকালে ধামালি কোন আঙ্গিকে অভিনীত হতো তার বিবরণ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে 'ধামালী' সেকালের লোকপ্রিয় নাট্যরীতি এবং বড়ুচণ্ডীদাস 'ধামালী'র সমকালীন আঙ্গিক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত যৌক্তিক।) অবশ্য বড়ুচণ্ডীদাস কিভাবে কোন মাত্রায়, প্রচলিত লোকনাট্যরীতিকে সংশোধন করেছিলেন তা খুঁজে বের করা সম্ভব নয় বিধায় এ মন্তব্য যুক্তিসিদ্ধ পন্থায় গ্রহণ করা যায় না।

২(এরূপ উক্ত হয়েছে যে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চিত্রনাটগীত'। আবার তা একই সঙ্গে 'চিত্রগীত'ও বটে, অর্থাৎ এর পরিবেশনারীতি হচ্ছে 'চিত্র দেখানোর সাথে সাথে গান'।[১১] আরও অনুমিত হয়েছে যে, 'চণ্ডীদাস পুতুল বাজির নাটুয়া ছিলেন', তাঁর পুতুলনাটের 'রঙ্গমঞ্চ'ও ছিল।[১২]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদশীর্ষে উল্লেখিত কিছু সঙ্কেতার্থক শব্দ পাওয়া যায়, এগুলো হচ্ছে—দণ্ডক, লগনী, দণ্ডকলগনী, চিত্রকলগনী, প্রকীর্ণকলগনী, প্রকীর্ণক, চিত্রলগনী-দণ্ডক ইত্যাদি।) এর অর্থ নিম্নরূপে নির্ণিত হয়েছে—

দণ্ডক ঃ বিবৃতিময় বা বর্ণনাত্মক গান, লগনী ঃ দ্বিসংলাপময় অর্থাৎ উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক। দণ্ডকলগনী বা লগনীদণ্ডক ঃ উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গান এতে বিবৃতির ঠাট থাকে। লগনীচিত্রক, চিত্রকলগনী ঃ ক্রিয়া অর্থাৎ 'চেষ্টিতের' উদ্যোগমূলক। বিচিত্রলগনী দণ্ডক ঃ বর্ণনামূলক উক্তি-প্রত্যুক্তি। প্রকীর্ণ-লগনী বা প্রকীর্ণক ঃ 'দ্বিসংলাপময়' গানে বর্ণনা। প্রকীর্ণক-লগনী-দণ্ডক ঃ আদ্যন্ত বর্ণনাত্মক লগনী ইত্যাদি।[১৩] (এরূপে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যথার্থই গীতি নাট্যকাব্য'।[১৪] কিন্তু পরে এই মতও ব্যক্ত হয়েছে যে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হ'লো পুতুল সহযোগে কৃষ্ণকাহিনী পদগীতির বই'।)[১৫]

(প্রথমেই উল্লেখ্য যে, এই সঙ্কেতার্থক শব্দগুলো প্রকৃতপক্ষে 'রচয়িতার' না 'সংস্কর্তার', সে বিষয়ে ইতিহাসকার সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি)[১৬] যদি এই অভিনয়-সঙ্কেত (যা পরবর্তীকালে পুতুলবাজির সঙ্কেতরূপে গৃহীত) রচয়িতার হয়, তবে স্বীকার করতে হবে যে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র চতুর্দশ শতকেই বাংলা গেয় বা আখ্যান কাব্যে অনুসৃত হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে সে রূপ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত উড়িষ্যার কবি জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণরত্নাকর' গ্রন্থে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র অনুরূপ 'দণ্ডক বিচিত্র, চিত্রা, বিচিত্রা, লগনী' প্রভৃতি সঙ্কেত 'গীত-অভিনয়ের পদ্ধতি' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।[১৭] কিন্তু তা সত্ত্বেও 'বর্ণরত্নাকর' পুতুলনাচের 'পাঞ্চালিকা' বলে উল্লিখিত হয় নি। বরং তা কথকতা ধরনের গ্রন্থ।

'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' বর্ণিত 'গঙ্গাবতরণের আখ্যায়িকা' অবলম্বনে 'পাঞ্চালি' ও 'পুতুলনাচের' একটি অনুমাননির্ভর রূপে কল্পিত হয়েছে।[১৮] এথেকে 'শ্রীকৃষ্ণ-

কীর্তন' 'পাঞ্চালিকা-নাট্য' রূপে অভিহিত হয়েছে। কিন্তু 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' উল্লিখিত গঙ্গাবতরণের আখ্যায়িকায় পুতুলনাচ সম্পর্কে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

'চণ্ডীদাস পুতুলবাজির নাটুয়া ছিলেন'—এরূপ উক্তি অনুমাননির্ভর। তাঁর 'পুতুলনাচের রঙ্গমঞ্চ ছিল' এরূপ সিদ্ধান্তের পক্ষেও কোনো প্রমাণ উপস্থাপিত হয় নি। অবশ্য 'সনাতন বা জীব'-এর একটি উক্তি (শ্রীজয়দেব চণ্ডীদাসাদিদর্শিতা দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি লীলা প্রকারাশ্চাজ্ঞেয়ঃ) থেকে 'দর্শিত' কথাটাকে 'প্রদর্শিত' অর্থে গ্রহণপূর্বক এরূপ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে যে, 'দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড পটে ও পুতুলবাজিতে' প্রদর্শিত হতো।[১৯] 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে ব্যবহৃত 'দেখিলা' কথাটার এরূপ ব্যাখ্যাই দেওয়া হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে চৈতন্যদেবের নাট্য উপভোগ প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

ঃ প্রাতে চলি আইলা প্রভু কানাইর নাটশালা।
দেখিলা সকল তাঁহা কৃষ্ণচরিত্র লীলা।।

পদদৃষ্টে 'দেখিলা' কথাটা থেকে অনুমিত হয়েছে যে, 'চৈতন্য দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডের পুতুলবাজিই দেখেছিলেন'।[২০] এরকম অনুমান অসঙ্গত না হলেও সন্দেহের উদ্রেক করে।

প্রথমত, চৈতন্যদেব কানাইর নাটশালায় যদি পুতুলনাচই দেখে থাকেন, তবে তার উল্লেখ করতে কৃষ্ণদাস কবিরাজের পক্ষে বাধা ছিল কোথায় ?

দ্বিতীয়ত, চৈতন্যদেবের তিরোধানের (১৫৩৩ খ্রীঃ) প্রায় উনআশি থেকে বিরাশি বছর পর রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' (১৬১২-১৬১৫ খ্রীঃ)[২১] গ্রন্থে ব্যবহৃত একটি মাত্র প্রসঙ্গ 'দেখিলা' থেকে পুতুল নাচের সঙ্গে তার অনিবার্য সম্পর্ক আবিষ্কার দুঃসাধ্য।

তৃতীয়ত, ভাবগত দিক থেকেও 'দেখিলা' শব্দটি ব্যাখ্যাযোগ্য। শ্রীচৈতন্যদেব অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে নিখিলের অনাদ্যন্ত প্রত্যক্ষ করেন কৃষ্ণমূর্তি, কাজেই কৃষ্ণ-বিষয়ক যে-কোনো-লীলা-কথা-অভিনয় তাঁর কাছে কৃষ্ণদর্শন।

চতুর্থত, গবেষক বলেছেন যে, 'যাত্রা' ও 'পদকীর্তন'-এর ক্ষেত্রে 'শোনা' কথাটা ব্যবহৃত হয়।[২২] চৈতন্যদেবের আমলে নাটক অর্থে যাত্রা কথাটা কখনই ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। সেকালে আমরা লীলানাটকেরই সাক্ষাৎ পাই। লীলানাট্য দেখার জিনিস। স্বয়ং কৃষ্ণদাস কবিরাজেই আছে—'দেখিলা সকল তাঁহা কৃষ্ণচরিত্রলীলা'। অর্থাৎ তা ছিল কৃষ্ণলীলা। একালেও কৃষ্ণলীলা বলতে,

কৃষ্ণবিষয়ক নাট্যভিনয়ই বোঝানো হয়। (অনুরূপ রামলীলা-রাম সম্পর্কিত লীলানাট্য)।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে 'পাঞ্চালিকা নাট' অভিহিত করার পেছনে একটি প্রধান যুক্তি এই যে, 'নারদের ভাঁড়ামি' বা জলেস্থলে 'কৃষ্ণের' 'রাধা-ধর্ষণ' 'জীবন্ত অভিনয়' দ্বারা প্রদর্শন সম্ভব নয়—'পুতুলবাজিতে তা খুবই সম্ভব ছিল'।[২৩] এ যুক্তি নানা দৃষ্টান্ত বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' যৌনলীলার বর্ণনা আছে আলাওলের 'পদ্মাবতী'তে নারীর গুপ্ত-অঙ্গের বর্ণনা ব্যতিরেকেও, সুবিস্তৃত যৌন-সম্ভোগের চিত্র আছে। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে সুন্দর ও বিদ্যার যৌনলীলার অনুপুঙ্খ বর্ণনা লভ্য। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' কথিত ধর্ষণের ঘটনা জীবন্ত অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপনের কথা কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু বর্ণনাত্মক পন্থায় এসকল পদ গায়েন কর্তৃক বিবৃত হবার পক্ষে কোনো বাধা নেই। 'গাজীরগানে', গর্ভিণীর উদরে লালিত ভ্রূণের সুবিস্তৃত বর্ণনা গায়েন অভিনয় সহকারে একাই উপস্থাপন করেন। 'ঘাটুগানে' যৌনলীলা আকারে ইঙ্গিতে অভিনীত হয়, অনেক সময় আসর বুঝে তা সীমাও অতিক্রম করে। কাজেই যৌনলীলা দৃশ্যনির্ভর না হলেও বর্ণনাত্মকরীতিতে উপস্থাপন করা সম্ভব। অন্যদিকে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' বর্ণিত 'রাধা-ধর্ষণ' পুতুলের মাধ্যমে প্রদর্শিত হলেও তাতে আদিরসের কোনো তারতম্য হবার কথা নয়। সেই সুদূরকালের লোকনাট্যের অভিনেতাদের শিল্পরুচি একালের নান্দনিক রুচিতে বিচার্যও নয়।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' 'চিত্রগীত' রূপেও আখ্যাত হয়েছে। চিত্রগীত হচ্ছে 'চিত্র দেখানোর সঙ্গে' পাত্রপাত্রীর গান। এ মতও এ যাবত কেউ স্বীকার করেন নি। একই অংশ বিশেষ যুগপৎ পাঁচালি ও চিত্রগীতে পরিবেশিত হবার দৃষ্টান্ত মধ্যযুগে একমাত্র শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত 'ইউসুফ' কাব্যে আছে। উপরন্তু পটচিত্র প্রদর্শনের সময়গত ব্যাপ্তিকাল—এ কালেও (গাজীরপট, রামসীতার পট) অত্যন্ত সীমিত। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মতো একটি সুবৃহৎ আখ্যান পটচিত্রে প্রদর্শনযোগ্য বলে ভাবাও দুঃসাধ্য। তবে কৃষ্ণবিষয়ক পটচিত্র মধ্যযুগে ব্যাপকভাবে প্রচরিত ছিল। এর অন্যনাম 'চিত্রনাট'।

জন্মখণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যক পদে, নারদ চরিত্র বর্ণনা থেকে পুতুলবাজির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনপূর্বক এরূপ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে যে, 'নারদের অঙ্গভঙ্গির বর্ণনা নাচের পুতুলের পক্ষেই খাটে'।[২৪]

এই মত কতদূর গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা যাক।

বাঙলা লোকনাট্যে নারদ সুমন্ত্রণা ও কুমন্ত্রণার দ্বৈতমিশ্রণে রচিত। পৌরাণিক নারদ সঙ্গীতশাস্ত্রসিদ্ধ পুরুষ। অথচ লোকনাট্যে বা আখ্যানকাব্যে সর্বত্রই নারদ হাস্যকর ও কৌতুককর চরিত্র হিসেবে চিত্রিত। বাঙলাকাব্যে নারদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 'শূন্যপুরাণে'। সেখানে তিনি ত্রিভঙ্গ আকৃতির, তাঁর গান 'ভেকর সঙ্গীত'। বড়ুচণ্ডীদাসের কালের পূর্বেই ধামালির প্রচলন ছিল। সে ক্ষেত্রে এ চরিত্রটির রূপরেখা সেখান থেকে গৃহীত হয়েছিল, এরূপ অনুমানই সঙ্গত। পরবর্তীকালে 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' শ্রীবাসের নারদ চরিত্রের 'কাচ' থেকেও দেখা যায় যে, বৃন্দাবনদাসের নারদ-বেশ বর্ণনা এমনকি নারদ-দর্শনে দর্শকের প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত প্রায় একই রকমের। 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' আছে—

ঃ ক্ষণেক নারদ কাচ করিয়া শ্রীবাস।
প্রবেশিলা সভামাঝে করিয়া উল্লাস।।
মহাদীর্ঘ পাকা দাড়ি ফোঁটা সর্ব্বগায়।
বীণা কান্ধে কুশহস্তে চারিদিকে চায়।।
... ...
শ্রীবাসের বেশ দেখি সর্ব্বগণ হাসে।
করিয়া গভীরনাদ অদ্বৈত জিজ্ঞাসে।।[২৫]

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র নারদ—

ঃ আয়িল দেবের সুমতি শুনি।
কংসের আগক নারদমুনী।।
পাকিল দাড়ি মাথার কেশ।
বামন শরীর মাকড় বেশ।।
নাচএ নারদ ভেকের গতি।
বিকৃতবদন উমত মতি।।
ক্ষণে ক্ষণে হাসে বিনিকারণে।
ক্ষণে হত্র খোড় ক্ষেণেকে কানে।।
নানা পরকার করে অঙ্গভঙ্গ।
তাক দেখি সক লোকের রঙ্গ।।[২৬]

কাজেই নারদকে কৌতুককর চরিত্র হিসেবে চিত্রণের সঙ্গে পুতুলনাচের সম্পর্ক অনিবার্য নয়। আদিমধ্যযুগে শুধু পুতুল (বা পট) নাচের জন্য এরূপ একটি সুবৃহৎ আখ্যান রচিত হয়েছিল, এরূপ মত আজ পর্যন্ত কোনো বিশেষজ্ঞ স্বীকার করেন নি। পরবর্তীকালে, শতশত বৎসরে পুতুলবাজি বা পটচিত্র প্রদর্শনের নিমিত্তে রচিত আর একটিও আখ্যানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। কাজেই এই মত যুক্তি ও প্রামাণ্যের অভাবে গ্রহণযোগ্য নয় বলেই মনে করি।

আঙ্গিকগত দিক দিয়েও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে পুতুলনাচের কাব্য বলে বিবেচনা করা যায় না। নাট্যকৌতূহল ও ক্ষিপ্রতা সৃষ্টি পুতুলনাচের অন্যতম পরিবেশন-কৌশল। সে ক্ষেত্রে দু'তিনটি পুতুলের মাধ্যমে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র এক একটি সুবিস্তৃতখণ্ড বা পূর্ণাঙ্গ আখ্যান পরিবেশনপূর্বক দর্শক কৌতূহল ধরে রাখা বাস্তবে কতদূর সম্ভব তাও বিচার্য। জন্মখণ্ড ও বিরহখণ্ডের বহু অংশ আছে যা পুতুলের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে পুতুলনাচের সঙ্গে এই আখ্যানের যোগ প্রকৃতপক্ষে স্বীকার করা যায় না।

কাব্যের পরিসর, পৌরাণিক ও লৌকিক অনুষঙ্গের মিশ্রণে কাব্যপরিকল্পনা ও কাহিনী বিস্তার বিবেচনা করে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে 'মহাকাব্য' রূপে গ্রহণ করা যায়।[২৭] তবে তা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র নয়, মধ্যযুগ পর্বে বাঙালির নিজস্ব শিল্পরীতির আলোকে বিচার্য।

৩. কেউ কেউ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে 'নাটগীত' শ্রেণীর রচনা বলে অভিহিত করেছেন। নাটগীতি 'উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গীতি'।[২৮] মঙ্গলনাটের সঙ্গে এর প্রধান পার্থক্য এই যে, 'মঙ্গলগানে একজন মাত্র মূল গায়েন' আসরে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আখ্যান পরিবেশন করে এবং মূল গায়েনের সঙ্গে থাকে দোহার। নাটগীতির 'প্রাচীনতর' রূপ বোলান গানে পাওয়া যায়।

'নাটগীতি আখ্যানমূলক গীত'-'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র সঙ্গে এর খানিকটা সাযুজ্য আছে একথা স্বীকার করা যায়। নৃত্য এবং গীত সহযোগে নাটগীতের আঙ্গিক গড়ে উঠেছিল। এতে 'কাহিনীর অনেকটা পাত্রপাত্রীর নাটকীয় সংলাপের' মাধ্যমে পরিবেশিত হতো।[২৯] এই লক্ষণ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' খানিকটা লভ্য বলেই তা 'নাটগীত শ্রেণীর রচনা' হিসেবে আখ্যাত হয়েছে।

'নাটগীত' 'গীতনাট' এর উল্লেখ মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্যে নানা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হতে দেখা যায়। কাজেই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র শ্রেণী নির্ণয়ে শব্দটির ব্যবহার

অপ্রাসঙ্গিক বা অযৌক্তিক নয়। উপরন্তু 'নাটগীত' মধ্যযুগের নাট্যপরিভাষারূপেই গ্রাহ্য হতে পারে।

কিন্তু নাটগীতের একান্ত লক্ষণ যদি নৃত্যগীত ও উক্তিপ্রত্যুক্তি হয়, তবে দেখা যায়, অনুরূপ নৃত্যগীত ও উক্তিপ্রত্যুক্তি সংবলিত নাট্যরীতি হচ্ছে ধামালি, ঝুমুর প্রভৃতি। সেক্ষেত্রে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে ধামালি বা ঝুমুর শ্রেণীর 'রচনা' বলেও অভিহিত করা যায়। এ কাব্যকে শুধু নৃত্যগীত ও সংলাপের বিচারে নাটগীতরূপে চিহ্নিত করলে এর সামগ্রিক পরিচয় উদ্ভাসিত হয় না। এতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ধরনটা বোঝা গেলেও গড়নটা বোঝা যায় না। এ কাব্যের পদান্তে গায়েনের ভণিতা ও পদাগ্রে দিশা বা ধুয়া দেখা যায়। সুতরাং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পরিবেশনায় গায়েন ও দোহারের ভূমিকাও বিবেচ্য।

৪. 'বাহ্যলক্ষণ' বিচারে 'সাগরনন্দীর নাটকলক্ষণরত্নকোষ'-এ বিবৃত ত্রিচরিত্রবিশিষ্ট রূপক 'বীথি'র সঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মিল আছে বলে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা নাট্য-আঙ্গিক বা রীতিতে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রানুশাসন কোথাও অনুসৃত হয়েছে এরূপ পরিদৃষ্ট হয় না। কাজেই শুধু বাহ্যলক্ষণের বিচারে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র 'কাব্যস্বরূপ' অন্বেষণ নিরর্থক বলেই প্রতীয়মান হবে।

৬. ধামালির সঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র আত্মীয়তা সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ধামালি ও জাগের গান সমার্থক। এ বিষয়ে এরূপ উক্ত হয়েছে যে, জাগের গানের রীতিতে 'একদা' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পালা 'পশ্চিমবঙ্গে গীত' হতো।[৩০] কিন্তু শতশত বৎসরের ব্যবধানে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র আদি পরিবেশনার রূপটি একালেও অবিকৃতরূপে আছে—এমন সিদ্ধান্ত সঠিক নয়।

৭. ঝুমুর গান আদিরসাত্মক, এতে 'শৃঙ্গার রসের বাহুল্য' আছে। বিশেষজ্ঞের মতে 'ঝুমুর গীত-বহুল লোকনাট্য-শ্রেণীর সাহিত্য'।[৩১] এতে উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং নৃত্যও আছে। কিন্তু 'ঝুমুর সঙ্গীতে সাধারণত লোক সঙ্গীতেরই প্রাধান্য', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পদগুলি রাগভিত্তিক। কাজেই এ আখ্যানকাব্য শুধু 'ঝুমুরের আদর্শেই বিচার্য নয়'।[৩২]

বিভিন্ন লোকনাট্যের সঙ্গে মিল ও অমিল প্রত্যক্ষপূর্বক 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে শেষ পর্যন্ত 'মূলত বর্ণনামূলক কাব্য' রূপেই অভিহিত করা হয়েছে। এই অভিমতও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মধ্যযুগের সকল গেয় ও আখ্যানকাব্য বর্ণনামূলক উপরন্তু সে-যুগের কাব্যরূপ বিচারে কোনো আখ্যানকাব্যকে মূলত কাব্যরূপে বিচার করলে, এর গেয় রূপটির অনিবার্যতাকে অস্বীকার করা হয়। মধ্যযুগের বিশাল

পাঁচালি পরিবেশনার ধারা বিচারপূর্বক একথা বলা যায় যে, পরিবেশনের উদ্দেশ্যেই ঐসকল আখ্যান বা কাব্য রচিত হয়েছিল। সেকালের প্রায় সকল কাব্য মৌখিক রীতিতে আসরের সামগ্রীরূপে দর্শকদের সামনে পরিবেশিত হতো। কাজেই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে শুধু বর্ণনামূলক কাব্য বললে, এর প্রকৃতরূপকে অস্বীকার করা হয়। যুগধর্মের ধারায়, যে-যে রীতি শত শত বৎসর ধরে কাব্য ও গেয়কাব্যের অদ্বৈতরূপে ঐক্যলাভ করেছিল, সে সকল শিল্প-রীতিকে শুধু 'কাব্য' বা 'বর্ণনামূলক কাব্য' নামে অভিহিত করা, রূপ বা রীতি-বিচারে সমর্থনযোগ্য নয়।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' পদশীর্ষে যুক্ত সংস্কৃত শ্লোক দৃষ্টে এরূপ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে যে, সেগুলো 'রূপ-গোস্বামীর পরবর্তীকালে', কোনো সংস্কর্তার।[৩৩] পদশীর্ষে অনুরূপ শ্লোক দ্বিজশ্রীধর ও সাবিরিদ খাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' নাটগীতে দৃষ্ট হয়। অষ্টাদশ শতকে রচিত 'মাধবসঙ্গীতে'ও পদশীর্ষে নানা সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে কাহিনী সংযোজন ও ঘটনা, চরিত্র ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। কাজেই এ রীতিটা যে পরবর্তী-কালের সে বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র নাট্যশ্রেণী ও পরিবেশনারীতি নির্ণয় সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত আলোচনার পর স্বতঃই প্রশ্ন জাগে যে, প্রকৃতপক্ষে এ কোন শ্রেণীর নাট্য, এর উপস্থাপনা পদ্ধতিই বা কিরূপ ছিল।

এর উত্তরে প্রথমেই বলা যায়, সম্পূর্ণত কোনো বিশেষ নাট্যাদর্শের আধারে এ কাব্যের রূপ অন্বেষণ করার পূর্বে বিচার্য যে মূলে, বড়ুচণ্ডীদাস কিভাবে এই আখ্যান পরিবেশন করতেন। কারণ, বড়ুচণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রচয়িতা এবং প্রথম গায়েন। কাব্যের পদান্তে ভণিতার সর্বত্রই 'গাইল বড়ুচণ্ডীদাসে' দেখা যায়। এর অর্থ, বড়ুচণ্ডীদাস গায়েনরূপে আসরে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' পরিবেশন করতেন।

একাব্যে সুনির্দিষ্টভাবে ধ্রুপদ অর্থাৎ ধুয়ার ব্যবহার দেখা যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ আখ্যান পরিবেশনায় সুনিশ্চিতভাবে দোহারের ভূমিকা বিদ্যমান। কাজেই বাঙলা বর্ণনাত্মক নাট্যরীতির দুটি প্রধান উপাদান—গায়েন ও দোহার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' লভ্য।

এ ক্ষেত্রে এ আখ্যান কাব্যের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক পদসমূহের প্রসঙ্গও বিচার্য।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' নিরালম্ব বর্ণনাত্মক পদের চেয়ে সংলাপাত্মক পদেরই প্রাধান্য। এ সকল সংলাপের প্রাসঙ্গিকতা ও অনিবার্যতা বিচার করলে দেখা যায়

যে, সেগুলি চরিত্রমূলক উপস্থাপনার ক্ষেত্রেই অধিকতর প্রযোজ্য। কেবল গায়েন কেন্দ্রিক উপস্থাপনার উদ্দেশ্যে রচিত হলে বড়ুচণ্ডীদাস সমগ্রকাব্যে সংলাপ বা উক্তি-প্রত্যুক্তির এত বিস্তৃত ও নাট্যমূলক প্রয়োগকৌশল অবলম্বন করতেন না।

এ কাব্যে পদধৃত উক্তি-প্রত্যুক্তি পাত্রপাত্রীর মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কট, দ্বন্দ্ব ও কাহিনীর অগ্রগতি সাধন করেছে। এ কারণেই এর আঙ্গিক হয়ে উঠেছে নাট্যমূলক। এ দিক থেকে বিচার করে বলা যায়, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' গায়েন ও দোহারের মধ্যবর্তীস্থলে চরিত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা থাকা স্বাভাবিক।

কিন্তু এ কথাও সত্য যে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক পদগুলির অন্তে যে ভণিতা, তা বহুক্ষেত্রে সংলাপের সঙ্গে মিশে গিয়ে, শুদ্ধ সংলাপরীতির পক্ষে প্রতিবন্ধকতা রচনা করেছে। যেমন—

রাধা ঃ এতেক সখীজন পার কইলোঁ
কৌড়ী নীলোঁ তাহার যে।
আহ্মার থানত দাম চাহসি
নিলজ বাপ তোহ্মার এ।।

কৃষ্ণ ঃ সহ্মার বন্ধক রাখিলোঁ তোহ্মাক
পুরহ আহ্মার আস এ।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ুচণ্ডী দাস এ।।

লক্ষণীয় যে, কৃষ্ণের উচ্চারিত সংলাপের অন্ত্যমিল ঘটেছে ভণিতায় এসে। কিন্তু সংলাপকেন্দ্রিক অন্ত্যমিল না থাকলেও পূর্ব-পদেই যে সংলাপের সমাপ্তি টানা যায় তাও স্পষ্ট। আবার এরূপ উক্তি (নৌকাখণ্ডে)-ও দেখা যায়—

কৃষ্ণ ঃ তোহ্মাত মজিল মোর মনে।
ভিড়িদেহ আলিঙ্গন দানে।।
তাত মোর বড় পতিআশে।
গাইল বড়ুচণ্ডীদাসে।।

শুদ্ধ সংলাপ উচ্চারণের পক্ষে এখানেও একই সমস্যা দৃষ্ট হয়।

তাহলে এই 'নাটগীত শ্রেণীর' আখ্যানে পাত্রপাত্রীর সংলাপ বলার রীতিটা কিরূপ ছিল—এ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক।

এ সমস্যার সমাধান আখ্যান পরিবেশনের ধারাতেই অন্বেষণ করা যায়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র সংলাপ একালের নাট্যে বিশুদ্ধ সংলাপরীতির আদর্শে বিচার্য নয়।

এ ছিল মূলত গায়েন কেন্দ্রিক নাট্যাভিনয়। কাজেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক ভণিতা, সংলাপের সর্বশেষ ধাপে দোহার বা গায়েন কর্তৃক গীত হতো, এরূপ সিদ্ধান্তই সঙ্গত। উল্লেখ্য মধ্যযুগের বাঙলা মৈথিলী নাটকে চরিত্রাভিনয়মূলক গীতি সংলাপের অন্তেও ভণিতা দৃষ্ট হয় (দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

একালেও লীলাশ্রেণীর নাটকে (যেমন-রামলীলা, কৃষ্ণলীলা) পাত্রপাত্রীর গীতিমূলক সংলাপের শেষ পদ, দোহার সহযোগে গীত হতে দেখা যায়। এ হচ্ছে দোহারের দিশাগীতের অতিরিক্ত পরিবেশনা। বাংলা নাট্যরীতির এ একটা বৈশিষ্ট্যও বটে।

(পরিশেষে, কাব্যের গঠন, পদবিচার ও আখ্যানস্থ বিভিন্ন লক্ষণ দৃষ্টে বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গায়েন-দোহার ও পাত্রপাত্রী সহযোগে অভিনীত আদি মধ্যযুগের 'গীতনাট শ্রেণীর' আখ্যান।)

এরপর আদি-মধ্যযুগের ধামালি প্রসঙ্গ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'ধামালী' কথাটার উল্লেখ আছে। দানখণ্ডে রাধা বলছে—

ঃ হেন মন করে বড়ায়ি দহে পৈসে মরী।
পরার পুরুষ সঁমে ধামালী না করি
ধামালী বুলিতে কাহ্নে দিহলি আস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস।

'ঢামালী'-'ঢেমন', 'ঢেমনি', অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'ব্যভিচারী,' 'ব্যভিচারিণী,' 'জার,' বা 'জারিণী' বোঝাতেও 'ঢেমনা' 'ঢেমনী' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।[৩৪] 'ঢামালী' বা 'ধামালি'র আভিধানিক অর্থ দুরন্তপনা, কৌতুক, চাতুরী।[৩৫] 'ধামালী' কথাটা বাদ্যপদ্ধতি বা গীত-পদ্ধতি থেকেও হতে পারে'। সঙ্গীতে তাল নির্দেশে 'ধামার' নামে একটি বিশেষ তালও প্রচলিত আছে।[৩৬]

'ষোড়শ-সপ্তদশ' শতকে আদি রসাত্মক কৃষ্ণলীলার গান 'ঢামালী' বা 'ধামালী' নামে প্রসিদ্ধ ছিল।[৩৭] 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' শব্দটির অস্তিত্ব থেকে বোঝা যায়, সেকালে এ শ্রেণীর নাটগীতের প্রচলন ছিল। 'ঢামালী'র আভিধানিক অর্থ থেকে প্রতীয়মান হয় যে কৃষ্ণের কৌতুক এবং চাতুরী বিষয়ক ঘটনা নিয়ে ধামালির আখ্যানভাগ গঠিত। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ভক্তিবাদের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ-কাহিনীর যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লভ্য 'গীতগোবিন্দ', বা 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', 'কৃষ্ণধামালী' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' তা খুঁজে পাওয়া যায় না।[৩৮] সেকালে ধামালি ধরনের নাট্যরীতি জনগণের নাট্যরস পিপাসার অনুকূলেই রচিত হয়েছিল। ঢামালী বা ধামালি

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পূর্বকালের। কারণ 'ঢামালী রীতিরস'কে অবলম্বন করে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রীতিরস গড়ে উঠেছে।[৩৯]

'উত্তরবঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক লঘু সুরের আদি রসাত্মক ধামালী গান' সারারাত্রিব্যাপী পরিবেশিত হয়। এর অন্য নাম 'জাগের গান'। 'রাধার শাকতোলা পালা, কৃষ্ণের মাছধরা পালা, বড়শীর সাহায্যে কৃষ্ণের মাছ ধরা পালা, রাসের পালা' প্রভৃতি ধামালি গানে পরিবেশিত হয়।[৪০]

পার্বণ বা উৎসব উপলক্ষে নারীদের ধামালি পরিবেশনা সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে মধ্যযুগে এমনকি তৎপূর্বকালে ধামালির অন্য একটি বিশেষরীতি নারীদের মধ্যে (ভাদুপরবের প্রাচীনতা স্মর্তব্য) প্রচলিত ছিল। নারীদের যৌথ নৃত্যগীতই এ শ্রেণীর ধামালির প্রাচীনতার স্মারক।

কৃত্তিবাস (জন্ম ১৩৯৮-১৪০০খ্রীঃ)[৪১]—এর 'রামায়ণ' ও মালাধরবসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' (১৪৩৭-১৪৮০ খ্রীঃ)[৪২] রচনার বহুপূর্ব থেকেই 'লোকগাথার আকারে' রামায়ণ মহাভারতের নানা আখ্যান এতদঞ্চলের জনগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল।[৪৩]

সেন বংশীয় রাজাদের আমলে 'মন্দির চিত্রে' 'রামকথা' জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।[৪৪] চর্যাগীতিকার 'রাআ, রাআরে...' পংক্তিটিতে 'অদ্ভুত বাশিষ্ট' রামায়ণের 'রাজা পদ্ম' ও 'রাণী লীলা' সংক্রান্ত কাহিনীর ইঙ্গিত আছে বলে কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন।[৪৫]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ডে ১৭ সংখ্যক পদে, কৃষ্ণ রাধাকে আপন জন্মান্তরের পরিচয় প্রদানপূর্বক রামায়ণের মূল গল্পটি অতি সংক্ষেপে বিবৃত করছে—

ঃ রামরূপে রাবণ বধিলোঁ
লঙ্কা কইল ছারখার।
লক্ষ্মণ সহাএঁ সাধিলো মান
সীতার কইলো উদ্ধার।।

দানখণ্ডের অন্ততঃ আরো দুটি পদে রামায়ণ প্রসঙ্গ লভ্য—

ঃ চৌদ চৌ যুগ আয়ু লঙ্কার রাবণ।
তেহোঁ সে মজিয়াগেল শীতার কারণ।।

ঃ হনুমান মাহাবীর হৈলা সারথী।
তবেঁ কৈলো সেতুবন্ধ আহ্মে দাশরথী।।
মাইল ইন্দ্রজিত ভায়ি লক্ষ্মণে
জয়জয় হুলাহুলী দিল দেবগণে।।

অবশ্য রামকথা 'গুপ্ত শাসনের পূর্বে' এতদ্দেশে প্রচলিত থাকার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৪৬] প্রাচীনকালে 'বাঙলা অক্ষরে' সংস্কৃত মহাভারতের লিখিত রূপ পাওয়া যায়।[৪৭] বাঙালির লোকজীবনের নানা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা,' 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠীর' ইত্যাদি প্রবাদ-প্রবচন থেকে মহাভারতের প্রভাব অনুমেয়। পালবংশের সর্বশেষ রাজা 'মদনপালের পাট মহিষী চিত্রমতিকা' 'বটেশ্বর স্বামী' নামে একজন কথকের কাছ থেকে নিয়মিত 'মহাভারত' শ্রবণপূর্বক তাঁকে একটি গ্রাম দানস্বরূপ দিয়েছিলেন।[৪৮]

মহাভারত, রামায়ণের মতো ব্রাহ্মণ্যশাসিত ছিল না, সেজন্য পরবর্তীকালে দেখা যায় এর 'কবিরা সাধারণত কায়স্থ, দৈবাৎ ব্রাহ্মণ, কৃচিত অন্যজাতি'।[৪৯]

চতুর্দশ শতকে মৈথিলী কবি সরলদাস 'মহাভারতে'র ঘটনাকে ভিত্তিপূর্বক কাব্য রচনা করেছেন। মৈথিলী ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে 'মহাভারতে'র অনুবাদ হলেও 'বাঙলা, হিন্দী প্রভৃতি উত্তরা পথের সাহিত্য' অতিপ্রাচীনকাল থেকে এর অনুবাদ 'অথবা ভাব-আহরণে'র মাধ্যমে 'বিশেষভাবে' সমৃদ্ধ হয়েছিল।[৫০]

'বাঙ্গালায় রামায়ণ গেয়কাব্য' এবং তা পাঁচালি কাব্য হিসেবেও পরিচিত। কিন্তু মহাভারত পাঁচালি হিসেবে আখ্যাত হলেও 'একান্তভাবে পাঠ্যকাব্য'।[৫১] 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' মহাভারতের প্রসঙ্গে আছে—

ঃ পরাশর নামে ঋষি আছিলা বিশাল।
তীন ভুবনে জানী তপস্যা যাহার।।
জলমাঝে মীনকন্যা করিল গমণ।
তাত উপজিলা বেদব্যাস তপোধন।।
তোহ্মার বচন রাধা সবই আতত।
পরদারে পাপ নাহি মুণীর সমত।।

পঞ্চপাণ্ডবের ভৈলা কুন্তী জননী।
পাঞ্চপতী যার ভৈল সবলোকে জানী।।[৫২]

এসকল দৃষ্টান্ত থেকে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই সঙ্গত যে, মহাভারত-নাটগীত, কথকতা-পাঁচালির আকারে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক এমনকি তৎ-পূর্ববর্তীকালে আসরে পরিবেশিত হতো।

পরবর্তীকালে মঙ্গলকাব্যসমূহের পরিণত আঙ্গিকের রূপ বিচারপূর্বক বলা যায় যে, ঐ সকল আখ্যায়িকা পূর্বে প্রচলিত ছড়া, ব্রতকথা, পূজা প্রভৃতি অবলম্বন করেই পূর্ণ কাব্যরূপ লাভ করেছিল। লৌকিক দেবদেবী-শিব, মনসা, চণ্ডী ষষ্ঠী'র ব্রতকথাগুলো গীতনৃত্য-পূজার আকারে বৎসরের নির্দিষ্ট দিনে, কৃত্যের অংশ হিসেবে গৃহাঙ্গনে বা মন্দির-প্রাঙ্গণে পরিবেশিত হতো। সকল ব্রতগীতে ও ব্রতকথায়, আনুষঙ্গিক পরিবেশনার মধ্যে সংশ্লিষ্ট আরাধ্যের আকার-আকৃতি, চারিত্র্যলক্ষণ প্রকাশিত হতো। এই কল্পিত রূপের সঙ্গে লৌকিক ও কবিকল্পনার সূত্র যুক্ত হয়ে তা ক্রমে ক্রমে সুবৃহৎ মঙ্গল পাঁচালির আকৃতি লাভ করে।

'খ্রীষ্টীয় একাদশ দ্বাদশ শতকের পূর্বেই' এদেশে মনসাপূজার প্রচলন ঘটেছিল।[৫৩] কিছু কিছু 'পুরাতাত্ত্বিক' আবিষ্কার থেকে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বাংলাদেশ ও সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে 'অসংখ্য মনসামূর্তি' আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলো 'দশম' থেকে 'দ্বাদশ শতাব্দীর'। উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরে মনসামূর্তিতে প্রাপ্ত 'উৎকীর্ণ লিপি' দৃষ্টে গবেষকগণ অনুমান করেন যে এর কালও পূর্বোক্তশতাব্দী। এই উৎকীর্ণ লিপিতে রাজা বিজয়সেনের নাম পাওয়া যায়।[৫৪]

মনসার ব্রতকথারূপে এমন কিছু কাহিনী প্রচলিত আছে, যার সঙ্গে প্রচলিত মনসামঙ্গল কাব্যে বিবৃত আখ্যানের মিল নেই।

এরূপ একটি ব্রতকথায়, কোনো এক সদাগরের সাতপুত্রবধূর সর্বকনিষ্ঠার নাগপ্রীতি ও মনসার বরলাভের কাহিনী আছে। কনিষ্ঠাবধূ মনসাপুত্রদের সেবায় প্রীত করে মনসার স্নেহ আকর্ষণে সমর্থ হয়। ছদ্মবেশী মনসা তাকে নিয়ে যায় নিজগৃহে। তারপর নানা সঙ্কটে উত্তীর্ণ হয়ে সে লাভ করে গা ভরা মনসার অলঙ্কার-উপহার। মনসা তখন আত্মপরিচয় দেয়-

'ঃ আমি মনসা, আমি সিজ-মনসা গাছে থাকি, তুমি আমার পূজা পৃথিবীতে প্রচার করিও। দশহরা নাগ-পঞ্চমীর দিনে ঐ গাছ আনিয়া পূজা

করিও, আর ভাদ্রমাসে অরন্ধনের দিন শুদ্ধাচারে পূজা করিয়া আমাকে পান্তা ভাতের সাধ দিও'।

এই ব্রতকথা মনসা বিষয়ক একটি প্রাচীন সংস্কার থেকে সৃষ্ট। কারণ প্রাচীন ব্রতগীতে মনসা সিজবৃক্ষপ্রতীকেই 'পূজিত' হতেন। লক্ষণীয় যে, এতে চাঁদসদাগর বা বেহুলার কোনো প্রসঙ্গ নেই। এ থেকে বিশেষজ্ঞগণ ধারণা করেন যে এ সকল ব্রতকথা কাব্যাকারে রচিত মনসামঙ্গলের কাহিনীর পূর্ববর্তী।[৫৫] বাংলাদেশের ময়মনসিংহ অঞ্চলে অনুরূপ একটি ব্রতকথা পাওয়া যায়।

এতে আধ অলঙ্কারে প্রথমবার মনসা গৃহ থেকে শ্বশুর বাড়িতে ফিরে আসার পর সকলের ধিক্কারে ছোটবউ উল্টো, নাগভ্রাতা ও মনসার প্রশংসাসূচক একটি ছড়া বলে—

ঃ এবার এসেছি আধ অলঙ্কারে
আরবার আসব সব অলঙ্কারে
আমার গর্বের কি টুটা?
দাড়াই-বাড়াই ভাই জিউক
পদমকুমারী মা জিউক
আইরাজ বাপ জিউক
মণিরাজ খুড়া জিউক
আমার গর্বের কি টুটা।[৫৬]

এতেও চাঁদ সদাগরের কাহিনী বা বেহুলা-লক্ষীন্দরের প্রসঙ্গ নেই।

মৈমনসিংহ অঞ্চলে এই ব্রতকথা, নৃত্যগীত ও আলপনা-চিত্র সহকারে পরিবেশিত হয়। এতে নানা চিত্রের মধ্যে আছে 'হেঁতালের লাঠি হাতে চাঁদ সদাগর' জোড়করে প্রার্থনারত স্ত্রী সনকা, অতলসমুদ্রে ভাসমান মধুকরাদি সপ্তডিঙ্গা, লৌহবাসর, 'বেহুলা-লক্ষীন্দর' ইত্যাদি।[৫৭] এই আলপনা পরবর্তীকালের, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আলপনা কেন্দ্রিক ব্রতনৃত্যগীতে নাট্যাভাস বিদ্যমান—একথা স্বীকার করা যায়। এ থেকে এও ধারণা করা যায়, সেকালে মনসার ব্রতকথামূলক পটচিত্র বা পটনাটের প্রচলন ছিল।

'বীরভূম' অঞ্চলে স্বর্ণকার সম্প্রদায়ের বিবাহের কৃত্যে 'গাছবেড়া' অনুষ্ঠানটি প্রাচীন মনসা কৃত্যের স্মারক বলে মনে হয়। 'এই আচারটি বিবাহের দিন বা বিবাহের পূর্বদিন' অথবা গায়ে হলুদের সময় পালিত হয়। গায়েন ও দোহার মিলে

মোট পাঁচজন' মনসামঙ্গল পরিবেশন করে। এর দু'তিন দিন আগে মন্দির থেকে মনসামূর্তি নীত হয়। এবং কয়েকদিন ধরে 'প্রতি সন্ধ্যায় মনসামঙ্গল'গীত হয়। গাছবেড়ার দিনটিতে কয়েকটি মেয়েলি আচার পালনীয়। আচার পালিত হবার পর একটি শোভাযাত্রা 'গাছবেড়া' অনুষ্ঠানের নিমিত্তে জড়ো হয়।

শোভাযাত্রার মধ্যভাগে 'চামর হস্তে মনসামঙ্গলের মূল গায়েন, গায়ক ও বাদ্যকরগণ' পশ্চাতে পুরোহিত অর্থাৎ 'দেয়াশীর' কোলে 'মনসা দেবীর ঘট' ও দেবীর পার্শ্বে 'পুরোহিত' এভাবে মিছিলটি সাজানো হয়। 'দুই কিশোর-কিশোরী' পথের ধারের জনসমাগমের উপর 'খই ছড়ায়' এ সময়ে 'এয়োস্ত্রীগণ হুলুধ্বনি' দেয়, 'কিশোর-কিশোরীরা' শঙ্খ বাজায়। 'এয়োগদিগের মধ্যে বা পশ্চাতে থাকে 'বর ও বধূ'। হাতে 'জাতি বা দর্পন,' কনের হাতে 'কাজল লতা'। কনে বাম হাতে 'একটা কাঠের নৌকা টানে' এবং একটি সুপক্ক নারকেল 'দক্ষিণহস্তে' আবর্তন করতে থাকে, সঙ্গে ঢাক-সানাই-কাঁসার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উচ্চনিনাদ। একজন 'এয়োস্ত্রীর' উপর মনসা দেবীর 'ভর' হয়, 'পুরোহিত' তাকে তার 'অপরাধ' ও 'প্রায়শ্চিত্তের' বিধান জিজ্ঞাসা করে—সে নিজের অপরাধ স্বীকারপূর্বক দেবীর কণ্ঠে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেয়। বৃক্ষপ্রদক্ষিণের আগে 'অল্পক্ষণ' মনসামঙ্গল গীত হয়।[৫৮]

বিষহরি ও চণ্ডীপূজার উদ্ভবের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে 'খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অথবা তারও আগে' এই দুই লৌকিক দেবীর পূজা প্রচলিত হয়েছিল। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে' আছে—

ঃ ধর্ম কর্ম লোকসব এইমাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে।।
দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরী।
তাহা সে পূজেন সেও মহাদম্ভ করি।।[৫৯]

পঞ্চদশ শতাব্দী শেষ হবার আগেই মনসামঙ্গলের কাহিনী 'পরিপূর্ণ পাঞ্চালীর' অবয়ব পেয়েছিল।[৬০] শুধু মনসা বা চণ্ডী নয় ষষ্ঠী দেবতার পূজাও চৈতন্য-পূর্বকালে প্রচলিত ছিল। এ প্রসঙ্গে মনসামঙ্গলের প্রাচীনতম পাঁচালি গীতের রচয়িতা কানাহরিদত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে এই পাঁচালিকারের নাম পাওয়া যায়—

ঃ প্রথমে রচিল গীত কানাহরিদত্ত।
মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।।

এ থেকে মনে হয় কানাহরিদত্ত মৌখিক রীতিতে তাঁর পাঁচালি রচনা করেছিলেন। তবে পাঁচালি অর্থে গীত ব্যবহারের দৃষ্টান্তও উদ্ধৃত পংক্তিদ্বয়ে মিলছে। বিজয়গুপ্তের সাক্ষ্যমতে তাঁর কালে হরিদত্তের গীত বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কানাহরিদত্তের আবির্ভাবকালে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে বলে অনুমিত হয়েছে।[৬১] বিজয়গুপ্তের বর্ণনা অনুসারে কানাহরিদত্তের গীত পরিবেশনের রীতি সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হয়। তিনি বলেছেন—

ঃ হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।
যোড়া গাঁথা নাই কিছু ভাবে মোর ছলে।।
কথার সঙ্গতি নাই, নাহিক সুস্বর।
এক গাহিতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর।।
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল।।[৬২]

এই উদ্ধৃতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে কাহিনীর 'জোড়' এবং সুসংবদ্ধ গ্রন্থনার বদলে লৌকিক নাট্যরীতিতেই হরিদত্ত কাহিনী পরিবেশন করতেন। তখনও রাগ-রাগিণী (সুস্বর) অবলম্বনপূর্বক মনসা-কথা প্রচলিত হয় নি। এজন্য মৌখিক-রীতিতে পরিবেশিত হরিদত্তের পালায় আসরে তাৎক্ষণিকভাবে পদ রচনার অবকাশ ছিল (এক গাহিতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর)। উপরন্তু 'কেহ' কথাটি থেকে একাধিক পরিবেশনকারী অর্থাৎ দলগত পরিবেশনার সংবাদও পাওয়া যাচ্ছে। হরিদত্তের আখ্যান পরিবেশনায় লৌকিক ধারায় নৃত্যাভিনয় সংযুক্ত ছিল, যা সুনির্বাচিত আখ্যান পরিবেশনের তুলনায় বিজয়গুপ্তের কাছে 'মিছা লাফ ফাল' বলে মনে হয়েছে। 'কানাহরিদত্ত খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে' মনসামঙ্গল রচনা করেন এরূপ অভিমতও আছে।[৬৩] হিন্দী ভাষায় রচিত মনসামঙ্গলের সঙ্গে 'কবি হরিদত্তে'র রচনায় 'অনেক সাদৃশ্য' বিদ্যমান।[৬৪] এখানে একটা কথা উল্লেখ্য যে, '১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে' রচিত বিপ্রদাস মনসামঙ্গল কাব্যকে 'ব্রতগীত' বলেছেন—

ঃ হেনকালে রচিল পদ্মার ব্রতগীত।[৬৫]

চণ্ডীমঙ্গলের ব্রতকথা রূপে 'কবি জনার্দ্দনের' রচনা পাওয়া যায়। জনার্দ্দনের কবিতা দৃষ্টে বলা যায় যে, 'এরূপ ব্রতকথা' অবলম্বনেই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উৎপত্তি। [৬৬] তবে এই রচনার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

মানিকদত্তকে চণ্ডীমঙ্গলের সর্বপ্রাচীন কবি বলে অনেকেই স্বীকার করেন। তাঁর আবির্ভাব কাল নিয়ে মতভেদ আছে। কবি-কঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্যে মানিকদত্তের প্রশস্তি পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল রচনাকাল '১৫৯৪' খ্রীষ্টাব্দের অন্ত থেকে '১৬০৩' খৃষ্টাব্দের মধ্যে।[৬৭] এ থেকে অনুমিত হয়েছে যে 'মানিকদত্ত মুকুন্দরামের অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্বে ছিলেন'।[৬৮] এই মত স্বীকার করলে বলা যায় মানিকদত্তের কাল '১২০০-১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ'।[৬৯] মানিকদত্তের পাঁচালির ভাষা থেকে অনুমান করা হয়েছে যে, 'তিনি প্রাচীন গৌড় বা মালদহের লোক'। তাঁর নামে প্রচলিত পুঁথির বহুপদ 'ছড়ার লক্ষণাক্রান্ত' স্থানে স্থানে ব্রতকথার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়।[৭০] চণ্ডীমঙ্গল পূজা যে কালে ছড়া ব্রতকথা-গীতের আঙ্গিকে নিবেদিত হতো একাব্য তারই অদূরবর্তীকালের। মুকুন্দরাম মানিকদত্তের প্রতি তাঁর বিনয় প্রকাশ করেছেন—

ঃ আদ্যকবি বন্দিলাম মহামুনি ব্যাস।
মানিকদত্তের দাণ্ডা করিয়ে প্রকাশ।।
যাহা হইতে হৈল গীত পথ পরিচয়।
বিনয় করিয়ে কবি কঙ্কণে কয়।।[৭১]

'দাণ্ডা' কথাটা দাঁড়া। অবশ্য কাহিনী অর্থেও তা ব্যবহৃত হয়।

পুথি দৃষ্টে অনুমিত দুজন মানিকদত্তের সম্ভাবনাও সম্প্রতি ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।[৭২]

সম্পাদিত মানিকদত্তের 'চণ্ডীমঙ্গলে' পালা সংখ্যা ষোল। অর্থাৎ তা অষ্টমঙ্গলারূপেই গীত ও পরিবেশিত হতো। এ কাব্যে প্রতি পালার বিভিন্ন পদশীর্ষে নিম্নলিখিত অভিনয় বা পরিবেশনারীতির সঙ্কেত লভ্য। এগুলো হচ্ছে- পদ, বোলাম, কথা, দিশা, নাচাড়ী (ও পুন নাচাড়ী)।

প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুসারে-পদ—'পাঁচালী', 'বোলাম-' পাত্রপাত্রীর কথোপকথন অথবা একক উক্তি, 'কথা-কবির কাহিনী বিবৃতি' এবং পাত্রপাত্রীর কথোপকথন, 'দিশা'-'ভাবাবেগ প্রকাশ', আরাধ্য বা শ্রোতৃবর্গকে সম্বোধন' ও

ও 'অভিজ্ঞতাপ্রসূত নীতির কথা প্রকাশ, 'নাচাড়ী-' নাচ সহযোগে ঘটনার বিবৃতি দান।[৭৩]

পদ ঃ মায়ারূপী নিরঞ্জন মহিমা অপার।
জেরূপে জন্মিল ধর্ম্ম কথা শুন তার।।
মন দিয়া শুন জয় ধর্ম্মের কাহিনী।
দুঃখ খণ্ডে হরে পাপ শুনি আদ্যবাণী।।[৭৪]

বোলাম ঃ য়হে মাতা প্রভু আমার জগতের দাতা
শিবের আশীর্ব্বাদে ইন্দ্রপদ মোর
পুত্র হবে কোন মত কথা।।[৭৫]

কথা ঃ দুর্গা বোলে পদ্মা দেবতা পূজা কৈল।
নরলোকে আমার পূজা কেননা হৈল।।
পদ্মাবলে শুনমাতা মঙ্গলচণ্ডীগণ।
কলিঙ্গে দেহরা তুমি করাহ নির্ম্মান।।[৭৬]

দিশা ঃ এইবার উদ্ধার হরজায়া।
বড় বিশম তোমার মায়া।।
এহি দিশা।[৭৭]

নাচাড়ী ঃ কেহ চামর ডুলায় কেহ তাম্বুল জোগায়
কার্ত্তীক তুলিয়া লইল কোলে।।[৭৮]

(পুন নাচাড়ী)–ঃ সিংহের পৃষ্ঠে দিয় পা বেগ্রে হেলাএঃা গা
অসুরে হানিল শেলের ঘা।।[৭৯]

এ পাঁচটি পরিবেশনারীতি সংক্রান্ত (রচনারও বটে) সঙ্কেত এবং কাব্য মধ্যে 'পাঁচালী' কথাটার উল্লেখ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানিকদত্ত পাঁচালির রূপেই তাঁর কাব্য পরিবেশন করতেন। কিন্তু পঞ্চসঙ্কেতের এই দৃষ্টান্ত বক্ষ্যমাণ চণ্ডীমঙ্গল ব্যতিরেকে অন্যকোন মঙ্গলকাব্যে পরিদৃষ্ট হয় না। এখন প্রশ্ন জাগে, পঞ্চসঙ্কেতের এই নির্দেশ যদি আদি কাব্যে থাকে তবে তা অর্বাচীনকাল বা পরবর্তীকালে কেন

অনুসৃত হলো না? উপরন্তু প্রদত্ত সঙ্কেতগুলির প্রাচীনতর উৎসও আমাদের গোচরীভূত হয় নি।

অন্যদিকে, পদমধ্যে প্রাপ্ত দৃষ্টান্ত অনুসারে অন্যান্য পাঁচালি কাব্যের মতো এখানেও মাত্র তিনটি পরিবেশনা সংক্রান্ত শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলো যথাক্রমে- নাচাড়ি, পদ ও দিশা। বুধবার দিবসের পালায় আছে—

ঃ তিনশত বত্তীশ নাচাড়ী রচিত হইল গান।
পদদিশা তাথে অনেক করিল মূর্তিমান।।

এখানে স্পষ্টতই নাচাড়ী, পদ ও দিশা সহযোগে কাব্য রচনার উল্লেখ মিলছে। 'মূর্তিমান' শব্দটি কৌতূহলোদ্দীপক। 'গান' মূর্তিমান হয় পরিবেশনায়। শব্দটি চণ্ডীমঙ্গল অভিনয়ের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতরূপে গৃহীত হতে পারে।

একই পদে এ আখ্যান পরিবেশনারীতিও বিবৃত হয়েছে—

ঃ তম্বুর বায়ন তথা দিল দরশন।
রঘুরাঘব পালী আইল দুইজন।।
তিন চারিজনে তবে সম্প্রদা করিল।
কলিঙ্গ নগরে দত্ত আসি উত্তরিল।।[৮০]

মানিকদত্তের 'সম্প্রদা'য় বায়ন, পালী ও মূল গায়েনসহ তিনচারজন পরিবেশনকারী ছিল। এথেকেও আদি মধ্যযুগে পাঁচালি-নাট্যের পরিবেশনারীতি অনুধাবনযোগ্য। পদদৃষ্টে বলা যায়, সেকালে একজন বায়ন, দুজন পালি বা দোহার এবং মূল গায়েন সমগ্র আখ্যান উপস্থাপন করতেন।

এখানে 'তম্বুর' শব্দটি নিয়ে একটু দ্বিধা জাগ্রত হয়। 'তাম্বুরা' আরবীতে 'ঢাক জাতীয়' এবং তুর্কী ভাষায় 'বেহালা শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র'। অন্যদিকে-তা একই সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় যন্ত্র, যা সুর দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।[৮১] এক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র হিসেবেই 'তম্বুরা' গ্রাহ্য। এই বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখের সঙ্গে, সেকালে চণ্ডীমঙ্গলের পরিবেশনায় আর কি কি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতো তার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

মানিকদত্তের 'সম্প্রদা' কলিঙ্গে গিয়ে ঘরে ঘরে চণ্ডীমঙ্গলের গান পরিবেশন করেছিল, সে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে পাঠান্তরে-

ঃ চারিজন যুক্তি করে লড়ে কলিঙ্গের দ্বারে
নাটগীত গায় প্রতিঘরে।।[৮২]

এখানে 'নাটগীতে'র উল্লেখ যদি প্রক্ষেপ না হয়, তবে এ আখ্যান যে 'নাটগীত' রূপেও সেকালে প্রচলিত ছিল তা বলা যায়। অবশ্য মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যকে গীত ও নাট (বিশ্রাম দিবস আট শুনগীত দেখ নাট) রূপে উল্লেখ করেছেন।

কলিঙ্গে 'গীত' পরিবেশন সম্পর্কে পুথি পড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়—

ঃ অদ্ভুত পুঁথি পড়ে অনেক গায় গীত।
লোকের গেল কর্ম্ম কার্জ্য মোহেলেক চিত।।[৮৩]

মৌখিক রীতির পরিবেশনায় পুথি পড়ার এই প্রসঙ্গ নিঃসন্দেহে প্রক্ষিপ্ত এবং পরবর্তীকালের গায়েন কর্তৃক সংযোজিত। কারণ মহাভারত বা ভাবগত- পুরাণ শ্রেণীর রচনা ব্যতিরেকে পুথির আকারে আসরে আখ্যান পাঠের রীতি মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল বলে কোনোরূপ প্রমাণ মেলে না। এই বিষয়ে মতান্তরের কোনো অবকাশ নেই যে মানিকদত্তের নামে প্রচলিত পুথির ভাষা পরবর্তীকালের গায়েনদের রচিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উদ্ভবকালের বিচারে দেখা যায় চণ্ডীর পূর্বেই মনসা পূজার প্রচলন হয়েছিল। অন্ততপক্ষে মানিকদত্তের পুথিতে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

ঃ ইমলা বিমলা হইল রথের সারথি।
জ্যোতিষ শুনাইতে আইল পদ্মাবতী।।
পদ্মার পূজা মর্থে হয় লোকে দেয় জয়।
ভবানী বসিয়া তাহা শুনে।।
দুর্গাবোলে মর্থপুরে কোন দেবের পূজা করে।

আমার পূজা মর্থপুরে না হয় কেনে।।
পদ্মা বোলেন বানী শুন মাতা নারায়নি।
ভবানী বাহড়া ত্রিনয়ানী।।
ধুম্রলোচনের শেবা কৈল তবে গিঞা পূজা পাইল।
শুনি চিন্তিত জগত জননী।।
ক্রোধে বলে নারায়নি শুন বাছা নারদ মুনি।
জদি অসুর মারিবারে পারি।।[৮৪]

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে 'সত্য নারায়ণ পূজা আদি মধ্যযুগে পরিকল্পিত' হয়েছিল।[৮৫] পরে মুসলমানরা 'সত্য নারায়ণ' এর 'নারায়ণ' স্থলে 'পীর' কথাটা যুক্ত করে দেয়।[৮৬] সত্য-পীরের আদি পাঁচালিকার 'কঙ্ক'। কিন্তু 'তিনি সত্যপীরের মহাত্ম্যসূচক কোনো প্রচলিত কাহিনী' নির্বাচন না করে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান অবলম্বনে তার কাব্য রচনা করে।[৮৭] কাজেই সত্যপীরের উপাখ্যান আদি মধ্যযুগের নয় ; অপেক্ষাকৃত 'অর্বাচীন' কালের।[৮৮] অন্যমতে, সত্যপীরের 'প্রথম পাঁচালিকার ষোল শতকের 'গোরক্ষবিজয়' রচয়িতা শেখ ফয়জুল্লাহ'।

'সেখ শুভোদয়া'র কাল বিচার করে বলা যায়, পীর পূজা নিতান্তই অর্বাচীন কালের নয়। 'সেখ শুভোদয়া' বাঙলা আর্যা-সম্বলিত প্রথম পীর গাথা।[৮৯]

টীকা

১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাংলা সাহিত্যের কথা* (২য় খণ্ড মধ্যযুগ), সং-কার্তিক-১৩৭৪, পৃঃ ৫৫।

২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (প্রথম খণ্ড), চতুর্থ সং-১৯৮২, পৃঃ ২৮৭।

৩. বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন,* ৯ম সং-১৩৮০, পৃঃ ৪।

৪. শ্রী শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *বাংলা সাহিত্যের নবযুগ,* সপ্তম সং-১৩৮৩, পৃঃ ১৬৯।

৫. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ* (১ম খণ্ড), সং-১৯৯৩, পৃঃ ৯৭২।

৬. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), ষষ্ঠ সং-১৯৭৮, পৃঃ ১২৮।

৭. সুকুমার সেন, *নট নাট্য নাটক,* ২য় সং-প্রকাশকাল ভাদ্র-৯১, পৃঃ ৫৪।

৮. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস,* ষষ্ঠ সং-১৯৭৫, পৃঃ ৮৭।

৯. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* ১ম খণ্ড চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮২, পৃঃ ৩৩৬-৩৩৯।

১০. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (১ম খণ্ড), প্রথম সং-১৯৭৮, পৃঃ ৩০০।

১১. সুকুমার সেন, *নট নাট্য নাটক,* ২য় সং-প্রকাশকাল ভাদ্র-৯১, পৃঃ ৫৪।

১২. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), ষষ্ঠ সং-১৯৭৮, পৃঃ ১২৭।

১৩. সুকুমার সেন, *বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ,* প্রথম সং-১৯৭০, পৃঃ ৭৪-৮২।

১৪. প্রাগুক্ত-পৃঃ ৭৪।

১৫. সুকুমার সেন, *নট নাট্য নাটক,* ২য় সং-প্রকাশকাল ভাদ্র-৯১, পৃঃ ৮৭।

১৬. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), ষষ্ঠ সং-১৯৭৮, পৃঃ১২৮।

১৭. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়,* প্রথম প্রকাশ-আগস্ট-১৯৭০ সাল, পৃঃ ৬৫।

১৮. নিরঞ্জন চক্রবর্তী, *উনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালীকার ও বাংলা সাহিত্য,* কলিকাতা, মহাজাতি-১৩৭১ বাং, পৃঃ ১৫।

১৯. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), ষষ্ঠ সং-১৯৭৮, পৃঃ ১২৮।

২০. সুকুমার সেন, *নট নাট্য নাটক,* ২য় সং-প্রকাশকাল ভাদ্র-৯১, পৃঃ ৮৭।

২১. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২য় খণ্ড), সং-১৬ই ডিসেম্বর-১৯৮৩, পৃঃ ২৪২।

২২. সুকুমার সেন, *নট নাট্য নাটক,* ২য় সং-প্রকাশকাল ভাদ্র-৯১, পৃঃ ৮৭।

২৩. প্রাগুক্ত-পৃঃ ৮৭।

২৪. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), ষষ্ঠ সং-১৯৭৮, পৃঃ১২৯।

২৫. সত্যেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত), *শ্রীচৈতন্যভাগবত,* সং-১৩৪২, পৃঃ ২৭১।

২৬. বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন,* ৯ম সং-১৩৮০, পৃঃ ১।

২৭. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), ষষ্ঠ সং-১৯৭৮, পৃঃ ১৪৮।

২৮. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস,* ষষ্ঠ সং-১৯৭৫, পৃঃ ৯০।

২৯. প্রাগুক্ত-পৃঃ ৮৭-৮৮।

৩০. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (১ম খণ্ড), চতুর্থ সং-১৯৮২, পৃঃ ৩৩৬।

৩১. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৩৩৭।

৩২. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৩৩৮।

৩৩. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৩৩৯।

৩৪. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), ষষ্ঠ সং-১৯৭৮, পৃঃ ১৫২।

৩৫. কাজী আবদুল ওদুদ (এম. এ,) *ব্যবহারিক শব্দকোষ* (প্রথম খণ্ড), দ্বিতীয় সং-ভাদ্র, ১৩৬৭ পৃঃ ৫০০।

৩৬. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), ষষ্ঠ সং-১৯৭৮, পৃঃ ১৫২।

৩৭. প্রাগুক্ত- পৃঃ ১২৮।

৩৮. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২য় খণ্ড), সং- ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ১৫৬।

৩৯. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), ষষ্ঠ সং-১৯৭৮, পৃঃ ১২৮।

৪০. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (১ম খণ্ড), চতুর্থ সং-১৯৮২, পৃঃ ৩৮২।

৪১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, *বাংলা সাহিত্যের কথা,* সং-কার্তিক, ১৩৭৪, পৃঃ ১৫১।

৪২. প্রাগুক্ত- পৃঃ ১৫৪।

৪৩. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস,* ষষ্ঠ সং-১৯৭৫, পৃঃ ১০৯।

৪৪. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড) ষষ্ঠ সং-১৯৭৮, পৃঃ ১১২।

৪৫. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (১ম খণ্ড), চতুর্থ সং-১৯৮২, পৃঃ ৪৭৫।

৪৬. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), ষষ্ঠ সং-১৯৭৮, পৃঃ ১৫১।

৪৭. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (১ম খণ্ড), চতুর্থ সং-১৯৮২, পৃঃ ৫৭৫।

৪৮. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার,* দ্বিতীয় সং-১৩৮২, পৃঃ ২০৮।

৪৯. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* (১ম খণ্ড) ষষ্ঠ সং-১৯৭৮, পৃঃ ২০৮।

৫০. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (প্রথম খণ্ড), চতুর্থ সং-১৯৮২, পৃঃ ৫৭৭।

৫১. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), ষষ্ঠ সং-১৯৭৮, পৃঃ ১৫১।

৫২. শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, ৯ম সং-১৩৮০, পৃঃ ২৬।

৫৩. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস,* ষষ্ঠ সং-১৯৭৫, পৃঃ ২৭৯।

৫৪. প্রাগুক্ত- পৃঃ ২৭৫।

৫৫. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৩১১-৩১৩।

৫৬. শ্রী কামিনীকুমার রায়, *বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার*, প্রথম প্রকাশ-১৯৮০, পৃঃ ৬১-৬৬।

৫৭. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৫৮।

৫৮. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস,* ষষ্ঠ সং-১৯৭৫, পৃঃ ৩০৯-৩১০।

৫৯. সত্যেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত), *শ্রীচৈতন্যভাগবত* সং-১৩৪২, পৃঃ ৪২৫-৪২৬।

৬০. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), ষষ্ঠ সং-১৯৭৮, পৃঃ ১৫৮।

৬১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাংলা সাহিত্যের কথা* (দ্বিতীয় খণ্ড), কার্তিক-১৩৭৪, পৃঃ ৩৬৯।

৬২. প্রাগুক্ত-পৃঃ ৩৩৭, এর পাঠান্তর নিম্নরূপ—

ঃ সর্ব্বলোকে গীত গাহে না বোজে মহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।।
হরিদত্তের গীত লোপ্ত পাইল এইকালে।
জোড়া গাথা নাহি কিছু ভাণ্ডে বোলে চালে।।
গীতে মতি না দেয়ে কেহ ভাবে বোলে চালে।
তাহা দেখি পুত্র মোর উপজে বিশাল।।
মোর বোলে পুত্র তোমি হও সাবহিত।
নানা ছন্দে নানা রাগে রচ মোর গীত।।

শ্রী জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত (এম. এ.) *কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২, পৃঃ ৫।

৬৩. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ* (প্রথম খণ্ড), সং- জানুয়ারী, ১৯৯৩, পৃঃ ৪৬৭।

৬৪. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৪৬৮।

৬৫. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাংলা সাহিত্যের কথা* (দ্বিতীয় খণ্ড), কার্তিক-১৩৭৪, পৃঃ ৩৭১।

৬৬. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস,* ষষ্ঠ সং-১৯৭৫, পৃঃ ৫৮৩।

৬৭. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাংলা সাহিত্যের কথা* (দ্বিতীয় খণ্ড), কার্তিক-১৩৭৪, পৃঃ ৩৯৫।

৬৮. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৩৯০।

৬৯. সুনীল কুমার ওঝা, *মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল,* সং-১৩৮৪, পৃঃ ৬২।

৭০. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস,* ষষ্ঠ সং-১৯৭৫, পৃঃ ৪৭৮।

৭১. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা* (দ্বিতীয় খণ্ড), সং-কার্তিক-১৩৭৪, পৃঃ ৩৯৫।

৭২. সুনীলকুমার ওঝা, *মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল,* সং-১৩৮৪, পৃঃ ৬১-৬৩।

৭৩. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৩৮।

৭৪. প্রাগুক্ত- পৃঃ ১।

৭৫. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৫০।

৭৬. প্রাগুক্ত- পৃঃ ২৮।

৭৭. প্রাগুক্ত- পৃঃ ২৪।

৭৮. প্রাগুক্ত- পৃঃ ২৫।

৭৯. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৫০।

৮০. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৩৫।

৮১. কাজী আবদুল ওদুদ, *ব্যবহারিক শব্দকোষ* (১ম খণ্ড), সং-১৩৬৭, পৃঃ ৪১২।

৮২. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), ষষ্ঠ সং-১৯৭৮, পৃঃ ৪৫০।

৮৩. সুনীল কুমার ওঝা, *মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল*, ১ম সং-১৩৮৪, পৃঃ ৩৬।

৮৪. প্রাগুক্ত-পৃঃ ২৫-২৬।

৮৫. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, *বাংলার লৌকিক দেবতা,* ১ম সং-জুন, ১৯৮৭, পৃঃ ২৩১।

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৫।

৮৭. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাংলা সাহিত্যের কথা* (দ্বিতীয় খণ্ড), সং-কার্তিক ১৩৭৪, পৃঃ ৪৪৮।

৮৮. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৪৪৯।

৮৯. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (*২য় খণ্ড), ১ম সং-১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৮০৮।

তৃতীয় অধ্যায়

[ক. পাঁচালি-পাঁচালির উদ্ভব ও আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য বিচার। খ. রামায়ণ পাঁচালি, কৃত্তিবাসকৃত 'রামায়ণ' ও কাব্যমধ্যে প্রাপ্ত নাট্যপ্রসঙ্গ, রামায়ণ নাট, চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ' ও অন্যান্য রামায়ণ রচয়িতাগণ। মহাভারতের অনুবাদ, কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের 'পাণ্ডববিজয়', সঞ্জয়ের 'মহাভারত', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত'।]

ক. পাঁচালি, মধ্যযুগের আখ্যান পরিবেশনার বিশিষ্ট রীতি। নাট্য-উপাদানের বিচারে, পাঁচালি হচ্ছে মূলত 'পালাভিনয়'।[১] এদেশে 'দৃশ্যকাব্য' মাত্রই 'সঙ্গীতাত্মক,' পাঁচালি এই ধারারই পূর্বসূরী।[২] এজন্য বিশেষজ্ঞের মতে তা কেবল 'গীত নয়' একই সঙ্গে 'গীতাভিনয়'। অন্যদিকে গায়েন দোহারের যৌথ পরিবেশনাদৃষ্টে পাঁচালি 'সম্প্রদা' (মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গলে আছে—তিন চারি জনে তবে সম্প্রদা করিল....) বা 'সম্প্রদায়ের অভিনয়' রূপেও আখ্যাত।[৩]

বাঙলায় গেয়কাব্যের নানা ধারায় পাঁচালি-নাট্যের সুবিশাল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সচরাচর বাঙলা আখ্যান কাব্য মাত্রই পাঁচালি। কিন্তু পাঁচালির অঙ্গসংস্থান ও এই শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রচুর মত-পার্থক্য বিদ্যমান।

কারো কারো মতে 'পাঞ্চালিকা' হচ্ছে পুতুল নাচের সঙ্গে নৃত্য-গীত-অভিনয়, পরে 'পুরানো ধরনের আখ্যায়িকা অর্থে' তা পাঁচালি নামে অভিহিত হয়।[৪] পাঁচালির পরিবেশনা সম্পর্কে উক্ত হয়েছে যে, 'দেবপূজা প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে' বর্ণিত আখ্যায়িকায় 'গীত প্রযুক্ত' হতো। এর কিছু অংশ 'নাচের তালে অভিনীত (নাচাড়ি)' ও 'বাকি অংশ সুরের তালে' পরিবেশিত হতো।[৫]

কেউ কেউ মনে করেন যে, সুবৃহৎ আখ্যায়িকায় পরিবেশনরীতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ক্রমে ক্রমে এর 'পাঁচটি অঙ্গ' অনিবার্য হয়ে উঠল। এই পাঁচ অঙ্গ যথাক্রমে, পা-চালী, ভাবকালি, নাচাড়ি, বৈঠকী এবং দাঁড়া কবি। এতে পাঁচালির পাঁচটি অঙ্গের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ দৃষ্ট হয়—

(ক) পা-চালী অর্থাৎ পদচালনা পূর্বক 'ঘুরিয়া ফিরিয়া গান।' (খ) ভাবকালি- অর্থাৎ 'হাবভাব সুরসহ পদের ব্যাখ্যা'। (গ) নাচাড়ি-'নৃত্য' সহকারে 'আবৃত্তি' ও

গান। (ঘ) বৈঠকী—উপবেশনপূর্বক 'রাগ-রাগিণীতে সঙ্গীতালাপ'। (ঙ) দাঁড়া কবি—দাঁড়ানো অবস্থায় দোহারের 'সমবেত সঙ্গীত'।[৬]

অন্যমতও প্রায় অনুরূপ। এই মত অনুসারে শুদ্ধ গায়নরীতিতে আখ্যান পরিবেশনা 'অসুবিধাজনক' বিধায় 'একাধিক ব্যক্তির' মাধ্যমে পাঁচালি পরিবেশনার উদ্ভব ঘটে।[৭]

কোনো কোনো ইতিহাসকারের মতে 'পাঞ্চাল বা কনৌজ অঞ্চল থেকে' এই গানের (পাঁচালির) উৎপত্তি।[৮] সংস্কৃত 'পাঞ্চালী' ছন্দের প্রভাবেই পাঁচালির উদ্ভব, এরূপ মতও আছে।[৯]

পাঁচালি কথাটা বাঙলা গেয়কাব্য 'পাঁচালি প্রবন্ধ'রূপেও পাওয়া যায়। এ থেকে 'প্রবন্ধ' কথাটাকে বিশ্লেষণপূর্বক—পাঁচালির রূপ আবিষ্কারের প্রয়াসও পরিলক্ষিত হয়।[১০]

উপরন্তু এরূপ উক্ত হয়েছে যে 'নরহরি' ক্ষুদ্রগীতের চারটি ভেদ নির্ণয়পূর্বক একটিকে বলেছেন 'পাঞ্চালি'।[১১]

কারো কারো মতে 'পাঁচ' এর সঙ্গে ভ্রমর শব্দ 'আলি' যোগে পাঁচালি হয়েছে। পাঁচালি হচ্ছে পঞ্চায়েতের কাজ—পাঁচজনে মিলে যা করা হয়।[১২]

এই মতগুলো পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

প্রথমত, 'পাঞ্চালিকা' অর্থাৎ পুতুল নাচ থেকে পাঁচালির উদ্ভব সম্পর্কিত মত পরবর্তীকালের গবেষকগণ কেউ পারতপক্ষে স্বীকার করেন নি।[১৩] পুতুলনাচ বা পুতুলবাজি একটি ভিন্ন মাধ্যম। এর আঙ্গিক ও প্রয়োগগত কৌশল কিভাবে সুবিস্তৃত পাঁচালির আঙ্গিকে রূপান্তরিত হলো, সে তথ্য এখনও উদঘাটিত হয় নি। উপরন্তু ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিচারপূর্বক দেখা যায় যে, একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মাধ্যমের আঙ্গিক অন্য একটি শিল্প আঙ্গিকে রূপান্তরিত হবার কোনো দৃষ্টান্ত নেই। 'পাঞ্চালিকা' সেক্ষেত্রে পুতুল নাচের ইতিহাস উদঘাটনের সহায়ক হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, পাঁচালির পাঁচটি অঙ্গ নির্দেশ সম্পর্কে বলা যায় যে, মধ্যযুগে পাঁচালি-আখ্যানের কোথাও পদ, দিশা ও নাচাড়ি ব্যতিরেকে পরিবেশনার অন্যকোনো নির্দেশ অধিকাংশক্ষেত্রে লভ্য নয়। কৃত্তিবাসের 'রামায়ণে'

'নর্ত্তকছন্দে'র উল্লেখ আছে, কিন্তু তা প্রক্ষিপ্ত (এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে)। পাঁচালিতে বর্ণনা অর্থে 'শিকলি' পাওয়া যায়। 'শিকলি' ও 'পদ' সমার্থক।

মানিকদত্তের 'চণ্ডীমঙ্গলে' বর্ণনা, নৃত্য, দিশা ও উক্তি-প্রত্যুক্তির শ্রেণীভেদে পাঁচটি অঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে পাঁচালি, ভাবকালি, বৈঠকী, দাঁড়া ইত্যাদি নির্দেশ নেই। এমনকি মানিকদত্তের গ্রন্থে প্রাপ্ত পাঁচালির বিভিন্ন অঙ্গের একটির সঙ্গে অন্যটির ভেদ নির্ণয় দুঃসাধ্য।

আমাদের বিবেচনায় পাঁচালির অঙ্গসংস্থান বিষয়ে এ ধরনের মতামত অষ্টাদশ শতক কিংবা আরও পরে ঊনবিংশ শতকে পরিবেশিত পাঁচালি দৃষ্টে উল্লিখিত হয়েছে।[১৪]

তৃতীয়ত, পাঁচালির পঞ্চাঙ্গ নির্দেশপূর্বক অভিনয়ের যে-ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে তা থেকেও দেখা যায় যে, এক অঙ্গের পরিবেশনার সঙ্গে অন্য অঙ্গের পার্থক্য ক্ষীণ। পা-চালী, ভাবকালি ও নাচাড়ির যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তারও রূপ প্রায় একই রকম।

ইতিহাস দৃষ্টে একথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো সুনির্দিষ্টরূপ নির্ণায়ক শাস্ত্রের অধীনে বাঙলা নাট্যরীতি গড়ে ওঠে নি। পাঁচালি অভিনয়ের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। মূলত শিথিলভাবে তিন অঙ্গের (পদ বা শিকলি, দিশা ও নাচাড়ি) প্রয়োগেই পাঁচালির অভিনয় পরিবেশিত হতো।

অন্যদিকে, আখ্যান পরিবেশনা 'অসুবিধাজনক' হওয়ায় পাঁচালি রীতির উদ্ভব বিষয়ে বলা যায় যে, কোথায় কখন কিভাবে এই অসুবিধা দেখা দিয়েছিল সে সম্পর্কে কোনোরূপ দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয় নি। সুতরাং তা কেবল অনুমাননির্ভর মত।

চতুর্থত, পাঞ্চাল দেশ থেকে পাঁচালির উদ্ভব সম্পর্কিত মত, আজ পর্যন্ত কোনো পণ্ডিত বা গবেষক স্বীকার করেন নি। পাঞ্চাল দেশের সঙ্গে পাঁচালির সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয় নি। তবে, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' নটগণের নৃত্য প্রসঙ্গে 'পাঞ্চাল' শব্দটি মিলছে-

ঃ দ্রুপদ-পাঞ্চাল নাট দাক্ষিণাত্য যত।
যত নাট নাচে সে বলিব আর কত।।[১৫]

এখানে 'পাঞ্চাল-নাট' বলতে মালাধর বসু 'ভরত নাট্যশাস্ত্রো'ক্ত (টীকা-১ প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) আঞ্চলিক রীতিকেই নির্দেশ করছেন। পাঞ্চালনাট সম্পর্কিত

ভরতকৃত ব্যাখ্যার সঙ্গে পাঁচালির কোনো সম্পর্ক নির্ণয় সম্ভব নয়। এ থেকে অবশ্য এরূপ সিদ্ধান্তই যৌক্তিক যে, 'ভরতনাট্যশাস্ত্রে'র সঙ্গে সেকালে বাঙালি কলাবিদদের পরিচয় ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাচীন বাঙলার নিজস্ব নাট্যরীতি ওড্রমাগধীর উল্লেখ নাট্যশাস্ত্রে লভ্য, কাজেই দেশজ বিশিষ্ট রীতি বাদ দিয়ে পাঞ্চালদেশের নাট্যরীতি মধ্যযুগের কলাকারগণ গ্রহণ করেছিলেন এরূপ অনুমান যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে হয় না।

পঞ্চমত, সংস্কৃত 'পাঞ্চালী' ছন্দের প্রভাবে পাঁচালির উদ্ভব-এ মতও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। বিশ্বনাথ কবিরাজ 'সাহিত্য দর্পণের' 'নবম অধ্যায়ে' বলেছেন—

সমস্তপঞ্চষপদামোজঃ কান্তিসমন্বিতাম্। মধুরাং সুকুমারং চ পাঞ্চালীং কবয়ো বিদুঃ।।

এ পদের অর্থ নির্ণয় করলে দেখা যায় যে, বিশ্বনাথ কবিরাজ 'গৌড়ী ও বৈদর্ভী'রীতিতে প্রযুক্ত বর্ণাদি ছাড়া অন্যান্য বর্ণযুক্ত পাঁচ ছয়টি পদের সমাসবদ্ধ রচনাকে 'পাঞ্চালী'রীতি (পাঞ্চালী মিশ্র ভাবেন) নামে অভিহিত করেছেন।[১৬] এর সঙ্গে বাঙলা গেয়কাব্য পাঁচালির সম্পর্ক নির্ণয় দুঃসাধ্য। 'পাঞ্চালী' সংস্কৃতে একটি বিশিষ্ট ছন্দের নাম।

ষষ্ঠত, নরহরি কর্তৃক উল্লেখিত ক্ষুদ্র গীত ভেদ 'পঞ্চালী'র সঙ্গে বাঙলা পাঁচালির সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় না। পাঁচালি সুবৃহৎ আখ্যানকাব্য। অন্যদিকে 'রূপক' নিবন্ধে বর্ণিত 'তিন ভেদের' একটি সঙ্কীর্ণ রূপক 'প্রবন্ধ' অনুসারে পাঁচালি-প্রবন্ধের উৎপত্তি, এমতও কেউ স্বীকার করেন নি।

সপ্তমত, পাঁচালি 'পঞ্চজন মনুষ্য' এবং 'ভ্রমর শব্দ' 'আলি' যোগে সৃষ্ট বলে যে অভিমত ব্যক্ত হয়েছে তাতে গায়েন-দোহার মিলে পাঁচালি পরিবেশনা রীতির আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু 'আলি' কেন ভ্রমর শব্দ, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

আমাদের মতে মধ্যযুগে 'গাহনার' এক বিশেষ রীতিকেই পাঁচালি নামে অভিহিত করেছেন সেকালের কবিরা।[১৭] এর প্রমাণ, দেবতার মঙ্গল-কথা, রামায়ণ প্রভৃতি কাব্য থেকে শুরু করে মুসলমান কবিদের রচিত প্রণয়োপাখ্যান পর্যন্ত প্রায় সকল কাব্যই পাঁচালি। একালেও কাহিনী অর্থে 'পাঁচালীর' ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, 'পথের পাঁচালী'।

পাঁচালির গাহন-রীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গায়েন দোহার সহযোগে আদিও মধ্যযুগের অভিনয় রীতিতে তা একটি সুবিস্তৃত ধারা। ভিন্নদেশ

বা সংস্কৃত শব্দের অনুষঙ্গে অন্বেষণ করলে পাঁচালির ব্যবহারিক দিকটি নিয়ে বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি হবে। কাজেই এ শব্দের উৎপত্তি বাঙলা ভাষার শব্দগঠনের ধারাবাহিকতায় অন্বেষণ করাই শ্রেয়। 'বিশ্বকোষ' অনুসারে বলা যায়, পাঁচজনে মিলে 'গান করে' এইজন্য তা 'পাঁচালি'।[১৮] এই মত অনুসারে পাঁচ (পঞ্চ) + আলি= পাঁচালি। 'ঠাকুরালি' 'ঘটকালি' 'ভাবকালি' প্রভৃতি শব্দের মতো একই প্রণালীতে 'পাঁচালি' শব্দের উদ্ভব ঘটেছে।[১৯]

এই মতের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে যে, 'পাঁচজনে মিলে' অনেক কিছু হয়; যেমন, 'আসর', 'বৈঠক', 'জমায়েত'—সেক্ষেত্রে এসব 'পাঁচালী' নামে অভিহিত হয় না কেন?

এর উত্তরে বলা যায়—এধরনের যুক্তিদ্বারা কোনো শব্দের ব্যাকরণ-সিদ্ধ গঠন খণ্ডন করা যায় না। বৈঠক, আসর ও জমায়েতের উদ্দেশ্য ভিন্ন ধরনের হলে সেগুলোকে পাঁচালি মনে করার কোনো যুক্তি নেই। যদি গায়েন-বায়েন-দোহার মঞ্চে উপস্থিত হয়ে আখ্যান পরিবেশন করে তবেই তা পাঁচালি। পাঁচালি পূর্বকৃত নয়, আসরে পরিবেশন ছাড়া পাঁচালি হয় না। নাটকের ক্ষেত্রে নাট্যভিনয় প্রদর্শন যেমত অপরিহার্যরূপে বিবেচিত হয়, পাঁচালির ক্ষেত্রেও তাই।

পাঁচালির নাট্যরস সৃজন ক্ষমতা, এর পরিবেশনারীতি—বাঙলা নাট্যধারায় সংলাপ ও চরিত্রভিত্তিক নাট্যরচনার সম্ভাবনাকে সর্বযুগেই শোষণপূর্বক, বিপুল প্রাণশক্তি দ্বারা আপন রীতি ও প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হয়েছিল। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' নাট্যকৌশলের যে আঙ্গিক ও মাত্রা তা থেকে অদূরবর্তীকালে বাঙলায় সংলাপ ও চরিত্র ভিত্তিক নাটকের উদ্ভব অনিবার্য ছিল। কিন্তু পাঁচালির আবির্ভাব ও বিস্তারের কারণে তা হয় নি, এরূপ মতই সঙ্গত বলে মনে হয়। মধ্যযুগে বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন বিভিন্ন প্রদেশের নাট্যপ্রবাহ প্রত্যক্ষ করলে এই সত্য উপলব্ধি করা যায়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকেই আসাম-উড়িষ্যা-নেপালে চরিত্র ও সংলাপভিত্তিক নাট্য রচনার প্রচলন দেখা যায়। সে সকল অঞ্চলের পালাকারগণ লেখ্যরূপে নাট্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন। এইকালে আসামে অঙ্কিয়া, মিথিলার কীর্তনীয়া ও নেপালে ভাষা নাটকের সূত্রপাত ঘটে।

কিন্তু পাঁচালি-নাট্যরীতি অষ্টাদশ শতকের অন্ত এমনকি উনবিংশ শতকের খানিকটা সময় পর্যন্ত আমাদের পালাকার ও গায়েনদের কাছে অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

বাঙলা পয়ার ছন্দের ক্ষেত্রেও ঠিক যেন এই ব্যাপারটাই ঘটেছিল। বাঙলা সাহিত্যে, গদ্যের সকল অনিবার্যতাকে লুপ্ত করে পয়ার ছন্দও অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত

গেয়কাব্য ধারায় অপ্রতিহত প্রভাব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল। মধ্যযুগের পাঁচালি নিরবলম্ব মৌখিক রীতির লোকনাট্য নয়, কারণ তা উচ্চকোটি লেখ্য কাব্যেরও রীতি। সাধারণ গ্রামীণ আসর থেকে রাজদরবারের সম্ভ্রান্ত আসর পর্যন্ত এর প্রভাব বিস্তৃত হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে এরূপ প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে যে, কেন সমগ্র মধ্যযুগে পাঁচালি-রীতিটাই এরকম সুবিস্তৃতরূপে অনুসৃত হয়েছিল। এর উত্তরে শুধু এটুকুই বলা যায়, আমাদের শিল্পরস পিপাসায় সহস্রবছর ধরে অদ্বৈত রুচিই প্রবল। পাঁচালিতেও তারই সংশ্লেষণ ঘটেছে। পাঁচালি, একই সঙ্গে কাব্য, আখ্যান, নৃত্যগীত এবং অভিনয়ের দ্বৈতাদ্বৈত শিল্পরূপ।

(খ) সংস্কৃত মহাকাব্য 'রামায়ণ' 'মহাভারতে'র নানা আখ্যানের সঙ্গে প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি জনপদের পরিচয় ছিল, একথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। তবে 'মহাভারত' ধর্মশাস্ত্র হিসেবে পাঠ্য এবং সচরাচর এর পরিবেশনারীতি হচ্ছে কথকতা। পক্ষান্তরে 'রামায়ণ' নৃত্যগীতের মাধ্যমে অভিনেয় পাঁচালি। আদর্শগতভাবে বাঙালি মানসে 'মহাভারতে'র চেয়ে 'রামায়ণে'র প্রভাব গভীরতর। সমগ্র 'রামায়ণে' বিবৃত গার্হস্থ জীবনের চিরায়ত সম্পর্কের মধ্যে লোভ-কুটিলতার দ্বন্দ্ব, রাজ্য ও রাজত্বের জটিলতায় সংঘটিত অমোচ্য ও বিয়োগান্ত পরিণাম বাঙালির চিত্তভূমি সহজেই অধিকার করতে পেরেছিল। বিশেষজ্ঞের মতে—'রামায়ণ পাঁচালী' বাঙালির 'গৃহজীবনের পরিচিত আদর্শকে মহত্তর মূল্য' দান করেছে।[২০]

প্রাচীনকাল থেকে রামায়ণের প্রতি বাঙালি মানসে যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল তা পূর্ণাঙ্গ কাব্যরূপে প্রথমবারের মতো অভিষিক্ত হলো কৃত্তিবাস-এর 'রামায়ণে'।

কৃত্তিবাস-কৃত 'রামায়ণ' মূলত 'শ্রীরাম পাঁচালী'।[২১] কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' আক্ষরিক অর্থে সংস্কৃত রামায়ণের অনুবাদ নয়। এ কাব্যে সংযুক্ত 'তরণীসেন বধ,' 'মহীরাবণ অহিরাবণ বধ' প্রভৃতি আখ্যান কবির নিজস্ব সংযোজন।[২২] এ কাহিনীগুলো কতদূর কবির স্বীয় উদ্ভাবনা অথবা তা পূর্ব থেকে লোককথা রূপে প্রচলিত ছিল কিনা সে কথা বিচার করা কঠিন। কারণ, রামায়ণের কাহিনী

সম্পূর্ণত আর্যদের নয়। আর্যদের ভারতবর্ষে প্রবেশের বহুপূর্ব থেকে 'অনার্যজাতি-সমূহের মধ্যে' রামায়ণের কাহিনী প্রচলিত ছিল।[২৩]

এই অভিমত বিবেচনাপূর্বক বলা যায় 'শ্রীরাম-পাঁচালি'র যে-সকল আখ্যান কৃত্তিবাসের নিজস্ব কিংবা পরবর্তীকালের গায়েনদের দ্বারা সংযোজন বলে প্রতীয়মান হয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোনো কোনো প্রসঙ্গ লোককথা রূপে পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল।

তবে একথাও ঠিক যে, কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' পূর্বাপর জনপ্রিয় ও আসরকেন্দ্রিক গেয়কাব্য। এইজন্য 'গায়ক-কথক-লিপিকররা' মূল আখ্যানের সঙ্গে নিজেদের কাহিনী কোথাও কোথাও যুক্ত করেছেন।[২৪] এর ফলে বাঙলা রামায়ণে নানা কালের ভাষা, উপাখ্যান, জনরুচি ও ধর্ম-চেতনার প্রভাব বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সমগ্র রামায়ণে রামভক্তিবাদের উচ্ছ্বাস শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব জাত। অন্যদিকে বাঙলা মঙ্গলকাব্যের প্রভাবও রামায়ণে দৃষ্ট হয়। বিশেষজ্ঞের মতে 'মনসামঙ্গলে' ধৃত শঙ্কর 'গারড়ীর' উপাখ্যান অবলম্বনেই পরবর্তীকালে 'রামায়ণে' হনুমান কর্তৃক রাবণ বধ নিমিত্তে 'মৃত্যুবাণ' সংগ্রহের কাহিনী তৈরি হয়েছে।[২৫]

এভাবে নানা কালের নানা চিহ্নপাতে কৃত্তিবাসের রামায়ণ সকল কালেই সমকালের নিজস্ব রুচির পরিপোষক হয়ে উঠেছে। একারণে মঙ্গলকাব্যগুলোর পূর্বে, যদি বাঙালির নিজস্ব শিল্পরীতির প্রকৃতি বিচার করা যায়, তবে সে মানদণ্ডে পঞ্চদশ শতকে মহাকাব্যের অভিধা একমাত্র কৃত্তিবাসের রামায়ণেরই প্রাপ্য।

কৃত্তিবাসের কাব্যের আদিরূপ প্রায় সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত, একথা পণ্ডিতগণ স্বীকার করেছেন। কিন্তু এর পরিবেশনারীতিটা কাব্যে নানা প্রক্ষেপ সত্ত্বেও অবিকৃতরূপেই বিদ্যমান রয়েছে। কৃত্তিবাস তাঁর কাব্যকে 'মধুর পাঁচালী' বলেছেন। কিষ্কিন্ধ্যা কান্ডে, রামের দণ্ডকারণ্য ভ্রমণ ও সুগ্রীবাদি বানরের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক একটি পদে আছে—

ঃ কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী।
রচেন কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে প্রথম শিকলী।।[২৬]

'শিকলী' পাঁচালি পরিবেশনার একটি বিশিষ্ট রীতি। এর অর্থ বর্ণনা। শুধু পাঁচালি নয়, কৃত্তিবাস তাঁর কাব্যকে গীত বা গানও বলেছেন—

ঃ রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্ত কাণ্ড গান।[২৭]

এ থেকে দেখা যায় পাঁচালি, গীত ও গান রূপে উক্ত হতো। কৃত্তিবাস স্বয়ং গায়েন ছিলেন—

ঃ আদি কাণ্ড গান কৃত্তিবাসা বিচক্ষণ।[২৮]

কৃত্তিবাস 'গাহনের নিমিত্তেই' কাব্য রচনা করেছিলেন। আদি কাণ্ডের একটি পাঠান্তরে আছে—

ঃ পঞ্চভাই পণ্ডিত কৃত্তিবাস গুণশালী।
অনেক শাস্ত্র পড়্যা রচে শ্রীরাম পাঁচালী।।[২৯]

'গুণশালী' কথাটা থেকে এরূপ ধারণা করা হয় যে স্বয়ং কৃত্তিবাস রামায়ণ পরিবেশন করতেন।[৩০]

কৃত্তিবাসের রামায়ণে 'নর্ত্তক ছন্দের' উল্লেখ পাওয়া যায়। পদটি থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত হলো—

ঃ তবে দেখি তাহারে সেইত দ্বারে
প্লবঙ্গমগণ।
তারা তরু শিখরী করেতে ধরি
রহে সুখী মন।।[৩১]

এ সংস্কৃত ছন্দ, কাজেই প্রক্ষিপ্ত। কৃত্তিবাসের কালে বাঙলা ছন্দে সংস্কৃত প্রভাব পরিদৃষ্ট হয় না। অন্যদিকে এই পদের ভাষারীতি ভারতচন্দ্রের কথা মনে করিয়ে দেয়।

কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে কুটুম্ব-সমাগম ও বরানুগমন অধ্যায়ে 'নাট্যগীত' (নাটগীত) প্রসঙ্গ পাওয়া যায়—

ঃ নাট্যগীত দেখি শুনি অতিকুতূহল।
কেহ বেদ পড়ে কেহ পড়ায়ে মঙ্গল।।
নানা শুভ নাট্যগীত হিমালয় ঘরে।
পরম আনন্দে লোকে আপনা পাশরে।।[৩২]

এর পাঠান্তর নিম্নরূপ—

ঃ নাট গীত দেখি শুনি পরম কুতূহলে
কেহ বেদ পড়ে কেহ পড়য়ে মঙ্গলে।
নানা মঙ্গল নাট গীত হিমালয়ের ঘরে
পরম আনন্দে লোক আপনা পাশরে।

এ থেকে মঙ্গলগান ও নাটগীতকে 'একই উদ্দেশ্যে' ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩৩]

নাটগীত যে কতটা অভিনয়মূলক তারও প্রমাণ মিলছে উদ্ধৃতি থেকে। নাটগীত হচ্ছে দেখাশোনা। এতে এই শ্রেণীর নাট্যের দৃশ্যমূল্যও যে শ্রবণ বা শোনার সমান্তরাল সে কথাও স্পষ্ট।

এই প্রশ্ন উদ্রিক্ত হতে পারে যে, কৃত্তিবাসের রামায়ণের মতো একটি সুবিশাল কাব্য কিভাবে অভিনীত বা পরিবেশিত হতো, উপরন্তু পাঁচালি-রীতিতে একজন গায়েনের পক্ষে এত বিস্তৃত ও সুপরিসর আখ্যানের উপস্থাপনা সম্ভব কিনা।

পাঁচালি-রীতির গেয়কাব্যের আয়তন বিপুল, এর পরিবেশনার আয়োজনটাও সেই প্রকার। মঙ্গল-পাঁচালির মতো সুবৃহৎ কৃত্যমূলক পরিবেশনার রীতি মধ্যযুগে সমগ্র জনপদে প্রচলিত ছিল। চণ্ডীমঙ্গলের পরিবেশনা চলত আটদিন। ধর্মমঙ্গলের পালা দ্বাদশ দিনব্যাপী পরিবেশিত হতো। কৃত্তিবাসের 'রামায়ণে'র পরিবেশনাও সেকালে এক নাগাড়ে পরিবেশিত হবার পক্ষে বাধা ছিল না। অবশ্য ধর্মীয় কাব্য হওয়া সত্ত্বেও রামায়ণ সর্বদা কৃত্যমূলক নয়। এ জন্য আসরে সমগ্র কাব্যের পরিবেশনা, অত্যাবশ্যক ছিল না। এ থেকে এরূপ বিশ্বাস করার যথেষ্ট যুক্তি আছে যে, ক্ষেত্র বিশেষে কৃত্তিবাসী-রামায়ণের লোকপ্রিয় অংশগুলোও পাঁচালির আকারে খণ্ড খণ্ড ভাবে পরিবেশিত হতো। গবেষকদের অভিমত অনুসারে এ-সম্পর্কে বলা যায় যে, 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ গান' থেকে 'পৃথকভাবে কোনো জনপ্রিয় পালা' সেকালেও পরিবেশিত হতো। আধুনিককালে রামায়ণের পূর্ণাঙ্গ মুদ্রণের পরিবর্তে খণ্ড খণ্ড পুথির মুদ্রণ দৃষ্ট হয়। বিশেষ খণ্ডের জনপ্রিয়তার কারণেই যে, এরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মুদ্রিত পুথি বিচারে দেখা যায় লঙ্কাকাণ্ডের পুথি-সংখ্যা সর্বাধিক।[৩৪]

কৃত্তিবাস ওঝার নাম দৃষ্টে এরূপ মনে করা হয় যে, তিনি রামায়ণ গানের গায়েন ছিলেন। অসমীয়া ভাষায় 'ওঝা' গায়েন অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৩৫] কিন্তু কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় দৃষ্টে প্রমাণিত হয় ওঝা কৌলিক উপাধি—

ঃ পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাঁর পাত্র ছিল নাম নরসিংহ ওঝা।।
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলি অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা এল গঙ্গাতীর।।

চৈতন্যদেবের আমলে 'রামচরিত' বিষয়ক 'নাটগান' ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।[৩৬] লন্ডনস্থ ইন্ডিয়া অফিসে রক্ষিত 'কৃত্তিবাসের পরিচয় সংগ্রহ (ঢাকা মে ১৮৭০)'-নামের একটি নিতান্ত ক্ষুদ্র পুস্তিকার অনুলিপিতে কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' (মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' ও ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল') পরিবেশনের বিবরণ পাওয়া যায়। উক্ত বিবরণে 'গানের ব্যবসার' জন্য '৭/৮ জনের একটি সম্প্রদায়' গঠনের উল্লেখ আছে। গায়েনের নেতৃত্বে গঠিত গানের দলকে মানিকদত্তের পুথিতেও 'সম্প্রদা' অর্থাৎ সম্প্রদায় বলা হয়েছে।

বিবরণ দৃষ্টে বলা যায় যে এধরনের পাঁচালি-নাট্য পরিবেশনায় একজন 'মূল গায়েন' থাকে, দোহারগণ 'তান লয় সুর সংশ্লিষ্ট ধুয়া' পরিবেশন করেন। প্রধান গায়েন 'মূল কাব্যের কবিতা সকল' যুক্তপূর্বক আখ্যান বিবৃত করেন। এতে কাহিনী অর্থাৎ 'প্রস্তাবের সুসংলগ্নতা' সাধিত হয় 'কথকতা ধরনের' রচিত গদ্য দ্বারা। (এ গদ্য অবশ্যই পূর্ব রচিত নয়, আসরে তাৎক্ষণিকভাবে গায়েন কর্তৃক সৃষ্ট হয়)। পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃত বিবরণ অনুসারে আরও দেখা যায় যে এ ধরনের পরিবেশনারীতিতে দোহারগণ 'মন্দিরা বা খোল বাজান'। মূল গায়েনের হাতে থাকে 'একটি কৃষ্ণবর্ণ চমর' এবং এই চমর বা চামর দ্বারা গায়েন 'কাব্যের বর্ণিত বিষয়ের ভাবভঙ্গি' দৃশ্যমান করে তোলেন।[৩৭]

এখানে অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, রামায়ণ পরিবেশনায় খোল বা মৃদঙ্গের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের। আদিতে কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' শুধু 'মন্দিরা' যোগে পরিবেশিত হতো।[৩৮]

রামায়ণ-অভিনয়ের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায় মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'। এ গ্রন্থের 'একাশীতিতম গীতে' বিবৃত হয়েছে যে দৈত্য-রাজসভায় রামাভিনয় প্রদর্শিত হয়েছিল—

ঃ দশরথ রূপে নট পরবেশে।
কৌশল্যা কেকয়ী কেহ সুমিত্রার বেশে।।
অপুত্রক রাজা হেতু যজ্ঞ কৈল।
বিষ্ণু-অংশ দুই চরু-তাহাতে পাইল।।[৩৯] ইত্যাদি।

তারপর দৈত্য রাজসভায় অভিনীত সমগ্র রামায়ণের নানা কাণ্ড ও আখ্যানের সংক্ষিপ্ত রূপ বর্ণিত হয়েছে। শ্রীরামাভিনয়ের কাহিনীর শেষাংশে আছে—

ঃ সরযূতে ঝাঁপ দিল সব রাজরাণী।
জীবন তেজিল যত অযোধ্যার প্রাণী।।

রাজ্য-সনে কৈল রাম স্বর্গ-আরোহণ।
নাচিয়া নর্ত্তক সব মোহিলা দৈত্যগণ।।
হেনরাম চরিত্র বিবিধ সময়ে।
রাম নাম স্মরণে লোক মুক্ত হয়ে।।

দেখা যাচ্ছে রামায়ণের অভিনয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে নৃত্য-গীতের আঙ্গিকে চরিত্রাভিনয়ের মাধ্যমে প্রদর্শিত হতো। উপরন্তু এই প্রথম, নাট্যভিনয়ে স্ত্রী চরিত্রানুগ বেশ (কৌশল্যা, কেকয়ী, কেহ সুমিত্রার বেশে) ধারণ সংক্রান্ত বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্ট নয় এখানে যে নারী চরিত্রের অভিনয় নারীদের দ্বারাই নিষ্পন্ন হতো কি না। মালাধর বসুর বর্ণনায় কোথাও 'নর্তকী' কথাটা পাওয়া যাচ্ছে না। সর্বত্রই তিনি 'নর্তক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'নটগণের বিবিধ নাট্যাভিনয়' অংশেও আছে—

ঃ হেন রামায়ণ-নাট নাচিল নর্ত্তকে।
মোহিত কৈল নটে সকল দৈত্যকে।।[৪০]

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে উক্ত নাট্যে নটেরাই স্ত্রীবেশ ধারণ করেছিল। পরবর্তীকালে ঘাটু প্রভৃতি লোকনাট্যে পুরুষদের (মূলত কিশোর) স্ত্রীবেশ ধারণ করাটা একটি প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য হিসেবেই এদেশে অনুসৃত হয়ে আসছে।

বিবরণ দৃষ্টে এ সত্য প্রতিভাত হয় যে, চরিত্রানুগ অভিনয় সত্ত্বেও বর্ণিত রামায়ণাভিনয় মূলত নৃত্যাভিনয় (হেন রামায়ণ নাট নাচিল নর্ত্তকে) ছিল। এ রীতি বাঙলা নাট্যাভিনয়ের সহস্র বছরের ধারার সঙ্গে নিতান্তই সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু চরিত্রাভিনয়ের যে-উল্লেখ এতে পাই তা অভিনব। কারণ চৈতন্যদেবের পূর্বে চরিত্রাভিনয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত অংশ ছাড়া অন্য কোথাও লভ্য নয়। সে ক্ষেত্রে বাঙলা নাট্য পরিবেশনার রীতি সম্পর্কে নতুন করে ভাবনার অবকাশ রয়েছে। অন্যদিকে বিবৃত অংশ প্রক্ষিপ্ত মনে করারও কারণ নেই, কেননা কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রভাব তখন সুবিস্তৃত। রামকথা পাঁচালির আকারে সুবিদিত। কিন্তু 'ধ্রুপদ-পাঞ্চাল নাট দাক্ষিণাত্য যত' ইত্যাদি উল্লেখ থেকে মনে হয়, সেকালে রাজদরবারেই এধরনের নাটের ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া, এ ধরনের নাট ভারতের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পরিভ্রমণকারী নর্ত্তক-সম্প্রদায় দ্বারা পরিবেশিত হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, বাঙলা নৃত্য বা নাট্য কখনই ভরতশাস্ত্রের অনুবর্তী ছিল না, একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য।

অন্যদিকে, চৈতন্যদেবের কালের নাট্যরীতি আলোচনায় আমরা 'রামায়ণে' চরিত্রাভিনয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করেছি। সে রামায়ণনাটের প্রধান চরিত্র ছিলেন চৈতন্যপরিকর কিশোর নিত্যানন্দ।

পরবর্তীকালে রামায়ণ পাঁচালি পরিবেশনারীতি সম্পর্কে একটি চাক্ষুষ বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো—

'একদিন গ্রাম্য আসরে রামায়ণ গান শুনিতেছি,—রাবণ-বধ পালা। অধিকারী, অর্থাৎ মূল গায়েন দুই হাতে দুই চামর ঝুলাইয়া রাবণের ভাবে পরিভাবিত হইয়া বীররস এবং রৌদ্ররসের সৃষ্টি করিয়াছেন। রাবণ আজ রণ-উদ্যমে উন্মাদ, আজ রাম-লক্ষ্মণকে হত্যা না করিয়া আর গৃহে ফিরিবে না। পৃথিবী আজ হয় অ-রাম অথবা অ-রাবণ হইবে, এই কথাই অধিকারী তাঁহার সঙ্গীত, দ্রুত এবং উত্তেজিত নৃত্য এবং অঙ্গ-ভঙ্গি সহকারে যখন বার বার ঘোষণা করিতেছিল তখন হঠাৎ দেখা গেল বেহালাদার তাহার হাত হইতে বেহালাটি আসরে রাখিয়া একান্ত নাটকীয়ভাবে আসিয়া রাবণের সম্মুখে যেন পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, এবং রমণীজনোচিত মিহিকণ্ঠে বলিল, 'মহারাজ ক্ষান্ত হোন, ক্ষান্ত হোন আজ যুদ্ধে যাইবেন না'। অধিকারী রাবণের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বলিল-'কেন প্রিয়ে?' মিহিকণ্ঠে বেহালাদার মন্দোদরীর ভূমিকায় বলিল-'মহারাজ, আমি আজ দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি'। উত্তরে অধিকারী রাবণরূপেই পুনরায় অধিকতর উত্তেজিতভাবে নৃত্যগীত আরম্ভ করিল—তাহার ভিতর দিয়া বক্তব্য প্রকাশ পাইল এই যে, আজ আর সে কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না; আজ পৃথিবী অ-রাম না হয় অ-রাবণ হইবে'।[৪১]

উদ্ধৃত বর্ণনা থেকে পাঁচালি-নাট্যের অভিনয় রীতি অনুধাবনযোগ্য। এ রীতিতে কাহিনী বর্ণনাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য গায়েন বা দোহার বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে। আধুনিককালে অভিনয়ের এই কৌশলকেই বলা হয়েছে 'বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতি'।

কৃত্তিবাসের পাঁচালি ধারাতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাঙলা রামায়ণ রচনা অব্যাহত ছিল। যেসকল কবি এসময়ে রামায়ণ রচনা করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন—চন্দ্রাবতী (ষোড়শ শতক), নিত্যানন্দ আচার্য (সপ্তদশ

শতক), রামশঙ্কর (আনুমানিক সপ্তদশ শতক), দ্বিজলক্ষণ (সতের শতক), গঙ্গারাম দাস (অষ্টাদশ শতকের অন্তে), কবি চন্দ্রশঙ্কর চক্রবর্তী (সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ) প্রমুখ। এঁদের মধ্যে পাঁচালি-রীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থায় দ্বিজবংশীদাস-তনয়া চন্দ্রাবতী রামায়ণ রচনা করেন। 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র চতুর্থ খণ্ডে ধৃত 'কবি চন্দ্রাবতী বিরচিত রামায়ণ' দৃষ্টে বলা যায় যে, এ কাব্য যে-ভাবেই রচিত হোক না কেন, অবশেষে তা কাল পরম্পরায় মৌখিক রীতিতেই পরিণতি লাভ করেছে। নয়ানচাঁদের 'চন্দ্রাবতী' পালায় বর্ণিত ঘটনা অনুসারে একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, চন্দ্রাবতী পিতার নির্মিত মন্দিরেই তাঁর রচিত রামায়ণ পালা স্বয়ং পরিবেশন করতেন। অবশ্য পুথি মধ্যে এরূপ কোনো দৃষ্টান্ত লভ্য নয়।

চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণে'র মাত্র পাঁচটি অধ্যায় পাওয়া গেছে। অধ্যায়গুলি যথাক্রমে (১) সীতার জন্ম (২) রামচন্দ্র চারভাই এবং ভগ্নী কুকুয়ার জন্ম (সম্পাদক বিষয় বিন্যাসে পূর্ববর্তী সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেনকে অনুসরণ করেছেন। মূলত গায়েন কর্তৃক সংগৃহীত পালায় রামচন্দ্রের জন্ম কথাই প্রথমে আছে।) (৩) লঙ্কাকাণ্ডের পরবর্তী কাহিনী, অযোধ্যার রাজপুরীতে ফিরে এসে সখীদের সামনে সীতার মনোবেদনা বর্ণনা (৪) সীতার বনবাস (৫) সীতার পাতাল প্রবেশ।[৪২]

বিষয়বিন্যাসে দেখা যায়, চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণে' সীতা-প্রসঙ্গই প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। প্রবাদ অনুসারে বলা যায়, চন্দ্রাবতীর শেষ জীবন করুণ ও মর্মান্তিক। কাজেই এ কাব্য রচনাকালে সীতার বিয়োগান্ত পরিণাম তাঁর কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছিল এরূপ অনুমান সঙ্গত। এ হচ্ছে রামায়ণ-গীতিকা, পাঁচালি-নাট্য নয়। এ কাব্যের বর্ণনারীতি গীতিকার ছাঁদে বাঁধা—

ঃ সাগর পারে আছে গো কনক ভুবন।
তাহাতে রাজত্বি করে গো লঙ্কার রাবণ।।
বিশ্বকর্মা নির্মাইল সেইনা রাবণের পুরী।
বিচিত্র বর্ণনার পুরী গো, কহিতে না পারি।।
যোজন বিস্তার পুরী গো, দেখিতে সুন্দর।
বড়ো বড়ো ঘর যেমন পর্বত পাহাড়।।

সাগরের তীরে লঙ্কা গো, করে টলমল।
হীরামন মানিক্যেতে পুরী করে ঝলমল।।

এ ভাষা পূর্ববঙ্গ গীতিকা তথা মৈমনসিংহ গীতিকার ভাষা। অন্যদিকে সচরাচর গীতিকা পালায় বর্ণিত নিসর্গের সঙ্গে লঙ্কাপুরীর নিসর্গ বর্ণনার মিল লক্ষণীয়—

ঃ দিবা রাত্রি ফুটে ফুল গো অশোকের বনে।
লঙ্কার ফুটিলে ফুল গো গন্ধ ছুটে তিভুবনে।।[৪৩]

লঙ্কার এই চিত্র ''কাঞ্চনকন্যা-ধোবার পাটে'র শুরুটা মনে করিয়ে দেয়।

চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ' গীতের নিমিত্তে রচিত হয়েছিল। কাজেই এ পালার সর্বত্র ছন্দশৈথিল্যের অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। পদ্যের ছন্দশৈথিল্য গীত বা গানের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করে না। এ কাব্যে ধুয়া বা দিশার সাক্ষাৎ মেলে—

ঃ সরযূ বইয়া চল ধীরে (ধুয়া)
রাজার নন্দিনী সীতা রামের ঘরণী।
বনবাসে দিব গো তারে আইজ রাম রঘুমনি।।

এরপর আছে গীতাংশ। এতে সীতার মর্মবেদনা নিপুণ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে—

ঃ না উইঠ না উইঠ গো তপন
তুমি মেঘে লুকাও মুখ।
জনম দুখিনী সীতার তুমি
না দেখিও মুখ।।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণে পয়ার বা নাচাড়ি ছন্দ নেই। সমগ্র পালাটি মূলত স্বরাঘাত-প্রধান গ্রাম্য-ছন্দে রচিত। এর পরিবেশনারীতি গড়ে উঠেছে মুখ্যত—ধুয়া, গীত ও বর্ণনার আশ্রয়ে। এরূপ ধারণা করা হয় যে, চন্দ্রাবতী পূর্ণাঙ্গ পালা রচনা করেছিলেন। এ অনুমান মাত্র। অনুমানের কারণ—প্রবাদ আছে যে পিতা দ্বিজবংশী চন্দ্রাবতীকে 'রামায়ণ' রচনার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি স্বীয় কন্যাকে পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ রচনার আদেশ দিয়েছিলেন এরূপ কোনো প্রমাণ এ যুক্তির স্বপক্ষে উপস্থাপন করা সম্ভব হয় নি। পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ রচনার দৃষ্টান্ত বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। কৃত্তিবাসের পর পূর্ণাঙ্গ কাব্য অপেক্ষা রামায়ণের খণ্ডাংশ রচনার দিকেই কবিদের অধিকতর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রাপ্ত চন্দ্রাবতীর রামায়ণে রাম ও রাবণের যুদ্ধাংশ নেই। সে ক্ষেত্রে এরূপ যুক্তি

অধিকতর সিদ্ধ যে, যুদ্ধ বর্ণনার মতো জটিল বিষয় চন্দ্রাবতী স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেছেন।

অন্যদিক থেকেও এই মতের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা যেতে পারে। গীতিকায় যে আঙ্গিক চন্দ্রাবতী গ্রহণ করেছিলেন তা প্রকৃতপক্ষে সুবৃহৎ পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ রচনার পক্ষে আদৌ উপযুক্ত নয়।

ব্যক্তিগত জীবনের কথা বাদ দিলেও গীতিকায় নানা নারীর যে বিয়োগান্ত পরিণাম, চন্দ্রাবতী তার সঙ্গে রামায়ণের সীতার সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। এ জন্যই তাঁর কাব্যে মূলত সীতার জীবনের সুমহৎ দুঃখ ভোগের চিত্র গীতিকার করুণ সুরে মর্মরিত হয়েছে।

চন্দ্রাবতী পাঁচালি বা পালার আকারে পূর্বে প্রচলিত রামকথা দৃষ্টে তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন, এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নয়। কারণ একথা নিশ্চিত যে তিনি বাল্মীকির কাব্য দৃষ্টে তাঁর রামায়ণ রচনা করেন নি। এমনকি কৃত্তিবাসের মতো যুগন্ধর কবির রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকলেও এ কাব্যের রূপরীতি এরূপ হতো না। কৃত্তিবাসের মতো বড় কবির প্রভাব এড়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো বলে মনে হয় না।

এই রামায়ণ-গীতি দোহার সহযোগে গায়েন কর্তৃক নৃত্য-গীতের মাধ্যমে পরিবেশিত হতো। গীতিকা পরিবেশনার রীতি অনুসারে এতে থাকত গায়েনের ব্যাখ্যা। কোনো কোনো গীতিকার সঙ্গে কৃত্যের যোগ (যেমন-মহুয়া, কাঞ্চনকন্যা ইত্যাদি) দেখে এরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে যে, চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ' সচরাচর ধর্মীয় কৃত্য বা তিথি-পার্বণ অনুসারে অথবা খরাকালীন বৃষ্টি নামানোর জন্য অন্যান্য গীতিকার মতোই 'বিশেষ যত্নপূর্বক' গায়েন কর্তৃক পরিবেশিত হতো।

নিত্যানন্দ আচার্য নিজেই রামায়ণ গান করতেন বলে উল্লিখিত হয়েছে।[৪৪] তাঁর তিন পুত্র যথাক্রমে- জয়ানন্দ, বিজয়ানন্দ, শিবানন্দ 'সম্ভবত' রামপাঁচালি পরিবেশন করতেন।[৪৫] রামশঙ্কর কৃত্তিবাস ও নিত্যানন্দের রামায়ণ অবলম্বনে 'রামকথা' রচনা করেছিলেন।[৪৬] পূর্ববঙ্গের দ্বিজলক্ষ্মণ অধ্যাত্ম-যোগাবাশিষ্ট ও অদ্ভুত রামায়ণের কাহিনী নিয়ে একটি 'জনপ্রিয় পালা' রচনা করেন।[৪৭] এছাড়া ষষ্ঠীবর দত্ত 'গুণরাজ খান' নামে 'রামকথা অনুসারে পাঁচালী' রচনা করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতকে লীলানাট্য ও মঙ্গল কাব্যের প্রভাবেও রামায়ণ রচিত হয়েছিল, রচয়িতা শঙ্কর চক্রবর্তী। তাঁর পাঁচালির নাম 'রামলীলা উপাখ্যান বা শ্রীরাম মঙ্গল'।

'মহাভারতে'র প্রথম অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস। তিনি 'পরাগলী মহাভারত কথার' (১৫১৯ খ্রীঃ) রচয়িতা।[৪৮] তাঁর কাব্যের নাম 'পাণ্ডব বিজয় কথা' বা 'ভারত কথা'।[৪৯] কবীন্দ্র পরমেশ্বর পরাগল খানের নির্দেশেই এই পাঁচালি কাব্য রচনা করেছিলেন—

ঃ শ্রী যুত পরাগল খান মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার বিখ্যাত খেয়াতি।।
পুত্রে পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।।
পুরাণ শুনন্ত নিত্য হরষিত মতি।
সংস্কৃত মহাশ্লোক অতিগুরুতর।।
কতূহল বহুল ভারত কথা শুনি।
কেমতে পাণ্ডবে হারাইল রাজ্য খানি।।
বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎসর।
কোন কোন কর্ম কৈল দ্বাদশ বৎসর।।
কেমতে পৌরসে পাইল নিজ বসুমতী।
এই সব কথা কহ সংক্ষেপ করিয়া।
দিনেক শুনিতে পারি পাঁচালী বলিয়া।।[৫০]

'দিনেক' (পাঠান্তর 'একদিনে') কথাটি থেকে এরূপ অনুমিত হয়েছে যে, মহাভারতের মতো সুবিশাল কাব্য একদিনে পরিবেশন করা সম্ভব নয়, কাজেই একদিনে 'যদি অল্পদিনে' এই অর্থ বহন না করে তা হলে মূলে 'পরমেশ্বরের কাব্য আকারে অনেক ছোট ছিল'।[৫১]

পরাগল খাঁ ভারত কথা সম্পর্কে কৌতূহলী ছিলেন। কূটনীতি ও যুদ্ধকথা সমগ্র মহাভারতের বিশেষ আকর্ষণ। কাজেই সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধ-কথার দিকেই তাঁর আগ্রহ বেশি থাকা স্বাভাবিক। অবশ্য কবীন্দ্রের প্রস্তাবনায় মহাভারতের সমগ্র কাহিনী বিবৃতির ইঙ্গিত আছে।

পরাগল খাঁর পর ছুটিখানের নির্দেশে শ্রীকরনন্দী 'অশ্বমেধপর্ব' (আনু. ১৫১৭-১৫১৮ খ্রী.) পাঁচালি রচনা করেন।[৫২]

দুটো কাব্যই 'পাঁচালি' নামে রচয়িতা কর্তৃক উল্লিখিত হয়েছে। এ বিষয়ে পূর্বেই বিশেষজ্ঞের মত ব্যক্ত হয়েছে। মহাভারত পাঁচালির 'ছাপ' লাভ করেও একান্তভাবে পাঠ্য কাব্য। কিন্তু কবির সাক্ষ্যমতে সেনাপতি স্বয়ং পাঁচালি রূপে মহাভারত (দিনেক শুনিতে পারি পাঁচালী বলিয়া) শ্রবণেচ্ছুক। তাঁর পক্ষে নিরবলম্ব পাঠরীতি অপেক্ষা পাঁচালির ক্রীড়াশীল অভিনয় রীতিতে মহাভারত শোনার ইচ্ছা থাকাই স্বাভাবিক। কারণ সেনাপতির সভায় পাণ্ডববিজয় শুধু ধর্মকথা শ্রবণ নয়, তা পৌরাণিক যুদ্ধকাব্য উপভোগও বটে।

সঞ্জয়ের মহাভারত গীত ও পাঁচালিরূপে উল্লিখিত হয়েছে। সঞ্জয়-ভণিতাযুক্ত মহাভারত সপ্তদশ শতকের। সঞ্জয় কবি-যশোলাভেচ্ছু 'কোন গায়েন কবি'।[৫৩] তিনি তাঁর 'মহাভারত'কে 'পূণ্য কথা' নামে অভিহিত করেছেন—

ঃ ভারতের পুণ্য কথা নানা রসময়।
লোক বুঝিবারে হেতু রচিল সঞ্জয়।।[৫৪]

'পুণ্য কথা' রূপে উল্লেখের কারণ এর রীতি হচ্ছে কথকতা। আদিপর্বে কবি যে পয়ার ছন্দেই মহাভারত রচনা করেছেন তার উল্লেখ আছে—

ঃ মহাভারতের শ্লোক রচিত পয়ার।[৫৫]

এতে সংস্কৃতে রচিত শ্লোক বাঙলা পয়ার ছন্দের আদলে গ্রহণের সাক্ষ্যও লভ্য। ত্রিপদী ছন্দে রচিত পদকে এ কাব্যে যথারীতি 'লাচাড়ি' বলা হয়েছে—

ঃ সঞ্জয় যে কবিবর অতি বিলক্ষণ।
হেনকালে বোলে কিছু লাচাড়ি যোজন।।[৫৬]

এই লাচাড়ি পাঁচালি-নাট্যে নৃত্য সম্পর্কিত। কিন্তু এখানে তা কথকতার সুর হিসেবেই বিবেচ্য। 'পাঁচালী প্রবন্ধ' কথাটা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এখানেও দেখা যায় তা সাঙ্গীতিক 'রূপক' বা 'সঙ্কীর্ণ' অর্থে ব্যবহৃত হয় নি—

ঃ পয়ার প্রবন্ধে এহি আদিপর্ব পোথা।
সঞ্জয়ে কহিল মহাভারতের কথা।।

'প্রবন্ধ' শব্দটির ব্যবহার প্রত্যক্ষপূর্বক বলতে হয় পাঁচালি, কথকতা বা পাঠ-অভিনয়ে রচয়িতা ও গায়েনগণ সাধারণ অর্থে (প্রবন্ধ-রচনা, সন্দর্ভ, নিবন্ধ,

পূর্বাপর সঙ্গতি, আরম্ভ, ব্যবস্থাপনা, কৌশল, যতেক প্রবন্ধ করে নিশাচরগণে- কৃত্তিবাস) ব্যবহার করেছেন।[৫৭]

সঞ্জয় রচিত 'মহাভারত' 'ভারত সঙ্গীতা,' 'মহাপোতা' ও 'কবিতা' নামেও আখ্যাত হয়েছে—

ঃ আদিপর্ব মহাপোতা ভারত সঙ্গীতা।
অতিশয় পুণ্যকথা ব্যাসের কবিতা।।[৫৮]

'ভারতসংহিতা'-ই 'ভারতসঙ্গীতা'। তবে এ কাব্যের সাঙ্গীতিক পরিবেশনার ইঙ্গিত রূপেও কথাটা গ্রহণযোগ্য। সঞ্জয়ের বিরাট পর্বে অর্জুনের বৃহন্নলা-বেশ প্রসঙ্গে 'নাটুয়া' কথাটা পাই—

ঃ তারপরে অর্জ্জুন যে হইল নাটুয়া।
সোন্দর নাটুয়া হইল বৃহন্নলা হৈয়া।।
কর সব ঢাকিল যে পরিয়া শঙ্খ।
মেঘে আচ্ছাদিয়া যেন চন্দ্রের কলঙ্ক।।

পূর্বে রামাভিনয়ে পুরুষের নারীবেশ ধারণ প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু এখানে অর্জুনের নাটুয়া-সাজ ঘটনাগত এবং ভারত-প্রোক্ত। এ থেকে সেকালে ব্যবহৃত নাটুয়ার অলঙ্কার সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। অর্জুনের নৃত্য গীতে সেকালের অভিনয়রীতির চিত্র মেলে—

ঃ এখানে অর্জ্জুন আইল সভার বিদিত।
অঙ্গভঙ্গ করিয়া গাহে নানা গীত।।[৫৯]

সভা অর্থাৎ দর্শকের সম্মুখেই এই পরিবেশনা। অঙ্গের নানা ভঙ্গিমা আর কিছু নয়, তা তাল ও মুদ্রার সংযোগে হাব ও ভাব প্রকাশ। নৃত্যের সঙ্গে গীতের এই সম্মিলনই নাট্য অর্থাৎ নৃত্যগীতাভিনয়।

সঞ্জয়ের মহাভারত 'পাঞ্চালী প্রবন্ধ' (সঞ্জএ কহিল কথা পাঞ্চালী প্রবন্ধ) এবং 'পাঞ্চালী কথা' (পবিত্র পাঞ্চালী কথা দ্রোণ যে পর্ব্বএ)[৬০] রূপেও উক্ত হয়েছে। এ থেকে অবশ্য একে পাঁচালি ধারার গেয়কাব্য না মনে করাই সঙ্গত। এ যে একান্তভাবে পাঠ্য কাব্য তা 'পবিত্র-পাঞ্চালী কথা'র উল্লেখ থেকে বোঝা যায়।

সপ্তদশ শতকে নিত্যানন্দ ঘোষ মহাভারত রচনা করেন। কিন্তু তাঁর রচিত কাব্যের পূর্ণাঙ্গরূপ পাওয়া যায় নি।

বাঙলায় মহাভারতের জনপ্রিয় কবি কাশীরাম দাস। তিনি সমগ্র মহাভারতের মাত্র চারটি পর্ব (আদি, সভা, বন ও বিরাট) রচনা করতে সক্ষম হন। বিরাট

পর্বের রচনাকাল ১৬০৪ বা ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ।[৬১] তাঁর মৃত্যুর পর 'ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম' এবং অন্য কয়েকজন কবি সমগ্র কাব্যকে সম্পূর্ণতা দান করেন। এর ফলে তা 'মহাভারত সংহিতা'র রূপ লাভ করে।[৬২] পরবর্তীকালের কবিরা কাশীরাম দাসের মহাভারতকে 'পাঁচালী লিখন' বলে উল্লেখ করেছেন। শল্য পর্বে আছে—

ঃ কাশীরাম দাস কহে পাঁচালী লিখন।
এতদূরে শল্য পর্ব্ব করি সমাপণ। ।[৬৩]

অন্যত্র একে 'পাঁচালী প্রবন্ধ'ও বলা হয়েছে—

ঃ মহাভারতের কথা সুধা সিন্ধুমত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত। ।[৬৪]

এ কাব্য যে প্রকৃতপক্ষে পাঁচালি কাব্য নয় সে সাক্ষ্যও মিলছে—

ঃ কাশীদাস করিলেক পাঁচালী রকম।
আশ্রমিক পর্ব্বকথা হৈল সমাপন। ।[৬৫]

কাশীদাসী মহাভারত 'প্রধানত পয়ার ছন্দে রচিত'। সমগ্র কাব্যে ছন্দগত ত্রুটি পরিদৃষ্ট হয়। অনেক ক্ষেত্রে ৮+৬ এর পরিবর্তে ৭+৭ মাত্রাও দেখা যায়। 'গানের আকারে' বা 'কথকতার সুরে' পাঠ করা হলে ছন্দের এই ত্রুটি ধরা পড়ে না।[৬৬]

মহাভারত পাঠ্য কাব্য। পাঠ্য কাব্য আসরের শিল্প। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজসভায় পুরাণ পাঠ হত। এই পাঠ থেকে 'পাঠক' কথাটা ক্রমে 'পদবী' হয়ে ওঠে। পুরাণ পাঠকের অন্য নাম 'ব্যাস'।[৬৭]

পরবর্তীকালে একই অর্থে 'কথক' কথাটাও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কথকঠাকুর— যিনি মহাভারত বা পুরাণাদি পাঠ করেন। এই পাঠকে 'কথকতা'ও বলা হয়ে থাকে। 'কথকতা' সকল কালেই একটি বিশিষ্ট শিল্পরীতি হিসেবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। আধুনিক কালের থিয়েটারে পাঠ-অভিনয় নাট্য পরিবেশনার একটি স্বীকৃত পন্থা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী মহাভারত রচনা করেন। শঙ্কর কবিচন্দ্রের মহাভারত-'রসকথা' 'শ্লোকার্থ' সহকারে 'সঙ্গীত' ও 'গাথা' (আদি পর্বে রসকথা শ্লোকার্থ সঙ্গীত গাথা) রূপে উল্লেখিত হয়েছে।[৬৮] বাঙলা ভাষা সেকালে শুধু 'ভাষা' নামেই বিদিত ছিল—

ঃ ভাষায় ভারত গ্রন্থ গানের কারণ।
কবিচন্দ্রে মহারাজা করাল্য রচন। ।[৬৯]

গান বা গীত, 'ভাষা'য় রচিত কাব্যের জন্য সেকালে অপরিহার্য ছিল।

কবিচন্দ্রের 'মহাভারত' 'গানের কারণে' অর্থাৎ সুবিশাল আখ্যান কাব্য গানের মাধ্যমে পরিবেশন করা কষ্টসাধ্য বলে সংক্ষেপে রচিত হয়েছে—

ঃ কবিচন্দ্রের বসুদেব গায়ন।
সংক্ষেপে রচিল পোথা গানের কারণ।।[৭০]

উদ্ধৃতাংশে এ কাব্যের প্রথম গায়েনের নাম পাওয়া যাচ্ছে। ভারতচন্দ্রও তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে প্রথম গায়েনের নাম উল্লেখ করেছিলেন। অবশ্য গায়েনের নাম পরবর্তীকালে লিপিকর কর্তৃক সংযোজিত হওয়াও বিচিত্র নয়।

অষ্টাদশ শতকে রচিত 'মহাভারতে'র বিভিন্ন পর্ব হল—শান্তি পর্ব্ব-কৃষ্ণানন্দ বসু, অশ্বমেধ পর্ব্ব-উৎকল কবি সারণ, আদি পর্ব্ব-রাজেন্দ্রদাস, দ্রোণ পর্ব্ব-গোপীনাথ দত্ত, অশ্বমেধ পর্ব্ব-দ্বিজকৃষ্ণ রাম, অশ্বমেধ পর্ব্ব-দ্বিজরঘুনাথ ইত্যাদি।[৭১]

মহাভারত কথকতার ধারাতেই বিকশিত হয়েছে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত, কিন্তু পাঁচালির ধারায় এর নানা উপাখ্যানের রূপান্তর দেখা যায় উনিশ শতকে। দাশরথি 'মহাভারতে'র বিভিন্ন প্রসঙ্গ তাঁর পাঁচালি-রীতিতে পরিবেশন করেছিলেন। এ ধরনের পাঁচালির মধ্যে আছে, 'রুক্মিণীহরণ', 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' ইত্যাদি।

লোকনাট্যে মহাভারতের কোনো কোনো পর্বের সাক্ষাৎ এখনও পাওয়া যায়। ভারতের উত্তরবঙ্গে ভীমের 'বকাসুর বধ' পালার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সচরাচর এ পালাটি 'মানত' অনুসারে, অগ্রহায়ণ ও চৈত্র মাসে অভিনীত হয়।[৭২]

মধ্যযুগে বাঙালি জীবনে মহাভারতের প্রভাব রামায়ণের তুলনায় কখনই ব্যাপক হয়ে ওঠে নি। বাংলাদেশের লোকনাট্যের সমকালীন অবস্থা বিচারপূর্বক বলা যায়, এদেশে সচরাচর মহাভারত কেন্দ্রিক কোনো পালার অস্তিত্ব চোখে পড়ে না অথচ রামলীলার প্রসার সর্বত্রই রয়েছে।

মহাভারতের অন্তর্গত রক্তাক্ত মানবিক সম্পর্কের চিত্র, কূটনীতি, দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী, যুদ্ধের অবিরল বর্ণনা বাঙালীর সরল ও গীতিপ্রবণ মানসে কখনই দৃঢ়মূল প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় নি। এমনকি 'পূর্ণরূপ মহাভারত পাঠে'ও তারা বিশেষ আগ্রহ কোনোকালে প্রকাশ করে নি। বাঙলায় পূর্ণাঙ্গ মহাভারতের রচয়িতার সংখ্যা বিচার করলে এ ধারণা সত্য বলেই প্রতীয়মান হয়। সমগ্র মধ্যযুগে প্রকৃত অর্থে মহাভারতের রচয়িতা 'মাত্র তিনজন-কবীন্দ্র পরমেশ্বর, সঞ্জয় ও কাশীরাম দাস'।[৭৩]

টীকা

১. সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক,* ১৩৮১ (১৯৭৪ ইং) পৃঃ ৩৯৫।

২. প্রাগুক্ত-পৃঃ ৩৯৬।

৩. প্রাগুক্ত-পৃঃ ৩৯২।

৪. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), সং জানুয়ারী ১৯৯১, পৃঃ ৮৬।

৫. প্রাগুক্ত-পৃঃ ১০৩।

৬. মন্মথ মোহন বসু (এম. এ.) *বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ,* ২য় সং- ১৯৫৯, পৃঃ ৪৮।

৭. অহীন্দ্র চৌধুরী, *বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র,* ১৯৫৭, পৃঃ ১৮।

৮. দীনেশ চন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য,* ৩য় সং- পৃঃ ২৪৭।

৯. হরিপদ চক্রবর্তী, *দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী,* প্রথম প্রকাশ-১৩৬৭, পৃঃ ৪৭।

১০. প্রাগুক্ত-পৃঃ ২০-২১।

১১. প্রাগুক্ত-পৃঃ ২২-২৩।

১২. প্রাগুক্ত-পৃঃ ৪৫।

১৩. নিরঞ্জন চক্রবর্তী, *ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালীকার ও বাংলা সাহিত্য* সং- ১৩৭১ বাং, পৃঃ ১৯।

১৪. এরূপ উক্ত হয়েছে যে পাঁচালির পাঁচ অঙ্গের সংস্কার করেন 'গংগারাম নস্কর ও গুরুদুম্বা'। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দাশরথি তা থেকে 'অষ্টাংগ পাঁচালী'র প্রবর্তন করেন।

এই সংস্কারের ধারণাও কল্পিত বলেই মনে হয়। আদি পাঁচালি পাঁচ অঙ্গের নয় বলেই প্রমাণিত। উপরন্তু কোনো সুবৃহৎ কাহিনীর খণ্ডাংশ মাত্র সচরাচর দাশরথির অষ্টাংগ পাঁচালির অবলম্বন। এতে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের গদ্য পদ্য ছড়া কাটা চলত-কিন্তু রামায়ণ, চণ্ডীমঙ্গল অথবা বিদ্যাসুন্দর শ্রেণীর পাঁচালিতে এর কোনো অবকাশ নেই। কাজেই এই মন্তব্যই গ্রহণযোগ্য যে গবেষকগণ অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালির রূপ দৃষ্টেই পাঁচালির পঞ্চাঙ্গ কল্পনার প্রয়াসী হয়েছেন (দ্রঃ *ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক,* পৃঃ ৩৯২-৩৯৩)।

১৫. নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ সম্পাদিত, *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* (মালাধর বসু গুণরাজ খান), ১৩৫২ (১৯৪৫ খ্রীঃ), পৃঃ ১৫৭।

১৬. শ্রীবিমলকান্ত মুখোপাধ্যায় অনুদিত, শ্রীবিশ্বনাথ কবিরাজ *সাহিত্য দর্পন* ১৩৮৬, পৃঃ ৫৯৮-৫৯৯।

১৭. হরিপদ চক্রবর্তী, *দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী,* প্রথম প্রকাশ-১৩৬৭, পৃঃ ৪৭।

১৮. নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, *বিশ্বকোষ* পৃঃ ১২০।

১৯. হরিপদ চক্রবর্তী, *দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী*, প্রথম প্রকাশ-১৩৬৭, পৃঃ ৪৪।
(এই মত অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও *সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়* সমর্থন করেছেন বলে উল্লিখিত হয়েছে)।

২০. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (১ম খণ্ড), চতুর্থ সং-১৯৮২, পৃঃ ৪৭৬।

২১. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), জানুয়ারী-১৯৯১, পৃঃ ১০৫।

২২. এ বিষয়ে রামগতি ন্যায়রত্ন বলেছেন 'এতদভিন্ন, মহীরাবণ ও অহীরাবণ বধ, গন্ধমাদন পর্ব্বত আনয়ন সময়ে হনুমানের সূর্য্যানয়ন, মৃত্যুশয্যায় শয়ান রাবণের রাম সমীপে রাজনীতি উপদেশ, সমুদ্রের সেতুভঙ্গ, ভূমিলিখিত রাবণের প্রতিকৃতির উপর সীতার শয়ন, কুশের অগ্রজত্ব না হইয়া লবের অগ্রজত্ব ইত্যাদি কৃত্তিবাস লিখিত ভূরি ভূরি বিবরণ মূল বাল্মীকি রামায়ণের সহিত বিসম্বাদী; এই সকল স্থলে কৃত্তিবাস পুরাণান্তরের আশ্রয় লইয়াছেন, অথবা কথকতায় আরোপিত আখ্যানে নির্ভর করিয়াছেন, ইহাই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে'।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, রামগতি ন্যায়রত্ন, *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব*, নতুন সং-১৯৯১, পৃঃ ৫৯।

২৩. আহমদ শরীফ কর্তৃক উদ্ধৃত সুকুমার সেনের আলোচনা থেকে গৃহীত, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২য় খণ্ড), সং-১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৩৩৪।

২৪. প্রাগুক্ত-পৃঃ ৩৩৫।

২৫. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, ষষ্ঠ সং-১৯৭৫, পৃঃ ১০৯।

২৬. শ্রী সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত *কৃত্তিবাস রচিত সম্পূর্ণ রামায়ণ*, ১৯৮৯, পৃঃ ১৮৭।

২৭. প্রাগুক্ত-পৃঃ ১৮।

২৮. প্রাগুক্ত-পৃঃ ২৫।

২৯. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), সং জানুয়ারী ১৯৯১, পৃঃ ১০৮।

৩০. প্রাগুক্ত-পৃঃ ১০৯।

৩১. শ্রী সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, *কৃত্তিবাস রচিত সম্পূর্ণ রামায়ণ*, ১৯৮৯, পৃঃ ৩৩২।

৩২. প্রাগুক্ত-পৃঃ ৫০৮।

৩৩. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, ষষ্ঠ সং-১৯৭৫, পৃঃ ৯১।

৩৪. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (১ম খণ্ড), চতুর্থ সং-১৯৮২, পৃঃ ৫০৬।

৩৫. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), সং-জানুয়ারী ১৯৯১, পৃঃ ১১৬ (টীকা-২)।

৩৬. প্রাগুক্ত-পৃঃ ১০৮।

৩৭. প্রাগুক্ত-পৃঃ ১০৪।

৩৮. হরিপদ চক্রবর্তী, *দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী*, প্রকাশকাল-১৩৬৭, পৃঃ ৬৭।

৩৯. নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ সম্পাদিত *শ্রীকৃষ্ণ বিজয়* (মালাধর বসু গুণরাজ খান) ১৩৫২ (১৯৪৫ খৃঃ), পৃঃ ১৫৩।

৪০. প্রাগুক্ত-পৃঃ ১৫৭।

৪১. শ্রী শশিভূষণ দাসগুপ্ত, *বাংলা সাহিত্যের নবযুগ,* মাঘ ১৩৮৩, পৃঃ ১৭২-১৭৩।

৪২. ক্ষিতিশ চন্দ্র মৌলিক, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* (৪র্থ খণ্ড), ১ম সং পৃঃ ২৭৮-২৭৯।

৪৩. প্রাগুক্ত-পৃঃ ২৮১।

৪৪. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (২য় খণ্ড), সং-১লা বৈশাখ ১৩৯৮, পৃঃ ১০৫।

৪৫. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২য় খণ্ড), সং-১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৩৪০।

৪৬. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (২য় খণ্ড), সং-১লা বৈশাখ ১৩৯৮, পৃঃ ১০৬।

৪৭. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২য় খণ্ড), সং-১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৩৪৩।

৪৮. প্রাগুক্ত-পৃঃ ৩৫৭।

৪৯. প্রাগুক্ত-পৃঃ ৩৫৮।

৫০. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), সং- জানুয়ারী ১৯৯১, পৃঃ ২২৪। (বর্ধমান সাহিত্য সভার 'প্রায় সম্পূর্ণ খণ্ডিত' পুথি ৪৩৪-ক দৃষ্টে সুকুমার সেন কর্তৃক উদ্ধৃত)।

৫১. প্রাগুক্ত-পৃঃ ২০৯।

৫২. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২য় খণ্ড), সং-১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৩৬৪।

৫৩. প্রাগুক্ত-পৃঃ ৩৭২।

৫৪. মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত, *কবি সঞ্জয় বিরচিত মহাভারত* ১৯৬৯, পৃঃ ৪ (আদিপর্ব)।

৫৫. প্রাগুক্ত-পৃঃ ১০।

৫৬. প্রাগুক্ত-পৃঃ ৫৫।

৫৭. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস এম. এ, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান,* চতুর্থ সং- ফেব্রুয়ারী-১৯৮৪, পৃঃ ৪৪৯।

৫৮. মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত, *কবি সঞ্জয় বিরচিত মহাভারত,* ১৯৬৯, পৃঃ ৫৯ (আদি পর্ব)

৫৯. প্রাগুক্ত-পৃঃ ১৮৩।

৬০. প্রাগুক্ত-পৃঃ ৩৩৫।

৬১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, *বাংলা সাহিত্যের কথা,* (২য় খণ্ড) ১৩৭৪, পৃঃ ১৬৮।

৬২. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (২য় খণ্ড), সং-১লা বৈশাখ ১৩৯৮, পৃঃ ৯৭।
৬৩. শ্রী সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, *কাশী দাসী মহাভারত,* সং-১৯৭৮, পৃঃ ৮৮০।
৬৪. প্রাগুক্ত-পৃঃ ১১৫০।
৬৫. প্রাগুক্ত-পৃঃ ৮৮০।
৬৬. প্রাগুক্ত-পৃঃ ১২২৯।
৬৭. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), সং-জানুয়ারী ১৯৯১, পৃঃ ২০৮।
৬৮. চিত্রাদেব সম্পাদিত, *শংকর কবিচন্দ্রের মহাভারত,* প্রথম প্রকাশ-১৩৮৯, পৃঃ ৮০।
৬৯. প্রাগুক্ত-পৃঃ ১১৭।
৭০. প্রাগুক্ত-পৃঃ ১৮৩।
৭১. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য,* ৯ম সং-১৯৮৬, পৃঃ ৫২৬-৫২৭।
৭২. শিশির মজুমদার, *উত্তর বঙ্গের লোকনাট্য,* ২য় সং-১৯৯০, পৃঃ ৪।
৭৩. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২য় খণ্ড), সং-১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৩৪৯।

চতুর্থ অধ্যায়

[ভাগবত পুরাণের অনুসৃতিমূলক গেয়কাব্য, মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', মাধবাচার্য্যের 'কৃষ্ণমঙ্গল (ভাগবত সার)', দুঃখীশ্যাম দাসের 'গোবিন্দমঙ্গল', অভিরাম দাস বিরচিত 'গোবিন্দবিজয়', দীন ভবানন্দের 'হরিবংশ', পরশুরাম রায়ের 'মাধবসঙ্গীত'—পরিবেশনারীতি ও কাব্য মধ্যস্থ নাট্য সংক্রান্ত উল্লেখ।]

কৃষ্ণবিষয়ক নানা প্রসঙ্গ গুপ্তশাসন ও উত্তরকালে বাঙলায় প্রচলিত ছিল। পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত পোড়ামাটি ও পাথরের ফলকে কৃষ্ণের বাল্যজীবনলীলা, গোবর্ধনপর্বত ধারণ, মল্লযুদ্ধ, জোড়া অর্জুনবৃক্ষ উৎপাটন, দৈত্যবধ, গোপীলীলা-সংক্রান্ত চিত্র পরিদৃষ্ট হয়।[১]

বিশেষজ্ঞের মতে মন্দিরের অলঙ্করণের নিমিত্তে ফলক ও পাথরে ঐ সকল গল্পচিত্র 'উৎকীর্ণ' হয়েছিল, কোনো বিশেষ কৃত্য বা 'পূজার' উদ্দেশ্যে নয়।[২] এ থেকে এরূপ অনুমান সঙ্গত যে, এদেশে ভাগবত-পুরাণাদির প্রচলনের পূর্বে কৃষ্ণ-সংক্রান্ত নানা কথা বা আখ্যান লোকসমাজে গল্পাকারে প্রচলিত ছিল।

ভাগবত-পুরাণ খুব প্রাচীন নয়। খ্রীষ্টীয় 'দশম শতাব্দীর দিকে পূর্বভারতে' এর ক্ষীণ প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।[৩] ভাগবতের দশম থেকে দ্বাদশ স্কন্ধ পর্যন্ত বর্ণিত কৃষ্ণকথার প্রভাবেই বাঙলা ভাষায় চতুর্দশ শতকে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পাঁচালির উদ্ভব। কিন্তু অন্যবিধ পুরাণ, যথা বিষ্ণু ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ভাগবতের অনুরূপ কৃষ্ণবিষয়ক আখ্যান দৃষ্ট হয়।

'বিষ্ণুপুরাণে'র পঞ্চম স্কন্ধে কৃষ্ণের জন্ম থেকে জীবনলীলার অন্ত পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।[৪] 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে'র শেষ স্কন্ধে মোট ১৩১টি অধ্যায়ে কৃষ্ণলীলার সুবিস্তৃত বিবরণ লভ্য।[৫] অবশ্য এতে রাধার উল্লেখ থেকে এরূপ অনুমিত হয়েছে যে, 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' অপেক্ষাকৃত নবীনকালের। কারণ মূল পুরাণে কৃষ্ণ নয়-'ব্রহ্মার মহিমাই' প্রধানত ব্যক্ত হয়েছে।[৬] এই পুরাণে 'রাধাবল্লভ সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপ' ও অন্যান্য প্রক্ষেপ বিবেচনাপূর্বক এর সংস্কৃত রূপের কাল 'ষোড়শ শতকের পূর্ববর্তী বলে স্বীকৃত হয় নি'।[৭]

সামগ্রিকভাবে ছত্রিশটি পুরাণ-উপপুরাণ মিলিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, বৈষ্ণব ধর্মতাত্ত্বিক ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের কাছে কৃষ্ণ ভাগবতই একমাত্র আরাধ্য ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বিবেচ্য। এমনকি মধ্যযুগে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনার বহুপূর্ব থেকে বাঙালি কবিগণ ভাগবত-কাহিনী দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ভাগবতাদি পুরাণ সংস্কৃত ভাষায় পরিবেশনযোগ্য রূপেই জন্ম নিয়েছে। পরবর্তীকালে সোমদেব ভট্টের 'কথাসরিৎসাগর' প্রভৃতি গল্পরীতির পরিবেশনা যে-ধারাতে চলত, তাও সেই পুরাণ কথকতার ঢঙে। সকল পুরাণেই, পাপপুণ্য, আচার-বিচার, কর্তব্য ও অকর্তব্যের নির্দেশ আছে। তাতে দেব-দেবীর অতিলৌকিকতার আবরণে, জন্ম ও জন্মান্তরের নানা লীলা উন্মোচিত। সুতরাং এক অর্থে এ হচ্ছে ধর্মকোষ।

প্রাচীনকাল থেকে পুরাণ-পাঠ শ্রবণ করা রাজাদের জন্য ছিল অত্যাবশ্যক এবং পুরাণকে কেন্দ্র করে উত্তরকালে 'কথকতা' একটি বিশিষ্ট শিল্পরীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

কাহিনী ও উপকাহিনীর নানা পল্লবিত ধারায় নানা কালে স্মৃতি-শাস্ত্রকার, কথক ও স্মার্তের ধর্ম ভাবনা এতে সংযোজিত হয়েছে।

পুরাণের গল্পকথায় ধ্রুপদী-কালের কথকতারীতির অনুসৃতি বিদ্যমান। অবশ্য মহাভারতের মতো সুবিশাল কাব্যের ঘটনা ও কাহিনীর নানা জটিলতর পর্যায়ের সঙ্গে পুরাণের তুলনা চলে না। সচরাচর এর সঙ্গে বরং 'কথা' অর্থাৎ গল্পকথনের মিল বেশি। পুরাণ-কথকতার শুরুতেই থাকে পাঠ-নির্দেশ, এরপর আরাধ্য দেবতার স্তুতি, এ অংশ মঙ্গলাচরণ। অতঃপর মহাভারতোক্ত মুনি-ঋষিদের কাছে সৃষ্টি, ধর্ম, বেদ-বেদাঙ্গ, দেবদেবী ও পৌরাণিক রাজাদের চরিত্র সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা। এবার যে-পুরাণের যিনি অধিদেবতা তাঁর প্রাধান্যে বিশ্ববীক্ষণের পালা। সংক্ষেপে এই হচ্ছে পুরাণ-কথকতার আঙ্গিক।

শ্রোতা প্রশ্ন করছে, সর্বজ্ঞ কথক-ঋষি উত্তর দিচ্ছেন। কথক এই পদ্ধতিটাকে তাঁর পরিবেশনায় কাজে লাগান। নানা কূটপ্রশ্নের অবতারণা পুরাণের ভাষায় মীমাংসিত হয়। এখন প্রশ্ন হলো, এর মধ্যে নাট্যের অবকাশ কোথায়? এক্ষেত্রে প্রথমেই বিবেচনায় আনতে হবে যে, কথক যে কথা বা পৌরাণিক গল্প পরিবেশন করছেন, তিনি তার বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করেন নিপুণ ভাব ও ভঙ্গি প্রকাশের

মাধ্যমে। জানা-অজানা জগতের অলৌকিকতা, দান-ধ্যানের কৃত্য তাঁর হাবে-ভাবে রসসিক্ত হয়।

দৃশ্যকাব্যের সকল উপাদনই আছে পুরাণ-কথকতায়। এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞের অভিমত যে, পুরাণের 'একটি বৈশিষ্ট্য' হচ্ছে 'এগুলো কথোপকথনের ভঙ্গিতে লিখিত'।[৮] কথোপকথন, নাট্যের অন্যতম উপাদান হিসেবেই বিবেচ্য।

পরিবেশনার এই ধ্রুপদী ধারার কথা মনে রেখেই, উত্তরকালে বাঙলা পাঁচালি ধারায় ভাগবতপুরাণের রূপান্তর বিচার্য। কথকতার সংস্কৃত রীতি বাঙলা মহাভারতে প্রবেশাধিকার লাভ করলেও ভাগবতপুরাণের পরিবেশনায় তা সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হলো না। এর কারণও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার্য। যে কালে, মালাধর বসু প্রমুখ কবিরা বাঙলায় পুরাণকথার কাব্যরূপ দান করেন তখন ভাগবতাদিপুরাণের স্বর্ণযুগ অবসিত। অন্যদিকে, সংস্কৃত শিল্পরীতি বাঙলা কাব্যে বা নাট্যে সেকালে বা পরবর্তীকালে প্রথানুগতভাবে কখনই গৃহীত হয় নি। উপরন্তু পঞ্চদশ শতকে দৃশ্যকাব্যের ধারায় পাঁচালির যে অভিযাত্রা, তাকে অস্বীকার করা বাঙালি কবিদের পক্ষে সম্ভব হয় নি বলেই তাঁদের হাতে পুরাণ কথকতারীতি পাঁচালিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

মধ্যযুগে মুসলিম শাসনামলে ভাগবত আর রাজদরবারের সম্পদ নয়, তা আশ্রয় পেয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। কাজেই পুরাণের পরিবেশনারীতি বা ভাষার ধ্রুপদীবন্ধন লোকরুচির অনুকূল নয় বলেই লোকপ্রিয় পাঁচালির ধারাতে রূপান্তর ঘটল পুরাণের।

চতুর্দশ শতকে মাধবেন্দ্রপুরী 'ভাগবত পুরাণের' যে 'আদর্শ ও কাহিনী' প্রচার করেন, তা ছিল মূলত রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলাভিত্তিক। মাধবেন্দ্রপুরী 'আদি-রসাত্মক ভক্তিমার্গের পথিক' ছিলেন।[৯]

কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কৃষ্ণধামালি প্রভৃতি নাট্যে, ভাগবতধর্ম প্রচারের পূর্বে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলার আদিরসাত্মক কাহিনী লোক সমাজে প্রচলিত ছিল। উপরন্তু ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণের অন্য যে-কোনো অতিলৌকিক লীলার (যেমন দৈত্যবধ, অগ্নিভক্ষণ প্রভৃতি) চেয়ে, এদেশে কালিয়দমন অংশই অধিকতর জনপ্রিয় হয়েছিল। এর কারণও অনুমান করা যায়,—কালিয়দমনে কৃষ্ণ শুধু সর্পভীতি নিবারণকারীই নন, তিনি সর্প-পীড়নকারী দেবতাও বটেন। কাজেই সমকালে মনসাপূজার ব্যাপকতা সত্ত্বেও চৈতন্যপূর্ব ও চৈতন্যকালে কৃষ্ণের

কালিয়দমন রূপে বিষহরি পূজার বিকল্প রচিত হয়। পরবর্তীকালে কালিয়দমনের কাহিনী লীলা-নাটকের ধারায় রূপান্তরিত হয়। মনসাপূজা সম্পর্কে বৈষ্ণবদের অনীহা অনুক্ত থাকে নি। চৈতন্যভাগবতে আছে—

ঃ দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি।
তাহাসে পূজেন সেহো মহাদম্ভ করি।।

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' আঙ্গিক ও পরিবেশনারীতির বিচারে পূর্ণাঙ্গ পাঁচালিরূপে বিবেচ্য।

পূর্বে বলা হয়েছে, ভাগবতপুরাণের কথকতা বা পুরাণ পাঠরীতি বাঙালি কবিদের পরিবেশনায় সচরাচর অনুসৃত হয় নি। পুরাণ পাঠের রীতি লঙ্ঘিত হয়েছে বলেই 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র শুরুতে এর পরিবেশনারীতির কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হতে দেখা যায়—

ঃ 'ভাগবত শুনি' আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকিক কহিয়ে সার, বুঝ মহাসুখে।।

কবি প্রথমেই সংস্কৃত পুরাণকে লৌকিক অর্থাৎ বাঙলা ভাষায় বিবৃত করার কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর—

ঃ ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া।।

কবি সচেতনভাবে ভাগবতের কাহিনী পয়ারে বন্ধনপূর্বক পাঁচালি রচনা করেছেন।

কথকতার মাধ্যমে যে কৃত্যমূলক পাঠের ধারা তার পরিবর্তে তিনি পাঁচালিকেও প্রতিষ্ঠিত করেন ধর্মানুভূতি থেকে—

ঃ ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি।
তে-কারণে ভাগবত গীতছন্দে গাহি।।
কলিকালে পাপচিত্ত হবে সব নর।
পাঁচালীর রসে লোক পাইব নিস্তার।।
গাইতে গাইতে লোক পাইব নিস্তার।
শুনিয়া নিষ্পাপ হবে সকল সংসার।।[১০]

'গীতছন্দে গাহি' কথাটা থেকে পাঁচালি পরিবেশনার আঙ্গিক বুঝা যায়। কথকতা হচ্ছে পাঠ, পাঁচালি, গীত-নৃত্যের ছন্দে পরিবেশনযোগ্য। অবশ্য তার আগেই 'রামায়ণে'র মতো সুবৃহৎ ধর্মকাব্য একইভাবে পরিবেশিত হতো। কাজেই কথকতার পরিবর্তে কোনো ধর্মকাব্য পাঁচালিরীতিতে পরিবেশনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির কোনো বিরোধ ছিল না। কিন্তু এ থেকে মালাধর বসুর আঙ্গিক ও পরিবেশনারীতির সচেতনতা কতদূর তা বোঝা যায়। এই কারণেই মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গীত-পার্বিক। অর্থাৎ এর অধ্যায়সমূহ গীত হিসেবে আখ্যাত।[১১] অবশ্য বিভিন্ন 'পুথিতে গীতের বিভিন্ন বিভাগ' দৃষ্ট হয়, এছাড়া 'রাগ-রাগিণীর মধ্যেও পার্থক্য' পরিলক্ষিত হয়।[১২] 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' এ গীত বিভাগের সংখ্যা একশ।

বিশেষজ্ঞের মতে এই গ্রন্থে 'ভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের আখ্যায়িকাংশের আদ্যন্ত বর্ণনা ও ১১শ স্কন্ধের তাত্ত্বিক অংশের কিছু কিছু তাৎপর্যানুবাদ' দৃষ্ট হয়। মূলত ভাগবত-পুরাণের অনুসরণে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য রচিত হলেও এতে 'কোনো কোনো স্থলে' মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণে'র আখ্যায়িকাও গৃহীত হয়েছে।[১৩]

এ কাব্যের 'বৃন্দাবন লীলায়' বর্ণিত 'রাস নৌকা লীলা, দানলীলা' পরবর্তী কালের গায়েনদের দ্বারা সংযোজিত বলে মনে করা হয়।[১৪]

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের' পরিবেশনারীতি আসরকেন্দ্রিক পাঁচালি-নাট্যের ধারায় বিচার্য। সংস্কৃত পুরাণের ভাষাগত গাম্ভীর্য, উপমা-রূপকের ধ্রুপদীরীতি এ কাব্যে নেই। পাঁচালির ভাষারীতিতে তা সম্ভবও ছিল না। মালাধর বসুর লক্ষ্য ছিল আসরের দর্শক শ্রোতা, কাজেই তিনি সমকালের লৌকিক ভাষাকেই তাঁর পাঁচালির উপজীব্য করেছিলেন।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' নাট্যাভিনয়ের সুবিস্তৃত বর্ণনা আছে। বিশেষত কাব্যের 'অশীতিতম' ও 'একাশীতিতম' গীতে এ সম্পর্কে যে অনুকাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা থেকে সমকালীন নাট্যের রীতি ও প্রকৃতির সুস্পষ্ট চিত্র লাভ করা যায়।

ইতোপূর্বে রামায়ণ পরিবেশনার রীতির দৃষ্টান্ত হিসেবে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে তা আরও বিস্তৃত আকারে আলোচিত হবার দাবি রাখে।

বজ্রনাভের সম্মুখে এই ভ্রাম্যমাণ নাট্যদলের স্তুতি উচ্চারিত হলো—

ঃ একদিন কহে ভদ্র নটের বৃত্তান্ত।
কত গুণ কহে তা'র নাহি পাই অন্ত।।
ব্রহ্মার স্থানে না দেখিল তেন নৃত্য কলা।
ত্রৈলোক্যে কে কহিতে পারে তা'র গুণলীলা।।

বজ্রনাভ তখন ভদ্রনটের অভিনয় দেখার জন্য হংসীনাম দূতীকে প্রেরণ করলেন। হংসী ছুটে এল দৈত্যরাজ কন্যা প্রভাবতীর কাছে। প্রভাবতী নটবেশী রাজকুমার প্রদ্যুম্নের বিরহে কাতরা। 'শুচিমুখীহংসী' তার সঙ্গে দেখা করে নিবেদন করল প্রভাবতীর মনোবেদনা।

ভদ্রনটের দল ভ্রাম্যমাণ, মালাধর বসু তার উল্লেখও করেছেন—

ঃ শুচিমুখী হংসী সঙ্গে চলিলাত নানা রঙ্গে
সব নটে করি এক মেলা।
একে একে প্রতিদিনে, নগরের নানা স্থানে
রচিল সে নানা নৃত্যকলা।।

ভদ্রনট 'নৃত্যরস' সৃজনে সিদ্ধ হস্ত। মুনিঋষি ও সাধারণ্যে অভিনয় করে সে নানা ধন লাভ করেছে—

ঃ কশ্যপের যজ্ঞস্থানে দেব ঋষি মুণিগণে,
সংসারে আছয়ে যত লোক।
তুষিয়া সবার মন পাইলেক নানা ধন
নাট দেখি ঘুচে সব শোক।।[১৫]

অর্থের বিনিময়ে নাট্যাভিনয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল সেকালে, এ থেকে তা বোঝা যায়।

নটগণ এল দৈত্যরাজের সমীপে। রাজাকে অভিবাদনপূর্বক উপবেশন করল সভায়। তারপর—

ঃ হেথা সব নটগণে দৈত্যরাজ বিদ্যমানে
আরম্ভিলা নানা নৃত্যকলা।

এই নাট্যের প্রথমে মহাভারতের অভিনয় হয়েছিল। যথাবিধি আহার্যের উল্লেখ আছে মালাধর বসুর বর্ণনায়— ,

ঃ প্রদ্যুম্নে নায়ক কৈল গদ বিদূষক হৈল,
শাম্ব হইল বৃহন্নলা।।

এ হচ্ছে মহাভারতের 'বিরাট-পর্বের' অভিনয়, পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস সম্পর্কিত নাট্য। এতে তিনজন অভিনেতার নাম পাওয়া যাচ্ছে—প্রদ্যুম্ন, গদ (গদাধর?) ও শাম্ব। সবাই চরিত্রানুগ সাজ গ্রহণ করেছিল সে কথাও উল্লিখিত হয়েছে—

ঃ আর সে নর্ত্তক যত তারা হইল নানা মত
বেশ ধরি বিবিধ বিধানে।
বহু বিধ রূপ ধরে অভিনব কলেবরে
কশ্যপ মুনির বরদানে।।

ভদ্রনটের দলে উল্লিখিত তিনজন ব্যতিরেকেও অন্যান্য নট শাস্ত্রানুগ পন্থায় (বিবিধ বিধানে) বেশ ধারণ করেছিল। মহাভারত অভিনয়ের বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং মাত্র 'বিরাট পর্বের' অভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও এ নাট্যের রসে মুগ্ধ হয়েছিল সবাই—

ঃ নটগণ-দরশনে মোহগেল দৈত্যগণে
তা-বিনু না পরে আনমনে।
সতত সে নৃত্যকলা তাহে চিত্ত রহি'গেলা
অহর্নিশি দেখিয়ে স্বপনে।।

মহাভারতের একাংশ দেখে মোহিত দৈত্যরাজ আদেশ করলেন রামায়ণ নাচতে—

ঃ রাজা দিল আমন্ত্রণ নাচ নট রামায়ণ
অনুমতি দৈত্যের সমাজে।

তারপর রামায়ণের চরিত্রানুগ আহার্য গ্রহণের শেষে নটগণের প্রবেশ—

ঃ দশরথ রূপে এক নট পরবেশে।
কৌশল্যা, কেকয়ী, কেহ সুমিত্রার বেশে।।

নাট্যের প্রথমেই দশরথের প্রবেশ। এর অর্থ নেপথ্য থেকে নটদের আগমন। সে-ক্ষেত্রে রামায়ণাভিনয়ে নিশ্চয় মঞ্চের ব্যবস্থা ছিল এবং সঙ্গে নেপথ্যে প্রসাধন গৃহ। এরপর রামায়ণাভিনয়ের শুরু।

সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে সমগ্র নাট্যাভিনয় সম্পর্কে কবির বিবৃতি উদ্ধৃতি হলো—

ঃ অপুত্রক রাজা পুত্র-হেতু যজ্ঞ কৈল।
বিষ্ণু-অংশে দুই চরু তাহাতে পাইল।।

চারিভাগ করিয়া খাইল তিন নারী।
চারি অংশে অবতার করিল শ্রীহরি।।
কৌশল্যা-তনয় হইল গোসাঞী শ্রীরাম।
সর্ব্বগুণে সম্পূর্ণ রূপে অনুপাম।।
কৈকয়ীর পুত্র হইল ভরত সুমতি।
লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন প্রসবে সুমিত্রা যুবতী।।
চারিভাই একভাব বিষ্ণু-অবতার।
রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন কুমার।।
বিশ্বামিত্র-রূপে কেহ আসি' সেই স্থানে।
রাম-লক্ষ্মণ লইয়া করিল গমনে।।
সুবাহু মাইল রাম, তাড়কা-রাক্ষসী।
যজ্ঞ রক্ষা রাম মুনির ঘর আসি'।।
জনকের ঘরে রাম কার্ম্মুক ভাঙ্গিল।
চারি ভাই চারি কন্যা বিবাহ করিল।।
সীতা, উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি।
চারি ভাই বিভা কৈল এ চারি যুবতী।।
কেহ পরশুরাম-রূপে পথে দেখা দিল।
শিশু হইয়া রাম তা'রে লীলায় জিনিল।।
পরশুরাম জিনি' আইলা অযোধ্যা-নগরে।
রামে রাজ্য দিতে বাপ উদ্যোগ সে করে।।
অধিবাস কৈল রামে রাজা দশরথ।
কুজীর মন্ত্রণায় কেকয়ী পাতিল অনর্থ।।
কেকয়ীর সত্যে রাজ্য দিল সে ভরতে।
রাম-লক্ষ্মণ-সীতা তিনে চলিলা বনেতে।।
বৃক্ষছাল পরিধান, শিরে জটা ধরি'।
পদব্রজে যায় রাম ধনু হাতে করি।।

... ...

হেথায় লক্ষ্মণ আর জানকী রূপসী।
দণ্ডক-অরণ্যে বুলি হইয়া তপস্বী।।
শূপর্ণখা হৈয়া কেহ আইলা নিকটে।
লক্ষ্মণ হইয়া কেহ নাক তা'র কাটে।।

খরদূষণ হৈয়া কেহ যুঝিতে আইল।
চৌদ্দ-সহস্র রাক্ষস এক রামে মাইল।।
'প্রাণ রাখ, লক্ষ্মণ ভাই'-মারীচ ডাকিল।
শূন্যঘরে রহিলা সীতা লক্ষ্মণ চলিল।।
রাবণের রূপে কেহ তপস্বী হইয়া।
রথে চড়ি' লইয়া যায় সীতাকে হরিয়া।।

... ...

একবাণে সপ্ততাল ভেদি রঘুবীর।
রামের বাণেতে পড়ে বালির শরীর।।
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া লঙ্কাপুরী প্রবেশিল।
সীতা সম্ভাষিয়া অশোকবন সে ভাঙ্গিল।।
অক্ষয়-কুমার-আদি রাক্ষস মারিল।
ইন্দ্রজিৎ আসি' হনুমানে সে বান্দিল।।
রাবণের আগে বিস্তর বিরূপ বলিল।
ক্রোধে লঙ্কেশ্বর তা'র লেজে অগ্নি দিল।।
লম্ফ দিয়া হনুমান্ প্রাচীরে উঠিয়া।
লেজের অগ্নিতে লঙ্কা ফেলিল পুড়াইয়া।।
লঙ্কা পুড়াইয়া আইল লঙ্ঘিয়া সাগরে।
কহিল সকল কথা রামের গোচরে।।

... ...

তর্জ্জন গর্জ্জন যত রাবণকে কৈল।
সব কথা কহিয়া সীতার মাথার মণি দিল।।
মণি পাইয়া রঘুনাথ কান্দিয়া হতাশ।
হিয়ার উপর থুইয়া মণি ছাড়িল নিঃশ্বাস।।

.. ..

রাবণ মারিয়া রাম সীতা উদ্ধারিল।
চড়িয়া পুষ্পক-রথে দেশেতে চলিল।।
অযোধ্যা আইলা রাম ভরত শুনিয়া।
পাদুকা মাথায় যায় প্রজাগণ লৈয়া।।
রামের চরণে গিয়া ভৃত্য-ব্যবহারে।
পাদুকা যোগায় পায়ে, দণ্ডবৎ করে।।
রাম রাজা হৈলা আসি' অযোধ্যা-নগরে।

রোগ-শোক, জরা-মৃত্যু নহিল প্রজারে।।
লোক-পরিবাদে পুনঃ সীতার বনবাস।
কান্দিয়া ব্যাকুল রাম, ভাবিয়া হতাশ।।
লব-কুশ দুই পুত্র সীতা প্রসবিল।
অশ্বহেতু পিতা-পুত্রে যুদ্ধ বড় হইল।।
... ...
নাচিয়া নর্ত্তক সব মোহিলা দৈত্যগণ।।
হেন রাম-চরিত্র বিবিধ সময়ে।
'রাম রাম'-স্মরণে লোক মুক্ত হয়ে।।
হেন রামায়ণ-নাট নাচিল নর্ত্তকে।
মোহিত কৈল নটে সকল দৈত্যকে।।
এক নাট নাচিয়া নর্ত্তক নাচে আর।
'অজ-ইন্দুমতী-কথা' 'গঙ্গা-অবতার'।।[১৬]

নাট্যাভিনয়ের ছলে গুণরাজ খান পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ কাহিনীও কৌশলে বিবৃত করেছেন।

বর্ণনাদৃষ্টে বলা যায়, দৈত্য-রাজসভায় সংক্ষিপ্ততম আকারেই রামায়ণের কাহিনী পরিবেশিত হয়েছিল। অর্থাৎ তা এক-নাগাড়ে অভিনীত নাটক। এতে প্রশ্ন থাকে যে, বাস্তবেই একটি মহাকাব্যের আদ্যন্ত কাহিনী একটিমাত্র ধারাবাহিকতায় পরিবেশন সম্ভব কিনা। এর উত্তরে বলা যায় গীত-নৃত্যের বর্ণনাত্মক কৌশলে রামায়ণের মতো সুবিশাল কাহিনীকে হ্রস্বায়তনদান সম্ভব। এর সঙ্গে চরিত্রাভিনয়ের কৌশল কী অনুপাতে মিশ্রিত ছিল তা গবেষণাসাপেক্ষ। যদি পূর্ণাঙ্গ রামায়ণাভিনয়ের বিবরণ সত্য হয় তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বর্ণনাত্মক রীতিতে চরিত্রসমূহের পক্ষে স্বীয় চরিত্র ব্যতিরেকেও বর্ণনামূলক গীত-নৃত্যে কাহিনীর সংক্ষিপ্ততম রূপ উপস্থাপন করা সম্ভব।

এ সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার—মালাধর বসু যে পদ্ধতিতে রামায়ণের কাহিনী বিবৃত করেছেন তার মধ্যে পাঁচালির সমকালীন রূপই অধিকতর স্পষ্ট।

রামায়ণাভিনয়ের পর রাজসভায় 'অজ-ইন্দুমতী-কথা' ও 'গঙ্গা-অবতার' নাটকও অভিনীত হয়েছিল। এক নাট নেচে অন্য নাট নাচার প্রসঙ্গ থেকে এটাও দেখা যায় যে, রামায়ণাভিনয়ের পর নর্তকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃত্যাংশই পরিবেশন করেছিল।

প্রদ্যুম্নের অপর দুই সঙ্গীসহ ছদ্মবেশ ধারণের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় 'দ্ব্যশীতিতম গীতে'। প্রণয়ের কারণে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে' সুন্দরের নটবেশ ধারণের সঙ্গে এ আখ্যানের চমৎকার মিল রয়েছে।

ষোড়শ শতকে যশোরাজখান 'কৃষ্ণমঙ্গল' রচনা করেন। গোবিন্দ আচার্য রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' পরবর্তীকালে 'ধামালি' হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। দেবকীনন্দন 'বৈষ্ণব বন্দনায়' বলেছেন—

ঃ গোবিন্দ আচার্য বন্দো সর্বগুণ শালী।
যে করিল রাধা-কৃষ্ণের বিচিত্র ধামালী।।

এখানে দেখা যায় 'বিচিত্র ধামালী' বিচিত্রলীলা হিসেবেই আখ্যায়িত হয়েছে। কাজেই একালে ধামালি কদর্থে ব্যবহৃত হতো না, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিজগোবিন্দ ও গোবিন্দ আচার্য অভিন্ন বলেই অনুমিত হয়েছে।[১৭] বিশেষজ্ঞের মতে, গোবিন্দ আচার্যের কাব্যে 'সর্বদা রাগ-রাগিণীর উল্লেখ' থাকায় তা 'গেয় পাঞ্চালী'।[১৮]

দ্বিজমাধব 'মাধবাচার্য' নামেও পরিচিত।[১৯] তাঁর কাল ষোলশতক। কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'। এ কাব্যে চৈতন্যদেবের স্তুতি আছে—

ঃ সব অবতার শেষ কলি পরবেশ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রগুপ্ত যতি বেশ।।[২০]

কবি নিজেই 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'কে পাঁচালি রূপে উল্লেখ করেছেন—

ঃ অপর অপার ভবসিন্ধু তরিবারে।
পাঁচালি প্রবন্ধে বলি কৃষ্ণ অবতারে।।

অন্যান্য ভাগবত রচয়িতার মতোই তিনি বলেছেন—

ঃ ভাগবত সংস্কৃত না বুঝে সর্ব্বজন
লোকভাষা রূপেতে কহিব পরমাণে।

তাঁর কাব্য পাঁচালির আঙ্গিকেই যে রচিত সে সাক্ষ্য কবি নিজে দিয়েছেন—

ঃ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-গীত মধুর সঙ্গীত।
নাচাড়ি শিকলি রূপে কহিব বিদিত।।[২১]

এ থেকে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'র আঙ্গিকগত রূপেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এ কাব্য গীত, শিকলি বা বর্ণনামূলক পদ ও নাচাড়ি রূপে (আঙ্গিকে) পরিবেশিত হতো। ধ্রুবপদ বা দিশার ভাষা স্থানে স্থানে অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের, যথা—

ঃ ক্ষীরোদশায়ী প্রভু ভগবান।
শুনিয়া ধরণী-দুঃখ সদয় চতুর্মুখ
সুরমনি সহিতে পয়ান।।[২২]

মাধবাচার্যের 'কৃষ্ণমঙ্গলে'র গীতসমূহে পদাবলীর আস্বাদ বিদ্যমান। যেমন—

ঃ শ্যাম ধাম রসধাম গহিরা।
যৈছে গুরু গোবিন্দ হরে তোমরা।।
মৌলি মিলিত কমল নয়না।
তরণী মনোহর মুরলী বয়না।।
পীত-বসন পরি নিরবধি লীলা।
গানে দ্বিজ মাধব কাণু মোর জীবনা।।[২৩]

ষোড়শ শতকে পদাবলীর প্রবল উচ্ছ্বাসের কালে আখ্যান-নির্ভর ভাগবত পাঁচালির পক্ষে এর প্রভাব এড়ানো সম্ভব ছিল না। সেজন্যই ষোড়শ শতক ও পরবর্তীকালে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্যে বৈষ্ণব পদাবলী-অঙ্গের গীত অপরিহার্যরূপেই স্থান লাভ করেছিল।

ভাগবতাশ্রয়ী কৃষ্ণবিষয়ক আখ্যানে কালিয়দমন একটি আবশ্যিক খণ্ড। বস্তুত-সমগ্র কৃষ্ণকাহিনীর মধ্যে কালিয়দমন ও দান-নৌকা খণ্ডে পরিস্ফুটিত কৃষ্ণের বীরত্ব ও প্রেমের দ্বৈতরূপ সকল কালেই সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনগণের মধ্যে আদৃত হয়েছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে স্বতন্ত্রভাবে কালিয়দমননাটের উৎপত্তি এ কারণেই।

মাধবাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' অবলম্বনে কালিয়দমনের গঠনকৌশল ও কাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। চৈতন্য প্রভাবিতকালে কৃষ্ণমঙ্গল শ্রেণীর

পাঁচালিতে পদাবলীর গীতিরস, আখ্যানের সামগ্রিক আঙ্গিকে এক নবতর বৈচিত্র্য দান করেছিল। মাধবাচার্যের 'কালিয়দমন' অংশেও তা লক্ষ্য করা যায়।

আলোচ্য খণ্ডের শুরুতে কালিন্দীহ্রদে বিষাক্ত জলপানে রাখাল ও ধেনুকুলের মৃত্যু, কৃষ্ণের অমিয়-কটাক্ষে তাদের পুনরুজ্জীবন লাভের বর্ণনা। একই পদে কালিয়নাগের ক্ষতিকর শক্তি সম্পর্কে কৃষ্ণের ক্রোধ এবং সংকল্প নিম্নরূপে বিবৃত—

ঃ এ পাপ নাগের বাস থাকিলে গোকুল নাশ
হইব দেখিল বিদ্যমানে।
আজুনিজ বিহরণে লোকের করিমুত্রাণে
কালিরে পাঠাইব নিজ স্থানে।।

এ হচ্ছে নাচাড়ি।

এরপর কৃষ্ণের নীপ-বৃক্ষশাখে আরোহণ এবং হ্রদের জলে ঝম্প প্রদান। জলে তাঁর অবাধ সন্তরণ—

ঃ এতেক বলিয়া হরি বসনে বসনে সারি,
নীপ-ডালে দিল এক লাফ।
ঘন ঘন বাহুমূলে, হানি সভ্য করতলে,
কালিদহ জলে দিলা ঝাঁপ।।
মত্ত দ্বিরদকুল, জিনিয়া বিশাল বল,
বেগে চলিলা অবিরত।।
তরঙ্গ লহরী বিষ, বর্ষায় অঞ্জন ভাস,
বেআপে ধনুক একশত।।
কুতূহলে সেই হ্রদে, বিহরে অভয় পদে,
ভূজদণ্ড ঘন আন্দোলনে।
হইল প্রচণ্ড ঘোষ, শুনি কালি মহারোষ,
ধাইল সকল নাগগণে।।

সর্পকুলের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ-দৃষ্টে কূলে রাখালগণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

এরপর সমবেত বিলাপগীত। কৃষ্ণের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু চিন্তায় রাখালকুল ক্রন্দনশীল। পরবর্তী পদে আছে ব্রজকুলে নৈসর্গিক দুর্বিপাকের বিবরণ (সঞ্জয়ের

মহাভারতে, যুদ্ধ-পূর্বরাতে ভীমের অমঙ্গল-চিহ্ন দর্শনের সঙ্গে এর মিল আছে)। এ হচ্ছে শিকলি—

ঃ হেনই সময় ওথা বরজ সমাজে।
ত্রিবিধ উৎপাত হয়া গেল সেই কাজে।।
রক্তবৃষ্টি ভূমিকম্প ঘন উল্কাপাত।
অমঙ্গল পক্ষনাদ বহে চণ্ড বাত।।[২৪]

ব্রজকুলে সর্প দংশনে কৃষ্ণের মৃত্যুর খবর প্রচারিত হলো। এরপর আবার গীত—

ঃ এ পাপ কালিদহ সভে জানি দুঃসহ
প্রাণী না ঘনায় তরাসে।
বিষম বিষের জালে তৃণ নাহি রহে কূলে
তাহে ঝাঁপ দিলা কেমন সাহসে।।
প্রাণের যদু চান্দরে কেন
হেন করিলা গোপালে।

এই গীত বৈষ্ণব পদাবলীরই অনুসরণ। পরবর্তী অংশে আবার জননীর বিলাপ। তার পরের পদে একই আবেগের অনুসৃতি। পরবর্তী পদেও ব্রজরমণীগণের সমবেত বিলাপ। কৃষ্ণের অদর্শনে তারাও কালিন্দীর জলে প্রবেশ করবে। তখন বলরাম তাদের সাহস ও সান্ত্বনা প্রদানের নিমিত্তে বলেন—

ঃ ... ...
স্থির হও গোপ সব নহিও কাতর।।
বিষজলে প্রবেশ করিবা অকারণ।
এখনি উঠিবে প্রভু নন্দের নন্দন।।

কৃষ্ণ সকলকে শোকার্ত দেখে জলের অভ্যন্তর থেকে সর্পকুণ্ডলীবন্ধন ছিন্ন করে ভেসে উঠলেন। শুরু হলো কৃষ্ণের 'সর্প-শিরসি' তাণ্ডব নৃত্য—

ঃ রুষিল বনমালী পলায় নাগ কালি
গরুড় সম হরি ধাড়ি (!)
কৌতুক ফণিমুণ্ডে চড়ি।।
রঙ্গে শ্রীরঙ্গ, রুচির অঙ্গ-ভঙ্গ,
সকল কলা আদিগুরু।
কালিয়া বিষধর শিরসি নটবর
পরম তাণ্ডব কারু।।[২৫]

এও পদগীতি। কৃষ্ণ সর্পশীর্ষে তাণ্ডব নৃত্য করছেন—সুন্দর অঙ্গভঙ্গি সহকারে। কারণ তিনি সকল কলার আদিগুরু। কিন্তু তাণ্ডব একান্তভাবেই শিবের নৃত্য—তা কি করে কৃষ্ণেরও নৃত্য-'কারু' হলো সে বিষয়ে অনুসন্ধান প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, কৃষ্ণের এই 'সকল-কলা আদিগুরু' রূপ দাক্ষিণাত্যে পূজিত।

দেখা যাচ্ছে কালিয়দমনে পাঁচালির নাচাড়ি-শিকলির মধ্যে পদাবলীর গীতও গৃহীত হয়েছে। এ হচ্ছে স্বতন্ত্রভাবে পরবর্তীকালে সৃষ্ট 'কালিয়নাটে'র পূর্ববর্তী রূপ, পাঁচালির অঙ্গে নতুন কালের দ্যুতি-সম্পাত। কালিয়দমনের অন্তে নাগ-নারীগণের করুণ আবেদনে কৃষ্ণ তাদের মুক্তি দিয়ে বললেন—

ঃ শুন শুন অএ কালি কহিয়ে তোমারে।
সমুদ্র ছাড়িয়া তুমি আইলা যার ডরে।।
আমার পদের চিহ্ন পাইয়া ফণায়।
আর না হিংসিবে সেই গরুড় তোমায়।।
এ বোল শুনিয়া কালি হরষিত মন।
গোবিন্দ পূজন কৈল লৈয়া নারীগণ।।[২৬]

চৈতন্যদেবের সময়েই কালিয়দমননাটের একটি বিশেষ রীতি 'ডঙ্ক' নামে পরিচিত ছিল। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে' প্রাপ্ত নাট্যপ্রসঙ্গে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। নব্য পাঁচালি ও 'ডঙ্ক' নাট্যের দুটি স্তর অতিক্রমপূর্বক পরবর্তীকালে এ শ্রেণীর নাটকের উদ্ভব ঘটেছিল একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। এ প্রসঙ্গে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে কালিয়দমননাটের মঞ্চ ও অভিনয়রীতি সম্পর্কে বঙ্গদর্শনে (১২৮৯), সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত বিবরণ লক্ষণীয়।[২৭]

ষোড়শ শতকে দুঃখী শ্যামদাস রচিত 'গোবিন্দমঙ্গলে' প্রাপ্ত বিবরণও প্রায় একইরকম—

ঃ কালিয় উপর নাচে গদাধর
পরম আনন্দ সুখে।
ঝলকিত তনু নটবর কানু
মুরলী বাজায় মুখে।।[২৮]

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে দুঃখী শ্যামদাস 'গোবিন্দমঙ্গল' রচনা করেন। শ্যামদাস 'মহাভারতে'র রচয়িতা কাশীরাম দাসের 'পিতৃব্য স্থানীয় জ্ঞাতি' বলে

অনুমিত হয়েছে।[২৯] এ কাব্য যে কথকতারীতিতেও উপস্থাপিত হতো নানা পদের প্রারম্ভে তার ইঙ্গিত আছে—

ঃ শুন রাজা পরীক্ষিত কহিয়ে তোমারে।
অমঙ্গল দেখে লোক গোকুল নগরে।।

ঃ শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত।
বর্ষা অন্তে শরৎ হইল উপনীত।।

ঃ পরীক্ষিত পুছেন মুনির পায় ধরি।
কহ কোন রূপে দান সাধিল মুরারি।।

এ কাব্যের বর্ণনাকৌশল মূলত পাঁচালির। 'রাধাকৃষ্ণ মিলন প্রসঙ্গ-বড়াই সমাগমে' নাতি-বৃহৎ উনিশটি পদে দূতীয়ালি, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড বর্ণিত হয়েছে। এই পদগুলি কবির বর্ণনাকৌশলে নাট্যগুণসম্পন্ন।

রাধারূপে কাতর কানাই। পথে দেখা হলো বড়াইর সঙ্গে। শ্যামদাস অত্যন্ত নিপুণ ভাষায় বড়ায়ির বর্ণনা দিয়েছেন—

ঃ বড়াইর বেশ যত কি বলিতে পারি।
পাকাচুলে রঙ্গ ফুলে বেন্ধেছে কবরী।।
সীথায় সিন্দুর ভালে চন্দনের ফোঁটা।
শ্রবণে কুণ্ডল যেন দিনমণি ছটা।।
এ বৃদ্ধ বয়সে বুড়ী না ছাড়ে কজ্জল।
রসনা চলনে নড়ে দশন সকল।।
স্বর্ণসূত্র নাসাপুটে গজমতি দুলে।
স্তন দুই গোটা তার দোলে নাভিমূলে।।
অষ্ট অঙ্গে পরে বুড়ী অষ্ট অলঙ্কার।
গৌরবরণ রূপে অস্থি চর্মসার।।
একপদ চলে বুড়ী চারিপদ বৈসে।
হাঁটু ধরি উঠে বুড়ী ঘন ঘন কাশে।।
অষ্ট অঙ্গে বাঁকা বুড়ী পরে পীতাম্বর।
নড়ি ধরি দাণ্ডাইল কানুর গোচর।।[৩০]

মধ্যযুগে কোনো চরিত্রের এমন নিখুঁত ও একই সঙ্গে এমন কৌতুককর বর্ণনা দুর্লভ।

'শ্রীকৃষ্ণের দান যাচ্ঞা', 'শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে রাধিকার প্রত্যুত্তর', 'বড়াইর প্রতি লীলা নিগ্রহ', 'কৃষ্ণের দানের দাবিকরণ', 'রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্ররোচনা', 'রাধিকার কাতরোক্তি' এবং 'নৌকা খণ্ডে নাবিকরূপে শ্রীকৃষ্ণের আগমন', 'শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে যমুনাপার করেন', 'রাধাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ জলমর্জ্জন' ও 'গোপীগণের ক্ষেদ' শীর্ষক বিভিন্ন পদে নাট্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়—

কৃষ্ণ ঃ ... আইস গো সুন্দরি রাধে শুন মোর বানী।
কি পসরা মাথে তোর কোথারে সাজনি।।

রাধা ঃ শুন কানু নন্দের নন্দন বিনোদিয়া।
মথুরা যাইব বিকে গোরস লইয়া।।

কৃষ্ণ ঃ শুন রাধে পথে মোর মহাদান লাগে।
পসরা উলাও রাধে বৈস মোর আগে।।[৩১]

'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুরূপ বড়াইর প্রাধান্য' দেখা যায়। উপরন্তু এ কাব্যের 'দান খণ্ড' ও 'নৌকা খণ্ডের' কাহিনীর সঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র বর্ণনার বেশ মিল পরিলক্ষিত হয়। 'গোবিন্দমঙ্গল' আদ্যন্ত বর্ণনা প্রধান নয়। এ কাব্যের প্রামাণিক পুথি পাওয়া যায়নি—তবে এর মধ্যে 'প্রাচীনত্বের চিহ্ন' দেখা যায়।[৩২] দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্য দৃষ্টে বলা যায়, তা মূলত কথকতার লক্ষণাক্রান্ত। কবি বহুক্ষেত্রে ভণিতায় বলেছেন—

১. গোবিন্দমঙ্গল গান শ্রীমুখনন্দন।[৩৩]

২. দুঃখী শ্যমদাস গায় গোবিন্দ মঙ্গলে।[৩৪]

৩. গোবিন্দমঙ্গল কারুণ্য কেবল
দুঃখী শ্যাম গায় সারে।

৪. গোবিন্দমঙ্গল গীত শুনিলে মুকুতি।[৩৫]

এ থেকে দেখা যায় যে এ কাব্যের গায়েন স্বয়ং দুঃখী শ্যামদাস।

কবি শেখরের 'গোপাল বিজয়' পাঁচালি কাব্যরূপে উল্লিখিত হয়েছে। তবে শুরুতে তিনি সম্ভবত 'গোপাল চরিত', 'গোপাল কীর্তন' ও 'গোপীনাথবিজয়' নাটক রচনা করেন। 'গোপীনাথ বিজয়' সংস্কৃতে রচিত বলে অনুমিত হয়েছে।[৩৬] এ সম্পর্কে গ্রন্থদৃষ্টে উদ্ধৃতি প্রদত্ত হলো—

ঃ তবে মহাকাব্য কৈল গোপাল চরিত।
তবে কৈল গোপালের কীর্তন অমৃত।।

গোপীনাথ বিজয় নাটক কৈল আর।
তমু (তবু?) গোপ বেশে মন না পুরে আমার।।
তবে সে পাঁচালী করি গোপাল বিজয়ে।
বৈষ্ণব চরণ রেণু ধরিয়া হৃদয়ে।।৩৭

এ থেকে দেখা যায় সেকালে পাঁচালি রীতির পরিবেশনাই কবিদের কাছে অধিকতর কাম্য ছিল।

সপ্তদশ শতকের অন্তে অভিরাম দাস বিরচিত 'গোবিন্দ বিজয়' কাব্যও কথকতারীতিতে পরিবেশিত হতো। কবি তাঁর কাব্যকে 'কৃষ্ণকথা' বলে উল্লেখ করেছেন—

ঃ তুমি মহাশয় মুনি উদার চরিত
কৃষ্ণকথা শুনাইয়া করিলে পবিত্র।৩৮

কবি কৃষ্ণকথার সমার্থক 'মঙ্গল কীর্তন'ও বলেছেন তাঁর কাব্যকে—'পরম পুন্যদ কথা মঙ্গল কীর্ত্তন'। কোথাও কোথাও এ কাব্য 'গাথা' হিসেবেও উক্ত হয়েছে ঃ 'কৃষ্ণগাথা সম্বল গাথিয়া রাখ ভাই'। এ কাব্য 'গোবিন্দবিজয় গীত' ও 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত' রূপেও অভিহিত হয়েছে—

ঃ গোবিন্দ পদারবিন্দ অভিরাম গায়।
গোবিন্দ বিজয় গীত এতদূরে সায়।।

এই অংশের পাঠান্তরে আছে—

ঃ গোবিন্দ বিজয় গায় অভিরাম দত্ত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত হইল সমাপ্ত।।

ভাগবতপুরাণের প্রথম, দ্বিতীয় এবং দশম স্কন্ধের অনুসরণেই অভিরাম দাস তাঁর 'গোবিন্দবিজয়' কাব্য রচনা করেছেন। পুরাণরীতির কথোপকথন এ কাব্যে দৃষ্ট হয়—

ঃ নৈমিষারণ্যের কথা শুক মুখামৃত।
শৌনকাদি মুনিগণ জিজ্ঞাসিলা যত।।৩৯

অন্যত্র—

পরীক্ষিত ঃ তুমি মহাশয় মুনি উদার চরিত
কৃষ্ণকথা শুনাইয়া করিলে পবিত্র।।

শুকদেব ঃ শুকদেব বলে কথা শুন আভিমুন্য
কৃষ্ণকথা অধিক উদয় মহাপূণ্য।।[৪০]
পরীক্ষিত ঃ নৃপ বলে অতঃপর কহ কৃষ্ণলীলা
তবে কি গোকুল মধ্যে করিলেন খেলা।।[৪১]

নিম্নোদ্ধৃত বচনটি বহুপদ শীর্ষে উল্লিখিত হয়েছে—

ঃ কৃষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা
সর্ব্ব ধর্ম্ম কৃষ্ণ নাম বিনে বৃথা।।

পদের শুরুতেই এই অংশটুকু নামকীর্তনের সুরে উচ্চারিত হতো। 'গোবিন্দবিজয়ে' কীর্তনগানও লভ্য। নিচের পদটি এর দৃষ্টান্ত—

ঃ কহিয়াছে বেদ আগম পুরাণে
কৃষ্ণনাম সবে দৃঢ়।
এমন ঠাকুর থাকিতে কেনে ভাই
যমের নিয়ড়ে পড়।।
ঠেকিলে কাল পুরুষের হাতে
এখন তেন্দন জান।
চেতন থাকিতে কৃষ্ণগুণ গাঅ
ডাকিয়া বলিরে শুন।।
যত যত দেখ জনম জনম
এমন হবার নহে।
হরিগুণ গায়া সকল করহ
দাস অভিরাম কহে।।[৪২]

'গোবিন্দবিজয়ে' নাট্যরস নেই। সপ্তদশ শতকের অন্তে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবের ফলে ভাগবত পুরাণাশ্রিত আখ্যানের প্রাধান্য লুপ্ত হতে থাকে। 'গোবিন্দবিজয়ে' গেয় 'রাগ-রাগিণীর' উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও তা 'পাঁচালী গানের' নিমিত্তে নয় বরং 'পুরাণ পাঠের কথকতার জন্য' বলে অনুমিত হয়েছে।[৪৩] গোবিন্দবিজয় হচ্ছে কথকতারীতির কাব্য।

পরশুরাম রায়ের 'মাধব সঙ্গীত' 'সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে' রচিত বলে অনুমিত। তবে এও উল্লিখিত হয়েছে যে, এ গ্রন্থ 'চৈতন্যচরিতামৃতের' পূর্বের নয়। এর লিপিকাল ১৭৫৯ খ্রীঃ।

কৃষ্ণলীলাকীর্তনই যেহেতু 'মাধবসঙ্গীতের মূল উদ্দেশ্য, এইজন্য বিশেষজ্ঞের মতে তা 'কৃষ্ণমঙ্গল' শ্রেণীর কাব্য'। মাধবসঙ্গীত 'গীত' রূপে উল্লিখিত হয়েছে—

ঃ পরশুরামের রহু গুরু পদে ধ্যান।
মাধব সঙ্গীত গীত আনন্দিতে গান।।[৪৪]

এ যে 'সঙ্গীত'-প্রকারে রচিত কবি তাও উল্লেখ করেছেন—

ঃ শ্রী গুরুদেব পদরজ কৃপালেশে
রচিল পরশুরাম সঙ্গীত বিশেষে।[৪৫]

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিশেষভাবে গীত হবার জন্যই এ কাব্য রচিত।

কাব্যটির বিশেষ গড়ন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রথমত এই কাব্যে সংস্কৃত শ্লোক, পদের গঠন ও পদশীর্ষে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ থেকে এর সঙ্গীতাঙ্গিক পরিবেশন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। ষোড়শ শতকে সাবিরিদ খান ও শ্রীধরের 'বিদ্যাসুন্দরে'ও এ রীতি দৃষ্ট হয়। 'মাধবসঙ্গীতে' সংস্কৃত শ্লোক, কাব্য পরিবেশনার রীতি হিসেবেই প্রযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ একটি শ্লোক উদ্ধৃত হলো—

ঃ যথা মন শিক্ষায়ং
রতিং গৌরীলীলে অনিতপতি
সৌন্দর্য কিরণে
শচী লক্ষী সত্যাঃ পরিভরতি সৌভাগ্য
বলনৈঃ।[৪৬]

'মনশিক্ষা' কৃত্যমূলক নাটকের অঙ্গ। গাজীর গানে এ হচ্ছে নাট্যারম্ভের দ্বিতীয় পর্যায়ের কৃত্য।

পরশুরাম রায় তাঁর কাব্যকে ধর্মীয় কৃত্যের মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন বলেই সমগ্র কাব্য মধ্যে বৈষ্ণব শ্লোকের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। তাঁর ভক্তিমার্গীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে—

ঃ শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণো স্মরণং পাদসেবনম
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনম।।[৪৭]
ইতি পুংসার্পিতাত্মানো ভক্তিশ্রবণলক্ষণা।

'মাধবসঙ্গীতে' কিভাবে পরিবেশিত হতো তার ইঙ্গিত সুস্পষ্টভাবে লভ্য নিচের উদ্ধৃতিটিতে—

ঃ বক্তা প্রশ্নকারী আর যত শ্রোতাগণে।
পবিত্র করএ একা কৃষ্ণকথা গানে।।[৪৮]

দেখা যাচ্ছে 'মাধবসঙ্গীতে' পরিবেশনকারীর সংখ্যা দুই। একজন বক্তা অন্যজন প্রশ্নকারী। এ যে আসরের কাব্য তা শ্রোতার উল্লেখ থেকে বোঝা যায়।

মাধব সঙ্গীতের সর্বত্রই 'ধ্রুপদ' বা 'ধুয়া-পদ' দেখা যায়। যেমন—

ঃ আগো বিনোদিনী কহিতে আইলু
এক কথা।
এ তোর যৌবন কালে না দেখিয়া
ভালে ভালে
অন্তরে রহিল এই ব্যথা।। ধ্রু।।[৪৯]

অন্যদিকে কবি তাঁর কাব্যকে 'কৃষ্ণকথা গান' রূপে উল্লেখ করেছেন। এ থেকেও এর সঙ্গীতাত্মক রূপটি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

এ কাব্য যে মৌখিক রীতিতে রচিত হয় নি তারও উল্লেখ পাওয়া যায়—

ঃ পাঞা গুরু উপদেশ কৃষ্ণসেবা সবিশেষ
অনন্ত মহিমা গুণগ্রাম।
আপন কলম ধরি লিখন করেন হরি
পরশুরামের মাত্র নাম।।[৫০]

কবির উক্তি থেকে এ কাব্য যে কথকতার ঢঙে পরিবেশিত হতো তার প্রমাণ লভ্য—

ঃ অবধানে শুন ভাই ভাগবত কথা।
যে কথা শুনিলে তুষ্ট সকল দেবতা।।[৫১]

'কথা' অর্থাৎ কথকতা। এ কালে যাকে বলা হয় 'কথানাট্য'। কিন্তু এর পরিবেশন রীতি যে নিতান্ত বৈঠকী ঢঙের নয় তা বোঝা যায় বক্তা ও প্রশ্নকারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থেকে। অর্থাৎ আসরে স্পষ্টতই দুজন গায়েন, তার প্রমাণ আছে। নিতান্ত বৈঠকী ঢং-এ এর পরিবেশনা তাই যুক্তিতে টিকে না।

উপরন্তু মাধবসঙ্গীতের গঠনকৌশল সমকালীন যে কোনো ভাগবতাশ্রয়ী কাব্যের চেয়ে অধিকতর শিল্পগুণসম্পন্ন। গীত, শ্লোক, বর্ণনা ও সংলাপ-মুখরতায় সমগ্র মাধবসঙ্গীত মধ্যযুগের বাঙলা গেয়কাব্যে একটি বিশিষ্ট আসনের

দাবিদার। এ কাব্যের গঠনরীতি কিরূপ তা পঞ্চম অধ্যায় অবলম্বনে দেখান হলো—

ঃ প্রথমে ধ্রুপদ, কৃষ্ণকর্তৃক কন্দর্পকে বড়ায়ির কাছে প্রেরণ—এরপর আছে কন্দর্প ও বড়ায়ির সংলাপ। এবার সংস্কৃত শ্লোকে কবির ব্যাখ্যা, বড়ায়ির সঙ্গে কৃষ্ণের মিনতিমূলক বচন—এরপর গীত, রাধার রূপ বর্ণনা অতঃপর ধুয়া—ধুয়ার পরই 'কাহ্নায়ি'র সংলাপ—আবার ধুয়া—বড়ায়ির সংলাপ, অতঃপর দীপিকা থেকে শ্লোক পাঠ—এরপর কৃষ্ণকে বড়ায়ির তিরস্কার ও রাধার রূপ বর্ণনা—এরপর 'উজ্জ্বলনীলমণি'র শ্লোক—শ্লোক পরম্পরায়-বৈদগ্ধ্য, গন্ধোন্মাদিত ও রম্যভাগ—শ্লোকের উদ্ধৃতি,—এরপর পয়ার ও কংসের রাজসভায় নারদের আগমন-তৎপরে 'কার্পণ্যমঞ্জিক্য' ও 'রুদ্রপুরাণে'র শ্লোক। এভাবে সম্পূর্ণ পরিচিত একটি আখ্যানকে শ্রুতিমূল্য ও রসগত দিক থেকে পরশুরাম রায় নবতর তাৎপর্য দান করেছেন। এ কাব্যে সংক্ষিপ্ত পদগুলি বৈষ্ণব পদাবলীর রসসিক্ত—

ঃ চলগো সজনী কপট পরাণী
করি তোরে পরিহার।
কৃষ্ণকথা বিনে শ্রবণ না শুনে
নিষেধ না কর আর।।[৫২]

এ কাব্যে সেকালে নাট্য সংক্রান্ত কিছু কিছু উল্লেখ দেখা যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, কানন-গমনেচ্ছু রাধার সাজসজ্জার সুবিস্তৃত বর্ণনা আছে—

ঃ কানন গমনে রাধা অভিপ্রায় দেখি।
চঞ্চল হইল যত বেশকার সখী।।

সাজসজ্জার কাজে 'বেশকার' কথাটা পাওয়া যাচ্ছে।

রাধার সখীদের বিচিত্র নাম—নর্ম্মদা, মাণিক্যা, সুগন্ধা, নলিনী, চিত্রিণী, প্রেমবতী, রসবতী, সুষমা, পেশলা। তারা গন্ধানুলেপন এবং চিত্র-অঙ্কনেও পারদর্শিনী—

ঃ সুগন্ধা নলিনী দোঁহে গন্ধানুলেপনে।
চিত্রিণী লেখনি লঞা চিত্রের কারণে।।[৫৩]

দেহে চিত্রলেখনের রীতিও ছিল সেকালে। এই সাজসজ্জার সঙ্গে 'নারী-গায়ন সম্প্রদা'র উল্লেখ পাই। অন্তত বারোজন সখী যে এই গায়েন সম্প্রদায়ে ছিল তা বলেছেন কবি—

ঃ কলকণ্ঠী পিককণ্ঠী সুকণ্ঠী কলাবতী।
সাসোল্লাসা গণতুঙ্গী রতি লীলাবতী।।
সুধাময় মধুশ্রবা ভারতী রঙ্গদা।
সুবেশ করিঞা আইল গায়ন সম্প্রদা।।[৫৪]

নামের অন্তরালে প্রত্যেক সখীর নাট্যকলা বিষয়ে পারদর্শিতার ইঙ্গিতও বিদ্যমান।

সাজসজ্জা গ্রহণপূর্বক অভিসারিকা রাধা যখন কাননের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করবে সে মুহূর্তে—

ঃ ধানশী মল্লার রাগ গান করে সখী।
নানা ছাদে বাজে রুদ্র বল্লভা বল্লকী।।
বিশাখা পঢ়েন যাত্রা মঙ্গল সুপাঠ।
সুন্দরী ময়ূরী পাশে করে চিত্রনাট।।[৫৫]

বিশাখা 'যাত্রামঙ্গল' পাঠ করেছে আর সেই সঙ্গে সখী ময়ূরী প্রদর্শন করেছে 'চিত্রনাট'। এ থেকে দেখা যায়, মধ্যযুগে 'চিত্রনাট' বিশেষ মুহূর্তেও পরিবেশিত হতো। উল্লিখিত পদদৃষ্টে এও বোঝা যায় যে, এ নাট সংক্ষিপ্ততম সময়ের জন্যই পরিবেশিত হয়েছিল। এ কাব্যে নাটক-নাটিকা ভেদের প্রসঙ্গ আছে—

ঃ ষোল অলঙ্কার যত নাটক-নাটিকা।
হাস্য-বাদ্য-গদ্য-পদ্য নিত্য আখ্যায়িকা।।[৫৬]

অন্যত্র—

ঃ নাটক নাটিকা ভেদ গোপাল তাপনী বেদ
বৃহৎকুল দীপিকা বিহিত।[৫৭]

রাধার সখী প্রসঙ্গে 'মাধবসঙ্গীতে' 'নাট্যকলা'র প্রসঙ্গও লভ্য—

ঃ মঞ্জুলা বিন্দুলা সান্দ্রা মৃদুলাদিবালা।
রাধিকার অগ্রে শিক্ষা করে নাট্যকলা।[৫৮]

'নাট্য' তখন যে শিক্ষণীয় 'কলা' হিসেবে পরিচিত—সে তথ্য মিলছে। কৃষ্ণের প্রণয়লীলা, মাধবসঙ্গীতে 'নাট্যলীলা' হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে—

ঃ যে কৃষ্ণ বিভূতি এত নাট্য লীলা করে।
সে তনু বাৎসল্য একা সম্বরিতে নারে।।[৫৯]

এই নাট্যলীলাই ষোড়শ শতাব্দীতে 'লীলানাটক' হিসেবে পরিচিত।

ভবানন্দের 'হরিবংশ' তত্ত্বগতভাবে কৃষ্ণমঙ্গল ধারার অন্তর্গত। কবির বর্ণনা থেকে মনে হয় যে, 'হরিবংশ' কোনো পুরাণের অনুসরণে রচিত—

ঃ চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র যতেক কাহিনী।
জন্মে জয় স্থানে কহিলেক ব্যাসমুনি।।
শুনিয়া হরিষ রাজা বোলে পুনর্ব্বার।
প্রণতি-পূর্বক করি মাগে পরিহার।।
চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র কহিলা মহামুনি।
বিস্তারিয়া হরিবংশ কহ চাই শুনি।।[৬০]

কিন্তু কবি প্রকৃতপক্ষে কোন পুরাণ থেকে এর আখ্যান ভাগ গ্রহণ করেছেন তা এখনও অপরিজ্ঞাত।[৬১] তবে 'এ কাব্যের কাঠামো পুরাণানুগ'।[৬২] 'হরিবংশে' পুরাণাশ্রয়ী অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের মতো ব্যাস হচ্ছেন কথক, রাজা-প্রশ্নকারী। কাব্যের অন্তে তিলোত্তমারূপিণী রাধার কৃষ্ণ-অঙ্গে লীন হবার ঘটনা বিবৃত হয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বে কৃষ্ণলীন সাধনার এই গূঢ় ইঙ্গিতে চৈতন্যদেবের অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত-তত্ত্বের ছাপ আছে। সমগ্র কাব্য পাঠান্তে মনে হয় আদিরসের লীলাচ্ছলে এ হচ্ছে কবির গৌরাঙ্গরূপ দর্শন।

'হরিবংশে' পদ-বন্ধ বা পয়ারের সঙ্গে পদাবলীর এক বিশাল সংযোজন আছে। ফলে এ কাব্য রূপগত দিক থেকে পুরাণাশ্রয়ী হলেও তা একই সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ গীতিমূলক আখ্যান হিসেবেও অভিহিত হবার যোগ্য। এ কাব্যে পদাবলী রসাশ্রিত গীতের সংখ্যা একশত ছাব্বিশ। হরিবংশের অধ্যায় সংখ্যা একষট্টি। এর সঙ্গে প্রক্ষিপ্ত রূপে আখ্যায়িত দুটি নবতর উপাখ্যান 'মৃগবতী-কন্যার উপাখ্যান ও এর অন্তর্গত বর্ব্বর বাখান এবং তুলসীর উপাখ্যান' পাওয়া যায়।[৬৩]

হরিবংশ নামের সার্থকতা এই যে, একাব্যে পৌরাণিক কৃষ্ণায়ণের আখ্যানের সঙ্গে কৃষ্ণের নানা জ্ঞাতির নাম পরিচয় লভ্য। এ সকল নামের কোনো কোনোটি অপৌরাণিকও বটে।

এ কাব্য মূলত কৃষ্ণের রাধা সম্ভোগের কাহিনী অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। কৃষ্ণ একই সঙ্গে মাতৃস্তন্য লালিত শিশু ও রতিরস লিপ্সু মোহন-মুরারি। সমগ্র হরিবংশে আদিরসেরই প্রাধান্য। এ কাব্যে কৃষ্ণের অজস্র গোপিনী-সম্ভোগ ও রতি সম্ভোগান্তে নারীগণের পতিনিন্দা কৌতূহলোদ্দীপক।

'হরিবংশ' সংস্কৃত শ্লোক থেকে গীতে রূপান্তরিত হয়েছে—এ কথা কবি উল্লেখ করেছেন—

ঃ ভকতি-মুকতি হীন কহে ভবানন্দ দীন।
শ্লোক ভাঙ্গি রচিলেক গীত।।[৬৪]

এ কাব্যের রচনারীতিকে তিনি বলেছেন 'পদ-বন্ধ'—

ঃ সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোক বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে।।

'পদ-বন্ধ' হল পয়ারবন্ধ। হরিবংশে নাচাড়ি নেই। গীতগুলো মূলত নায়ক-নায়িকার একক ও অন্তর্গত অনুভূতিজাত উচ্চারণ। সুতরাং তা গীতিমূলক উক্তিও বটে। উপরন্তু গীতে সর্বত্র ধুয়া বা দিশা থেকে এর কীর্তনাঙ্গ রূপটি সহজেই অনুমান করা যায়।

আদিরসাত্মক বর্ণনাতেই ভবানন্দের কবি-কুশলতা। বড়ুচণ্ডীদাসের সঙ্গে এক্ষেত্রে তাঁর মিলও আছে। কিন্তু গীতিকা শ্রেণীর পদে তিনি যথার্থই বৈষ্ণবীয় আবহ রচনায় সক্ষম।

যেমন—

।।সুহি রাগ।।

কেন গেলা নীপ তরু মূলে
রাই-কেন গেলা নীপ তরু মূলে।।
তুমি গুণবতী নারী মুররি করিলা চুরি
ভাল নাম রাখিলা গোকুলে।। ধ্রু
মুররির কিবা দোষ তাকে কেন করে রোষ

কহ রাধা শুনি বিবরণ।

মুররি হরিয়া মোর কি লাভ হইল তোর

চুরি কর কেমন কারণ।।৬৫ ইত্যাদি।

ধুয়াপদ দোহারগণ কর্তৃক গীত হতো।

অন্যত্র—

ঃ . বন্ধু কানাই

কহ নিশি কোথাতে আছিলা।

রতির আবেশ লাগি কোথা হে আছিলা জাগি

তিল-আধ ত না ঘুমাইলা।। ধ্রু

নীল কমল আঁখি আলসে মুদ্রিত দেখি

কালা হৈছে অরুণ অধর।

কেমন মুগধি রামা বিনে সিনানে তোমা

পাঠাইয়া দিছে মোর ঘর।।৬৬

নিচের পদটির গীতি-লালিত্য অসাধারণ বলেই মানতে হয়—

ঃ ... .

কালা কালা করি বোল বিনোদিনি

তাতে কি বোলিতে পারি।

তোমার আমার আইস বিনোদিনি

রূপ যে বদল করি।

কাজল বরণ ' আমাকে দেখিয়া

তুমি যদি মোকে নিন্দ।

তবে কেনে তুমি কালিয়া কাজল

ভুরুর উপরে পিন্ধ।৬৭

'হরিবংশে'র পরিবেশনারীতি হচ্ছে কথকতা।৬৮ কিন্তু পুরাণ-কথকতার প্রচলিত রীতির সঙ্গে এর আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য সাধন করেছে পদগীতিকাসমূহ। এই পদগীতি মূলত কীর্তনাঙ্গ গান। ফলে শুদ্ধ বর্ণনাত্মক-কথকতার ক্ষেত্রে পদাবলীর সঙ্গীতগুলো নতুনতর বৈচিত্র্য সৃজন করেছে। আদ্যন্ত পাঠে দেখা যায় পদাবলীর সমাহারে 'হরিবংশ' সুচির-স্নিগ্ধ সাঙ্গীতিক পরিবেশনায় রূপান্তরিত হয়েছে। মধ্যযুগে বাঙালির নিজস্ব নন্দনতাত্ত্বিক রুচির বিশিষ্টতা সংস্কৃত কথকতারীতিকে

নতুনতর আঙ্গিক দান করেছে একথা স্বীকার্য। 'হরিবংশ' নবকালের নতুন আঙ্গিকে রচিত কথকতারীতির কাব্য।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' থেকে 'মাধবসঙ্গীত' পর্যন্ত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্যের পরিবেশনারীতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়—পাঁচালি ও কথকতা এই দ্বিবিধ প্রকারে এ সকল কাব্য পরিবেশিত হতো। এখন এরূপ প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক যে, একই বিষয়ে রচিত হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন কাব্যে দু'ধরনের পরিবেশনারীতি কেন অনুসৃত হলো? এর উত্তরে বলা যায় মালাধর বসু যে-কালে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করেন, সেকালে গেয়কাব্য ধারায় কৃত্তিবাসের 'রামায়ণে' গৃহীত পাঁচালি-রীতির বিপুল প্রভাব বিদ্যমান। উক্ত রীতি রামায়ণের মতো এক বিশাল মহাকাব্যিক আখ্যায়িকায় প্রযুক্ত হবার ফলে পাঁচালির শক্তি ও রূপ তখনকার দিনে পরিবেশনার ক্ষেত্রে গেয়কাব্যের আদর্শ রূপেই বিবেচিত হলো। মালাধর বসুর পক্ষে তাই জননন্দিত পাঁচালির প্রভাব এড়ানো সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে ভাগবত পুরাণাশ্রয়ী কাব্যের পরিবেশনারীতিতে সংস্কৃত পুরাণের নিয়মই অনুসৃত হবার কথা। অনেকটা সে কারণেই কোনো কোনো কবি, পরবর্তীকালে পাঁচালিরীতি অপেক্ষা কথকতারীতিকেই তাঁদের কাব্যে-উপস্থাপনার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরী যে আদি-রসাত্মক ভাগবতধর্ম প্রচার করেন, তা পূর্বকালের কৃষ্ণধামালি, নাটগীত ও পাঁচালি শ্রেণীর কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের সম্ভোগ চিত্রের পরিপন্থী ছিল না। ভাগবতের আঙ্গিকে কৃষ্ণের বিচিত্র যৌন-সম্ভোগ বর্ণনা সম্ভব বিধায় কোনো কোনো কবি তাঁদের কাব্যে ('হরিবংশ', 'মাধবসঙ্গীত') শুধু রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলাকেই উপজীব্য করেছিলেন। সংস্কৃত পুরাণের কথকতা রীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া সত্ত্বেও দেখা যায়, মধ্যযুগে পুরাণ পাঠের বিশুদ্ধ কথকতারীতি প্রকৃতপক্ষে এ ধারার কোনো কবি অনুসরণ করেন নি।

এর কারণ, পাঁচালির জননন্দিত রূপের মুখোমুখি নিরবলম্ব ব্যাসরীতি শ্রোতাদের আকর্ষণ করার কথা নয়। এজন্য তাঁরা কথকতা ঢঙের কাব্যে পদাবলী-গীতিকা সংযুক্ত করলেন। এসকল কাব্যে পয়ার প্রবন্ধের রীতিতে অধিকতর লীলাচঞ্চল ত্রিপদী ছন্দ। এর ফলে কথকতার সঙ্গে পাঁচালির আঙ্গিকগতভেদও খানিকটা ঘুচে এল এবং তা হয়ে উঠল সুর, ছন্দ ও দিশায়

অধিকতর নাট্যধর্মী। তবে কৃষ্ণমঙ্গল শ্রেণীর কাব্যে কবিরা যে কীর্তনযোগ্য গীতাবলী গ্রহণ করেছিলেন তার কারণ যুগধর্মে অন্বিষ্ট। বৈষ্ণব পদাবলীর অপূর্ব সুর-মূর্ছনায় অন্য সকল শিল্পরীতি (পাঁচালি ব্যতিরেকে) ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে ক্রমেই গৌণ হয়ে উঠেছিল। ভাগবত পুরাণাশ্রয়ী কাব্যে কৃষ্ণভক্তি যেভাবে আখ্যানের ধারায় বাহিত হচ্ছিল পদাবলীর গাঢ়-গীতরস সর্বাংশে তার পরিপূরক রূপে আত্মপ্রকাশ করল। এর ফলে আখ্যান মধ্যে পদাবলী সন্নিবেশ অপরিহার্য রূপেই হলো বিবেচ্য। কথকতারীতি শেষ পর্যন্ত কালের ধারায় আত্মরক্ষা করেছিল চৈতন্যজীবনীমূলক নানা রচনায়।

কথকতারীতির ক্ষেত্রে দিশা, ত্রিপদী ও পদাবলী গ্রন্থণের আরও একটি কারণ বাঙালি কবিদের শিল্প-স্বভাবের মধ্যেই নিহিত। পূর্ববর্তীকালের রামায়ণ-মহাভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায় এদেশের কবিরা দেশকালের নান্দনিক-রুচির প্রেক্ষাপটেই তাঁদের কাব্য রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত কাব্যের রূপরীতি কোথাও বাঙলা কাব্যের রচনা কিংবা পরিবেশনায় প্রকৃত অর্থে সেকালে অনুসৃত হয় নি। কৃষ্ণমঙ্গল শ্রেণীর গেয়কাব্যের ক্ষেত্রেও তাই কবিগণ দেশকালের প্রেক্ষাপটে তাঁদের কাব্যের আঙ্গিক ও উপস্থাপনারীতি সৃজন করেছিলেন। অবশ্য বাঙলায় কথকতারীতি মহাভারত ও ভাগবতাশ্রয়ী কাব্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

কিন্তু এর পাশাপাশি বিচার করলে দেখা যায় যে পাঁচালি ধারা সর্বকালেই বাঙলা পালাভিনয় কিংবা গেয়কাব্যের প্রধান অবলম্বন ছিল। পাঁচালিরীতি, কৃষ্ণমঙ্গলের পালাসহ কৃত্যমূলক মঙ্গলকাব্য ও প্রণয়াখ্যানের ধারায় বাহিত হয়েছিল।

ভাগবত অনুবাদের সংখ্যা-দীনতার কারণ হিসেবে 'প্রথম শ্রেণীর কবি প্রতিভার অভাব' নির্দেশিত হয়েছে।[৬৯] এ সম্পর্কে বলা যায় যে যুগধর্মের প্রভাবেই পুরাণাশ্রিত কথকতামূলক আখ্যান অপেক্ষা চৈতন্যকালে লীলানাটক, জীবনীকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলীর দিকে জনরুচির নব খাত প্রবাহিত হয়। সকল কালেই নবকাল-সম্ভব শিল্পরীতির অভূতপূর্ব প্রাণশক্তির আকর্ষণে ভূতপূর্ব ধারা ক্ষীয়মাণ হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রেও তা ঘটেছিল। কিন্তু কৃষ্ণমঙ্গলকাব্যে প্রথম শ্রেণীর কবি প্রতিভার অভাব ছিল একথা স্বীকার করা যায় না। কারণ তাহলে ভাগবতপুরাণের ধারায় মালাধর বসু ও কবি ভবানন্দের মতো কবিদের কাব্যপ্রতিভা অস্বীকার করতে হয়।

টীকা

১. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব,* ১ম দেজ সং- বৈশাখ ১৪০০ সাল, পৃঃ ৪৯৯।

২. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৫০০।

৩. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে ইতিবৃত্ত* (২য় খণ্ড), ৩য় সং ১৯৮৩, পৃঃ ৭১৮।

৪. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (সম্পাদিত), *বিষ্ণুপুরাণ,* প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ ১৩৯৪, পৃঃ ১৫।

৫. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (সম্পাদিত), *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* (প্রথম খণ্ড), প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯২, পৃঃ ৭।

৬. প্রাগুক্ত- পৃঃ ১।

৭. প্রাগুক্ত- পৃঃ ২।

৮. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৭।

৯. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (২য় খণ্ড), তৃতীয় সং- ১৯৮৩, পৃঃ ৭১৮।

১০. নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ (সম্পাদিত), *শ্রীকৃষ্ণবিজয়,* ১৩৫২ (১৯৪৫ খৃঃ), পৃঃ ১৫-১৯।

১১. 'এই গ্রন্থ অধ্যায় বা পরিচ্ছেদাদিতে বিভক্ত নহে কেবল রাগ রাগিণীর বিভাগে গীত বিভাগ হইয়াছে। সাধারণত একটি রাগের শেষে বা একই রাগের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন আখ্যায়িকার শেষে গ্রন্থকারের ভণিতা আছে; সেই স্থানেই আংশিক বিরাম লক্ষিত হয়'। প্রাগুক্ত -পৃঃ ।৶৹

১২. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৷৷৶৹ —৸৹

১৩. প্রাগুক্ত- পৃঃ ।৵৹

১৪. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (১ম খণ্ড), চতুর্থ সং-১৯৮২, পৃঃ ৬৪৪।

১৫. নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ (সম্পাদিত), *শ্রীকৃষ্ণবিজয়,* ১৩৫২ (১৯৪৫ খৃঃ), পৃঃ ১৫২।

১৬. প্রাগুক্ত- পৃঃ ১৫৩-১৫৭।

১৭. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২য় খণ্ড), ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৩২২।

১৮. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), প্রথম আনন্দ সং ঃ জানুয়ারী-১৯৯১, পৃঃ ৩৭৭।

১৯. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২য় খণ্ড), ১৬ ডিসেম্বর-১৯৮৩।

২০. শ্রী মাধবাচার্য্য, *শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল,* শ্রীনুটুবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলিকাতা-১৩১০, পৃঃ ১।

২১. প্রাগুক্ত- পৃঃ ২।

২২. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৫।
২৩. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৪।
২৪. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৪৯।
২৫. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৫১।
২৬. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৫৩।
২৭. বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে প্রদত্ত ১২ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।
২৮. ঈশানচন্দ্র বসু (সম্পাদিত), *গোবিন্দ মঙ্গল,* দুঃখী শ্যামদাস, ২য় সং- ১৩১৭, পৃঃ ৭১।
২৯. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), প্রথম আনন্দ সং-১৯৯১, পৃঃ ৩৭৯।
৩০. ঈশানচন্দ্র বসু (সম্পাদিত), *গোবিন্দ মঙ্গল,* দুঃখী শ্যামদাস, ২য় সং-১৩১৭, পৃঃ ৯০।
৩১. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৯৫।
৩২. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), প্রথম আনন্দ সং, জানুয়ারী-১৯৯১, পৃঃ ৩৭৯।
৩৩. ঈশানচন্দ্র বসু (সম্পাদিত), *গোবিন্দ মঙ্গল* , দুঃখী শ্যামদাস, ২য় সং ১৩১৭, পৃঃ ৯৪।
৩৪. প্রাগুক্ত- পৃঃ ১৫।
৩৫. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৭৩।
৩৬. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), প্রথম আনন্দ সং-জানুয়ারী-১৯৯১, পৃঃ ৩৮০।
৩৭. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৪০৪ (টীকা-২৬)।
৩৮. পীযূষকান্তি মহাপাত্র (সম্পাদিত), *অভিরাম দাস বিরচিত গোবিন্দবিজয়,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৬৯, পৃঃ ১৯৬।
৩৯. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৮।
৪০. প্রাগুক্ত- পৃঃ ১৯৬।
৪১. প্রাগুক্ত- পৃঃ ১৯৭।
৪২. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৭৩।
৪৩. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৮০ — ৮/০
৪৪. অমিতাভ চৌধুরী (সম্পাদিত), *পরশুরাম রায়ের মাধবসঙ্গীত,* বিশ্বভারতী ১৩৭১, পৃঃ ২৯।
৪৫. প্রাগুক্ত- পৃঃ ২৫০।
৪৬. প্রাগুক্ত- পৃঃ ১৩২-১৩৩।
৪৭. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৫০।
৪৮. প্রাগুক্ত- পৃঃ ২২।
৪৯. প্রাগুক্ত- পৃঃ ১৩৫।
৫০. প্রাগুক্ত- পৃঃ ১৫।

৫১. প্রাগুক্ত- পৃঃ ১৭।
৫২. প্রাগুক্ত- পৃঃ ২০৫।
৫৩. প্রাগুক্ত- পৃঃ ২৬৫।
৫৪. প্রাগুক্ত- পৃঃ ২৬৬।
৫৫. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৬৭।
৫৬. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৭৯।
৫৭. প্রাগুক্ত- পৃঃ ১৩।
৫৮. প্রাগুক্ত- পৃঃ ১২৫।
৫৯. প্রাগুক্ত- পৃঃ ২৯।

৬০, শ্রী সতীশচন্দ্র রায় (সম্পাদিত), *কবি ভবানন্দের হরিবংশ* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্য গ্রন্থমালা। ২ ।।) সন-১৩৩৯, পৃঃ ১।

৬১. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (২য় খণ্ড), প্রথম আনন্দ সং-১লা বৈশাখ-১৩৯৮, পৃঃ ৩৩।

৬২. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য,* ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৩২৭।

৬৩. শ্রী সতীশচন্দ্র রায় (সম্পাদিত), *কবি ভবানন্দের হরিবংশ,* সন-১৩৩৯, পৃঃ

৬৪. প্রাগুক্ত- পৃঃ ১৮।

৬৫. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৮৫।

৬৬. প্রাগুক্ত- পৃঃ ৯৩।

৬৭. প্রাগুক্ত- পৃঃ ২।।.

৬৮. শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের মতে 'কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল সবচেয়ে ছোট কৃষ্ণলীলা-পাঞ্চালী। কবি দানখণ্ড-নৌকা খণ্ডের সম্পর্কে হরিবংশের দোহাই দিয়েছেন। পরবর্তীকালে ভবানন্দ এই নামেই কৃষ্ণলীলা-পাঞ্চালী রচিয়া ছিলেন'। (সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, প্রথম আনন্দ সং জানুয়ারী ১৯৯১, পৃঃ ৩৮৪) তিনি একে বলেছেন 'লৌকিক হরিবংশ' (প্রাগুক্ত- পৃঃ ৪০৫)। কিন্তু ভবানন্দ কোথাও তার কাব্যকে পাঁচালি বলেননি। দেখা যায় সকল পাঁচালি কাব্যের রচয়িতা রচনার কোনো না কোনো অংশে নাচাড়ি, শিকলি ও পাঁচালি (পাঞ্চালী) কথাগুলো উল্লেখ করে থাকেন। 'হরিবংশে' তার কোনটিই দৃষ্ট হয় না। সুকুমার সেন ভবানন্দের কাব্যের সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন কিন্তু সেখানে এর পাঞ্চালী রূপ সম্পর্কে কোন আলোচনা নেই। হরিবংশের কাহিনী কাঠামো সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'একথা ঠিক যে এ কাব্যের কাহিনী যেভাবে পরিকল্পিত তাহা পুরাণেররীতিতে, পুরানো বাঙ্গালা কাব্যের রীতিতে নহে' (সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪)। পুরানো বাঙলার কাব্যরীতি হয় 'নাটগীত' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) অথবা 'পাঁচালি' (কৃত্তিবাসের রামায়ণ)। সুতরাং পুরাণের রীতিতে রচিত বলে হরিবংশের পরিবেশনারীতি হলো 'কথকতা'।

৬৯. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (২য় খণ্ড), ৩য় সং-১৯৮৩, পৃঃ ৭২০-৭২১।

পঞ্চম অধ্যায়

[চৈতন্য-চরিতাখ্যান কাব্যের পরিবেশনারীতি ঃ বৃন্দাবনদাসের 'শ্রী চৈতন্য-ভাগবত', লোচনদাসের 'শ্রী শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'। চরিতাখ্যানসমূহে প্রাপ্ত নাট্য প্রসঙ্গ ও লীলানাট্যের ধারা। বৈষ্ণব রসশাস্ত্র, পদাবলী ও লীলাকীর্তনে নাট্য-উপাদান।]

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাঙালীর ক্ষয়িষ্ণু ও আচারসর্বস্ব ধর্মীয় কৃত্যে এক নতুন সুর যোজনা করেছিল। তাঁর সর্বগ্রাসী কৃষ্ণচেতনা, জীবন ও জগতের মধ্যে যে ঐক্য ও ছন্দ আবিষ্কার করে, তা সনাতন ধ্রুপদী ধর্মচেতনার বিরুদ্ধে এক যুগজয়ী বিদ্রোহ। ফলে প্রাচীন ধারায় বাহিত যে সকল শিল্পরীতি প্রথানুগত্য ও সংস্কারের চিহ্নপাতে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে উঠেছিল, তার স্থলে অভ্যুদয় ঘটল নব নব বিস্ময় ও রীতির। চৈতন্যদেবের ধর্মসাধনার প্রভাবেই বাংলা সাহিত্যে চরিতাখ্যান, লীলানাট্য, বৈষ্ণব পদাবলী ও শাস্ত্র গ্রন্থের এক সুবিস্তৃত ধারার জন্ম হয়।

চৈতন্য-চরিতাখ্যান সমকালীন ভারতীয় সাহিত্যের অভিনব সম্পদ। বাস্তবে একজন যুগন্ধর মানুষের জীবন অবলম্বনপূর্বক কাব্য রচনার কোনো দৃষ্টান্ত এ শ্রেণীর চরিতাখ্যানের পূর্বে ছিল না। হলায়ূধ মিশ্রের 'সেক শুভোদয়া' অবশ্য শেখ জালালুদ্দিন তাবরিজির জীবন-সংক্রান্ত কল্পকথা রূপে বিবেচ্য। কিন্তু তা মূলত সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

চৈতন্য জীবনীর কাব্যরূপের দাবি নব্যকালের পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব হলো না। যে মানুষের উৎসর্গীকৃত জীবন, বঙ্গদেশ থেকে নীলাচল পর্যন্ত সমগ্র জনপদে মধ্যযুগীয় অতিলৌকিক দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হলো, সে জীবনকে নিয়ে নবতর ধারার কাব্য রচিত হবে, তা স্বাভাবিক।

জীবৎকালেই চৈতন্য অবতার রূপে গৃহীত হয়েছিলেন— কখনও পুরুষাবতার, কখনও বা প্রকৃতিস্বরূপা, আবার সমকাল তাঁকে কখনও কখনও প্রত্যক্ষ করেছে পুরুষপ্রকৃতির এককায় অবতার হিসেবে। চৈতন্যচরিতকারের কাছে

তাই চৈতন্য-বন্দনা ঈশ্বর বন্দনারই নামান্তর। সে ক্ষেত্রে রাম ও কৃষ্ণের লীলা নিয়ে রচিত নানা ধরনের কাব্য-কথার সঙ্গে বিশ্বম্ভর-চৈতন্যের অতিলৌকিক সাধনার পরিচয়মূলক কাব্য রচনাকে ভক্ত-রচয়িতাগণ অভিন্ন রূপেই দেখেছিলেন।

এ ধরনের জীবনী কাব্যে সচরাচর ভক্তের আবেগের সঙ্গে সমকালীন জনমানসের দৃষ্টিভঙ্গিও মিশ্রিত হয়ে থাকে। চৈতন্য-চরিতকারগণের রচনায়ও তাই ঘটেছে। কিন্তু তার মধ্যে কতকটা তাঁদের অলক্ষ্যেই যেন সমকালের নানাচিত্র প্রবেশ করেছে। সেই চিত্রে নানা বিষয়ের সঙ্গে নাট্যপ্রসঙ্গও বিদ্যমান। স্বয়ং চৈতন্যদেব নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর অদ্বৈত রামকৃষ্ণ সাধনার পথে লক্ষ্য করি বিচিত্র পুরাণ ও লোককথাকে তিনি নাট্যে এনেছেন। অশ্রু-কম্প-পুলক-হর্ষে কখনও এক হয়ে গেছেন চরিত্রের সঙ্গে। চৈতন্যদেব শুধু যে নাট্যে অভিনয় করেছেন তা নয়, একালের সতর্ক বিচারে দেখা যাবে তিনি সামগ্রিক অর্থে তাঁর অভিনীত নাটকের নির্দেশকও ছিলেন।

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' (১৫৪৫ থেকে ১৫৫৩-৫৫ খ্রীঃ)[১] 'চৈতন্যজীবনী সম্বন্ধে সর্বপ্রাচীন' বাঙ্গালা পুস্তক।[২] এর আদি নাম 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'। লৌকিক মঙ্গল-পাঁচালির অনুসারে প্রদত্ত এ গ্রন্থের প্রথম নামকরণ বৃন্দাবন অঞ্চলের গোস্বামী ও বৈষ্ণবদের মনোযোগ্য হয় নি, সেইজন্য আদি-গ্রন্থনাম পরিবর্তন পূর্বক 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' রাখা হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থে বলেছেন—

ঃ কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস।।
বৃন্দাবন দাস কইল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশ সর্ব্ব অমঙ্গল।।

... ...

চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেহো মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ।।[৩]

বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
তাহাতে চৈতন্যলীলা বর্ণিল সকল।।[৪]

কৃষ্ণদাস কবিরাজের কালে 'শ্রী চৈতন্যভাগবত' 'চৈতন্যমঙ্গল' রূপে পরিচিত ছিল। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র রচনাকাল '১৬১৫ খ্রীঃ' বলে অনুমিত হয়েছে।[৫] তাহলে দেখা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে, গোস্বামীগণের প্রক্ষেপণে 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' 'চৈতন্যভাগবতে' পরিণত হয়। পণ্ডিতদের মতে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' যখন 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' রূপে রচিত হয় সে সময় 'মঙ্গলগ্রন্থেররীতি অনুসারে' তাতে 'বহুগীতযোগ্যপদ সংযোজিত ছিল'। তারপর কাব্যনাম পরিবর্তনকালে গীতসমূহ মূলগ্রন্থ থেকে 'স্বতন্ত্র' বা আলাদা করে দেওয়া হয়।[৬] কাজেই দেখা যাচ্ছে, মূলে বৃন্দাবনদাস পাঁচালি ধারাতেই তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। পরে বৈষ্ণবীয় অতিনৈয়ায়িক সতর্কতার কালে এর মধ্যে কথকতারীতির শাস্ত্রীয় রূপারোপ ঘটে।

অবশ্য এরূপ 'কল্পিত কাহিনীও' রয়েছে যে, লোচনদাসের চরিতাখ্যানের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' হওয়াতে মাতা নারায়ণীর পরামর্শে বৃন্দাবনদাস তাঁর গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করে 'চৈতন্যভাগবত' রাখেন। কিন্তু এ মত কোনো কোনো পণ্ডিত স্বীকার করেন না।[৭]

কৃষ্ণলীন সাধনার প্রারম্ভে ভাগবতাদি পুরাণের নানা প্রসঙ্গ ও চরিত্র শ্রী বিশ্বম্ভরের ভাব সমাধিতে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর পার্ষদগণের মধ্যেও নানা চরিত্রের ভাবানুষঙ্গ স্ফুরিত হতে দেখা যায়। এঁদের মধ্যে আছেন নিত্যানন্দ, মুরারি, অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ।

বৈষ্ণবীয় আবেশজাত রূপান্তরের সঙ্গে, স্পষ্ট ভাবে প্রমাণ না করা গেলেও, চারিত্রাভিনয়ের একটা গভীর মিল অনুভূত হতে পারে। 'মঞ্চে চরিত্র যেমন নটের আত্মস্বীকৃত ক্রিয়ালীলা অবতারবাদেও তাই দেখা যায়।' অবশ্য, ধর্মসাধনার ভক্তিবাদী ও আত্মবিলোপী দর্শন থেকে উদ্ভূত দেবতা চরিত্রের স্বানুভবের সঙ্গে 'চরিত্রাভিনয়ের দর্শনের প্রত্যক্ষ তুলনা উচ্চাভিলাষী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু নানান স্বানুভবরূপ ধারণ, পৌরাণিক কোনো চরিত্রের গল্পে লীন হয়ে সেইমত আচরণকে খানিকটা হলেও অভিনয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কবিকর্ণপুর 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' গ্রন্থে চৈতন্য এবং তাঁর মর্তলীলার সঙ্গীদের পৌরাণিক চরিত্রের অবতার রূপেই প্রত্যক্ষ করেছেন। কৃষ্ণ সেখানে চৈতন্যদেব, কৃষ্ণ সঙ্গী বলরাম-নিত্যানন্দ এবং কৃষ্ণমাতা-যশোদা হচ্ছেন শচীদেবী।[৮]

পুরাণকে নবোদ্ভূত কৃষ্ণতত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করার প্রেরণায় চৈতন্যদেব লীলাভিনয়ের তাগিদ অনুভব করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত মানব মধ্যে দেবতার বিচিত্র শক্তি ও রূপান্তর প্রত্যক্ষ করার ধর্মীয় আবেগ থেকে বৈষ্ণব ধর্ম সম্প্রদায়ে অনিবার্য রূপেই লীলা নাট্যের প্রসার ঘটেছিল।

চৈতন্য ভাগবতে গ্রন্থ পরিকল্পনা অংশে মধ্যখণ্ডের বিষয় সম্পর্কিত বিবরণে বিভিন্ন সময় চৈতন্যদেবের স্বানুভব প্রদর্শনের উল্লেখ লভ্য—

ঃ মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভু বরাহ হইয়া।
নিজতত্ত্ব মুরারিরে কহিল গর্জ্জিয়া।।

এই খণ্ডে আছে 'চতুর্ভুজ' বিষ্ণুর রূপ ধরে চৈতন্যদেব গরুড় বাহনরূপী মুরারির স্কন্ধে আরোহণ করেছিলেন—

ঃ মধ্যখণ্ডে মুরারির স্কন্ধে আরোহণ।
চতুর্ভূজ হৈয়া কৈলা অঙ্গনে ভ্রমণ।।

গ্রন্থ পরিকল্পনার এই অধ্যায়ে আছে চৈতন্যদেবের নাট্যলীলার প্রসঙ্গ—

ঃ ... মধ্যখণ্ডে নানা কাচ হৈলা নারায়ণ।।
মধ্যখণ্ডে রুক্মিণীর বেশে নারায়ণ।
নাচিলেন স্তনপিল সব ভক্তগণ।।[৯]

এতদ্ব্যতীত 'চৈতন্যভাগবতে'র বহুস্থলে, জলে নাট্যভিনয়, অভিনয়মূলক যুদ্ধ ও জলকেলির প্রসঙ্গ লভ্য।

বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দ-পন্থী বৈষ্ণব। 'চৈতন্যভাগবতে' সঙ্গত কারণে চৈতন্য পরিকরগণের মধ্যে স্বীয় গুরু নিত্যানন্দকেই তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণাবতার রূপে গণ্য করতেন, বৃন্দাবনদাসও তাই চৈতন্যদেবের পরম পুরুষাবতার রূপকে নানা দৃষ্টান্ত ও যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'চৈতন্যভাগবতে'র ষষ্ঠ অধ্যায়ে নিত্যানন্দের চৈতন্যজন্ম আবাহন ও সুবিস্তৃত নাট্যলীলার প্রসঙ্গ আছে। চৈতন্যদেবের জন্মকালে চন্দ্রগ্রাস সংগঠিত হয়, 'বলরাম-অবতার' নিত্যানন্দ 'এক অতি লৌকিক হুঙ্কারে আবাহন করেছিলেন এই মহাজন্মকে'—

ঃ যে দিনে জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র।
রাঢ়ে থাকি হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ।।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি হইল হুঙ্কার।
মূর্ছিত হইল যেন সকল সংসার।।
কত লোক বলিলেক হৈল বজ্রপাত।
কত লোক মানিলেক পরম উৎপাত।।
কত লোক বলিলেক জানিল কারণ।
মৌড়েশ্বর গোসাঞির হইল গর্জন।।

কিশোর নিত্যানন্দের নাট্যলীলার সঙ্গী সমবয়সী শিশু-কিশোর। জন্ম থেকেই তিনি কৃষ্ণে নিবেদিত প্রাণ, লীলাভিনয়ের ছলে নিত্য কৃষ্ণপূজা করে থাকেন। নিত্যানন্দ নির্দেশিত লীলাভিনয়, ভাগবত পুরাণের নানা অনুপুঙ্খ উপস্থাপনা। তাতে যেমন মহড়া নির্দেশনা, রূপসজ্জা, মঞ্চ, মঞ্চসজ্জা, পোশাকের প্রসঙ্গ বিদ্যমান তেমনি আছে চরিত্রগত আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিকাভিনয়ের ইঙ্গিত।

বালক নিত্যানন্দ কৃষ্ণ-পিপাসু। তাঁর নিত্য ক্রীড়ায় 'শ্রীকৃষ্ণের কার্য বিনা', অন্য কিছু স্ফুরিত হয় না। কৃষ্ণলীলা নাট্যের প্রারম্ভে দেখা যায় নিত্যানন্দ 'পৃথ্বী'রূপ সৃজন করছেন। তা লীলানাট্যের মঞ্চ উপকরণ রূপে গ্রাহ্য হতে পারে—

ঃ দেব সভা করেন মিলিয়া শিশুগণ।
পৃথিবীর রূপ কেহ করে নিবেদন।।
তবে পৃথ্বী লঞা সবে নদী তীরে যায়।
শিশুগণ মেলি স্তুতি করে উর্ধ্ব রায়।।

আগেই বলা হয়েছে নিত্যানন্দ ও তাঁর বালক সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত কৃষ্ণ বিষয়ক নাট্য ভাগবত আশ্রয়ী। এর প্রারম্ভে আছে কৃষ্ণজন্ম প্রসঙ্গ। বালককুল কর্তৃক নিশাভাগে বসুদেব-দৈবকীর বিবাহ প্রদান পূর্বক কারাগারে অর্থাৎ, 'বন্দিঘরে' কৃষ্ণজন্মের অভিনয় প্রদর্শিত হতো—

ঃ কোনদিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া।
বসুদেব-দেবকীর করায়েন বিয়া।।
বন্দিঘর করিয়া অত্যন্ত নিশাভাগে।
কৃষ্ণ জন্ম করায়েন কেহ নাহি জাগে।।
গোকুল সৃজিয়া তথি আনেন কৃষ্ণেরে।
মহামায়া দিলা লঞা ভাঙিলা কংসেরে।।

পুরাণ দৃষ্টে বলা যায়, নিশিকালে কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল, কাজেই নিত্যানন্দ নির্দেশিত অভিনয়ও নৈশকালে প্রদর্শিত। এখানে লক্ষণীয় যে গোকুল সৃজন করেই অর্থাৎ মূলে ভাগবত পুরাণে বর্ণিত পরিবেশ সাজিয়ে এই লীলানাট্যের পরিবেশনা। এখানে উল্লেখ্য 'কৃষ্ণ-জন্ম করায়েন' কথাটা। এর যৌক্তিক অর্থ হলো কৃষ্ণজন্মের অভিনয় করানো অর্থাৎ নিত্যানন্দের নির্দেশে বালকরা কংসের 'বন্দিঘর' সাজিয়ে সেখানে তা অভিনয় করে দেখাচ্ছে। বালক সম্প্রদায় দ্বারা এ ধরনের অভিনয় কষ্টকল্প মনে করার হেতু নেই কারণ এ-কালেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বালক সম্প্রদায় কৃত্য রূপে ভাগবত পুরাণের নানা অংশ নৃত্যগীত সহকারে শাস্ত্রসম্মত ভাবে অভিনয় করে থাকে। উদ্ধৃত পদ দৃষ্টে বলা যায়, যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করে সময়ের হিসাব অনুসারে সেকালে কৃষ্ণ বিষয়ক লীলা নাট্যের কোনো কোনো অংশ পরিবেশিত হতো।

নিত্যানন্দের নির্দেশিত লীলানাট্যে চরিত্র ভিত্তিক রূপসজ্জা গ্রহণের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে—

ঃ কোন শিশু সাজায়েন পুতনার রূপে।
কেহ স্তন পান করে উঠে তার বুকে।।
কোন দিন শিশু সঙ্গে নল-খড়ি দিয়া।
শকট গড়িয়া তাহা পেলেন ভাঙ্গিয়া।।

নিত্যনন্দের নাট্যলীলা শিশু সুলভ ক্রীড়ামাত্র নয়, কারণ তার অনুপুঙ্খ উপস্থাপনা, রস ও ভাব সৃজন ক্ষমতা সকল শ্রেণীর দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে—

ঃ সবে বলে নাহি দেখি হেনমত খেলা।
কেমতে জানিল শিশু এত কৃষ্ণলীলা।।

লীলানাট্যের কোনো কোনো অংশ জলে অভিনীত হতো এবং তাতে অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণই বিদ্যমান থাকত—

ঃ কোনদিন পত্রের গড়িয়া নাগগণ।
জলে যায় লইয়া সংহতি শিশুগণ।।
ঝাঁপ দিয়া পড়ে কেহ অচেষ্ট হইয়া।
চৈতন্য করায় পাছে আপনি আসিয়া।।
কোনদিন তালবনে শিশু সঙ্গে গিয়া।

শিশু সঙ্গে তাল খায় ধেনুকে মারিয়া।।
শিশু সঙ্গে গোষ্ঠে গিয়া নানা ক্রীড়া করে।
বক অঘ বৎস করিয়া তাহা মারে।।
বিকালে আইসে ঘর গোষ্ঠীর সহিতে।
শিশুগণ দল শৃঙ্গ বাইতে বাইতে।।
কোনদিন করে গোবর্দ্ধনধর লীলা।
বৃন্দাবন রচি কোন দিন করে খেলা।।
কোনদিন করে গোপীর বসন হরণ।
কোনদিন করে যজ্ঞ পত্নী দরশন।।

উদ্ধৃতাংশ দৃষ্টে বলা যায়, কালিয়দমনের অংশ বিশেষ জলে অভিনীত হতো। জলমধ্যে এ ধরনের অভিনয় 'জলনাটক' নামে আখ্যায়িত হতে পারে। জল নাটকের অভিনয় রামলীলার ক্ষেত্রেও বিদ্যমান ছিল।

সে-কালে চরিত্রাভিনয়মূলক নাট্যের প্রচলন ছিল। বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্রে রূপসজ্জা গ্রহণের বিবরণ 'চৈতন্যভাগবতে'ই আছে। নিত্যানন্দ নির্দেশিত লীলানাট্যে বালকগণের রূপ সজ্জার বিস্তৃত বিবরণ লভ্য—

ঃ কোনো শিশু নারদ কাছয়ে দাড়ি নিয়া।
কংস স্থানে মন্ত্র কহে নিভৃতে বসিয়া।।
কোনদিন কোন শিশু অক্রুরের বেশে।
লৈয়া যায় রামকৃষ্ণ কংসের আদেশে।।[১০]

'কাছয়ে' 'বেশে' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ থেকে দেখা যায়, সেকালে রূপসজ্জা গ্রহণের নাট্য পরিভাষারূপে এ ধরনের শব্দ প্রচলিত ছিল। চরিত্রের রূপসজ্জায় 'দাড়ি'র ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে মধ্যযুগের বাঙলা লীলানাট্যের আয়োজনে ক্ষেত্র বিশেষে যথাযথ পরিবেশ রচনা করা হতো। কালিয়দমনে'র ক্ষেত্রে দেখা যায়, নাট্যের কিছু অংশ জলে অভিনীত হচ্ছে। নিচের উদ্ধৃত পদ দৃষ্টে ও এ মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়—

ঃ মধুপুরী রচিয়া ভ্রমেণ শিশুগণ সঙ্গে
কেহ হয় মালী কেহ মালা পরে রঙ্গে।।

লীলানাট্যের ক্ষেত্রে চরিত্রভিত্তিক রূপসজ্জার কথা পূর্বে বিবৃত হয়েছে, নিত্যানন্দের কৃষ্ণলীলানাট্যের মথুরা পর্বেও এর উল্লেখ লভ্য। এস্থলে কেউ 'মালী' হয় কেউবা সে 'মালীর' তৈরি 'মালা' পরিধান করে—

ঃ কুব্জা বেশ করি গন্ধ পরে কারো স্থানে।
ধনুক করিয়া ভাঙ্গে করিয়া গর্জ্জনে।।
কুবলয় চানুর মুষ্টিকে মল্ল মারি।
কংস করি কাহারো পাড়য়ে চুলে ধরি।।
কংস বধ করিয়া নাচয়ে শিশু সঙ্গে।
সর্ব্বলোক দেখি হাসে বালকের রঙ্গে।।
এই মত যতযত অবতার লীলা।
সব অনুকরণ করিয়া করে খেলা।।

এ স্থলে 'সর্বলোক' হলো দর্শক। 'রঙ্গ'-এর একটি সাধারণ অর্থ 'কৌতুক' কিন্তু এখানে এ হচ্ছে পূজাভিনয়। তা সর্বাংশে কৃষ্ণপ্রীতির কৃত্য সুতরাং উদ্ধৃত পদে 'রঙ্গ' কথাটি পূর্ণাঙ্গরূপে 'অভিনয়' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্ধৃত পদের শেষে আছে 'সব অনুকরণ করিয়া করে খেলা'। এখানে 'অনুকরণ' কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাঙলা নাট্যাভিনয় পাশ্চাত্যের অনুকরণাত্মক রীতি থেকে ভিন্ন এ কথা পূর্বে উক্ত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগে অভিনয় সংক্রান্ত নানান উল্লেখে আর কোথাও 'অনুকরণ' কথাটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। চৈতন্য-ভাগবতে এই অভিনয়জ্ঞাপক শব্দটি গবেষকের দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

বাঙলা লীলানট্যের ক্ষেত্রে, গায়েন দোহার এখনও স্বতন্ত্র চরিত্রাভিনয়ের সঙ্গে অবিভাজ্যরূপে বিবেচ্য। বৃন্দাবনদাসের কালেও এ শ্রেণীর নাট্যে গায়েন দোহার যে ছিল না তা নয়। এখানে উল্লেখ্য হচ্ছে, চরিত্রাভিনয়কে নৈয়ায়িক বিচারে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হতো। দেখা যাচ্ছে, সে ক্ষেত্রে তা অনুকরণাত্মক শিল্প রূপেই সেকালে গণ্য ছিল। মধ্যযুগের বাঙলা নাটক নৃত্য, সঙ্গীত ও অভিনয়ের ত্রি-সঙ্গমজাত শিল্পরীতি। কাজেই, বাঙলা নাটকের রূপ ও রীতি বিচারে 'অনুকরণ' কথাটি পাশ্চাত্য অথবা সংস্কৃত নন্দনতত্ত্বের আলোকে একান্তভাবে বিচার্য সে-কথা স্বীকার করা যায় না। বৃন্দাবন দাস কথিত 'সব অনুকরণ' বাঙলা নাট্যরীতির বিচিত্রতর রীতির সীমাতেই বিবেচ্য। অনস্বীকার্য যে,

এই 'অনুকরণ' শুধু শিল্প ভাবনা সম্ভূত নয়, তা পুরাণনিষ্ঠ অনুসৃতিকেও নির্দেশ করে।

অভিনয় প্রসঙ্গে 'কোনদিন' কথাটা পৌনপুনিকভাবে পদমধ্যে আবর্তিত হয়েছে, সুতরাং অনুমান করা যায়, নিত্যানন্দ নির্দেশিত কৃষ্ণবিষয়ক লীলানাট্য পালাভিত্তিক ছিল। একালেও পালাভিত্তিক কৃষ্ণলীলা দেখা যায়।

এরপর 'চৈতন্যভাগবতে' রাম বিষয়ক লীলানাট্যের প্রসঙ্গ লভ্য। নিত্যানন্দ এ নাট্যের নির্দেশক এবং অভিনেতা—

কোনদিন নিত্যানন্দ হইয়া বামন।
বলিরাজা করি চলে তাহার ভবন।।
বৃদ্ধকাছে শুক্ররূপে কেহ মানা করে।
ভিক্ষা লই শেষে প্রভু চড়ে বলি শিরে।।
কোনদিন নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ করে।
বানরের রূপ সব শিশুগণ ধরে।।

এখানেও দেখা যায়, চরিত্রানুগ রূপসজ্জা গ্রহণের উল্লেখ। রাম বিষয়ক লীলা নাট্যে একালেও 'বানরে'র সাজে অভিনেতা মঞ্চে (বিশেষত চৈত্র সংক্রান্তির রামলীলায় গৃহস্থবাড়ির অঙ্গনে) অবতীর্ণ হয়ে থাকে।

রামলীলা নাট্যের কোনো কোনো অংশ জলে অভিনীত হতো—

কোনদিন নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ করে।
বানরের রূপ সব শিশুগণ ধরে।।
ভেরাণ্ডার গাছ কাটি পেলায়েন জলে।
শিশুগণ মেলি জয় রঘুনাথ বলে।।[১১]

পূর্বে গাঙে-সরোবরে অভিনীত নাটককে আমরা 'জলনাটক' নামে আখ্যায়িত করেছি। এ ধরনের পরিবেশ নির্ভর নাট্যকে 'জলনাট্য' (জলে অভিনীত নাটক অর্থে) রূপেও অভিহিত করা চলে।[১২]

'রামায়ণে' বানর সৈন্যগণের সেতুবন্ধ রচনার অনুকরণে শিলার পরিবর্তে এখানে 'ভেরেণ্ডার গাছ' ব্যবহৃত হয়েছে। এক একদিন রামলীলার একএকটি পালার অভিনয় প্রসঙ্গও এতে লভ্য।

নিত্যানন্দ স্বয়ং শ্রী লক্ষ্মণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। ভূমিকায় উচ্চারিত সংলাপের ধরনটা বৃন্দাবনদাস উদ্ধৃত করেছেন তাঁর 'চৈতন্যভাগবতে'—

ভেরাণ্ডার গাছ কাটি পেলায়েঁন জলে।
শিশুগণ মেলি জয় রঘুনাথ বলে।।
শ্রীলক্ষ্মণ রূপ প্রভু ধরিয়া আপনে।
ধনু ধরি কোপে চলে সুগ্রীবের স্থানে।।
আরে রে বানরা মোর প্রভু পায় দুঃখ।
নারীগণ লইয়া বেটা তুমি কর সুখ।।
কোনদিন ক্রুদ্ধ হই পরশুরামেরে।
মোর দোষ নাহি বিপ্র পলাহ সত্বরে।।
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু হয় সেই রূপ।
বুঝিতে না পারে শিশু মানয়ে কৌতুক।।
পঞ্চ বানরের রূপে বুলে শিশুগণ।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসয়ে প্রভু হইয়া লক্ষ্মণ।।
কে তোরা বানর সব বুল এই বনে।
আমি রঘুনাথ ভৃত্য বল মোর স্থানে।।
তারা বোলে আমরা বালির ভয়ে বুলি।
দেখাও শ্রীরামচন্দ্র লই পদধূলি।।
তা সবারে সঙ্গে করি আইলা লইয়া।
শ্রী রামচরণে পড়ে দণ্ডবত হৈয়া।।

সেকালে রাম লীলানাট্যে ইন্দ্রজিৎ বধের পালাও অভিনীত হতো। এতে রাবণ ও বিভীষণের চরিত্র থাকতো—

ইন্দ্রজিৎ বধ লীলা কোন দিন করে।
কোনদিন আপনে লক্ষ্মণভাবে হারে।।
বিভীষণ করিয়া আনেন রাম স্থানে।
লঙ্কেশ্বর অভিষেক করেন তাহানে।।
কোন শিশু বলে এই আইনু রাবণ।
শক্তিশেল হানি এই সম্বর লক্ষ্মণ।।

উদ্ধৃত পদ দৃষ্টে অনুমান করা যায় যে, মঞ্চে হস্তবাহিত দ্রব্য সম্ভারও ব্যবহৃত হতো। নিত্যানন্দ নির্দেশিত ও অভিনীত লীলানাট্যে সাত্ত্বিক অভিনয়ের প্রমাণ লভ্য—

এত বলি পদ্ম পুষ্প মারিল পেলিয়া।
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু পড়িল ঢলিয়া।।
মূর্ছিত হইয়া প্রভু লক্ষ্মণের ভাবে।
জাগায়েন শিশুসব তবু নাহি জাগে।।
পরমার্থে ধাতু নাহি সকল শরীরে।।
কান্দয়ে সকল শিশু হাত দিয়া শিরে।।
শুনি পিতা মাতা ধাই আইল সত্বরে।
দেখয়ে পুত্রের ধাতু নাহিক শরীরে।।
মূর্ছিত হইয়া দোঁহে পড়িলা ভূমিত।
দেখি সর্বলোক আসিল বিস্মিত।।
সকল বৃত্তান্ত কহিলেন শিশুগণ।
কেহ্ কেহ্ বুলিলেন ভাবের কারণ।।
পূর্বে দশরথভাবে এক নট বর।
রাম বনবাসী শুনি ত্যজে কলেবর।।

'সেক শুভোদয়া' গ্রন্থে এই নটের নাম 'গাঙ্গোনট' রূপে উল্লেখিত হয়েছে। বিদ্যাপতির 'পুরুষ পরীক্ষা'য় 'গন্ধর্ব' 'উত্তর রামচরিতে'র অভিনেতা—লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় এক আবেগদীপ্ত অভিনয়ে গন্ধর্ব ভাবাবেশ বশত প্রাণ ত্যাগ করে বলে উল্লেখিত হয়েছে। সম্ভবত 'গাঙ্গোনটের' উপাধি ছিল 'গন্ধর্ব'।

'চৈতন্যভাগবতে', 'দশরথ ভাবে' অর্থাৎ দশরথের প্রসঙ্গ অভিনয়কালে ভাবাবিষ্টতায় নিমগ্ন যে-নটের মৃত্যুমুখে পতিত হবার ঘটনা ব্যক্ত হয়েছে, তা লোকশ্রুত সত্যমূলক কাহিনী সন্দেহ নেই।

নিত্যানন্দের জ্ঞানহীন অবস্থা প্রত্যক্ষপূর্বক দর্শকের উৎকণ্ঠা শেষ অবধি নাট্য কৌতূহলে পরিণত হয়। কারণ, নির্দেশনা কালে সহ অভিনেতাদের এই কথা শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি মূর্চ্ছাহত হলে নাট্যাভিনয়ের অংশরূপে

সহচরিত্রাভিনেতাদের করণীয় কি। নিত্যানন্দের এই 'কাছ' (কাচ) বা রূপসজ্জা ও অভিনয় নিখুঁত সেজন্য তা উপস্থিত দর্শকদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিল—

কেহ বলে কাছ কাছিয়াছে যে ছাওয়াল।
হনুমান ঔষধি দিলে হইবেক ভাল।।
পূর্ব্বে প্রভু শিখাইয়াছিলেন সবারে।
পড়িলে তোমার বেড়ি কান্দিহ আমারে।।
ক্ষণেক বিলম্বে পাঠাইয়া হনুমান।
নাকে দিলে ঔষধি আসিবে মোর প্রাণ।।
নিজভাবে প্রভু মাত্র হৈলা অচেতন।
দেখি বড় বিকল হইল শিশুগণ।।
ছন্ন হইলেন সবে শিক্ষা নাহি স্ফুরে
উঠ ভাই বলি মাত্র কান্দে উচ্চৈস্বরে।।
লোকমুখে শুনি কথা হইল স্মরণ।
হনুমান কাছে শিশু চলিল তখন।।
আর এক শিশু পথে তপস্বীর বেশে।
ফলমূল দিয়া হনুমানেরে অ্যাশংসে (আশংসে)।।
রহবাপ ধন্য কর আমার আশ্রম।
বড় ভাগ্যে আসি মিলে তোমা হেন জন।।
হনুমান বলে কার্য গৌরবে চলিব।
আসিবারে চাহি রহিবারে না পারিব।।
শুনিয়াছ রামচন্দ্র-অনুজ লক্ষ্মণ।
শক্তিশেলে তাঁরে মূর্চ্ছা করিল রাবণ।।
অতএব যাব আমি গন্ধমাদন।
ঔষধি আনিরে রহে তাহার জীবন।।
তপস্বী বলয়ে যদি যাইবা নিশ্চয়।
স্নান করি কিছু খাই করহ বিজয়।।
নিত্যানন্দ শিক্ষাতে বালক কথা কয়।
বিস্মিত হইয়া সর্বলোকে রহি যায়।।

মূলে এ কাহিনী রামায়ণের। তা সত্ত্বেও ধারণা করা যায়, এর লীলানাট্যরূপ সেকালের রাম-পাঁচালির ধারা থেকে গৃহীত। কৃত্তিবাসের পূর্বকালে রাম-পাঁচালি ও ভারত-পাঁচালি প্রচলিত ছিল। তবে এর লীলানাট্যরূপের কথা 'চৈতন্যভাগবতে'র পূর্বে অন্য কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' প্রাপ্ত রাম বিষয়ক নাট্য প্রসঙ্গ থেকে অনুধাবন করা যায় যে তা লোকজ লীলানাট্যের গোত্রভুক্ত নয়। লীলানাট্যের জন্ম প্রাকৃত জীবনে কৃত্যের শিল্পরূপ সৃষ্টির প্রবণতা থেকে।

উদ্ধৃত পদ দৃষ্টে বলা যায়, শক্তিশেল পর্বে লক্ষ্মণের মূর্ছা হনুমান কর্তৃক 'বিশল্যকরণী' আনয়ন ও লক্ষ্মণের মূর্ছাভঙ্গ পর্যন্ত এই লীলানাট্যের অভিনয় সম্পন্ন হয়েছিল। পূর্বেই বিবৃত হয়েছে যে, যথাযথ পরিবেশ সৃজনপূর্বক এই বিশেষ শ্রেণীর লীলানাট্য সেকালে পরিবেশিত হতো। এই নাট্য পুরো গ্রামের বর্ত্মে, স্থলে ও জলে অভিনেয়। দেখা যাচ্ছে পথপার্শ্বে নাট্যের একটি অংশে তপস্বীর রূপসজ্জায় গন্ধমাদনগামী হনুমানকে ফলমূল নিবেদন করছে। হনুমান রামভক্ত, সুতরাং সে তপস্বীরও প্রিয়, সেজন্যে সে তাকে আশ্রমে অবস্থানের নিমিত্ত আহ্বান জানায়। হনুমানকে স্নানপূর্বক আহারাদি অন্তে গন্ধমাদনে যেতে অনুরোধ করে। হনুমান স্নানের নিমিত্তে সরোবরে গেল। এবার শুরু হলো নাটকের জল পর্ব। সেখানে জলমধ্যে পূর্ব থেকেই রাক্ষস ও কুম্ভীররূপী অভিনেতারা অপেক্ষা করছিল। হনুমানের সঙ্গে তাদের কৃত্রিম যুদ্ধের শুরু হল। হনুমান প্রবেশ করল গন্ধমাদনে—

তপস্বীর বোলে সরোবরে গেলা স্নানে।
কুম্ভীরের বেশ শিশু ধরে ততক্ষণে।।
অগাধ জলেতে যায় চরণ ধরিয়া।
হনুমান শিশু তোলে কুম্ভীর টানিয়া।।
কতক্ষণ যুদ্ধ করি জিনিয়া কুম্ভীর।
আসি দেখে হনুমান আর মহাবীর।।
আর এক শিশু ধরি রাক্ষসের কাছ।
হনুমানে খাইবারে যায় তার পাছ।।
কুম্ভীর জিনিলে মোরে জিনিবা কেমনে।
তোমা খাই এবে কেবা জীয়াবে লক্ষ্মণে।।
হনুমান বলে তোর রাবণ কুক্কুর।

তারে নাহি বস্তুজ্ঞান তুই পাপী দূর।।
এইমত দুইজনে হয় গালাগালি।
শেষে হয় চুলাচুলি তবে কিলাকিলি।।
কতক্ষণে সে কৌতুকে জিনিয়া রাক্ষসে।
গন্ধমাদনে আসি হইলা প্রবেশে।।

এখানে স্পষ্টভাবে কুমির ও রাক্ষসের রূপসজ্জা এবং 'কাছ' (কাচ) এর প্রসঙ্গ আছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মধ্যযুগে পরিবেশ নির্ভর পুরাণ প্রসূত নাট্য অনুপুঙ্খ আয়োজন ও পরিবেশনার নানা স্তর ও পারম্পর্য দ্বারা সমৃদ্ধতর রূপ লাভ করত। এই অভিনয়ে নিঃসন্দেহে শারীরিক কসরত প্রদর্শিত হতো। বৃন্দাবন দাস সেই ইঙ্গিত স্থাপন করেছেন তাঁর বর্ণনায়। এতে দু'ধরনের কসরতের উল্লেখ আছে, কুমির হনুমানের দ্বৈতযুদ্ধ, রাক্ষস হনুমানের মল্লযুদ্ধ (শেষে হয় চুলাচুলি তবে কিলাকিলি)। 'চুলাচুলি' এখানে মল্লযুদ্ধ এবং 'কিলাকিলি' মুষ্টিযুদ্ধের অভিনয়।

হনুমান বা 'কুম্ভীরে'র রূপ ধারণের বিষয়টিও মধ্যযুগের বাঙলা নাট্যে অসম্ভবকল্প নয়। মধ্যযুগের অন্যবিধ নাট্য 'ডক্কে'ও মূল অভিনেতা নাগরাজের রূপসজ্জা গ্রহণ করত বলে অনুমিত হয়েছে।

অন্যদিকে এই পরিবেশ নির্ভর লীলানাট্যে মঞ্চোপকরণের সংস্থান ছিল। ইতোপূর্বে সেতুবন্ধের অনুকরণে ভেরেণ্ডার গাছ সঙ্কমরূপে ব্যবহৃত হবার উল্লেখ পাওয়া গেছে, এখানে আছে, অভিনেতা কর্তৃক 'গন্ধমাদন' পর্বত বহনের ইঙ্গিত। মস্তকে পর্বতন্যাস নিতান্ত ইঙ্গিতাভিনয় অথবা গন্ধমাদনের অনুকরণে সৃষ্ট কোন বহনযোগ্য পর্বত প্রদর্শন কিনা সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা জাগ্রত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে শেষোক্ত বিষয়টিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য, অর্থাৎ দৃশ্যগত ভাবে বস্তুরূপে গন্ধমাদন পর্বতই অভিনেতারূপী বালক-হনুমান বহন করে এনেছিল। এর পক্ষে যুক্তি স্বরূপ বলা যায়, সেতুবন্ধ থেকে বিভিন্ন জটিল প্রসঙ্গ যথাযথ রূপেই পালিত হয়েছিল আলোচ্য রামবিষয়ক লীলানাট্যে। কাজেই তাতে বহনযোগ্য 'গন্ধমাদনে'র উপস্থিতি যুক্তিযুক্ত। গন্ধমাদন পর্বত উৎপাটিত করার পূর্বে আর একদল গন্ধর্বরূপী বালকাভিনেতার সঙ্গে হনুমানের যুদ্ধ হয়েছিল। এ বিষয়ে বৃন্দাবনদাসের সাক্ষ্য নিম্নরূপ—

এহি গন্ধর্বের বেশ ধরি শিশুগণ।
তা সবার সঙ্গে যুদ্ধ হয়ে কতক্ষণ।।

কৌতুকে গন্ধর্বজিনি থাকে কতক্ষণ।
শিরে করি আইলেন গন্ধমাদন।।
আর এক শিশু এহি বৈদ্যরূপ ধরি।
ঔষধ দিলেন নাকে শ্রীরাম সঙরি।।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু উঠিলা তখনে।।
দেখি পিতামাতা লোক হাসে সর্বজনে।।

এই 'রামলীলা' কৃষ্ণলীলারই নামান্তর মাত্র। কারণ বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের সামগ্রিক নাট্য প্রয়াসকে 'কৃষ্ণলীলা' নামেই অভিহিত করেছেন—

এইমতে ক্রীড়া করে নিত্যানন্দ রায়।
শিশু হৈতে কৃষ্ণলীলা বহি নাহি ভায়।।[১৩]

রামলীলার উক্ত পালার অভিনয় সারা গ্রামব্যাপী অনুষ্ঠেয় ছিল মধ্যযুগে। বৃন্দাবনদাস দৃষ্টে এর অভিনয় স্থল ছিল এরূপ—

ক) নাট্যাভিনয়ের জন্য প্রথমে স্থল ভাগের একটি অংশ নির্ধারিত হতো। পালা অনুসারে এ স্থলে রাবণ ও রাম লক্ষ্মণের যুদ্ধ ও শক্তিশেলে হতপ্রায় লক্ষ্মণ প্রসঙ্গ।

খ) এরপর মূল অভিনয় স্থল থেকে গ্রামের পথে হনুমানের যাত্রা। সেখানে তপস্বীর গৃহ।

গ) তপস্বীর গৃহ থেকে সরোবরে স্নান, যুদ্ধ এবং যুদ্ধ শেষে আহার গ্রহণ।

ঘ) তৎপর, কৃত্রিম কোন পাহাড় কিংবা নৈসর্গিকভাবে বিদ্যমান কোন উচ্চস্থান কিংবা সরোবরের পাড়, যেখানে গন্ধর্ববেশী বালকদের অবস্থান। সেখানে পুনরায় যুদ্ধাভিনয় এবং গন্ধমাদন পর্বত উৎপাটন পূর্বক তা বহন করে হনুমান কর্তৃক মূর্ছাহত লক্ষ্মণের কাছে আনয়ন। লক্ষ্মণের মূর্ছা ভঙ্গ।

অভিনয়স্থল পৃথকভাবে নির্ধারিত হওয়ায় ধারণা করা যায়, নাট্যস্থল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকও স্থান পরিবর্তন পূর্বক অভিনেতাদের সহযাত্রী হতো।

'চৈতন্যভাগবতে' এর পরে উল্লেখ্য 'ডঙ্কনৃত্য' অর্থাৎ ডঙ্কনাট্যের প্রসঙ্গ।

চৈতন্যদেবের 'মহামুখ্য অনুচরে'র প্রসঙ্গে এই নাট্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। হরিদাস এক কাজী দ্বারা প্রহৃত হন—

ঃ সবে এক কাজী পাপী মুলুক পতিরে।
বলিতে লাগিলা শাস্তি করহ উহারে।।

এই দুষ্ট আর দুষ্ট করিবে অনেক।
যবন-কুলের অমহিমা আনিবেক।।
এতেক ইহার শাস্তি কর ভালমতে।
নহেবা আপন শাস্ত্র বলুক মুখেতে।।

এরপর শুরু হল অত্যাচার—

পাপীর বচনে সেহ্ পাপী আজ্ঞা দিল।
দুষ্টগণ আসি হরিদাসেরে ধরিল।।
বাজারে বাজারে সব বেড়ি দুষ্টগণে।
মারেন নির্জীব করি মহাক্রোধমনে।।[১৪]

কিন্তু সর্বপীড়নজয়ী কৃষ্ণভক্ত হরিদাসের তাতে কিছুই হয় না। শেষে সকল 'যবন' বিস্মিত হয়ে ভাবে, 'মনুষ্যের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে?'। অবশেষে হরিদাসের অধ্যাত্মশক্তিতে শ্রদ্ধাবনত হয়ে মুলুকপতি তাকে মুক্ত করেদেন। তাঁর নির্দেশে হরিদাস চলে যায় গঙ্গাতীরের 'নির্জন গোফায়'। সেই গোফায় গোপনে বাস করত এক মহানাগ। হরিদাস দর্শনে আগত ভক্তবৃন্দ প্রায়শই সে মহানাগের বিষ-নিশ্বাসে আক্রান্ত হতো—

মহানাগ বৈসে সেই গোফার ভিতরে।
তার জ্বালা প্রাণীমাত্র সহিতে না পারে।।
হরিদাস ঠাকুরের সম্ভাষ করিতে।
যতেক আইসে কেহ না পারে রহিতে।।
পরম বিষের জ্বালা সবাই পায়েন।
হরিদাস পুনঃ ইহা কিছু না জানেন।।

সবাই যুক্তিতে বসে, উদ্দেশ্য অভ্যাগতদের শরীরে বিষক্রিয়ার কারণ নির্ণয়—

বসিয়া করেন যুক্তি সর্ব বিপ্রগণে।
হরিদাস আশ্রমে এতেক জ্বালা কেনে।।
সেই ফুলিয়ায় বৈসে মহা বৈদ্যগণ।
তারা আসি জানিলেক সর্পের কারণ।।
বৈদ্য বলিলেক এই গোফার তলায়।
এক মহানাগ আছে তাহার জ্বালায়।।
রহিতে না পারে কেহ বলিল নিশ্চয়।

বৈদ্যগণ হরিদাসকে 'গোফা' ছেড়ে 'অন্যাশ্রয়ে' যাবার উপদেশ দিল-কিন্তু হরিদাস বললেন, তিনি কখনই বিষজর্জরিত হননি—

হরিদাস সত্বরে চলহ অন্যাশ্রয়ে।।
সর্পের সহিত বাস কভু যুক্তি নয়।
অন্য স্থানে তুমি আসি করহ আশ্রয়।।
হরিদাস বলেন অনেক দিন আছি।
কোন জ্বালারিষ্ট এ গোফায় নাহি বাসি।।

তবু সকলের অনুরোধে 'গোফা' ছাড়তে সম্মত হলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, পরের দিন যদি মহাসর্প 'গোফা' পরিত্যাগ না করে তবে হরিদাস নিজেই আশ্রমস্থান পরিত্যাগ করবেন—

সবে দুঃখ তোমরা যে না পার সহিতে।
এতেকে চলিব কালি আমি যে সে ভিতে।।
সত্য যদি ইহাতে থাকেন মহাশয়।
তিহোঁ গুতি কালি না ছাড়েন এ আলয়।।
তবে আমি কালি ছাড়ি যাইব সর্বকথা।
চিন্তা নাহি তোমরা বলহ কৃষ্ণকথা।।
এইমত কৃষ্ণকথা মঙ্গলকীর্তনে।
থাকিতে অদ্ভুত অতি হৈল সেই ক্ষণে।।
হরিদাস ছাড়িবেন শুনিয়া বচন।
মহানাগ স্থান ছাড়িলেন সেই ক্ষণ।।

প্রাবৃটকালে অপূর্বদর্শন সেই মহানাগ আপন গুপ্তবাস থেকে উত্থিত হল। সবাই দেখল, সে স্থানত্যাগ পূর্বক অন্যদেশে প্রস্থান করছে। তার বর্ণ পীত, শুক্ল এবং রক্তবর্ণ, সে মহাভয়ঙ্কর, তেজোদীপ্ত, শীর্ষে মহামণি—

গর্ত্ত হৈতে উঠি সর্প সন্ধ্যার প্রবেশে।
সবাই দেখেন, চলিলেন অন্যদেশে।।
পরম অদ্ভুত সর্প মহাভয়ঙ্কর।
পীত শুক্ল রক্তবর্ণ মহা তেজধর।।
মহামণি জ্বলিতেছে মস্তক ঔপরে।
দেখি ভয়ে বিপ্রগণ কৃষ্ণকৃষ্ণ স্মরে।।

বৃন্দাবনদাস বিবৃত 'ডঙ্ক'নাট্যের পূর্ব পটভূমি অনুধাবন করার নিমিত্তে এস্থলে হরিদাস ও সর্প প্রসঙ্গের অবতারণা। উপরন্তু 'চৈতন্যভাগবতে' হরিদাস প্রসঙ্গেই এই নাট্যের উল্লেখ আছে—

ঃ আর এক শুন তান অদ্ভুত আখ্যান।
নাগরাজে যে মহিমা কহিল তাহান।।
একদিন এক বড় লোকের মন্দিরে।
সর্প-ক্ষত ডঙ্ক নাচে বিবিধ প্রকারে।।

'ডঙ্ক' শব্দটি প্রাচীন বাঙলায় 'দংশন' অর্থে প্রযুক্ত। এখানে তা নাট্য পরিভাষা রূপে উক্ত। যে ব্যক্তি সর্প (এখানে যুক্তিযুক্তি অর্থ কালিয়) বিষয়ক এই নৃত্য পরিবেশন করত, সে ডঙ্ক। সুতরাং 'ডঙ্কনাচ' হল সর্প বিষয়ক নৃত্য বা নাট্য। 'সর্প-ক্ষত' কথাটার যথার্থ অর্থ সর্প-অঙ্কিত। অর্থাৎ 'ডঙ্ক' প্রদর্শনকারীর রূপসজ্জায় সাপের চিত্র, সর্পলেখা অঙ্কিত অথবা সর্পের অনুকৃতি মূলক রূপসজ্জা গৃহীত হতো। ডঙ্ক 'বিবিধ প্রকারে' নৃত্য প্রদর্শন করল-এর সঙ্গত ব্যাখ্যা হল, বিবিধ ভঙ্গি ও ভাব প্রদর্শন পূর্বক এই নাট্য উপস্থাপিত হয়েছিল। এ থেকে ধারণা করা অসঙ্গত নয় যে, এই নাট্যে, বিভিন্ন তাল ও ছন্দে নৃত্য প্রদর্শিত হতো।

'ডঙ্ক নাট্যে'র অভিনয়স্থল বড়লোকের মন্দির। কেন? বড়লোক এখানে ধনবান অর্থে প্রযুক্ত। সুতরাং এই পরিবেশনার নিমিত্তে ডঙ্কবেশী অভিনেতার অর্থলাভের ইঙ্গিত এ থেকে খুঁজে পাওয়া যায়। ডঙ্কনাট্যের অভিনয়স্থল গৃহ (মন্দির) অর্থাৎ গৃহাঙ্গন।

'চৈতন্যভাগবতে' আছে—

মৃদঙ্গ মন্দিরা তার মন্ত্র ঘোরে।
ডঙ্কবেড়ি সবই গায়েন উচ্চৈঃস্বরে।।
দৈবগতি তথাই গেলেন হরিদাস।
ডঙ্কনৃত্য দেখেন হইয়া এক পাশ।।
মনুষ্যশরীরে নাগরাজমন্ত্র বলে।
অধিষ্ঠান হইয়া নাচেন কতুহলে।।

ডঙ্কনৃত্যে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখও লভ্য। এতে মৃদঙ্গ, মন্দিরা, তারবাদ্য (একতারা, দোতারা, বা অন্যকোন ততযন্ত্র) ব্যবহৃত হতো। প্রত্যেক বাদ্যযন্ত্রের জন্য একজন করে বাদকের প্রয়োজন, সুতরাং প্রধান অভিনেতা ব্যতিরেকেও ডঙ্ক

নাট্যে বাদক-দোহারের সংস্থান ছিল। একথার সত্যতা মেলে 'ডঙ্ক বেড়ি' সকলের উচ্চকণ্ঠে গীত পরিবেশনের উল্লেখ থেকে। অর্থাৎ ডঙ্কনাট্য প্রধান গায়েন এবং দোহার কেন্দ্রিক নাট্য পরিবেশনা। এখানে, মঞ্চে গায়েন- দোহারের অবস্থান সংক্রান্তও ইঙ্গিত আছে। মূল অভিনেতা ডঙ্ককে দোহারগণ বেষ্টন পূর্বক (ডঙ্কবেড়ি সবেই গায়েন উচ্চৈঃস্বরে) সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করছে, সুতরাং দেখা যায়, এই নাট্যে দোহারগণ বৃত্তাকারে মঞ্চে উপবেশন করত।

ডঙ্ক নাগরাজের চরিত্রে অভিনয় করত তার প্রমাণও মিলছে। মানবদেহে মন্ত্র বলে (মন্ত্রঘোরে, অর্থাৎ এ নাট্যের শুরুতে কৃত্য প্রসূত মন্ত্র পঠিত হতো) নাগরাজের অধিষ্ঠান হয়েছে। এ নিখুঁত অভিনয়ের প্রশংসারূপে গ্রাহ্য। উপরন্তু এ থেকে পুনরায় প্রমাণিত হয় যে, ডঙ্কের অভিনেতা সাপের রূপসজ্জাই গ্রহণ করত।

এরপর, ডঙ্কনাট্যের বিষয়ও বিবৃত হয়েছে চৈতন্যভাগবতে—

ঃ কালীদহে করিলেন যে নাট্যে ঈশ্বরে।
সেই গীত গায়েন কারুণ্যরূপ স্বরে।।
শুনি নিজ প্রভুর মহিমা হরিদাস।
পড়িলা মুর্ছিত হই কোথা নাহি শ্বাস।।

উদ্ধৃতি দৃষ্টে বলা যায়, ডঙ্কনাট্যের বিষয় ছিল, কৃষ্ণের কালিয়দমন লীলা।

জলক্রীড়াসক্ত কৃষ্ণ কালিদহকে সর্পবিষ মুক্ত করতে চাইলেন। কালিদহ সর্পসঙ্কুল, এদের প্রধান কালিয়-নাগ। কৃষ্ণ তীরলগ্ন সুউচ্চ কদম্ব বৃক্ষ থেকে দৃঢ় চিত্তে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন নদীর জলে কিন্তু সর্পরাজ অর্থাৎ নাগরাজ ও অন্যান্য সর্পের দংশনে হলেন হতচেতন। এই দৃশ্যে কৃষ্ণসঙ্গী বালক ও নন্দ-যশোদার ক্রন্দনে কারুণ্যে পরিপূরিত হল কালিয় নদের তীরভূমি। সেই উদ্বেলিত ক্রন্দনে চৈতন্যে ফিরে আসেন কৃষ্ণ, শুরু হয় উদ্যত সর্পরাজের ফণার উপর লীলাময় নৃত্য।

পদপ্রহারে জর্জরিত নাগের আর্তনাদে নাগিণীগণের মিনতিমাখা আবেদনে কৃষ্ণ দয়ার্দ্র হন। মুক্ত করে দেন জলের পরিবেশ বিনষ্টকারী নাগেদের। ফণায় কৃষ্ণের পায়ের চিহ্ন নিয়ে তারা চলে যায় দক্ষিণ সাগরে। এই চিহ্নের ফলে সর্পভক্ষী গরূড় থেকে পরিত্রাণ পাবে তারা।

'ডঙ্ক নাট্যে'র বিবরণ থেকে দেখা যায় তা সেকালে প্রচলিত কৃষ্ণলীলার পালারই ভিন্নতর আঙ্গিক। মূলে তা লীলানাট্যেরই একটি শাখা। এর সঙ্গে

'পাঁচালি'র একটি নিকট সম্বন্ধ আবিষ্কার দুরূহ নয়। গায়েন ও দোহার ধৃত আঙ্গিক, পাঁচালির একান্ত পরিচয়বাহী। ডঙ্কনাট্যেও তা দেখা যায়, তবে রূপসজ্জা ও অন্যবিধ নাট্য-উপাদানের কারণে তাকে লীলানাট্যের শ্রেণীভুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত।

এই নাট্য কৃত্যমূলক সন্দেহ নেই, তবে বিবরণ দৃষ্টে ধারণা করা যায়, ডঙ্ক তিথি বা পার্বণ কেন্দ্রিক নাট্য নয়। বিশেষ প্রয়োজনে ডঙ্ক আমন্ত্রিত হয়েই এই নাট্য পরিবেশন করত। কৃত্যমূলক নাট্য, বিধায় গৃহস্থবাড়িতে সর্পভয় নিবারণ বা সর্পদংশনের ঘটনা, সাধারণ কল্যাণ কামনা, বা বিশেষ ক্ষেত্রে ফললাভের নিমিত্তে 'ডঙ্কনাট্যের অভিনয় হত-এরূপ অনুমানই সঙ্গত।

'চৈতন্যভাগবতে' বিবৃত ডঙ্কনাট্যে হরিদাস ও ডঙ্কের অভিনেতা বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

হরিদাস ঠাকুরের আবেশ দেখিয়া।
এক ভীত হই ডঙ্ক রহিলেন গিয়া।।
গড়াগড়ি যায়েন ঠাকুর হরিদাস।
অদ্ভুত পুলক অশ্রু কম্পের প্রকাশ।।
রোদন করেন হরিদাস মহাশয়।
শুনিয়া প্রভুর গুণ হৈলা প্রেমময়।।
হরিদাস বেড়ি সবে গায়েন হরিষে।
যোড় হস্তে রহি ডঙ্ক দেখে এক পাশে।।
ক্ষণেকে রহিল হরিদাসের আবেশে।
সবেই হৈলা অতি আনন্দ বিশেষে।।
যেখানে পড়য়ে তান চরণের ধূলি।
সবেই লেপেন অঙ্গে হই কুতূহলী।।
আর এক ঢঙ্গ বিপ্র থাকে সেই খানে।
মুঞি নাচিবাঙ আজি গণে মনে মনে।
বুঝিলাম নাচিলেই অবোধ বর্বরে।
অল্প মনুষ্যেরেও পরম ভক্তি করে।।
এত বলি সেই ক্ষণে আছাড় খাইয়া।
পড়িলা যেহেন মহা অচেষ্ট হইয়া।।
যেই মাত্র পড়িল ডঙ্কের নৃত্যস্থানে।

মারিতে লাগিল ডঙ্ক মহাক্রোধ মনে।।
আশে পাশে ঘাড়ে মুড়ে বেতের প্রহার।
নির্ঘাত মারয়ে ডঙ্ক রক্ষা নাহি আর।।
বেতের প্রহারে বিপ্র জর্জর হইয়া।
বাপ বাপ বলি ত্রাসে গেল পলাইয়া।।
তবে ডঙ্ক নিজ সুখে নাচিলা কিস্তর।
সবার জন্মিল বড় বিস্ময় অন্তর।।[১৫]

হরিদাস ও কৃত্রিম স্বানুভব প্রদর্শনকারী 'ঢঙ্গ বিপ্রে'র অংশগ্রহণ থেকে অনুধাবন করতে অসুবিধা হয়না যে ডঙ্কনাট্যের এক পর্যায়ে ভাবাবেশ নৃত্যে সাত্ত্বিক দর্শকরাও অংশগ্রহণ করত। ডঙ্কের হাতে থাকত 'বেত্রদণ্ড। 'ডঙ্কনাট্য' চৈতন্যপূর্ব কালের। এ'হল ভ্রাম্যমাণ নাট্য।

'চৈতন্যভাগবতে'র মধ্যখণ্ডে সেকালে প্রচলিত শিবগান বা 'শিবের কথন' প্রসঙ্গ লভ্য। চৈতন্যদেবের গৃহ প্রাঙ্গণে একদা এক ভিক্ষাজীবী শিবের গায়ন উপস্থিত হল। ডমরু বাজিয়ে সে শিবগীত শুরু করল—

একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায় গায় শিবের কথন।।
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইয়া শিবের গীত বেঢ়ি নৃত্য করে।।

ডমরু শিবের প্রতীকবাদ্য। 'শিবের কথন' হল শিব বিষয়ক কোন একটি পালা। উল্লেখ্য যে, ষোড়শ শতাব্দীর পরে শিব সংক্রান্ত কাহিনী, শিথিল পালা সম্পর্কিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ মঙ্গলকাব্য রূপ লাভ করে। চৈতন্য ওতদপূর্ববর্তীকালেপ্রাকৃত জীবনে শিব সংক্রান্ত নানা পালা মৌখিকরীতিতে প্রচলিত ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, ভিক্ষাজীবী শিবগায়ন ভ্রাম্যমাণ—সুতরাং সংক্ষিপ্ত কোন পালা সে পরিবেশন করেছিল চৈতন্যদেবের গৃহপ্রাঙ্গণে, এরূপ অনুমানই সঙ্গত।

শিবের গীত পরিবেশনকারী 'বেঢ়ি' অর্থাৎ বেষ্টন পূর্বক এই নাট্য পরিবেশন করেছিল। এ থেকে বুঝা যায়, এ নাট্যের অভিনয়স্থল, 'ভূমিসমতল বৃত্ত মঞ্চ'। গায়েন বৃত্তকারে আবর্তিত হতো নৃত্যকালে।

এখানে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হবেনা যে, ভিক্ষাজীবী শিব গায়েনের পোশাকও শৈবপন্থীদের পরিধানের অনুরূপ ছিল।

চৈতন্যদেব ভাবাবেশ বশত, শিবগায়নের স্কন্ধে আরোহণ করেছিরেন, বৃষ পৃষ্ঠাসীন শিবের অনুকরণে—

ঃ শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
হইলা শঙ্কর মূর্তি দিব্য জটাধর।।
একলাফে উঠে তার কান্ধের উপর।
হুঙ্কার করিয়া বলে মুই সে শঙ্কর।।

চৈতন্যদেব, অতিশয় শাক্তপন্থী দর্শনকেও বিগলিত করেছিলেন একেশ্বরবাদী কৃষ্ণতত্ত্বে—উদ্ধৃত পদদৃষ্টে তার প্রমাণ মেলে। অতঃপর—

ঃ বাহ্য পাই নাম্বিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপনি দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর।।[১৬]

'চৈতন্যভাগবতে' 'যমনৃত্যে'র প্রসঙ্গ আছে। জগাই মাধাই দুই ব্রহ্মদৈত্যের পাপ খণ্ডন হল বিশ্বম্ভর প্রসাদে। সূর্যপুত্র 'যম' তা শুনে (কৃষ্ণগুণে) মূর্ছা গেলেন—

ঃ যখন শুনিলা চিত্রগুপ্তের বচন।
কৃষ্ণাবেশে দেহ পাসরিলা ততক্ষণ।।
পড়িলা মুর্চ্ছিত হইয়া রথের উপরে।
কোথাও নাহিক ধাতু সকল শরীরে।।
আথে ব্যথে চিত্রগুপ্ত আদি যত গণ।
ধরিয়া লাগিলা সভে করিতে ক্রন্দন।।
সর্বদেব রথে জান কীর্ত্তন করিয়া।
রহিল যমের রথ শোকাকুল হৈয়া।।
দুই ব্রহ্মা-অসুরের মোচন দেখিয়া।
সেই গুণ মর্ম সভে চলিলা গাইয়া।।

অতঃপর যমরাজের জ্ঞান ফিরে এল। মহামত্তভাবে নৃত্যে মেতে উঠলেন তিনি—

ঃ কৃষ্ণাবেশে হেন জানি অজ পঞ্চানন।
কর্ণমূলে সভে মিলি করয়ে কীর্ত্তন।।

উঠিলেন যমদেব কীর্ত্তন শুনিয়া।
চৈতন্য পাইয়া নাচে মহা মত্ত হইয়া।।

যমরাজের নৃত্যই 'যমনৃত্য'রূপে আখ্যাত—

ঃ যমনৃত্য দেখি নাচে সর্ব দেবগণ।
নারদাদি সঙ্গে নাচে অজ পঞ্চানন।।
দেবগণ নৃত্য শুন সাবধান হৈয়া।
অতিগুহ্য বেদে ব্যক্ত করিবেন ইহা।।

'যমনৃত্যে'র আঙ্গিকগত একটা ধারণা পাওয়া যায় বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে। এতে দেবগণের নৃত্য প্রসঙ্গে নানা হাবভাবাবেশ অতি গোপনীয় জ্ঞানে পরিবেশনের নির্দেশ দিয়েছেন।—

ঃ নাচই ধর্মরাজ ছাড়িয়া সব কাজ
কৃষ্ণাবেশে না জানে আপনা।
সঙরিয়া শ্রীচৈতন্য বলেন ধন্য ধন্য
পতিত পাবন ধন্য বানা।।
হুঙ্কার গর্জ্জন পুলক মহা প্রেম
সঙরিয়া জগাই মাধাই।।
যমের যতেক গণ দেখিয়া যমের প্রেম
আনন্দে পড়িয়া গড়ি যায়।
চিত্রগুপ্ত মহাভাগ কৃষ্ণে বড় অনুরাগ
মালসাট পূরি পূরি ধায়।।
নাচে প্রভু শঙ্কর হইয়া দিগম্বর
কৃষ্ণাবেশে বসন না জানে।
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য জগতে কয়য়ে ধন্য
কহিয়া তারক রামনামে।।
মহেশ নাচে আনন্দে জটাও নাহিক বান্ধে
দেখি নিজ প্রভুর মহিমা।
কার্ত্তিক গণেশ নাচে মহেশের পাছে পাছে
সঙরিয়া কারুণ্যের সীমা।।
নাচয়ে চতুরানন ভক্তি যার প্রাণধন
লইয়া সকল পরিবার।

কশ্যপ কর্দম দক্ষ মনু সব মহা মুখ্য
পাছে নাচে সকল ব্রহ্মার।।
সভে মহা ভাগবত কৃষ্ণরসে মহামত্ত
সবে করে ভক্তি অধ্যপনা।
বেড়িয়া ব্রহ্মার পাশে কান্দে ছাড়ি দীর্ঘশ্বাসে
সঙরিয়া প্রভুর করুণা।।
দেবর্ষি নারদ নাচে রহিয়া ব্রহ্মার পাছে
নয়নে বহয়ে প্রেমজল।
পাইয়া যশের সীমা কোথা বা রহিল বীণা
না জানয়ে আনন্দে বিহ্বল।।
চৈতন্যের প্রিয়ভৃত্য শুকদেব করে নৃত্য
ভক্তির মহিমা শুকে জানে।
লুটাইয়া পড়ে ধূলি জগাই মাধাই বলি
করে বহু দণ্ড-পরণামে।।[১৭]

'যম-নৃত্য' সেকালে কৃষ্ণপন্থীদের নাট্যমূলক অনুষ্ঠান ছিল, এরূপ অনুমান করা যায়। উদ্ধৃত পদ দৃষ্টে মনে হয় এতে দেবাদির রূপসজ্জাও গ্রহণ করার নিয়ম ছিল। ধর্ম ও শিবের গাজনে নানা দেব-দেবীর রূপসজ্জা গ্রহণের প্রথা একালেও প্রচলিত আছে।

অন্যদিকে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, মূলে যম-নৃত্য চৈতন্যপূর্ব কালের এবং বৃন্দাবন দাসের কালে এতে বৈষ্ণব ভক্তি মার্গীয় রূপারোপ ঘটে। এর প্রমাণ, জগাই মাধাই প্রসঙ্গে যম-নৃত্য এবং চৈতন্য পরিকর 'শুকদেব' প্রসঙ্গ। উল্লেখ্য যে, নিমাই সন্ন্যাসের পালায় জগাই-মাধাই লোকপ্রিয় প্রসঙ্গ।

যমনৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গি বা ছাঁদের নানা সঙ্কেত উদ্ধৃতাংশে লভ্য-যেমন, 'হুঙ্কার গর্জ্জন', 'ক্রন্দন', 'গড়ি' বা গড়াগড়ি যাওয়া, 'মালসাট পুরে' ধাওয়া, নির্বসন নৃত্য, 'পাছে নাচে' অর্থাৎ সারিবদ্ধ নৃত্য, ইত্যাদি। 'নৃত্য গীত কোলাহলে' যমনৃত্য পরিবেশিত হতো।

বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, উদ্ধৃত পদে দিগম্বর শঙ্করের নৃত্যে, বৃন্দাবন দাসের গুরু নিত্যানন্দের শৈবনৃত্যের ছায়া আছে।

'চৈতন্যভাগবতে'র মধ্যখণ্ডে, চৈতন্যদেব ও তাঁর পরিকরবৃন্দ কর্তৃক পরিবেশিত 'অঙ্কের বন্ধনে' কৃত নাট্যের সুবিস্তৃত বিবরণ লভ্য। নবদ্বীপ তখন তাঁর অবিশ্রান্ত নামকীর্তন ও নগর সঙ্কীর্তনে মুখর, এর মধ্যে সহসা একদিন সংকল্প করলেন- 'অঙ্কের বন্ধনে' তিনি নৃত্য করবেন। বৃন্দাবন দাসের সাক্ষ্য অনুসারে—

মধ্যখণ্ড কথা ভাই শুন একমনে।
লক্ষীকাছে প্রভু নৃত্য করিলা যেমনে।।
একদিন প্রভু বলিলেন সভাস্থানে।
আজি নৃত্য করিবাওঁ অঙ্কের বন্ধনে।।

এরপর সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানক চৈতন্যদেব নির্দেশ দিলেন-'কাচসজ্জ' করতে—

সদা শিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু কাছে সজ্জ কর গিয়া।।

এ রূপসজ্জায় পরিধেয় বস্ত্রের উল্লেখ আছে—

শঙ্খ কাঁচলী পাটসাড়ী অলঙ্কার।
যোগ্যযোগ্য করি সজ্জ কর সভাকার।।

বিশ্বম্ভর নির্দেশক রূপে, চরিত্রানুগ 'সজ্জ' অর্থাৎ সাজ গ্রহণের কথা বলছেন। এরপর পরিকরগণের মধ্যে চরিত্র বন্টন করা হল—

গদাধর কাছিবেন রুক্মিণীর কাছ।
ব্রহ্মানন্দ তালবুড়ী সখী সুপ্রভাত।।
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতোয়াল হরিদাস জাগাইতে ভার।।
শ্রীবাস নারদ-কাছ স্নাতক শ্রীরাম।
দেউড়িয়া হাড়ি মুঞি বলয়ে শ্রীমান।।
অদ্বৈত বলয়ে কে করিব পাত্র-কাছ।
প্রভু বোলে পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ।।

গদাধর রুক্মিণী, ব্রহ্মানন্দ 'তালবুড়ী', নিত্যানন্দ 'বড়াই' হরিদাস 'কোতোয়াল', শ্রীবাস 'নারদ', শ্রীরাম 'স্নাতক', শ্রীমান দেউড়িয়া হাড়ি অর্থাৎ 'মশালধারী শূদ্র' বা পাহারাদার চরিত্রে অভিনয় নিমিত্ত আদিষ্ট হলেন। অদ্বৈত প্রশ্ন করলেন 'পাত্রকাছ' অর্থাৎ প্রধানতম চরিত্রের ভূমিকায় কে অভিনয় করবে—বিশ্বম্ভর বললেন, গোপীনাথ হবেন প্রধান চরিত্র। শুরুতে চৈতন্যদেব 'লক্ষ্মী' চরিত্রে

অভিনয় করবেন এরূপ উল্লিখিত হয়েছে, নিঃসন্দেহে তা ভাগবত পুরাণের প্রসঙ্গ কিন্তু এরপর বিবৃত হল যে, নিত্যানন্দ বড়াই সাজবেন এর অর্থ চৈতন্যদেব হবেন রাধা।

বড়াই রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রণয়কথার চরিত্র। অন্যদিকে, বৃন্দাবন দাস প্রদত্ত পরবর্তী বিবরণ অনুসারে দেখা যায়, চৈতন্যদেব 'রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন' হয়েছেন, এবং রুক্মিণীর চরিত্রে মঞ্চে অবতীর্ণও হয়েছেন। সে ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, উক্ত অঙ্ক নৃত্যে চৈতন্যদেব কমপক্ষে একাধিক চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

প্রভু বিশ্বম্ভরের নির্দেশে সদাশিব বুদ্ধিমন্ত 'গৃহে' গমন করলেন নাট্যাভিনয়ের আয়োজন নিমিত্তে—

সত্বরে চলহ বুদ্ধিমন্ত খান তুমি।
কাছ গিয়া সজ্জ কর না চিনিবাওঁ আমি।।
আজ্ঞে শিরে করি সদাশিব বুদ্ধিমন্ত।
গৃহে চলিলেন আনন্দের নাহি অন্ত।।
সেই ক্ষণে কথুয়ার চান্দয়া খাটিয়া।
কাছ সজ্জ করিলেন সুছন্দ করিয়া।।
লইয়া সকল কাছ বুদ্ধিমন্ত খান।
থুইলেন লঞা ঠাকুরের বিদ্যমান।।

নির্দেশক রূপে চৈতন্যদেব চেয়েছিলেন নিখুঁত রূপসজ্জা। বুদ্ধিমন্ত খান সকল কাচসজ্জা এসে জড়ো করলেন ঠাকুরের বিদ্যমানে।

কথুয়া (বা কথিবার) অর্থাৎ মোটা কাপড়ের চাঁদোয়া খাটানো হল অভিনয় স্থলের উপর। এ থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে যে, বিশেষভাবে তৈরি কোন মঞ্চের উপরই চাঁদোয়ার আচ্ছাদন দেয়া হয়েছিল। বিশেষভাবে মঞ্চ তৈরির কথা এ জন্য বলা হল যে, চৈতন্যদেব জীবতকালেই অবতাররূপে গৃহীত হয়েছিলেন, সে কারণে তার অভিনয়স্থল বেদী স্বরূপ উচ্চস্থান হবার কথা। সে ক্ষেত্রে (চাঁদোয়ার আকৃতি সচারাচর চৌকোণ হয়ে থাকে) উক্ত মঞ্চ চৌকোণ ছিল এরূপ অনুমানে বাধা নেই।

নাট্যের পূর্বে বিশ্বম্ভর ঘোষণা করলেন তিনি 'প্রকৃতিস্বরূপা' অর্থাৎ রাধার ভূমিকায় নৃত্য প্রদর্শন করবেন। শর্তও জুড়ে দিলেন, 'জিতেন্দ্রিয়' যে, সে-নৃত্য দেখার অধিকার তার। তাঁর চেতনায় নবোদ্ভূত অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদী তত্ত্বের

ব্যাখ্যার নিমিত্তেই এ নাট্যের আয়োজন। সেই তত্ত্বের পরিপোষক নাট্যের দর্শকদেরও একটি বিশুদ্ধ মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন, চৈতন্যদেব যেন তাঁর বচনে সেই ইঙ্গিত দান করলেন। অদ্বৈত আচার্য 'ভুমিতে অঙ্ক' অর্থাৎ রেখা অঙ্কন করে বললেন যে, তিনি 'অজিতেন্দ্রিয়' কাজেই, নৃত্য দর্শনের তাঁর আর প্রয়োজন নেই, শ্রীবাসও একই উক্তি করলেন—

দেখিয়া হইলা প্রভু সন্তোষিত মন।
সকল বৈষ্ণব প্রতি বলয়ে বচন।।
প্রকৃতি স্বরূপা নৃত্য হইবে আমার।
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয় তার অধিকার।।
সেই সে যাইব আজি বাড়ির ভিতরে।
যে যে জম ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে।।
লক্ষ্মী বেশে অঙ্কনৃত্য করিব ঠাকুর।
সকল বৈষ্ণবের রঙ্গ বাঢ়িল প্রচুর।।
শেষে প্রভু কথাখানি করিলেন দঢ়।
শুনিয়া হইল সভে বিষাদিত বড়।।
সর্বাদ্য ভূমিতে অঙ্ক দিলেন আচার্য।
আজি নৃত্য দরশনে মোর নাহি কার্য।।

সাধারণ নাট্য কৌতূহল থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, এই নাট্যের প্রযোজনা পূর্বে অভিনেতা ও নির্দেশকের মধ্যে সাত্ত্বিকতার প্রশ্নে খানিকটা তর্কবিতর্ক হয়েছিল।

এখানে 'অঙ্ক' কথাটার উল্লেখ দেখা যায়, প্রথমে 'অঙ্কের বন্ধনে' অন্যত্র 'সর্বাদ্য ভূমিতে অঙ্ক দিলেন আচার্য' সর্বমোট দুবার দু স্থলে।

'অঙ্কের বন্ধনে নৃত্যে'র উল্লেখ থেকে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে, তা সংস্কৃত দশ রূপকের 'অঙ্ক' শ্রেণীর রূপক কিনা। বস্তু সংস্কৃত রূপক 'অঙ্কের' সঙ্গে চৈতন্যদেব পরিকল্পিত নাট্যের কোনরূপ সম্পর্ক আবিষ্কার সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে আসামে শঙ্করদেব রচিত লীলানাট্য 'নাট'ও পরবর্তী কালে 'অঙ্কিয়া' নামে অভিহিত হয়েছে যদিও সে নাট্যের সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের কোনরূপ নিকট সম্বন্ধ আবিষ্কার দুরূহ। কাজেই চৈতন্য দেবের অঙ্ক সম্মত নৃত্য করার সংকল্প পরবর্তীকালের সংযোজন হওয়া অস্বাভাবিক

নয়। অবশ্য 'অঙ্ক' যদি সাধারণভাবে 'পর্ব' বা 'পালা' অর্থে ব্যবহৃত হয় তবে, এর রহস্য খানিকটা উন্মোচিত হতে পারে। চৈতন্যদেব অভিনীত নাটকে দুটি ভাগ ছিল, একটি ভাগবত পুরাণের অনুসরণে রুক্মিণী হরণ পালা অন্যটি লোকজ রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় কথা। বৃন্দাবন দাস স্পষ্টতই রাত্রির প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহর মোট দুভাগে এই নাট্যের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেছেন।

অদ্বৈত আচার্য এই নাট্যে বিশেষ কোন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বলে উল্লেখ নেই। নাট্যপূর্বে অভিনয় সংক্রান্ত আলোচনা চূড়ান্ত হলে, তিনি প্রশ্ন করলেন তিনি কোন চরিত্রের বেশ গ্রহণ করবেন—

করজোড়ে [illegible] বোলয়ে বারবার।
মোরে আজ্ঞা প্রভু কোন কাছ কাছিবার।।

এর উত্তরে—

প্রভু বোলে যত কাছ সকলি তোমার।
ইচ্ছা অনুরূপ কাছ কাছ আপনার।।

এরপর অদ্বৈতের ভূমিকা হল 'সর্বভাবে' নৃত্যপর 'বিদূষক প্রায়'—

বাহ্য নাহি অদ্বৈতের কি করিব কাছ।
ভ্রুকুটি করিয় বুলে শান্তিপুর-নাথ।।
সর্বভাবে নাচে মহা বিদূষক প্রায়।
আনন্দ সাগর মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়।।

মুকুন্দ কীর্তনের শুভারম্ভ করলেন। কীর্তনের পর প্রবেশ ঘটল হরিদাসের—

কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ।
রামকৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ।।
প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু হরিদাস।
মহা দুই গোপ করি বদর-বিলাস।।
মহা পাগ শিরে শোভে ধটী পরিধান।
দেখিয়া সভার হৈল বিস্ময় গেয়ান।।
আরে আরে ভাই সব হও সাবধানে।
হাথে নড়ি চারিদিগে ধাইয়া বেড়ায়।
সর্বাঙ্গে পুলক কৃষ্ণ সভায়ে জাগায়।।

কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ সেব বল কৃষ্ণনাম।
দম্ভ করি হরিদাস করয়ে আহবানে।।

মাঙ্গলিক কীর্তনের পর হরিদাস প্রবেশ করলেন, নাট্যবিষয়ে পূর্বকথা বিবৃত করবেন তিনি। তাঁর শীর্ষে 'মহাপাগ' অর্থাৎ বিশাল পাগড়ি, পরণে 'ধটি' অর্থাৎ কৌপীন, বদনে সংযুক্ত হয়েছে 'গোপ', হাতে নড়ি বা লাঠি। তিনি স্বর্গীয় কোটাল রূপে মঞ্চে প্রবেশ করলেন।

হরিদাস দেখিয়া সকল গণ হাসে।
কে তুমি এথায় কেনে সভেই জিজ্ঞাসে।।
হরিদাস বোলে আমি বৈকুণ্ঠ-কোটাল।
কৃষ্ণ জাগাইয়া আমি বুলি সর্বকাল।।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু আইলেন এথা।
প্রেমভক্তি লোটাইব ঠাকুর সর্বথা।।
লক্ষ্মীবেশে নৃত্য আজি করিব আপনে।
প্রেমভক্তি লুটি আজি হও সাবধানে।।
এ বলিয়ে দুই গোঁপ মুচূড়িয়া হাথে।
নড় দিয়া বুলে গুপ্ত মুরারির সাথে।।

'সকল গণ' এখানে দর্শক। সকলের জিজ্ঞাস্য 'কে তুমি'। উত্তরে হরিদাস বলেন তিনি কৃষ্ণপুরী থেকে আগত কারণ বৈকুণ্ঠ ছেড়ে কৃষ্ণ বিশ্বম্ভর বেশে নবদ্বীপে আগমন করেছেন। লক্ষ্যণীয় যে, হরিদাস, লক্ষ্মীবেশী বিশ্বম্ভরকে কৃষ্ণাবতার রূপে নির্দেশ করছেন। লক্ষ্মীরূপী, কৃষ্ণাবতার প্রেমভক্তি বিতরণের নিমিত্তে নৃত্যে অবতীর্ণ হবেন 'নড় দিয়া' অর্থাৎ দৌড়ে মুরারি গুপ্তের কাছে হরিদাস, অভিনেয় নাট্যের বিষয় বর্ণনা করছেন এর অর্থ সে-মঞ্চে মুরারি গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন।

এরপর প্রবেশ করলেন শ্রীবাস—নারদ বেশে। মুহূর্ত মধ্যে রূপান্তরিত শ্রীবাস মঞ্চে আবির্ভূত হলেন—

ক্ষণেকে নারদ কাছ কাছিয়া শ্রীবাস।
প্রবেশিলা সভা মাঝে করিয়া উল্লাস।।
মহাদীর্ঘ পাকা দাড়ি ফোটা সর্বগায়।
বীনা কান্ধে কুশ হস্তে চারি দিগে চায়।।

রামাই পণ্ডিত কক্ষে করিয়া আসন।
হাথে কমণ্ডুল পাছে করিলা গমন।।
বসিতে দিলেন রাম পণ্ডিত আসন।
সাক্ষাৎ নারদ যেন দিল দরশন।।

সে কালে নারদ চরিত্রের রূপসজ্জা কিরূপ নিখুঁত ও কৌতূহলোদ্দীপক হতো, তার সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাচ্ছে এখানে। আদি মধ্যযুগে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ও তৎপূর্বকালের 'শূন্য পুরাণে' বর্ণিত নারদ বেশের সঙ্গে শ্রীবাসের নারদ সজ্জার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষণীয়। শ্রীবাসের দীর্ঘ শ্মশ্রু, সমগ্রশরীরে ফোঁটা সম্ভবত সাদা রঙের, কারণ শুভ মাঙ্গলিক চিহ্নরূপে নানা কৃত্যমূলক অনুষ্ঠানে সাদা ফোঁটা অঙ্কনের প্রথা প্রচলিত আছে। নারদ সর্বত্রই বীণাধারী, শ্রীবাসও কাঁধে নিয়েছেন বীণা। শ্রীবাসের হাতের কুশাসন এবং কমন্ডলু(?) ছিল।

চৈতন্যদেব অভিনীত নাট্যে চরিত্রানুগ বেশবাস কতদূর নিখুঁত হয়েছিল তার প্রমাণ উপস্থাপনের জন্যই নারদের রূপসজ্জার এই বিস্তৃত বিবরণের অবতারণা। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, নারদ পৌরাণিক গাম্ভীর্যে মঞ্চে অবতীর্ণ হননি। তাঁকে দেখে সবাই কৌতুকাপ্লুত হয়েছে। কারণ, সে কালে লোকনাট্যে প্রচলিত ভাঁড় বেশী নারদের রূপসজ্জাই শ্রীবাস গ্রহণ করেছিলেন। এ থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত নির্গত হতে পারে যে, লৌকিক চরিত্রাভিনয়ের ধারাতেই চৈতন্যদেব খানিকটা তার নাট্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। যদি এ সিদ্ধান্ত সঠিক হয় তবে, এরূপ অনুমানও সঙ্গত যে, ধ্রুপদী শাস্ত্রসম্মত কোন রূপক নয়, বাঙলা লীলানাট্যের ধারাতেই স্বীয় দর্শন ব্যাখ্যা ও প্রচারের তাগিদে চৈতন্যদেবে এক বিশেষরীতির নাট্য আঙ্গিকের সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্রীবাসের বেশ দেখে সবাই আমোদিত হল—

শ্রীবাসের বেশ দেখি সর্বগণ হাসে।
করিয়া গম্ভীর নাদ অদ্বৈত জিজ্ঞাসে।।
কে তুমি আইলা এথা কোন বা কারণ।
শ্রীবাস কহয়ে শুন কহিয়ে বচন।।
আমার নারদ নাম কৃষ্ণের গায়ন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমি করিয়ে ভ্রমণ।।
বৈকুণ্ঠ গোলাম কৃষ্ণ দেখিবার তরে।

শুনিলাম কৃষ্ণ গেলা নদীয়া নগরে।।
শূন্য দেখিলাম বৈকুণ্ঠের ঘরদ্বার।
গৃহিণী গৃহস্থ নাহি নাহি পারিবার।।
না পারি রহিতে শূন্য বৈকুণ্ঠ দেখিয়া।
আইলাম আপন ঠাকুর সন্তরিয়া।।
প্রভু আজি নাচিবেন ধরি লক্ষ্মীবেশে।
অতএব এ সভায় আমার প্রবেশে।।

পৌরাণিক ও লোকজ নারদের এই রূপান্তর চৈতন্যদেবের নাট্য পরিকল্পনারই অংশ। যে দেবকল্প মানব, হীন ও পতিত মানুষকে আমৃত্যু উৎসঙ্গ প্রদান করেছেন, তাদের মুক্তি দিয়েছেন অসহ ধর্মীয় শ্রেণী শৃঙ্খল থেকে, তিনি পুরাণ প্রসঙ্গকে লোকজীবনের সাধারণ রুচি ও কৃত্যের কাছে টেনে আনবেন, তাকে ধ্রুপদীর অচল কৃত্যরূপে অনুপুঙ্খ অনুসরণ করবেন না, তা স্বাভাবিক। তাঁর নির্দেশিত নাট্যরীতি সম্পর্কেও একথা বলা যায় যে, তা নিশ্চিতই শাস্ত্রীয় রূপকের অনুসৃতি ছিলনা। অন্যত্র তিনি যেমন পুরাণকে ভেঙে স্বীয় দর্শনের পরিপোষক করে তুলেছিলেন, নাট্যের ক্ষেত্রেও তাই করেছিলেন বলে ধরে নেয়া যৌক্তিক।

শ্রীবাস ব্যাখ্যা করলেন তাঁর মর্তলোকে আগমনের হেতু—সঙ্গে সঙ্গে দর্শকগণ উল্লাস ধ্বনি করে উঠে। তাঁর নিখুঁত অভিনয়ে বিমুগ্ধ সবাই, বিশ্বম্ভর জননী মূর্ছাহত।

এরপর প্রবেশ করলেন লক্ষ্মীবেশী বিশ্বম্ভর। তিনি নেপথ্যগৃহে চরিত্রানুগ সজ্জা গ্রহণ করছেন। ভাবাবেশের লীলা চাঞ্চল্যে অধীর তিনি—

গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইলা নির্ভর।।
আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
বিদর্ভের সুতা হেন আপনার বাসে।।

'গৃহান্তরে' কথাটা থেকে মঞ্চের নেপথ্য গৃহে রূপসজ্জা গ্রহণের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য মধ্যযুগের বাঙলা নাট্যে সাজঘরের ইঙ্গিত শুধু এখানে নয়, অন্যত্রও লভ্য।

নারায়ণদেব ও উড়িষ্যার কবি দ্বারিকা দাসের 'মনসামঙ্গল' বেহুলার নৃত্যপ্রস্তুতি ও আসরের প্রবেশ প্রসঙ্গে সাজঘর ও 'অন্তঃস্পটে'র উল্লেখ পাওয়া যায়।

এখনে একটি বিষয় বলা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, শুরুতে বৃন্দাবনদাস বলেছেন, 'গদাধর কাছিবেন রুক্মিণীর কাছ', অথচ এ স্থলে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে বিশ্বম্ভর চৈতন্যদেবই উক্ত চরিত্রের অভিনয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। গদাধরের রুক্মিণীর 'কাছ' কথাটা মূলে অভিনয় সম্পর্কিত বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

এরপর ভাগবত পুরাণের অনুসরণে রুক্মিণীবেশী বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সপ্তশ্লোক পত্র রচনা করছেন—

নয়নের জলে পত্র লিখিলা আপনে।
পৃথিবী হইল পত্র অঙ্গুলী কলমে।।
রুক্মিণীর পত্র সপ্ত শ্লোক ভগবতে।
যে আছে পঢ়য়ে তাহি কান্দিতে কান্দিতে।।
গীত বন্ধে শুন সাত শ্লোকের ব্যাখ্যান।
যে কথা শুনিলে স্বামী হয় ভগবান।।

এর আগে বলা হয়েছিল 'প্রভু আজি নাচিবেন ধরি লক্ষ্মীবেশে।' এখানে দেখা যাচ্ছে বিশ্বম্ভর রুক্মিণীর ভূমিকায় মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। এর একটা যুক্তি আছে বৈকি—লক্ষ্মী জন্মান্তরে রুক্মিণী-এবং তাঁর অংশে রাধার জন্ম। ধারণা করা যায়, চৈতন্যদেব তাঁর পুরো চরিত্রাভিনয়ে লক্ষ্মীকে মূল উৎস ধরে নাট্য নির্মাণে অগ্রসর হয়েছিলেন। তবে এর চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বিষয় হল রুক্মিণী চরিত্রপূর্বে তিনি লক্ষ্মীবেশে নৃত্য করেছিলেন। অবশ্য এ অনুমানের পক্ষে বৃন্দাবনদাস থেকে কোন প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু লোচন দাসে আছে যে চৈতন্যদেব প্রথমে গোপীকা ও পরে লক্ষ্মীর বেশে অভিনয় করেছিলেন। কাজেই রুক্মিণী চরিত্রে অভিনয় পূর্বে তিনি লক্ষ্মীর বেশে মঞ্চে নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন, এ অনুমান সঙ্গত।

চৈতন্যদেব যে শূন্যে আঙুলের সঙ্কেতে ইঙ্গিতাভিনয়ে এই পত্র রচনা করেছিলেন তা পূর্বোদ্ধৃত পদ দৃষ্টে প্রমাণিত হয়। তাঁর অশ্রুজল হল কালি, পৃথিবী কাগজ এবং আঙুল হলো কলম—কাজেই তাঁর অভিনয় পদ্ধতি ও এ থেকে অনুধাবনীয়। এ ছিল ইঙ্গিতাভিনয়।

ভাগবত থেকে চৈতন্যদেব যে সপ্ত শ্লোক মঞ্চে উচ্চারণ করেছিলেন তার পদরূপ ধৃত আছে 'চৈতন্যভাগবতে'। এখানে তার গদ্য রূপান্তর উদ্ধৃত হল—

> হে ভুবন সুন্দর কৃষ্ণ, তোমার গুণ শ্রবণপূর্বক আমার অঙ্গতাপ অপসৃত হলো। তোমার রূপ দর্শনে সর্বনিধি লাভ হয়। হে যদুসিংহ, কোন কুলবতী এ মর্তে আছে যে তোমার চরণ ভজনা করে না। আমার ধার্ষ্ট্য ক্ষমা কর কারণ আমার চিত্ত নিরন্তর তোমাতে লীন হতে চায়। আমাকে পত্নীপদে অধিষ্ঠিত কর হে ত্রিলোকের রাজা! আমি তোমার অংশ তাতে শিশুপালের যেন কোনো দাবি না থাকে। সিংহের ভাগ শৃগালের প্রাপ্য নয়। যদি আমি ব্রত, গুরু, বিপ্র ও দেবের অর্চনা করে থাকি, তবে কৃষ্ণ যেন আমার প্রাণেশ্বর হয়।

হে সদাগ্রজ, কাল আমার বিবাহ; তুমি দ্রুত এসে বিদর্ভ নগরে গুপ্তভাবে থাক তারপর অকস্মাৎ এসে চৈদ্য, শাল্ব, জরাসন্ধ মন্থন পূর্বক আমাকে হরণ কর।

> প্রভু, আমাকে নেবার উপায় বলে দিচ্ছি—কুলধর্ম অনুসারে বিবাহের পূর্বদিন, ভবানীর কাছে যায় নববধু—সেই অবসরে আমাকে হরণ করবে তুমি। তোমাকে পাবার নিমিত্তে, যতজন্মের প্রয়োজন হয় ততবার আত্মহত্যা করব আমি।

ভাটের কাছে শূন্যে লেখা এই পত্র অর্পিত হলো। এলেন কৃষ্ণ, অনুমান করা যায়, রুক্মিণী স্বেচ্ছায় কৃষ্ণকর্তৃক লুণ্ঠিত হলেন। পত্র প্রেরিত হল অথচ কৃষ্ণ এসে উদ্ধার করলেন না, এ কথা স্বীকার করা যায় না। কাজেই সে-রাতের নাট্যে পুরাণের এ অংশটুকু অভিনীত হয়েছিল এরূপ অনুমানই সঙ্গত।

রুক্মিণীর অভিনয় সুচারু রূপে সমাপ্ত হয়েছিল। এর প্রমাণ 'চৈতন্যভাগবতে' আছে—

> এইমত বোলে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
> সকল বৈষ্ণবগণ প্রেমে কান্দে হাসে।।
> হেন রঙ্গ হয় চন্দ্রশেখর-মন্দিরে।
> চতুর্দিগে হরিধ্বনি শুনি উচ্চস্বরে।।
> জাগ জাগ জাগ ডাকে হরিদাস।
> নারদের বেশে নাচে পণ্ডিত শ্রীবাস।।

চন্দ্রশেখরের গৃহাঙ্গনে সে রাতে নাট্যের প্রথমাংশ হরিধ্বনি দ্বারা বৃত হলো। রুক্মিণীর পুরাণ কথার অন্তে প্রবেশ করলেন 'কৃষ্ণ কোটালি' হরিদাস। মধ্যরাতে দর্শকের আবেগদীপ্ত হৃদয় যেন উদ্বেল হয়ে থাকে, তারই প্রতিধ্বনি হারিদাসের

আহ্বান, 'জাগ জাগ জাগ'। এরপর কৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণী হরণজনিত ঘটনায় নারদের নৃত্য।

নাট্যের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হলো। দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর সাজলেন গোপিকা, সঙ্গে সখী—সুপ্রভা-ব্রহ্মানন্দ-হরিদাস জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কারা' ব্রহ্মানন্দ উত্তর দিলেন, তাঁরা মথুরা গামী। কৃষ্ণ দানী হলেন, তর্ক-বিতর্কের পর শুরু হলো রামবেশী গদাধরের নৃত্য—

প্রথম প্রহরে এই কৌতুক বিশেষ।
দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর পরবেশ।।
সুপ্রভা তাহার সখী করি নিজসঙ্গে।
ব্রহ্মানন্দ তাহান বড়াই বুলে রঙ্গে।।
হাতে নড়ি কাখে ডালী নেত পরিধান।
ব্রহ্মানন্দ যেহেন বড়াই বিদ্যমান।
ডাকি বোলে হরিদাস কে সব তোমরা।
ব্রহ্মানন্দ বোলে যাই মথুরা আমরা।।
শ্রীবাস বোলয়ে দুই কাহার বণিতা।
ব্রহ্মানন্দ বোলে কেনে জিজ্ঞাস বারতা।।
শ্রীবাস বোলয়ে জানিবারে ত জুয়ায়।
হয় বলি ব্রহ্মানন্দ মস্তক চুলায়।।
গঙ্গাদাস বোলে আজি কোথায় রহিবা।
ব্রহ্মানন্দ বোলে তুমি স্থান খানি দিবা।।
গঙ্গাদাস বোলে তুমি জিজ্ঞাসিলা বড়।
জিজ্ঞাসিয়া কার্য নাহি ঝাট তুমি নড়।।
অদ্বৈত বোলয়ে এত বিচারে কি কাজ।
মাতৃসম পরনারী কেনে দেহ লাজ।।
নৃত্যগীত প্রিয় বড় আমার ঠাকুর।
এথায়ে নাচহ ধন পাইবা প্রচুর।।
অদ্বৈতের বাক্য শুনি পরম সন্তোষে।
নৃত্য করে গদাধর প্রেম পরকাশে।।
রামবেশে গদাধর নাচে মনোহর।
সময় উচিত গীত গায় অনুচর।।
গদাধর নৃত্য দেখি আছে কোন জন।

বিহ্বল হইয়া নাহি করয়ে ক্রন্দন।।
প্রেমে নদী বহে গদাধরের নয়নে।
পৃথিবী হইয়া সিক্ত ধন্য হেন মানে।
গদাধর হৈলা যেন গঙ্গা মূর্তিমতী।
সত্যসত্য গদাধর কৃষ্ণের প্রকৃতি।।
আপন চৈতন্য বলিয়াছে বারবার।
যে গায় যে দেখে সব ভাসিলেন প্রেমে।
চৈতন্য প্রসাদে কেহ বাহ্য নাহি জানে।।
হরি হরি বলি কান্দে বৈষ্ণব মণ্ডল।
সর্বগণে হইল আনন্দ কোলাহল।।
চৌদিগে শুনিয়ে কৃষ্ণ প্রেমের ক্রন্দণ।
গোপিকার বেশে নাচে মাধবনন্দন।।

উদ্ধৃত পদ দৃষ্টে বলা যায়, দুগ্ধ-দধির ভার নিয়ে মথুরা গমনকালে রাধা ও সখীদের সঙ্গে কৃষ্ণের বচসা একটা নাট্যিক ক্ষিপ্রতা লাভ করেছে। গদাধরের নৃত্য অসাধারণ শিল্প সূক্ষ্মতায় পরিবেশিত হয়েছিল। তা নইলে তাঁর নৃত্য সম্পর্কে এরূপ সুগভীর বিহ্বলতা ব্যক্ত হতো না।

এরপর বিশ্বম্ভর 'আদ্যাশক্তি বেশধর' রূপে প্রবেশ করলেন, নিত্যানন্দ সেজেছিলেন বড়াই। 'আদ্যাশক্তি' মূলে দূর্গা, এখানে রাধা ও দূর্গার অদ্বৈতরূপ বিবেচনা করা প্রয়োজন। স্মরণ করা যায়, অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদের মূল কথা হলো তর্কাতীত ঐক্যের উপলব্ধি। কাজেই এ নাট্যের প্রধান প্রধান চরিত্র বিশেষত চৈতন্যদেব অভিনীত চরিত্র একটিমাত্র নামের সরলরেখায় কাহিনীগত পরিণতি লাভ করেনি, বরং ঐ দর্শননিষ্ঠ অবতারবাদী চেতনায় নানা কাল নানা পুরাণ এবং লোকজ কাহিনী একীভূত সম্পদরূপে গ্রন্থিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় প্রহরের অভিনয়ে প্রথমে প্রবেশ করলেন বিশ্বম্ভর, সঙ্গে নিত্যানন্দ, রাধা ও বড়াই। নিখুঁত তাঁদের রূপসজ্জা, অপূর্ব সাত্ত্বিকভাব—তাতে ভক্তিরস সিক্ত হয়ে উঠে দর্শক—

আগে নিত্যানন্দ প্রভু বড়াইর বেশে।
বঙ্ক বঙ্ক করি হাটে প্রেমরসে ভাষে।।
মণ্ডলী হইয়া সর্ব বৈষ্ণব রহিলা।

জয় জয় মহাধ্বনি করিতে লাগিলা।।
কেহ নারে চিনিতে ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
হেন অলক্ষিত বেশ অতি মনোহর।।
নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর বড়াই।
তার পাছে প্রভু আর কিছু চিহ্ন নাই।।
অতএব সঙে চিনিলেন প্রভু শেষে।
সিন্ধু হৈতে প্রত্যক্ষ কি হইলা কমলা।
রঘুসিংহ-গৃহীনী কি জানকী আইলা।।
কিবা মহালক্ষ্মী কিবা আইলা পার্বতী।
কিবা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মূর্তিমতী।।
কিবা সেই মহেশ- মোহিনী মহামায়া।।
এই মতে অন্য-অন্যে সর্ব জনে জনে।
না চিনিয়া প্রভুরে আপনে মোহ মানে।।

বিশ্বম্ভরের অভূতপূর্ব নৃত্য, আদ্যাশক্তি রাধার মধ্যে একীভূত। সে-নৃত্য একই সঙ্গে 'কমলা', 'সীতা', 'পার্বতী', 'ভাগীরথী', 'মহামায়া'র মোহ জাগ্রত করে। আগেই বলা হয়েছে, নানা পুরাণ ভেঙে এক অভিন্ন ঐক্যে কৃষ্ণতত্ত্বকে অচিন্ত্যবাদে পরিশোধিত করেছিলেন শ্রীচৈতন্য, এ তারই ব্যাখ্যা মাত্র।

চৈতন্যভাগবতে আছে—

ঃ জগত জননী-ভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময় উচিত গীত গায় অনুচর।।

চৈতন্যদেব জগৎ জননী বেশে নাচলেন, এবং তার পরিকরবৃন্দ প্রয়োজনমত স্থলে স্থলে গীত পরিবেশন করল। এর অর্থ, এ নাট্যে দোহারের সংস্থান ছিল, দোহার উপযুক্ত সময়েই (একক বা সমবেত কণ্ঠে) গান ধরে, এখানেও তা পরিদৃষ্ট হয়। একালের লীলানাট্যেও দোহার অভিনয়-পরিবেশনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে অস্তিমান।

চৈতন্যদেবের আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক অভিনয়ের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন বৃন্দাবনদাস। বাহুল্য মনে হলেও এ থেকে তাঁর অভিনয়ের উজ্জ্বল দিকগুলোর সন্ধানলাভ করা যায়—

ঃ হেন না চাইতে কেহো নারে কোনজন।
কোন প্রকৃতির ভাবে নাচে নারায়ণ।।
কখনো বোলয়ে বিপ্র কৃষ্ণ কি আইলা।

তখন বুঝয়ে যেন বিদর্ভের বালা।।
নয়নে আনন্দধারা দেখিয়ে যখন।
মূর্তিমতী গঙ্গা যেন দেখিয়ে তখন।।
ভাববেশে যখন বা অট্ট অট্ট হাসে।
মহাচন্ডী হেন সভে বুঝিয়ে প্রকাশে।।
ঢলিয়া ঢলিয়া প্রভু নাচয়ে যখনে।
সাক্ষাৎ রেবতী যেন কাদম্বরী-পানে।।
ক্ষণে বোলে চল বড়াই যাই বৃন্দাবনে।
গোকুল সুন্দরী ভাব বুঝিয়া তখনে।।
বীরাসনে ক্ষণে প্রভু বসে ধ্যান করি।
সভে দেখে যেন মহাকোটি যোগেশ্বরী।।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজশক্তি আছে।
সকল প্রকাশে প্রভু রুক্মিণীর কাছে।।

রুক্মিণীর অভিনয়ের ভেতর দিয়েই চৈতন্যদেব বিষ্ণুপুরাণের প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য চরিত্র স্পর্শ করে উপনীত হয়েছেন মহাভাবে। এমন কি শৈব তান্ত্রিকতার 'চণ্ডী' বা মহামায়াও তাঁর অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদী তত্ত্বে বিষ্ণুপুরাণের সাঙ্গীকৃত।

এই গৃহাঙ্গন মঞ্চে কৃষ্ণ-প্রহরীর হাতে মশাল ছিল—

নাচেন ঠাকুর ধরি নিত্যানন্দ-হাত।
সে কটাক্ষ স্বভাব বলিতে শক্তি কাত।।
সমুখে দিউড়ি ধরে পণ্ডিত শ্রীমান।
চতুর্দিগে হরিদাস করে সাবধান।।

এই নৈশ-নাট্যলীলায় আলোক সম্পাতের ব্যবস্থাও মশালের মাধ্যমে নিস্পন্ন হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। আসামের লীলানাট্যের মঞ্চও মশাল দ্বারা আলোকিত করা হতো।

অভিনয়ের এক পর্যায়ে হলধর অবতার মূৰ্ছিত হয়ে পড়লেন, তাঁর বড়াই সাজ গেল খসে। বৈষ্ণব দর্শকদের মধ্যে ক্রন্দনের কোলাহল উঠল। গোপীনাথ কৃষ্ণের ভূমিকায়, তাঁকে ক্রোড় দিলেন বিশ্বম্ভর—খট্টার উপরে উঠে—

ক্ষণেকে ঠাকুর গোপীনাথ কোলে করি।
মহালক্ষ্মী-ভাবে উঠে খট্টার উপরি।।

সমুখে রহিলা সভে জোড়হস্ত করি।
মোর স্তব পড় বোলে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।
জননী-আবেশ বুঝিলেন সর্বজনে।
সেইরূপ সবে স্তুতি করে প্রভু শুনে।।[১৮]

এস্থলে মঞ্চে দ্বিতীয় ব্যক্তি গোপীনাথের উপস্থিতি লক্ষণীয়। এখানে মঞ্চোপকরণ রূপে উল্লিখিত হয়েছে 'খট্টা' বা খাটিয়া, পূর্বে যা সিংহাসন রূপে উক্ত। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে চৈতন্যদেব অভিনীত লীলানাট্যে যথাযথ মঞ্চোপকরণের অভাব ছিলনা।

অতঃপর মাতৃভাবে ক্রন্দনরত দর্শকদের স্তন্যদান করলেন চৈতন্যদেব—

ঃ মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সভারে ধরিয়া।
স্তনপান করায়ে পরম স্নিগ্ধ হৈয়া।।
কমলা পার্বতী দয়া মহানারায়নী।
আপনে হইলা প্রভু জগৎ জননী।।[১৯]

চৈতন্যদেব ঘোষণা করলেন যে, তিনি পিতা-পিতামহ, ধাতা এবং মাতা। গীতায় পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—

পিতা হহমস্য জগতো মাতাধাতা পিতামহ ঃ
বেদং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সমাযজুরের চ।।

অর্থাৎ আমিই এই জগতের পিতা মাতা ও সর্ব প্রাণীর কর্মফল দাতা, পিতামহ এবং একমাত্র জ্ঞেয় ও পরিশুদ্ধিকর বস্তু। আমিই ওঙ্কার এবং আমিই ঋক্‌বেদ, সামবেদ এবং যজুর্বেদ স্বরূপ।[২০]

বৃন্দাবন দাসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মূলে বিশ্বম্ভর কৃষ্ণরূপী। তিনি যে সকল চরিত্রে অভিনয় করেছেন, তা মায়া। অদ্বৈতপন্থীদের সঙ্গে এখানেই নিত্যানন্দ সম্প্রদায়ের মতভেদ। বৃন্দাবনদাসের সাক্ষ্য অনুসারে দেখা যায়, সে রাতে অভিনয়ের অন্তে চৈতন্যদেব নিজেকে অনাদ্যন্ত কৃষ্ণরূপে ঘোষণা করছেন। সে জন্য যারা তার সাধনাকে গোপিকা পন্থী বলে মনে করে, বৃন্দাবনদাস তাদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন—

ইহা না বুঝিয়া কোনো পাপী জনা জনা।
প্রভুরে বলয়ে গোপী খাইয়া আপনা।।

এ স্থলে একটা ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হয়। চৈতন্যদেব গোপীবেশেও নৃত্য করেছিলেন শ্রী চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহ প্রাঙ্গণে। এই নৃত্য থেকেই পরবর্তী কালে 'গোপিকা নৃত্যে'র উদ্ভব। গোপিকা নৃত্য ধামালির আঙ্গিকজাত।

চৈতন্যদেবের নাট্যাভিনয়, সমগ্র শৈব-বিষ্ণু-কৃষ্ণপুরাণের মধ্য দিয়ে, গীতায় সংস্থিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের পর, তিনি যে প্রেমধর্ম প্রচার করলেন, তার আদি ছাঁচ যেন বক্ষ্যমাণ নাট্যে লভ্য। যে অলোক-আবেশে যৌবনের প্রারম্ভে আলোড়িত হয়েছিলেন তিনি-নানা পুরাণের একটি অভিন্ন ঐক্য আবিষ্কারের প্রেরণায়, তাঁর আরাধ্য কৃষ্ণের অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠায় যে দার্শনিক চিন্তা তখন উদ্ভূত হয়েছিল, তারই শিল্পরূপ হল আলোচ্য লীলানাট্য। বৃন্দাবন দাস বলেছেন—

সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা।
আমি পিতা পিতামহ আমি ধাতামাতা।।
আনন্দে বৈষ্ণব সব করে স্তন পান।
কোটি কোটি জন্মজয়া মহাভাগ্যবান।।
স্তনপানে সভার বিরহ গেল দূর।
প্রেমরসে সভে মত্ত হইলা প্রচুর।।
এসব লীলার কভো অবধি না হয়।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র বেদে কয়।।
মহারাজ রাজেশ্বর গৌরাঙ্গ সুন্দর।
এহো রঙ্গ করিলেন নদীয়া ভিতর।।

লীলানাট্য কৃত্যমূলক। এ ধরনের নাট্যে সচরাচর মূল অভিনেতা বা গায়েনাভিনেতা নাট্যের অন্তে দর্শকদের মধ্যে গমনপূর্বক নানা পন্থায় দৈবপ্রসাদ বিতরণ করে থাকেন। গাজীর গানের শেষে গায়েন আরোগ্য লাভেচ্ছু দর্শকদের চোখে মুখে চমর বুলিয়ে দেয়। চৈতন্যদেবের স্তন্যদানের ঘটনাটি সম্পূর্ণ তাঁরই উদ্ভাবনা কিন্তু তা কৃত্য-পাঁচালি বা লীলানাট্যের ধারারই অংশ।

চৈতন্যদেব অভিনীত নাটকটি পরিবেশনরীতি বিচারে অনেকখানি তাঁর নিজের উদ্ভাবনা। এতে সংস্কৃত নাটকের রূপকগত আদল খুঁজতে যাওয়া যৌক্তিক নয় কারণ তিনি তাঁর নবোদ্ভূত ধর্ম ভাবনার দার্শনিক অভিপ্রায়ে সকল পুরাণকে ভেঙে গড়ে নিয়েছিলেন। সকল বিচ্ছিন্ন পুরাণের প্রচলিত আঙ্গিক ও প্রাণধর্মকে

যিনি সম্পূর্ণ একটি মাত্র ঐক্যে নতুন মাত্রা দান করলেন তিনি সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের অনুবর্তী বা ঐ শাস্ত্রে বর্ণিত 'অঙ্ক', 'বীথি বা অন্য কোন শাস্ত্রীয় আঙ্গিক গ্রহণ করেছিলেন একথা স্বীকার্য নয়।

আলোচ্য নাটকটির অন্ত্যপর্ব সম্পর্কে এরূপ একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, অভিনয় সমাপ্ত হবার পূর্বে চৈতন্যদেব ভাবাবেশে সংজ্ঞাহীন হন এবং নাটকের পরবর্তী অংশ সেজন্য আর অভিনীত হয়নি। এ ধারণাও ভ্রান্ত। বৃন্দাবনদাস, নিত্যানন্দের শিষ্য, চৈতন্যদেবের সমসাময়িক, সুতারাং এ সম্পর্কে তাঁর সাক্ষ্যই অধিকতর গ্রহণ যোগ্য। বৃন্দাবনদাস শুধু বলেছেন বড়াইবেশী নিত্যানন্দের সংজ্ঞাহীন হবার কথা।

'চৈতন্যভাগবতে' আছে যে, মহামায়ার স্তব পাঠের অন্তে রাত্রিশেষ হয়েছিল—

সভে লইলাম মাতা তোমার শরণ।
শুভদৃষ্টি কর তোর পদ রহমান।।
এইমত সভেই করেন নিবেদন।
উর্ধ্ববাহু কবি সভে করেন ক্রন্দন।।
গৃহমাঝে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
আনন্দ হইল চন্দ্রশেখর ভবন।।
আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে।
হেনই সময় নিশি হৈল অবসানে।
আনন্দে না জানে সভে নিশি হৈল শেষ।
দারুণ অরুণ আসি ভেল পরবেশ।।

সকল লীলানাট্যের শেষে উদ্দিষ্ট দেবদেবীর স্তুতি গীত হয়। এ নাট্যেও তা দেখা যায়। ভাবের আবেশে দর্শকমণ্ডলীর প্রহর জ্ঞানও লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সেজন্য 'আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে'। দেবীর স্তুতি থেকে প্রমাণিত হয়, তা নাট্যের সর্বশেষাংশ। এরপর স্তন্যদানের বিষয়টি—এহলো মূল মঞ্চের বাইরের কৃত্য—তা নাট্য সমাপন ব্যতিরেকে অনুষ্ঠেয় নয়। কাজেই স্তন্যদান থেকেও বুঝতে পারা যায়, চৈতন্যদেবের নাট্যলীলা সে রাত্রে সর্বাংশে সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। অবশ্য নিত্যানন্দ একবার মূর্ছাতুর হয়েছিলেন কিন্তু চৈতন্যদেবের কারণে অভিনয় ভঙ্গের কোনো উল্লেখ 'চৈতন্যভাগবতে' নেই। নিত্যানন্দের মূর্ছার

বিষয়টিও অন্যভাবেও বিবেচনা করা যায়। আমরা রামলীলায় দেখেছি, শক্তিশেলে লক্ষ্মণরূপী নিত্যানন্দের মূর্ছা এতদূর নিখুঁত ছিল যে, উপস্থিত দর্শকরা তাতে ভীতি বিহ্বল হয়ে পড়ে। পরে জানতে পারি যে, তা পূর্বকৃত কৌশল। এখানে অবশ্য নিত্যানন্দ মূর্ছাপ্রাপ্তি অনুরূপ কৌশলমাত্র একথা বলা যায় না।

এ নাট্যের সর্বাঙ্গ সমাপ্তি সম্পর্কে অন্যবিধ ইঙ্গিত দিয়েছেন বৃন্দাবন দাস—

পোহাইল নিশি হৈল নৃত্য অবসান।
বাজিল সভার বুকে যেন মহাবাণ।।
চমকিত হই সভে চারিদিকে চায়।
পোহাইল নিশি করি কান্দে উভরায়।।
কোটিপুত্র শোকেও এতেক দুঃখ নহে।
যে দুঃখ জন্মিল সর্ব বৈষ্ণব হৃদয়ে।[২১]

এ নাট্যের যৌক্তিক সমাপ্তি সম্পর্কে বৃন্দাবন দাসের এই বিবরণই যথেষ্ট যে নিশি প্রভাত হলো, নৃত্যও শেষ হলো।

চৈতন্যদেব নৃত্যপটু ছিলেন। পরিকরবৃন্দ সহকারে যূথবদ্ধ নৃত্যে মেতে উঠতেন তিনি—

উষঃ কাল হৈতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর।
যূথ যূথ হৈল যত গায়ন সুন্দর।।
শ্রীবাস পণ্ডিত লৈয়া এক সম্প্রদায়।
মুকুন্দ লৈয়া আর জন কথো গায়।।

তাঁর সাত্ত্বিক অভিনয়ের খ্যাতি ছিল। নাটগীতে যে তিনি দক্ষ ছিলেন তাও উল্লিখিত হয়েছে ঃ

কেহ বোলে ভাল ভাল নিমাঞি পণ্ডিত।
ভাল ভাব লাগে ভাল লাগে নাটগীত।।

মধ্যযুগে বাঙলা নৃত্যপদ্ধতিও খানিকটা সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর হাতে। 'উদ্দণ্ড নৃত্য' ও 'মধুর নৃত্য' একান্তভাবে, বৈষ্ণবীয়—

যখন উদ্দণ্ড নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর।
পৃথিবী কম্পিত হয় সভে পায় ডর।।
কখনো বা মধুর নাচয়ে বিশ্বম্ভর।
যেন দেখি নন্দের নন্দন নটবর।।[২২]

নাথ সাধনায় নৃত্য আছে, সুফিতন্ত্রেও দরবেশের নৃত্য প্রচলিত।

চৈতন্যদেব বিভিন্ন সময়ে নানা পৌরাণিক চরিত্রের ভাবাবেশে আচ্ছন্ন হতেন। শ্রীবাসের গৃহে একদা তিনি বিষ্ণু সেজেছিলেন, অমৃতলোভী গরুড়ের স্কন্ধে আরোহণপূর্বক তিনি গৃহপ্রাঙ্গণে বিচরণ করেছিলেন। চৈতন্যদেব অভিনীত বহুশ্রুত সেই লীলা নাট্যের পূর্বে এধরনের ভাবাবেশ তাঁর আনুষ্ঠানিক নাট্যাভিনয়ের পূর্ব সঙ্কেতরূপে গ্রাহ্য।

'চৈতন্যভাগবতে' সমকালে প্রচলিত গীতি-পালার বিবরণও পাওয়া যায়—

ঃ কৃষ্ণযাত্রা অহোরাত্রি কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
ইহার উদ্দেশ্য নাহি জানে কোনজন।।
ধর্ম কর্ম লোকসব এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে।।
দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি।
তাহা সে পূজেন সেহো মহাদম্ভ করি।।
যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত।
ইহাই শুনিতে সর্ব্বলোক আনন্দিত।।

এখানে 'কৃষ্ণযাত্রার' অর্থ হলো কৃষ্ণের জন্ম তিথি উপলক্ষে শোভাযাত্রা। কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্বে নাট্যরূপে যাত্রার কোনোরূপ অস্তিত্ব থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। উদ্ধৃতপদে প্রাচীন বাঙলা নাট্যমূলক গীতিকা হিসেবে যোগীপাল, ভোগীপাল ও মহীপালের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞের মতে এ সকল গীতিকাহিনী হলো 'শিব' এবং 'মীননাথ' 'জালন্ধরীপা' 'কাহ্নপা' 'গোপীচন্দ্র' প্রমুখ 'যোগসিদ্ধাদের উপখ্যান'।[২৩]

সেকালে জলনাট্য ব্যতিরেকেও নদী সরোবরে 'কয়া' নাম জলখেলার প্রচলন ছিল। চৈতন্যদেব নীলাচলে রামকৃষ্ণের জন্ম যাত্রায়, জলে গৌড়দেশীয় জলখেলা প্রদর্শন করেন—

ঃ গৌড় দেশে জলকেলি আছে কয়া নামে।
সেই জলক্রীড়া আরম্ভিলেন প্রথমে।।

এ খেলার বোল হচ্ছে 'কয়া কয়া'। এতে বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযুক্ত হতো—

ঃ কয়া কয়া বলি করতালি দেন জলে।
জলে বাদ্য বাজায়েন বৈষ্ণব মণ্ডলে।।

এই ক্রীড়া পৌরাণিক জলকেলির ছলেই পরিবেশিত হতো, সুতরাং তা নাট্যমূলক—

গোকুলের শিশুভাব হইল সভার।
প্রভুও হইলা গোকুলেন্দ্র অবতার।।[২৪]
পূর্ব্বে যেন জলকেলি হৈল দ্বারকায়।
সেই সব ভক্ত লই শ্রী চৈতন্য রায়।।....

'চৈতন্যভাগবতে'র একটি সংস্কারণে, পরিকর গদাধরের লীলাভিনয়ের ইঙ্গিত আছে। চৈতন্যসঙ্গী রূপে গদাধর বৃন্দাবন গমনকালে রাধার ভাবাবেশে স্বানুভব প্রদর্শন করেছিলেন—

ঃ ক্রোশ পাঁচ ছয় আছে যমুনার তীর।
বাহ্য ছাড়ি গদাধর হইল অস্থির।।
দধি নিবে ঘোল নিবে ডাকে পরিত্রাই।
শুনিয়া যতেক লোক আইসে ধাঞাধাঞি।।[২৫]....ইত্যাদি।

এতে সেকালের পথ-নাটকের ইঙ্গিত আছে।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনার উর্ধ্বতম সময়কাল ১৫৫০ খৃষ্টাব্দ বলে অনুমিত হয়েছে।[২৬] চৈতন্যমঙ্গল' পাঁচালি, জয়ানন্দ নিজেই তা গান করতেন। আদিখণ্ডে কবি বলেছেন—

ঃ ইবে শব্দ চামর সঙ্গীত বাদ্যরসে।
জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল গাএ শেষে।।[২৭]

এখানে অক্ষর বা ভাবা অর্থে 'শব্দ' কথাটা গ্রহণ করলে দেখা যায় এর সঙ্গে চামর (কৃত্য-পাঁচালির হস্তবাহিত দ্রব্য সম্ভার) সঙ্গীত ও বাদ্য সংযোগে 'চৈতন্যমঙ্গল' আসরে উপস্থাপিত হতো। পাঁচালির পরিবেশনগত উপাদানের এমত উল্লেখ অন্য কোনো কবির রচনায় সচরাচর দেখা যায় না।

'চৈতন্যমঙ্গল' সর্বমোট নয়টি খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ডগুলি যথাক্রমে আদি, নদীয়া, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, উৎকল, প্রকাশ, তীর্থ, বিজয় ও উত্তরখণ্ড। কবি নানা ছন্দে এই কাব্য রচনা করেছিলেন—সে কথা উল্লেখ করছেন—

ঃ চৈতন্যমঙ্গল গীত ত্রিজগত আনন্দিত
জয়ানন্দ রচে নানা ছন্দে।[২৮]

কাব্যের সর্বত্র রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। নাচাড়ির সংখ্যা কম নয়। তবে পয়ার ও নাচাড়ি পদের শীর্ষে-ততো দিশা, ততো কথা দিশা, ততঃকথা, কথা দিশা, ততদিশা কথা প্রভৃতি পরিবেশনারীতি-জ্ঞাপক শব্দ আছে।

'চৈতন্যমঙ্গলের' 'নদীয়া খণ্ডে'র ৬৯ সংখ্যক পদে চৈতন্যদেবের নাট্যাভিনয়ের বিবরণ পাই—

কথা দিশা

ঃ একদিন গৌরচন্দ্র সংকীর্ত্তন নাচে।
নটবর বেশে অকিঞ্চনে প্রেম জাচে।।
খেনে শিখি পুচ্ছ চূড়া গলে গুঞ্জা দাম।
খেনে গৌরচন্দ্র খেনে মেঘারম্ভ শ্যাম।।
জে জে ভাবে নাচে তা বুঝিতে শক্তি কার।
ভাবাবেশে কত কত অশেষ বিকার।।
ব্রহ্ম হর ইন্দ্র চন্দ্র দেখে অন্তরীক্ষে।
জয় জয় হরিধ্বনি শুনি কত লক্ষে।।
তুম্বুরু নারদ গান শ্রীবাস পণ্ডিত।
মুকুন্দ আলাপে নিত্যানন্দ আনন্দিত।।
সর্ব্বলোকে হরি বলান ঠাকুর হরিদাস।
অদ্বৈত গোসাঞি দেখি বাড়িল উল্লাস।।
বিষ্ণুভাব দেখিআ নারদ শ্রীনিবাস।
নৃসিংহ ভাব দেখি প্রহলাদ হরিদাস।।
রঘুনাথ ভাব দেখিয়া চন্দ্রচূড়।
মুরারি গুপ্তের দেখ দিঘল লেঙ্গুড়।।
গোরাঙ্গ কানাঞি নিত্যানন্দ বলরাম।
শ্রীরামদাস সুন্দরানন্দ শ্রীদাম সুদাম।।
কৃষ্ণভাবে নাচে গৌর অপার মহিমা।
গদাধর জগদানন্দ রাধা সত্যভামা।।
রাধা গদাধর আর গোবিন্দ গরুড়।
মুকুন্দ বাসুদেব দত্ত রুক্মিণী অক্রূর।।
মোহিনীর বেশ ধরি নাচে গৌরচন্দ্র।

তা দেখিয়া বিস্ময় অদ্বৈত নিত্যানন্দ।।
প্রকৃতির ভাব দেখি বাসুদেব চমৎকার।
লক্ষ্মী রূপাধিক হইল শচীর কুমার।।
সপ্ত প্রহর প্রভু রহিলা অচৈতন্যে।
দেখিয়া প্রমাদ সভে মানিল সামান্যে।।[২৯]

এই বর্ণনা দৃষ্টে, সে রাতের অভিনেতাদের একটি তালিকাও মিলছে—

চৈতন্যদেব	-	কৃষ্ণ ও লক্ষ্মী
তুম্বুরু নারদ	-	শ্রীবাস পণ্ডিত
প্রলহাদ	-	হরিদাস
রঘুনাথ	-	চন্দ্রচূড়
মুরারি গুপ্ত	-	হনুমান
নিত্যানন্দ	-	বলরাম
শ্রীরামদাস ও সুন্দরানন্দ	-	শ্রীদাম ও সুদাম
গদাধর	-	রাধা
জগদানন্দ	-	সত্যভামা
গোবিন্দ	-	গরুড়
মুকুন্দ ও বাসুদেব	-	রুক্মিণী ও অক্রূর।

বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার সঙ্গে এর খানিকটা মিল আছে। কিন্তু নানা চরিত্রের বিস্তারিত রূপসজ্জার পরিচয় এবং নাট্যাভিনয়ের এক পর্যায়ে বিশ্বম্ভরের অচৈতন্য অবস্থায় 'সাত প্রহর' অতিবাহিত হওয়ার বিবরণ দৃষ্টে মনে হয় জয়ানন্দ অতিরঞ্জন করেছেন অথবা চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে অভিনীত নাটকের রূপসজ্জার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে চৈতন্যদেব ও তাঁর পরিকরবৃন্দের নানা পৌরাণিক চরিত্রের স্বানুভবজাত ও ভাবাবেশগত আচরণকে এক করে ফেলেছেন। অবশ্য সর্তকভাবে পাঠ করলে হরিদাস, অদ্বৈত, শ্রীনিবাস সর্বোপরি চৈতন্যদেবের লক্ষ্মী 'রূপাধিকে'র প্রসঙ্গ আচার্যের গৃহে অভিনীত নাটকের কথাই মনে করিয়ে দেয়। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেব অভিনীত নাটকটির প্রস্তুতি থেকে অন্ত পর্যন্ত সুবিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। জয়ানন্দ বৃন্দাবনদাসের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন অথচ তাঁর কাব্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত নাট্যাভিনয়ের বিবরণ অনুসরণ করেন নি। জয়ানন্দ সর্পদংশনে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণান্তে চৈতন্যদেবের উল্লসিত নৃত্যের

কথাও বলেছেন। বিশেষজ্ঞের মতে তা 'অবিশ্বাস্য হলেও জয়ানন্দের কাছে স্বাভাবিক ও চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ'।[৩০] এত লোকের রূপসজ্জা গ্রহণ ও চৈতন্যদেবের 'সাত প্রহর' অচৈতন্য থাকার ঘটনা অবিশ্বাস্য বলে মনে করাই সঙ্গত।

'চৈতন্যমঙ্গলে'র উৎকল—১৯ সংখ্যাক পদে, নীলাচলে কৃষ্ণ জন্মযাত্রা উপলক্ষে 'কাপ' (কৌতুককারী, অভিনেতা) প্রসঙ্গ আছে। নাটকের কলাকুশলী অর্থেও সেকালে 'কাপ' শব্দটি ব্যবহৃত হতো—

ঃ ভাদ্রে কৃষ্ণাষ্টমী জন্ম যাত্রা নীলাচলে।
কপটে কৃষ্ণের জন্ম হইল বন্দিশালে।।
কাপ লৈয়া আল্য যত দেবতা গন্ধর্ব্ব।
নীলাচলে জন্ম যাত্রা জগন্নাথের পর্ব্ব।।

এখানে 'জন্মযাত্রার' সঙ্গত অর্থ হলো কৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব। তা নাটক অর্থে প্রযুক্ত নয়। জন্মযাত্রা 'জগন্নাথের পর্ব্ব' রূপেও অভিহিত হতো। কাপগণের অভিনয় জন্মযাত্রা উৎসবের অন্তর্গত। এ থেকে দেখা যায় নীলাচলের মতো ভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলেও ষোড়শ শতকে নাটক অর্থে 'যাত্রা' ব্যবহৃত হতো না। জয়ানন্দ যে বিবরণ দিয়েছেন তা লীলানাট্যেরই বিষয়—

ঃ কেহো বসুদেব কেহো দৈবকী হইলা।
কংস হয়্যা কেহো কারাগারে বন্দী কৈলা।।
ভাদ্রে কৃষ্ণাষ্টমী তিথি রোহিণী নক্ষত্রে।
মথুরাতে জন্মিলা কৃষ্ণ দুই প্রহর রাত্রে।।
বসুদেবে থুইল লঞা নন্দ ঘোষ ঘরে।
যশোদার কন্যা আনি ভাণ্ডিল কংসেরে।।
বিষস্তন পানে কৃষ্ণ বধিল পুতনা।
ব্রহ্মপদ পাইল তার মাতৃভাবনা।।
শকট ভাঙ্গিআ তৃণাবর্ত্ত বধ কৈল।
মৃত্তিকা ভক্ষণে মাত্র ভূগোল দেখাইল।।
কৃষ্ণ নাম থুইল গর্গ মুনি মহাশয়।
ধান্য দিআ ফল খাইল নন্দের আলয়।
দধি খাএ ভাণ্ড ভাঙ্গে ধাইল সত্বরে।
উদুখলে যশোদা বান্দিল গদাধরে।।

যমল অর্জুন ভাঙ্গে লোকে চমৎকার।
শাপে মুক্ত হইল দুই কুবের কুমার।।
গোকুল ছাড়িল নন্দ উৎপাত দেখিয়া।
বৃন্দাবনে রহিল যমুনাকূলে গিয়া।
বৎসক মারিল কৃষ্ণ গোরু রাখে গোঠে।
পানি পিতে সম্যাইল বকাসুর পেটে।।
অঘাসুর মারিয়া ব্রহ্মারে বিড়ম্বিল।
ধেনুক মারিয়া শিশুসনে তাল খাইল।।
ইন্দ্রসনে বাদ করি পর্ব্বত ধরিল।
বরুণের ঘর হইতে নন্দ উদ্ধারিল।।
বৃন্দাবনে রাসক্রীড়া করিল কৌতুকে।
সুদর্শনের শাপ খণ্ডাইল একে একে।।
শঙ্খচূড় অসুর মারিল সুছন্দে।
নারদ বচনে কংস বসুদেবে বান্ধে।।
কেশী বধ ব্যোম বধ কৈল একে একে।
রামকৃষ্ণ অক্রূর লইল মথুরাকে।।
রজক মারিয়া মালাকারে বর দিল।
কুবুজীর গন্ধ লয়্যা কুজ ঘুচাইল।।[৩১]
ধনুর্ল্যায় যজ্ঞস্থানে ধনুক ভাঙ্গিল।
কুবলয় হস্তী কংস দুয়ারে মারিল।।
চানুর মুষ্টিক মারি নিস্তারিল প্রজা।
মঞ্চে হৈতে মারিয়া পাড়িল কংস রাজা।[৩২]

শুধু তাই নয়, জয়ানন্দের সাক্ষ্যমতো ভাগবতপুরাণের এমন কোনো প্রসঙ্গ নেই যা, জগন্নাথের জন্মযাত্রায় অভিনীত হয় নি। জরাসন্ধের ভয়ে কৃষ্ণের পলায়ন এবং সমুদ্রে দ্বারকাপুরী নির্মাণ থেকে, জাম্ববতী সত্যভামার 'বিভা', বজ্রনাভ বধ, যাদবদের হানাহানি ও তাদের ধ্বংস পর্যন্ত সমগ্র কৃষ্ণকাহিনী পরিবেশনার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। এ বর্ণনার কিছু অংশের সঙ্গে বৃন্দাবনদাস বর্ণিত নিত্যানন্দের লীলাভিনয়ের সাদৃশ্য আছে। উপরন্তু এত সুবিস্তৃত কাহিনীর অনুপার্ষিক উপস্থাপনা, নীলাচলের উৎসবে সম্ভব হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু এ থেকে, কবির বর্ণনা দৃষ্টে সেকালে উড়িষ্যায় প্রচলিত লীলানাটের একটা চিত্র পাওয়া যেতে পারে সন্দেহ নেই।

দেখা যায় কৃষ্ণের জন্ম থেকে তিরোধান পর্যন্ত সুবিস্তৃত কাহিনী নীলাচলের জন্মযাত্রা উৎসবে অভিনীত হয়েছিল। কৃষ্ণের আদ্যন্ত কাহিনী নিঃসন্দেহে শুধু 'জন্মযাত্রা' নামে অভিহিত হতে পারে না। এদিক থেকেও বিচার করে বলা যায়—জন্মযাত্রা—নাট্যের নয়, তা মূল উৎসবের নাম।

জন্মযাত্রা শেষে স্বর্গে যথাবিহিত প্রত্যাবর্তন করলেন দেবতাগণ—

ঃ এতাবধি জন্মযাত্রা হইল নীলাচলে।
স্বর্গে গেলা দেবগণ রথে কুতূহলে।[৩৩]

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' নীলাচলের নাট্যাভিনয় বিবরণের সমাপ্তি এখানেই।

লোচনদাসের 'শ্রী শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' '১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত' এ কাব্যও গেয় পাঁচালি। ভণিতায় আছে—

ঃ গোরাগুন গায় মুখে এ লোচন দাস।
ঃ আনন্দে লোচন গায় গোরাগুন গাথা।

এ 'কাব্য মঙ্গল-বিজয়' অর্থাৎ পাঁচালি রূপে পরিবেশিত হতো তার প্রমাণ আছে—

ঃ চৌদিকে জয় জয় মঙ্গল বিজয়
হয়ে লোচন দাসে।

মধ্য খণ্ডের অন্তে, একটি পাঠান্তরে এ কাব্য যে 'পাঁচালি প্রবন্ধে' রচিত তার উল্লেখ লভ্য—

ঃ যে কিছু কহিল নিজ বুদ্ধি অনুরূপ।
পাঁচালি প্রবন্ধে কঁহো মো ছার মুরুখ।।[৩৪]

'চৈতন্যমঙ্গলে' সুদীর্ঘ নাচাড়ি আছে। এছাড়া 'দিশা' (২য় অধ্যায়, মানিকদত্তের পুঁথি প্রসঙ্গে আলোচনা দ্রষ্টব্য) শ্রেণীর পদও দৃষ্ট হয়—

ঃ আহিরী রাগ। দিশা।
আবে না ছাড়িহ মোরে।
তোমা বহি কেহ নাহি সকল সংসারে।।

এই মনে অনুমানে জানাজানি কথা।
সন্ন্যাস করিবে পুত্র শুনে শচীমাতা।।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মস্তক উপরে।
অচেতন হৈলা মূৰ্চ্ছিত অন্তরে।।৩৫

লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গলে', পালাভিনয়ের অভিনব প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। মধ্যখণ্ডের একটি পদ 'তর্জ্জাবন্ধ' রূপে উল্লিখিত হয়েছে। তর্জ্জাবন্ধ—আরবী তরজিহ্-বন্দ্ থেকে গৃহীত। এ হচ্ছে দু'দলের তাৎক্ষণিকভাবে গান রচনার মাধ্যমে পরস্পরকে আক্রমণ। অবশ্য নাচাড়ি ছন্দে রচিত লোচনদাসের এই পদটিতে, উক্তি-প্রত্যুক্তিসমূহের কোনো দলগত ভাগ নেই এমনকি সম্পূর্ণ পদটি নিছক বর্ণনাধর্মী, তবু এর মধ্যে স্তবক বিন্যাসে 'তরজা'র একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। পদের প্রথমে ধুয়া—

ঃ কমলা-সেবিত পদে মহেশ ধেয়ায়ে।
বল দেখি কৃষ্ণপদ পাব কি উপায়ে।। ধ্রু।।

মূলে পদটির প্রারম্ভে দিশাপদ একবার মাত্র উল্লেখিত হয়েছে। আমরা এই পদের স্তবক বিভাজন অনুসারে, উদ্ধৃত 'দিশাপদ' নির্দেশপূর্বক-এর সম্ভাব্য পরিবেশনারীতি নির্ণয় করেছি—

ঃ শুন সৰ্ব্বজন সংসার দারুণ
সংশয় করিব মোরে।
বিষম বিষয় যেন বিষময়
গুপতে অন্তর পোড়ে।।
... ...
ঃ কমলা-সেবিত পদ মহেশ ধেয়ায়ে।
বল দেখি কৃষ্ণপদ পাব কি উপায়ে।।
ঃ শুন সবজন, কহিলু মরম,
আশীৰ্ব্বাদ কর মোরে।
কৃষ্ণে রতি হউ, এ দুখ পালাউ,
এবর মাগোঁ সভাকারে।।
কৃষ্ণের চরিত, গাও অবিরত,
বদনে লাগয়ে সাধে।
শ্রীমুখ কমলে, নয়ান যুগলে,

হিয়া বান্ধ ছিরিপদে।।

কি কহিব ইহা, কৃষ্ণ না দেখিয়া,

মরমে বিরহজ্বালা।

সংসার সাগরে, অকূল পাথারে,

চিত বিয়াকুল ভেলা।।

... ...

ঃ কমলা-সেবিত পদ মহেশ ধেয়ায়ে।

বল দেখি কৃষ্ণপদ পাব কি উপায়ে।। ধ্রু।।

ঃ হরি হরি বোল, ডাকে উতরোল,

সঘন নিশ্বাস নাসা।

অঙ্গের পুলক, আপাদ মস্তক,

গদগদ আধ ভাষা।।

খণএ রোদন, খণএ বেদন,

খণে চমকিত চাহে।

ক্ষণে হাপ ঝাঁপ, কলেবর কাঁপ

উঠয়ে কৃষ্ণবিরহে।।

ঃ কমলা-সেবিত পদ মহেশ ধেয়ায়ে।

বল দেখি কৃষ্ণপদ পাব কি উপায়ে।। ধ্রু।।

ঃ দেখি সবজন, গুণে' মনে মন,

অন্তরে বেথিত হঞা।

কি কহিব আরে, শোকের পাথারে,

পড়িল যে হেন গিয়া।।

... ...

ঃ কমল-সেবিত পদ মহেশ ধেয়ায়ে।

বল দেখি কৃষ্ণপদ পাব কি উপায়ে।।

ঃ শুন সব জন আমার বচন,

সন্দেহ না কর কেহো।

যথা তথা যাই, তোমা সভা ঠাই,

আছিয়ে জানিহ এহো।।

তবে বিশ্বম্ভর, গেল নিজঘর,

সভারে বিদায় দিয়া।
সন্ন্যাস আশয়ে যতেক করয়ে,
জননী না জানে ইহা।।
শচীর অন্তরে ধক্ ধক্ করে,
সোয়াথ না পায় চিতে।
লোচন বোলে হেন, প্রেমের সাগর,
কি লাগি চাহে ছাড়িতে।।[৩৬]

তরজা সাধারণ অর্থে 'সহজবোধ্য প্রবচন'। কিন্তু উদ্ধৃত পদটি কোনোমতে উক্ত অর্থে গ্রহণ করা যায় না। কারণ এ হচ্ছে বিশ্বম্ভরের কৃষ্ণবাসনার উৎক্ষিপ্ত উচ্চারণ, এর ধুয়া পদটি মূলত প্রশ্নমূলক। এতে দোহারগণের জিজ্ঞাস্য এই লক্ষ্মীপূজিত যে বিষ্ণুপদ শিবও ধ্যান করেন—সেই বিষ্ণুরূপী কৃষ্ণকে কিভাবে পাওয়া যাবে। সুতরাং এখানে 'তর্জ্জাবন্ধ'কে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক প্রবন্ধ রূপে গ্রহণই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

এছাড়া একটি পদ শীর্ষে 'ধূলাখেলাজাত' কথাটার উল্লেখ আছে পদটি 'করুণা ছন্দে' রচিত—

ঃ তবে দেবী শচীরাণী কহে মন কাহিনী
হিয়া দুঃখে বিরস বদন।
মুখে না নিঃসরে বাণী দু নয়ানে ঝরে পানী
দেখি বিষ্ণুপ্রিয়া অচেতন।। ইত্যাদি

সম্ভবত এটি পরিবেশনাত্মক কোনো শব্দ—এবং তা নৃত্য-সংক্রান্ত নির্দেশ হওয়াই স্বাভাবিক।

অবশ্য মধ্যখণ্ডের আরো একটি পদে রাগনাম পূর্বে 'ধূলাখেলাজাত (বড়ারি রাগ)' কথাটির উল্লেখ আছে।

লোচনদাসে, 'চৈতন্যভাগবতে'র অনুরূপ শিবগীতের উল্লেখ মেলে—

ঃ তারপর দিনে কথা শুন সর্ব্বজন।
আচম্বিতে আইল এক শিবের গায়ন।।
নমস্কার করি গৌরহরির চরণে।
মহেশের গুণগায় আনন্দিত মনে।।
শিব শিব করি ডাকে অন্তরে উল্লাস।

শিবের ভকতি তার দেহে পরকাশ।।
শুনি আনন্দিত মন ভৈগেল ঠাকুর।
শিবগুণ শুনি সুখ বাড়িল প্রচুর।।
শিবের আবেশে নৃত্য-করয়ে তখন।
আপনা পাসরে সুখে শিবের গায়ন।।
তার সম ভাগ্যবান নাহি কোনজন।
আপনে ঠাকুর কৈল স্কন্ধে আরোহণ।।
স্কন্ধে করি আনন্দে সে নাচয়ে গায়ন।
আবেশে হইল প্রভুর রকত লোচন।।
শিবের আবেশে কহে শিবের কথন।
খটক ডম্বরু মুখে শিঙ্গার গর্জ্জন।।
রামকৃষ্ণ বলিয়া সে কাঁদে ডাকে হাসে।
ক্ষণেক কান্দয়ে গোরা শিবের আবেশে।।
শ্রীবাসপণ্ডিত সেই সর্ব্বতত্ত্ব জানে।
শিব স্তব পড়ে সেই সাবধান মনে।।
পড়য়ে মহেশ স্তব শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
আনন্দে নাচয়ে তারা জানে সর্ব্বতত্ত্ব।
গায়নের কান্ধে হৈতে নাম্বিলা ঠাকুর।
হরি পরায়ণ হরি গায়ে ত প্রচুর।।[৩৭]

চৈতন্যদেবের নাট্যাভিনয়ের বর্ণনা লোচনদাসও বিবৃত করেছেন। তাঁর প্রদত্ত তথ্য বৃন্দাবনদাসের মতো পারম্পর্যসূত্রে গ্রন্থিত না হলেও তাতে 'চৈতন্যভাগবতে' বিবৃত কাহিনীর সমর্থন পাওয়া যায়।

লোচনদাস বিশ্বম্ভর অভিনীত নাটকটিকে বলেছেন, 'গোপীকার গুণ

ঃ নিজজন সঙ্গে করি শ্রীবিশ্বম্ভর হরি
শ্রীচন্দ শেখর বাড়ী গেলা।
কথা পর সঙ্গে কথা গোপীকার গুণ গাথা
কহিতে সে গদগদ ভাষ।।

চৈতন্যদেব সংকল্পমাত্র বেশধারণ করেছিলেন, এবং শ্রীবাস নারদ সেজেছিল—

ঃ তবে বিশ্বম্ভর হরি গোপিকার বেশ ধরি
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য ঘরে।

নাচয়ে আনন্দে ভোলা   শ্রীবাস হেনই বেলা
নারদ আবেশ ভেল তারে।।[৩৮]

এ বিবরণ বৃন্দাবনদাসের তুলনায় দায়সারা গোছের বলেই মনে হয়।

কিন্তু চৈতন্যদেবের রূপসজ্জার এক অনুপম চিত্রও লোচনদাসে লভ্য। একটি পদে আছে—

ঃ এখন কহিয়ে শুন   সাবধানে সর্ব্বজন,
গোপীকা আবেশ বশ প্রভু।
হৃদয়ে কাঁচালির পরে   শঙ্খ কঙ্কণ করে
দুটি আঁখি রসে ডুবু ডুবু।।
পট্ট বসন পরে   নূপুর চরণ তলে
মুঠে পাই ক্ষীণ মাজাখানি।
রূপে ত্রিজগত মোহে   উপমা বা দিব কাহে
গোপীবেশ ঠাকুর আপনি।।
আলোক অঙ্গের তেজে   বায়ু বহে মলয়জে
তাহে নব মালতীর মালা।
সুমেরু শিখরে যেন   সুরনদী ধারা হেন
গোরা অঙ্গে বহে দুই ধারা।।
সকল বৈষ্ণব মাঝে   নাচে মহানটরাজে
রসের আবেশে ভাব ধরে।
এই মন করিতে   লখিমী পড়িল চিতে
সেই বেশে গেলা প্রভুঘরে।।

এই পদ বৈষ্ণবীয় গীতিরস-স্নিগ্ধ। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যের গোপিকা-রতিকে অস্বীকার করেছেন—কিন্তু লোচনদাস নাট্যের শুরুতেই চৈতন্যদেবকে গোপীবেশে দেখেছেন।

নাট্যাভিনয়ের এক পর্যায়ে আদ্যাশক্তিরূপে চৈতন্যদেবের ঘোষণা এখানেও পাই—

ঃ আমি চণ্ডী পরচণ্ড   সভে হবে প্রচণ্ড।
এই বর দিল সর্বজনে।।[৩৯]

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' (১৬১০ অব্দের কিছুকাল আগে রচিত) চৈতন্যের জীবন-চরিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রসঙ্গের নানাস্তরে তিনি বৈষ্ণব

অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈতবাদী দর্শনের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন—তা অন্যত্র দুর্লভ। তাঁর ভাষা দার্শনিকের, একজন সাধারণ চরিতাখ্যান রচয়িতার নয়। জীবন-জগৎ, লৌকিক-অলৌকিকের সর্বক্ষেত্র থেকে আহরিত দার্শনিক প্রামাণ্য, তুলনা ও উপমা, জটিল তত্ত্বের অনুপুঙ্খ মীমাংসা সমগ্র 'চৈতন্যচরিতামৃত'কে এক কালোত্তীর্ণ মহিমা দান করেছে। চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ্য কাব্য।[৪০]

এ গ্রন্থে চৈতন্যদেবের কৃষ্ণলীলা ও রামলীলাভিনয়ের বিবরণ আছে। বৃন্দাবনদাসের ' চৈতন্যভাগবতে' এই লীলানাট্যের কথা অনুল্লেখিত।

চৈতন্যদেব দবীরখাশ ভ্রাতৃদ্বয়কে আর্শীবাদপূর্বক নব-নামকরণ করলেন রূপ ও সনাতন। দুজন চৈতন্যকে গৌড়রাজ থেকে সাবধান করে বিদায় নিলেন। কারণ এত ভক্ত এক সাথে থাকলে রাজরোষে পতিত হবার সম্ভাবনা। প্রাতে চৈতন্যদেব এলেন কানাইয়ের নাটশালে, সেখানে তিনি কৃষ্ণচরিত্র লীলা উপভোগ করলেন (এ বিষয়ে আলোচনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। নাটশালায় কৃষ্ণলীলার পরিবেশন থেকে দেখা যায় সেকালে নাটশালের অস্তিত্ব ছিল এবং কৃষ্ণবিষয়ক নাট্য কৃষ্ণলীলা বা 'কৃষ্ণচরিত্র লীলা' (দেখিলা সকল তাঁহা কৃষ্ণ চরিত্র লীলা) নামেও অভিহিত হতো।

'চৈতন্যচরিতামৃতে' পাঁচজনে দোহার মিলে 'পালিগান' পরিবেশনের প্রসঙ্গ দেখা যায়। এ হচ্ছে জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তদের কৃত্যানুষ্ঠান—

ঃ তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া।
চারি সম্প্রদায় কৈল গায়ন বাঁটিয়া।।
নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে।
চারিজনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে।।
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ-প্রধান।
আর পঞ্চজন দিল তার পালি গান।।
দামোদর নারায়ণ দত্ত গোবিন্দ।
রাঘবপণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ।।
অদ্বৈত-আচার্য্য তাঁহা নৃত্য করিতে দিল।
শ্রীবাস-প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল।।[৪১]

চৈতন্যদেবের তাণ্ডব নৃত্যের উল্লেখও জগন্নাথের রথযাত্রা বিবরণে লভ্য—

ঃ এই মত তাণ্ডব-নৃত্য করি কতক্ষণ।
ভাব বিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন।।

'মধ্যলীলা'র পঞ্চদশ অধ্যায়ে চৈতন্যদেব ও ভক্তগণের কৃষ্ণলীলা ও রামলীলা-ভিনয়ের উল্লেখ দেখা যায়—

ঃ এই মত নানা রঙ্গে চতুর্মাস্য গেল।
কৃষ্ণজন্ম যাত্রায় প্রভু গোপবেশ হৈলা।
কৃষ্ণজন্ম যাত্রা দিনে নন্দমহোৎসব।
গোপবেশ হৈলা প্রভু লৈয়া ভক্ত সব।।
দধি-দুগ্ধভার সবে নিজ কান্ধে করি।
মহোৎসবের স্থানে আইলা বলি হরি হরি।।
কানাঞি খুঁটিয়া আছে নন্দবেশ ধরি।
জগন্নাথ মাহিতী হইয়াছে ব্রজেশ্বরী।
আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্র কাশী।
সার্ব্বভৌম আর পড়িছা পাত্র তুলসী।।
ঞিহা সব লইয়া প্রভু করে নৃত্যরঙ্গ।
দধি দুগ্ধ হরিদ্রা জলে বরে সবার অঙ্গ।।[৪২]

এ কৃষ্ণের দানলীলার অভিনয়। এরপর বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলার প্রসঙ্গ। চৈতন্যদেব যে লাঠি-কসরতে নিপুণ ছিলেন, সে প্রসঙ্গও উল্লেখিত হয়েছে—

ঃ অদ্বৈত কহে সত্য কহি না করহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার তবে জানি গোপ।।
তবে লগুড় লইয়া প্রভু ফিরাইতে লাগিল।
বার বার আকাশে ফেলি লুকিয়া ধরিলা।। ইত্যাদি।

এরপর রামলীলা—

ঃ বিজয়া দশমী লঙ্কা বিজয়ের দিনে।
বানর সৈন্য হয় প্রভু লৈয়া ভক্তগণে।।
হনুমানাবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লইয়া।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া।
কাঁহারো রাবণ প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা হয়ে পাপী মারিনু সবংশে।।[৪৩]

উদ্ধৃত বিবরণ থেকে দেখা যায়, এই রামলীলাভিনয়েও বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল।

[‘চৈতন্যচরিতামৃতে’র পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিবৃত রামানন্দরায় কর্তৃক স্বরচিত ‘জগন্নাথবল্লব’ নাটকের অভিয়ন শিক্ষাদান প্রসঙ্গ এ গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য]

চৈতন্যদেবের কালে লীলা ও নাট্য অভিন্ন অর্থেই উচ্চারিত হতো। একালেও লীলা কথাটা রাম বা কৃষ্ণসংক্রান্ত অভিনয়ের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়—যেমন রামলীলা, কৃষ্ণলীলা। নিত্যানন্দের কৃষ্ণ ও রামলীলা অভিনয়ের পরিবেশ সৃষ্টির যে প্রয়াস তা বাংলা নাট্যের এক অভিনব পর্যায়রূপে বিবেচ্য। চৈতন্যদেবের রথযাত্রাভিনয়ও পরিবেশনির্ভর।

উল্লেখ্য যে, লীলানাট্য থেকে যাত্রার উদ্ভব, কারণ লীলা যাত্রার পূর্ববর্তী। ‘পাঁচালী’ থেকে ‘যাত্রার উদ্ভব’ এই মত নানা কারণে সন্দেহের উদ্রেক করে।[৪৪] যাত্রা নাট্য হিসেবে রূপলাভের পূর্বেই, যাত্রা-উৎসবে মধ্যযুগে, লীলা নাটকের অভিনয় হতো। কৃষ্ণ জন্মযাত্রা বা জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষে লীলানাট্যের অভিনয় স্বয়ং চৈতন্যদেব দ্বারা সাধিত হয়েছিল। কিন্তু লীলানাট্য যে শুধু যাত্রা উপলক্ষেই অভিনীত হতো তা নয়। এর একটা অনানুষ্ঠানিক রূপও ছিল। ‘চৈতন্যভাগবতে’ নিত্যানন্দের কৃষ্ণ ও রামলীলা বিষয়ক অভিনয় ছিল অনানুষ্ঠানিক, আচার্য চন্দ্রশেখরের গৃহ-প্রাঙ্গণে চৈতন্যদেবের নাট্যানুষ্ঠানও তিথি নক্ষত্র বা যাত্রা উপলক্ষে পরিবেশিত হয় নি। কাজেই একথা বলা যায় যে, লীলানাট্য আনুষ্ঠানিক শোভাগমন বা উৎসব উপলক্ষ ব্যতিরেকেও স্বতন্ত্রভাবে সেকালে অভিনীত হতো।

যে-কালে লীলানাট্য চরিত্রাভিনয়ের ধারায় আত্মপ্রকাশ করে, পাঁচালি সেকালেও নিজস্ব বর্ণনাত্মক-পালাভিনয়ের ধারায় উজ্জ্বলভাবে বিদ্যমান ছিল। কাজেই পাঁচালি থেকে লীলানাটকের উদ্ভব হয় নি। অন্যদিকে যাত্রা-উৎসবে লীলানাটক অভিনীত হওয়া সত্ত্বেও যাত্রার নাট্যরূপান্তর লীলানাট্য থেকে না হয়ে কেন পাঁচালি থেকে হবে, তার কোনো কারণ ব্যাখ্যা করা হয় নি। এদেশে অষ্টাদশ শতকের পূর্বে যাত্রা-নাটকের অস্তিত্ব ছিল, এরূপ কোনো প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি। সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত যে, লীলাশ্রেণীর নাটক থেকেই পরবর্তীকালে যাত্রানাটকের উদ্ভব।

লীলানাটক সর্বাংশে কৃত্যমূলক, মধ্যযুগের প্রায় সকল ধারার নাট্যের ক্ষেত্রে তা খাটে। কৃত্যের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার যে-অংশটা অনিবার্যভাবে নাট্যরূপ লাভ করার কথা সে অংশটাই পরিবেশিত হতো। কাজেই লীলানাট্যের লক্ষ্য নাট্য নয় কৃত্য এবং একটি সামগ্রিক কৃত্যের অংশমাত্র। যাত্রার পাশাপাশি লীলানাটকের অস্তিত্ব একালেও বিদ্যমান রয়েছে।[৪৫]

পরিশেষে বলা যায়, ভাগবত পুরাণ রীতির সঙ্গে জন-নন্দিত পালাভিনয় অর্থাৎ পাঁচালি-রীতির একটি দ্বন্দ্ব কৃষ্ণমঙ্গল শ্রেণীর কাব্য থেকে শুরু হয়েছিল। চৈতন্যচরিতাখ্যান রচনার ক্ষেত্রেও তা প্রত্যক্ষ করি। একদিকে জনগণের নাট্যরস পিপাসার তাগিদ এবং অন্যদিকে ভাগবতের পরিবেশনায় কৃত্যবিধির প্রতি আকর্ষণের কারণে একই বিষয়ে দ্বিবিধ পরিবেশনারীতির এই অনুসৃতি—এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত।

প্রসঙ্গক্রমে মধ্যযুগে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের ধারায় রচিত পদাবলীর কথাও উল্লেখ্য। পদাবলী সাহিত্য দৃষ্টে নরনারীর প্রণয়ঘটিত মনস্তত্ত্বের সঙ্গে নাট্যস্থিত চরিত্রের সম্পর্ক আবিষ্কার দুরূহ নয়।

বৈষ্ণব রসতত্ত্বে নায়ক-নায়িকার দেহমনের নানা ভাবগত রূপান্তরের বিশদ ব্যাখ্যা আছে। চৈতন্যপূর্ব ও উত্তরকালে, পদাবলী—সম্পদের গীতিসমূহে লভ্য, কৃষ্ণরাধা, বিট, বিদূষক, চেট, বা চেটক, প্রিয় নর্মসখা, আপ্তদূতী 'বীরা বৃন্দা প্রভৃতি ব্রজাঙ্গনাগণে'র[৪৬] নানা মনোভাব ও ক্রিয়ার সঙ্গে ভরতকৃত 'নাট্যশাস্ত্রে' চরিত্র ও মনস্তত্ত্ব বিচারের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বৈষ্ণব পদাবলীর বহু গীত সংলাপতুল্য। এ সকল গীতিকায় যে মন্ময়-সুখ-দুঃখ ও স্মৃতি-বেদনার সুর, তাও চরিত্রানুগ। উপরন্তু, বিশাল পদাবলী সঞ্চয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কোনো কোনো গীত কৃষ্ণ-বিষয়ক নাট্যেরও সম্পদ।

চৈতন্য উত্তরকালে, বিশেষত রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'র শাস্ত্রীয় প্রভাবে (খেতুরীতে বৈষ্ণবীয় সম্মিলনে কীর্তনোৎসবের পর)[৪৭] লীলাকীর্তনের এক নতুন ধারা প্রবর্তিত হয়। এই ধারার কীর্তনে, গীতমধ্যে পাত্রপাত্রীর মনোভাব, রসগত ব্যাখ্যা কাহিনীর অগ্রগতি ও ঘটনা বর্ণনার অবকাশ বিদ্যমান। সচরাচর কীর্তনের পাঁচটি অঙ্গ—কথা, আখর, তুক, ছুট ও ঝুমুর। 'কথা' হলো গীতাদির মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র রক্ষা এবং কোনো পংক্তি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা। 'আখর' আরবি শব্দ 'আখেরী' থেকে এসেছে।[৪৮] এ হলো, গীতের মধ্যে

অবসর সৃজনপূর্বক গায়েনের ললিত কথামালা বিস্তার। অনুপ্রাস যুক্ত 'ছন্দোময় মিলনান্তক' পদ হলো 'তুক'[৪৯] এবং 'ছুট' হলো লঘু রসাত্মক।[৫০] একই পালায় দু'দলের মধ্যবর্তী মিলনান্তক গান হলো ঝুমুর। প্রথম পালার অন্তে ও সমগ্র পালার শেষে ঝুমুর গেয়ে পালা 'স্থগিত' করতে হয়।[৫১]

লীলাকীর্তনের 'কথা' পাঁচালি গায়েনের শিকলি বা গদ্যে বিবরণ-ব্যাখ্যা দানের অনুরূপ। এক্ষেত্রে লীলাকীর্তনের উপর পাঁচালির কিছু প্রভাব কল্পনা করা যায়। তবে সূক্ষ্মভাবে লীলাকীর্তনের আঙ্গিক ও বিষয় বিচার করলে দেখা যায় যে এর উপর লীলানাট্যের প্রভাবই সর্বাধিক।

টীকা

১. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২য় খণ্ড), ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ২১৫।

২. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা* (২ খণ্ড-মধ্যযুগ), ১৩৭৪, পৃঃ ১৩০।

৩. শ্রী সুকুমার সেন সম্পাদিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত *চৈতন্যচরিতামৃত* (লঘু সংস্করণ), তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৩, পৃঃ ৩৭।

৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮।

৫. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা* (২য় খণ্ড-মধ্যযুগ), ১৩৭৪, পৃঃ ১৩৩।

৬. সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ভক্তি সিদ্ধান্ত-বাচস্পতি সম্পাদিত *শ্রীচৈতন্যভাগবত*, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ঠ।

৭. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড)*, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি-১৯৯১ পৃঃ ২৬১-২৬২।

৮. মৎ প্রণীত *শ্রীচৈতন্যভাগবতে নাট্য প্রসঙ্গ*, থিয়েটার স্টাডিজ (১ম সংখ্যা), নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

৯. সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ভক্তিসিদ্ধান্ত বাচস্পতি সম্পাদিত *শ্রীচৈতন্যভাগবত*, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৮-৯।

১০. সুকুমার সেন সম্পাদিত, *বৃন্দাবনদাস বিরচিত, চৈতন্যভাগবত*, প্রথম প্রকাশ-১৯৮২, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯১, পৃঃ ৩৯।

১১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯-৪০।

১২. জলে নাট্যাভিনয় মধ্যযুগে সুবিদিত ছিল, জলনাটক সম্পর্কে 'যাত্রার ইতিবৃত্ত' প্রবন্ধে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১২৮৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গ দর্শনে বলেছেন যে, 'চৈতন্যদেবে'র পর যখন বৈষ্ণব সম্প্রদায় জাঁকিয়ে উঠিল, তখন কৃষ্ণলীলার, যাত্রা আরম্ভ করিবার ইচ্ছা অনেকের হয়। এই সময় একজন বৈষ্ণব এক নতুন পদ্ধতি অবলম্বন পূর্বক এক

পুষ্করিণীর উপর কৃষ্ণযাত্রা অভিনয় করেন। পুকরিণীটি বড় সুন্দর সাজান হইয়াছিল। তাহার নাম কালীয় হ্রদ দেওয়া হইয়াছিল, মধ্যস্থলে এক অজগর কালীয় সর্প, জল হইতে ফণা বিস্তার করিয়াছে, সেই ফণার উপর শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া বেণু বাজাইতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে "নয়ন ঢোলাইয়া" নৃত্য করিতেছেন। নৃত্য পীড়নে কালীয়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে। চারিপার্শ্বে তার স্ত্রীগণ জল হইতে অর্ধাঙ্গ তুলিয়া যোড় কৃষ্ণকে মিনতি করিতেছে-কখন তাহা কথায়, কখন বা গীতে। নিকটে এক মাচার ওপর মৃদঙ্গ, করতাল, খরতাল বাজিতেছে, তথায় বসিয়া 'যাত্রাওয়ালারা দোয়ার্কি করিতেছে"।' কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের 'একজন বৈষ্ণব এক নতুন পদ্ধতি অবলম্বন পূর্বক'...মন্তব্যটি যথার্থ বলে মনে হয় না, কারণ জলে নাট্যাভিনয়ের রীতি চৈতন্যপূর্বকালেই বিদ্যমান ছিল। 'চৈতন্যভাগবতে' এর প্রমাণ পরোক্ষভাবে লভ্য। কৃষ্ণলীলার কোন কোন পর্ব, 'কৃষ্ণকেলি নাট্য' জলে অভিনীত হতো। এতদ্ব্যতীত, 'কয়া' নামে প্রাচীন বাঙলার জলখেলা চৈতন্যদেবের হাতে সংস্কৃত হয়ে বিশিষ্ট আঙ্গিক লাভ করে। তা ছাড়া উদ্ধৃতাংশে সঞ্জীবচন্দ্র যাকে 'যাত্রা' নামে অভিহিত করেছেন তা মূলে লীলানাট্য। 'যাত্রা' নাট্যরূপে অষ্টাদশ শতকের পূর্বে প্রচলিত ছিল-এরূপ প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

১৩. সুকুমার সেন সম্পাদিত *চৈতন্যভাগবত*, পৃঃ ৪০-৪১।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮০-৮১।
১৬. সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত *'শ্রীচৈতন্যভাগবত'* পৃঃ ১৯২।
১৭. সুকুমার সেন সম্পাদিত ' *চৈতন্যভাগবত'*, পৃঃ ১৭০-১৭১।
১৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৩-১৮৭।
১৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৮।
২০. স্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত, *শ্রীমদ্ভগবত গীতা*, অষ্টম সংস্করণ, পৃঃ ২০৯।
২১. সুকুমার সেন সম্পাদিত *'চৈতন্যভাগবত'* পৃঃ ১৮৩-১৮৮।
২২. সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত *'শ্রীচৈতন্যভাগবত'* পৃঃ ১৯৪-১৯৫।
২৩. সুকুমার সেন সম্পাদিত *'চৈতন্যভাগবত'* পৃঃ ১১।
২৪. সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত *'শ্রীচৈতন্যভাগবত'* পৃঃ ৪৭৭।
২৫. *শ্রীচৈতন্যভাগবত*, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, পৃঃ ৩৯৫।
২৬. Edited by Bimanbehari Majumdar and Sukhamay Mukhopadhyay Jayananda's Caitanaya-Managala The Asiatic Society 1971. Page No. XIII.
২৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪।
২৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।
২৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭।
৩০. প্রাগুক্ত, পৃঃ XIVII.

৩১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪।

৩৪. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), প্রথম আনন্দ সং-জানুয়ারি ১৯৯১, পৃঃ ৩১৪ (টীকা-১৮১)।

৩৫. মৃণাল কান্তি ঘোষ সম্পাদিত লোচন দাসের *শ্রী শ্রী চৈতন্যমঙ্গল* গৌরাব্দ ৪৪, পৃঃ ৫১ (মধ্য খণ্ড)।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০-৫১।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪।

৪০. 'চৈতন্যচরিতামৃত পড়িবার জন্য লেখা, গান করিবার জন্য নয়। তাই রাগ-রাগিণীর উল্লেখ নাই। তবে ত্রিপদী ছন্দে কাব্য রসসিক্ত অংশগুলি পাঠক ইচ্ছামত সুরে আবৃত্তি করিতে পারেন ইহা জানাইবার জন্য 'যথারাগ' এই নির্দেশ আছে। চৈতন্যচরিতামৃত বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম পঠনীয় অর্থাৎ অ-গেয় গ্রন্থ"। সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড)*, প্রথম আনন্দ সং-জানুয়ারি, ১৯৯১, পৃঃ ২৮১।
উদ্ধৃত মন্তব্য দৃষ্টে বলা যায় চৈতন্যচরিতামৃত মূলত বিশুদ্ধ কথকতা রীতির কাব্য। কিন্তু কাব্যমধ্যে 'যথা রাগ'-এর নির্দেশ থাকায় প্রমাণিত হয় যে তা গেয়কাব্যও বটে।

৪১. শ্রী সুকুমার সেন সম্পাদিত *কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত* (লঘুসংস্করণ) ৩য় মুদ্রণ ১৯৮৩, পৃঃ ২৫৯।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭১।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৯।

৪৪. এ সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেন 'পাঁচালি হইতেই যাত্রার উদ্ভব। যাত্রার সঙ্গে পাঁচালির পার্থক্য এইমাত্র ছিল যে পাঁচালিতে মূল গায়ন বা পাত্র একটিমাত্র, যাত্রায় একাধিক সাধারণত তিনটি।' সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (২য় খণ্ড), প্রথম আনন্দ সং ১৩৯৮, পৃঃ ৫১১।

৪৫. লীলানাট্যের প্রভাবে যাত্রা নাটকের উদ্ভব ঘটলেও, আমাদের কৃত্যমুখর শিল্পধারায় তা আজও টিকে আছে। ১৯৯০ সালে মানিকগঞ্জ অঞ্চল থেকে একটি কৃষ্ণলীলার দল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগে আমন্ত্রিত হয়েছিল। তাদের নাট্যাভিনয়ে চরিত্রানুগ আহার্য, নৃত্য, দোহার রীতি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি। দলে মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে সর্বমোট পনের-ষোলজন। রাধা ও সখী মেয়ে চরিত্র কিন্তু বড়ায়ি বয়স্ক পুরুষ। সচরাচর নৌকাখণ্ডে কৃষ্ণের সাথে রাধার কথাবার্তা সখীর মাধ্যমেই নিষ্পন্ন হতে দেখা গেছে। রাধা ও কৃষ্ণের নদী-পারের কড়ি ধার্য করা নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে

পারস্পরিক বাদানুবাদ চলে। কৃষ্ণের নৌকা হচ্ছে দুটো বাঁশের বাখারি ধনুকের ছিলারূপে বাঁকানো, কৃষ্ণের পায়ের গোড়ালির উপর পর্যন্ত বাখারির সঙ্গে লাগানো দু'টুকরো রঙিন কাপড়, অভিনেতার কাঁধের সাথে নৌকাটি ঝুলানো। এক অপূর্ব নৃত্যছন্দে কৃষ্ণবেশী অভিনেতা নৌকাটিকে একবার রাধার কাছে নেয় আবার তা কৌশলে সরিয়ে ফেলে। এতে গদ্য সংলাপ খুবই কম। সংলাপমূলক গানের প্রথম বা দ্বিতীয় পংক্তি অভিনেতা-অভিনেত্রী বলামাত্রই দোহার কণ্ঠে তা ধৃত হয়। দলটি দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড অভিনয় করে, কারণ তা ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রোতা-দর্শকের পচ্ছন্দ।

সে দলের অভিনয়ে রাধার সখীর গানের বিষয় ছিল এ রকম যে, কৃষ্ণের নৌকার গুন হবে তার চুল, হাত বৈঠা, ভক্তি হবে পাল। বাঙলার চিরায়ত দেহতত্ত্বের গানের সঙ্গে এই ব্যাখ্যা অদ্ভুতভাবে মিলে যায়। এ দলের সকলেই নিম্নবর্ণের বৈষ্ণব।

৪৬. শ্রী হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (রূপগোস্বামীকৃত) *উজ্জ্বলনীলমণি,* মাঘী পূর্ণিমা ১৩৭২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৯।

৪৭. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া,* প্রকাশকাল, আগস্ট, ১৯৯০/বি পৃঃ ৭১।

৪৮. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, পৃঃ ১৯৬।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৯।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৯।

৫১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০০।

ষষ্ঠ অধ্যায়

[প্রধান ও অপ্রধান মঙ্গলকাব্য। প্রধান মঙ্গলকাব্য—বিভিন্ন কবি রচিত ধর্মমঙ্গল, ময়ূরভট্ট রচিত 'ধর্ম্মমঙ্গল', মানিকরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল', রূপরাম চক্রবর্তীর 'ধর্ম্মমঙ্গল', খেলারাম চক্রবর্তী, ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল'—বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ', বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত 'মনসাবিজয়', নারায়ণদেবের 'পদ্মাপুরাণ', কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসার ভাসান', জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গল', উড়িষ্যার কবি দ্বারিকাদাসের 'মনসামঙ্গলের গীত'। মনসামঙ্গলের কৃত্য ও বিভিন্ন ধরনের পরিবেশনারীতি, কাব্য মধ্যে উল্লিখিত নাট্যপ্রসঙ্গ। চণ্ডীমঙ্গল—দ্বিজমাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত', দ্বিজরামদেবের 'অভয়ামঙ্গল গীত', মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল', রামানন্দ যতি বিরচিত 'চণ্ডীমঙ্গল', চণ্ডীমঙ্গলের পরিবেশনারীতি ও কাব্যমধ্যে প্রাপ্ত নাট্যপ্রসঙ্গ, চণ্ডীমঙ্গলের কৃত্যাভিনয়। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', 'বিদ্যা-সুন্দরে'র পরিবেশনারীতি, ভারতচন্দ্রের 'চণ্ডী নাটক', কৃষ্ণরামের 'কালিকামঙ্গল'। অপ্রধান মঙ্গলকাব্য—'শিবমঙ্গল'—শিবমঙ্গলের কবিগণ, রামকৃষ্ণরায়ের 'শিবমঙ্গল', রামেশ্বরের 'শিব সঙ্কীর্ত্তন', পরিবেশনারীতি ও কাব্য মধ্যে উল্লিখিত নাট্যপ্রসঙ্গ। কৃষ্ণরামদাসের 'ষষ্ঠীমঙ্গল', 'শীতলামঙ্গল', 'রায়মঙ্গল'।]

বিষয়স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও মঙ্গলকাব্যসমূহের পরিবেশনারীতি এক—অর্থাৎ তা পাঁচালি। তবে সাধারণত কৃত্য সংশ্লিষ্ট বলে বিশেষজ্ঞগণ মঙ্গল-পাঁচালিকে সাধারণরীতির পালাভিনয় থেকে ভিন্ন বলে মনে করেন। পাঁচালির একটি কৃত্যমূলক শাখা হচ্ছে মঙ্গলকাব্য। সুতরাং তা কৃত্য-পাঁচালি বা মঙ্গল-পাঁচালি রূপেও অভিহিত হতে পারে। কৃত্যের নানা অঙ্গ যথা ঘট, পট ও পূজার সঙ্গে যুক্ত হয়েই পালাপার্বিক পাঁচালি সম্পূর্ণতা লাভ করে। মধ্যযুগে সমগ্র জনপদে লৌকিক ও পুরাণ রঞ্জিত নানা দেবদেবীকে কেন্দ্র করে রচিত মঙ্গলকাব্যের সংখ্যা বিস্ময়কর। মঙ্গল-পাঁচালির এক একটি প্রধান শাখায়, বহু কবি একই বিষয় অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছেন, আবার এমনও দেখা যায় যে, বিশেষ কোনো অপ্রধান লৌকিক বা

পৌরাণিক দেবতার উদ্দেশ্যে একটিমাত্র কাব্যও রচিত হয়েছে। কোনো কোনো মঙ্গলগান কাব্য হিসেবে আখ্যাত হলেও সে গুলোর আঙ্গিক মোটেই মঙ্গলকাব্য-রীতির নয়, বরং তা খণ্ডকাব্য এবং ব্রতকথার আকারে রচিত, যেমন—'ষষ্ঠীমঙ্গল', 'কমলামঙ্গল', 'শীতলামঙ্গল'। অন্যদিকে সুনির্দিষ্ট কোনো কাহিনী ব্যতিরেকেও সুবৃহৎ মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে—যেমন 'শিবায়ণ' বা শিবমঙ্গল। প্রধান ও অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের বিষয় ভেদে শ্রেণীবিন্যাস নিম্নরূপে নির্ণীত হলো—

প্রধান মঙ্গলকাব্য—'ধর্মমঙ্গল', 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল' প্রভৃতি। অপ্রধান মঙ্গলকাব্য—'শিবমঙ্গল', 'ষষ্ঠীমঙ্গল', 'শীতলামঙ্গল', 'রায়মঙ্গল' প্রভৃতি।

প্রকৃত অর্থে মনসা-চণ্ডী-ধর্মমঙ্গলের কাহিনীবৃত্তই মৌলিক ও শিল্পরসসিদ্ধ। সমগ্র মধ্যযুগে বৃহত্তর বঙ্গীয় জনপদের প্রায় সর্বত্র দুই শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যের অপ্রতিহত প্রভাব দৃষ্ট হয়। ধর্মমঙ্গল বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চল বা সম্প্রদায় বিশেষের কাব্য। ছড়া, ব্রতকথা, খণ্ডপালা ও কৃত্যাভিনয়ের ধারায় অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলোর কোনো কোনোটির (শিব, ষষ্ঠী) উৎপত্তি প্রাচীনকালে হলেও কাব্য হিসেবে তা শেষ পর্যন্ত প্রধান মঙ্গলকাব্যসমূহের তুলনায় ক্ষীণ শিল্পরসাশ্রিত বলেই বিবেচ্য। উপরন্তু এসকল মঙ্গলকাব্য অপেক্ষাকৃত নবীন কালেরই রচনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিবমঙ্গলের কাহিনী সপ্তদশ শতকের, ষষ্ঠী দেবতাকে নিয়ে কাব্য রচিত হয় মধ্যযুগের একেবারে অন্তে যখন মঙ্গলকাব্যের প্রাধান্য ক্ষীয়মাণ প্রায়।

মঙ্গলকাব্যের গঠন কৌশলের মধ্যে এর পরিবেশনারীতির বৈশিষ্ট্য নিহিত। সকল প্রধান মঙ্গলকাব্যই পালাপার্বিক। এর মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের পালা সুনির্দিষ্ট অঙ্কের। মনসামঙ্গলের গান পরিবেশনের সময় পরিধি আটদিনের বলে উল্লেখিত হয়েছে।[১] কিন্তু বাস্তবে তা আটদিনে গীত হবার কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই।[২] পরবর্তীকালে ছাব্বিশ পালায়ও 'শিবায়ণ' (রামকৃষ্ণ কর্তৃক) রচিত হতে দেখা যায়।

মঙ্গলগীতের 'আসরে যে ঘট' স্থাপন করা হয় তা উদ্দিষ্ট দেবতার প্রতীকরূপে গণ্য—তিনি এ আসরের শ্রোতাও বটেন।[৩] পালার পরিবেশনা বিশেষ দিন, তিথি বা মাস নির্ভর। সচরাচর ধর্মমঙ্গল বৈশাখে, চণ্ডীমঙ্গল দুর্গাপূজা উৎসবে এবং মনসামঙ্গল শ্রাবণ মাসে পরিবেশিত হয়। মঙ্গলকাব্যের কাহিনী স্তর সাধারণত

তিনটি। প্রথম স্তরে কাব্যের উৎপত্তির কারণ, স্বপ্নাদেশ প্রভৃতির বিবরণ, দ্বিতীয় স্তরে অমর্তলোকের দেবদেবীর পরিচয় ও শাপগ্রস্ত মর্তসম্ভব স্বর্গবাসীর ঘটনা, তৃতীয় স্তরে মর্তলোকের ঘটনা ও শাপমোচনান্তে স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী। লোকজ কথা কাহিনীর উপর পৌরাণিক বর্ণসম্পাতের প্রয়াস, মনসা ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেই সবচেয়ে বেশি দৃষ্ট হয়।

জন্মমৃত্যু, মানব চরিত্র, বিবাহ, খাদ্য, আচার-অনুষ্ঠান, সমাজ, যুদ্ধ, বাণিজ্য ও নিসর্গের এক বিশাল পরিচয় উদ্ভাসিত হয়েছে মঙ্গলকাব্যে। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের আদ্যোপান্ত রুচি ও বিশ্বাসের ভেতর থেকে উদ্ভূত মঙ্গলকাব্যগুলো শুধু পরিসরে নয়, গঠন-কৌশলের বিচারেও নিঃসন্দেহে মহাকাব্যের গুণসম্পন্ন। জীবন ও জগতের যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা এসকল আখ্যানে কাব্যচ্ছলে বর্ণিত হয়েছে তা বিচারপূর্বক মঙ্গলকাব্যকে মধ্যযুগের 'বিশ্বকোষ' হিসেবে অভিহিত করা যায়। শ্রোতার আসরে তাই মঙ্গলকাব্য নিতান্ত ধর্মকাব্য নয়; এ হচ্ছে লৌকিক অভিজ্ঞতা ও অতিলৌকিক কল্পনার গীতনাট।

মঙ্গলকাব্যসমূহ মূলত অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এতে লৌকিক অর্থাৎ স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ খুব কমই দেখা যায়। গীতিমূলক বলে এ ধরনের কাব্যের ছন্দে মাত্রাসাম্য নেই। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দেই মূলত সমগ্র কাব্য রচিত হতো। ভারতচন্দ্রের হাতেই মঙ্গল-পাঁচালির ছন্দে বৈচিত্র্য সাধিত হয়। তবে তাঁর প্রবর্তিত ছন্দের রসজ্ঞ-শ্রোতা রাজদরবারের, সাধারণ্য নয়।

মঙ্গলকাব্য পরিবেশনায় পদগুলি যে সর্বাংশে গীত হতো তা নয়। এর কিছু অংশ দ্রুত সুরে আবৃত্তি করা হতো, বাকি অংশ গান।[৪] ধুয়া বা দিশার মাধ্যমে পরিবেশনের এই রীতিটা সম্পূর্ণ পাঁচালির। এ কালের মঙ্গল শ্রেণীর পালাভিনয়েও এই বৈশিষ্ট্য বজায় আছে—'গাজীর-গান' ও 'মনসার ভাসানে' গীত, আবৃত্তি, দিশা রীতি হিসেবে আজও অস্তিমান।

মঙ্গলকাব্যের শেষ পালা 'জাগরণের পালা' বা 'জাগরণ' নামে পরিচিত। এর অর্থ সর্বশেষ পালা পরিবেশনের সময়, ফললাভের বাসনায় দর্শকশ্রোতার রাত্রিব্যাপী জাগরণ। অনুরূপ সারারাতব্যাপী পরিবেশিত গীতাভিনয় হলো 'জাগের গান'। কিন্তু তার সঙ্গে মঙ্গল-পাঁচালির জাগরণ-পালার কোনো অন্তর্গত সাদৃশ্য কল্পনা করা যায় না। চট্টগ্রাম অঞ্চলে চণ্ডীমঙ্গল সামগ্রিকভাবে জাগরণের পালা নামেই পরিচিত, ধর্মমঙ্গলের চব্বিশ পালার একটি 'জাগরণ পালা' নামে

অভিহিত। চণ্ডীমঙ্গলের শনিবার নিশার পালা সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ। এ থেকে ধারণা করা হয় যে, এই পালাটি 'চণ্ডীমঙ্গলে জাগরণ পালা'। বরিশাল অঞ্চলে 'রয়ানী' নামে পরিচিত পালায়, লক্ষ্মীন্দরের সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ থেকে পুনরুজ্জীবন লাভ পর্যন্ত সমগ্র পালাটি দর্শকদের পক্ষে অবশ্যই 'শ্রোতব্য'।[৫] ভাদুগান সারারাত গেয়, তাও জাগরণ। কাজেই 'জাগরণ' মধ্যযুগে গেয়কাব্য বা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু কৃত্য-পাঁচালি অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রে এর লক্ষ্য ভিন্ন, এ হচ্ছে দেবতার বর লাভের নিমিত্তে 'জাগরণ'।

মঙ্গলকাব্য পরিবেশনায়, গায়েনের ভাবভঙ্গির সঙ্গে দোহারদের উক্তি-প্রত্যুক্তি নাট্যরস সৃষ্টি করত। দীর্ঘ পালায়, নৃত্য ও সঙ্গীতের সঙ্গে গায়েনের রসনিষ্পত্তির দক্ষতাই হচ্ছে মঙ্গলকাব্যের অভিনয় অংশ। মঙ্গলকাব্য তাই কখনও কখনও 'গীতনাট' রূপেও উল্লেখিত হয়েছে। [বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে মুকুন্দরাম প্রসঙ্গে তা দ্রষ্টব্য], নাটগীত ও গীতনাটের আঙ্গিক ভিন্ন, 'নাটগীত' উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক এবং 'গীতনাট' পালাভিত্তিক গায়েন-দোহারের পরিবেশনা। 'রামায়ণে'র 'উত্তরকাণ্ডে'র ('রামায়ণ' প্রসঙ্গে এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে) বর্ণনা থেকে দেখা যায় মঙ্গল গান ও নাটগীত অভিন্ন উদ্দেশ্যেই সেকালে পরিবেশিত হতো।[৬] কিন্তু তা সত্ত্বেও মঙ্গলনাট বর্ণনাত্মক আখ্যান পরিবেশনা। এর আঙ্গিকে নাটগীতের মত প্রচুর উক্তি-প্রত্যুক্তি থাকলেও তা পাত্রপাত্রীর আধারে নয়, গায়েন দোহার রীতিতে উপস্থাপিত হয়।

ধর্মমঙ্গল

ধর্মমঙ্গলের আদিকবি হিসেবে ময়ূরভট্টের নাম উত্তরকালে এ ধারার সকল কাব্য রচয়িতাই উল্লেখ করেছেন। তাঁর কাব্য 'হাকন্দপুরাণ' বা 'ধর্মপুরাণ' রূপে আখ্যাত। 'হাকন্দ' হলো, 'আত্মমুণ্ডচ্ছেদ'পূর্বক 'ধর্মঠাকুর অর্থাৎ সূর্যদেবতাকে প্রসন্ন' করা।[৭] ময়ূরভট্টের কোনো পুথি আজও পাওয়া যায় নি। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে প্রকাশিত ময়ূরভট্টের 'শ্রীধর্মপুরাণ', 'অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জের রচনা'।[৮]

অন্য একখানা পুথি 'ময়ূরভট্ট ধর্মমঙ্গল' নামে প্রকাশিত হয়েছে। পুথিটি আদ্যন্ত খণ্ডিত। ভাষা অপরিণত, পদগুলিও কাব্যমূল্যের বিচারে নগণ্য। এ কাব্য

মূলত মৌখিক রীতিতেই রচিত হয়েছিল, কাব্যমধ্যে গায়েনের ভণিতা থেকে তা বোঝা যায়—

ঃ পুরাণের কথা বলি সুন এক চিত্ত করি
মহেস দাসে এসব গায়।

একাব্য 'য়নাদ্য সঙ্গিত' নামেও আখ্যাত—'

ঃ মউরভট্ট দিজ গান য়নাদ্য সঙ্গিত।[৯]

আসরে এ কাব্য-পরিবেশনায় যে নাটকীয় কলাকৌশল অবলম্বন করা হতো তার প্রমাণ কাব্যমধ্যেই পাওয়া যায়। গৌড়েশ্বরের যুদ্ধযাত্রা প্রসঙ্গে আছে—

ঃ 'এই খানে বাদ্য নাচাড়ি'।

এ হলো পরিবেশনারীতির নির্দেশ। 'বাদ্য নাচাড়ি'র যৌক্তিক অর্থ, বাদ্য ও নৃত্যসহযোগে নাচাড়ি পরিবেশন—

ঃ রণে রাজা সাজে গোড়েশ্বর
সেনা নব লক্ষ্যদল সঙ্গে লঞা নৃপবর
জায় কন্যা কানড়ার উপর।[১০]

লাউসেনের বিবাহ যাত্রা উপলক্ষে আছে—

ঃ নানা সব্দে বাদ্য বাজে হঞা এক মেলি
গন্ধর্ব্বে গায় গীত নাচে বিদ্যাধরী।।[১১]

এ ধরনের নৃত্যগীতের উল্লেখ মধ্যযুগের নানা কাব্যে প্রায়শই দেখা যায়। আলোচ্য 'ধর্ম্মমঙ্গলে', 'উব্বসির' নৃত্যপূর্ব রূপসজ্জা গ্রহণের প্রসঙ্গ আছে—

ঃ বেশ করে উব্বসি লো ইন্দ্রের নাচনি।
দেখিঞা ভুলএ মণি মনুস্য কি গুনি।।
চিকুর চামুরি ঝুরি সামারি চারু বেনী।
অঙ্গভাগ নগভগখগ আহারিনি।।
মেঘবাহন ভূসা সিরের সাজনি।
ছাআ জীনি অভাজনি কন্দর্প দাপুনি।।
য়লপ য়লকা পাষে চন্দনের বিন্দু।
গোরচোনা তার (তাহে) গয়াসিতে ইন্দু।।

রাজা উর্বশীর রূপ দেখে বিস্মিত—

ঃ আচম্বিতে কিবা হইল বিধুর উদয়।

চিত্রের পোতলি কিবা চিত্র মধ্যে রয়।।
নবঘনমাঝ কিবা উড়িল বিজুরি।
অনুমান করি রাজা লখিতে না পারি।।
বিস্ময় গুনিঞা মনে ডাকিলেন কাছে।
জতন করিয়া কিছু গৌড়েস্বর পুছে।।

তারপর রাজা বললেন—

ঃ কহ তুমি কার কন্যা থাক কোন দেশে।
কোথা কার গতি কৈলে কহনা বিসেসে।।

চতুরা উর্বশী উত্তর দিল—

ঃ সুন রাজা বলি বটী আমি নওকী জুবতী।
নিত্য (নৃত্য) করি বুলি য়ামি জথা নরপতি।।

তারপর—

ঃ ই বোল সুনিঞা রাজা কহেন উত্তর।
একাকিনি দেখি তোরে নাহিখ দোসর।।
সাজ কাছ নাহি দেখি মন্দিরা মৃদঙ্গ।
গাইবে বাজাবে কিসে নিত্যের তরঙ্গ।।

তখন—

ঃ কন্যা বলে শুন রাজা আমি গুনমন্ত।
হাথে তালে নিত্য করি গীতে অনুবন্ধ।।

রাজা এ কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেন—

ঃ রাজা বলে তোর কথা সুনিতে কৌতুক।
নিত্য করিহ দেখি আমার সম্মুখ।।

রাজা ও 'উব্বসি'র এই উক্তি-প্রত্যুক্তি নিঃসন্দেহে নাট্যসংলাপের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। রাজার নির্দেশ লাভের সঙ্গে সঙ্গে উর্বশী নৃত্য শুরু করল—

ঃ ই বোল সুনিঞা রামা উঠে বেগগতি।
রচিল পঞ্চম তাল সুললিত অতি।।
হাথ তাল গান স্বরে পেলয় চরন।
তাল মানে বাদ্য করে অতি সুসোভন।।
য়ঙ্গের ভঙ্গিমা কত দেখায় জৌবন।

বাহু নাড়া দিঞা নাচে তুলিঞা বসন।।
কটাক্ষ্য করিঞা বান জুড়িঞা নঞানে।
মরম সন্ধানে বিন্ধে পরান জেখানে।।
ইসত হাসিঞা মুখে ঝাপিঞা বসনে।
দুই বাহু তুলি কুচ দেখায় সঘনে।।
হানিল মদন বান রাজা অন্তরে।
উপজে বিরহ তাথে আপনা পাসরে।।[১২]

মানিকরামের 'ধর্মমঙ্গল' দ্বাদশ পালায় বিভক্ত। এ কাব্য গীতরূপে উল্লিখিত হয়েছে—

ঃ হুকুম হইল গীত করিতে বর্ণন।
নিজ বীজ মন্ত্র লেখি দিলা নিরঞ্জন।।[১৩]

এ কাব্য গাথা রূপেও আখ্যাত—

ঃ চিত্তে ভাবিয়া ভূদেব নাথ।
দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল গাথ।।[১৪]

দেবসভায় ধর্মরাজের নৃত্য, শিবের তাণ্ডব নৃত্যেরই নামান্তর—

ঃ সুর মাঝে শক্র বসে শর্মমান চিত্ত।
হেনকালে ধর্মরাজ আরম্ভিল নৃত্য।।
ডম্বুর ডিণ্ডিমডিম শিঙ্গায় সুতাল।
বম্বু ববম্বু বাজে ঘন গাল।।
সুরমাঝে স্বকার্য সাধিত নারায়ণ।
নর্তনে উত্তম কৈল সবাকার মন।।
হুড়হুড়ি পড়ে গেল হরিহর বাসে।
ধৈর্য নাই ধ্বনি শুনে সকলে ধেয়ে আসে।।
তিলোত্তমা রম্ভা আদি কন্যা কত শত।
উর্ব্বশী মেনকা আর অন্য অন্য যত।।
নাচে নাচে নিরঞ্জন নিমিষ নয়নে।
ভ্রূকুটি করেন চেয়ে তা সবার পানে।।
তিলোত্তমা আদি তারা সবে অতি শান্তা।
রম্ভাবতী শক্রসুতা সে বড় দুরন্তা।।

তাতে ধর্মমায়া তায় হয়েছে আচ্ছন্ন।
হুহু করে হেসে হেসে হল মূর্ছাপন্ন।।
ছল পেয়ে ছলা করে ছেড়ে নৃত্য ক্রিয়া।
রোহিতাক্ষে রম্ভাকে কহেন রুষ্ট হৈয়া।।
হ্যাদে ছুঁড়ি হাস্যা মোর ভঙ্গ কৈলি নৃত্য।
অপার আনন্দে দুঃখ জন্মাইলি চিত্তে।।
বড়া বলে ব্যঙ্গ কর বুকে নাহি ডর।
মনে কর একি বা কি হবেক নশ্বর।।[১৫]

মানিকরাম ষোড়শ শতকের কবি, সে জন্য তাঁর কাব্যে কৃষ্ণলীলার নানা প্রসঙ্গ লভ্য। এ কাব্যের চতুর্থ পালায়—হরগৌরীর 'কৃষ্ণকথা কথোপকথনে'র উল্লেখ আছে—

ঃ পূর্বরূপ ঈশ্বরী ঈশ্বর একাসনে।
বসিলেন কৃষ্ণকথা কথোপকথনে।।[১৬]

'সপ্তম পালা'য় কৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণিত হয়েছে—

ঃ . . . কৃষ্ণের চরিত্রকথা সুধার সমান।।
যশোদা যমুনা গেল জল আনিবারে।
কনক কলসী লয়্যা কৃষ্ণে রেখ্যা ঘরে।।
একা বস্যা ভবনে ভাবেন ভগবান।
মায়ের নিতান্ত হল মনুষ্যের জ্ঞান।।
করিব কপট ছলে মৃত্তিকা ভক্ষণ।
উদরে দেখাব আজিএ চোদ্দ ভুবন।।
ভগবান্ বল্যা তবে করিবেন ভক্তি।
নবনী দিবেন খেত্যা এই মনে যুক্তি।।[১৭]

এ কাহিনী সেকালে মূলত লীলানাট্যে অভিনীত হতো।

'নবম পালায়' রাজসভায় হীরা নটিনীর নৃত্য পরিবেশনের বর্ণনা দিয়েছেন কবি—

ঃ নাসায় বেসর পরে মুকুতার ফল।
তিমিরে তড়িৎ যেন করে ঝলমল।।
আরম্ভে নটিনী নৃত্য রাজার সভায়।

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়া রায়।।

... .

নাচে নটিনী হীরা নটিনী হীরা।
সুতান সুষন্দ্র সুচঙ্গ কর্য্যা।। (?)
ঘাঘর ঘুঙ্গুর ঘুনুনু বাজে।
অম্বুজ লোচনে বঙ্কিম সাজে।।
খোল করতাল খঞ্জরী তুরী।
মরুজা মঙ্গল ভরঙ্গ ভেরী।।
বাজে অনিবার তাথেই নাদে।
রুনুনু ঝুনুনু নূপুর পদে।।[১৮]

মানিকরামের 'ধর্মমঙ্গলে'র কোনো কোনো স্থলে ষোড়শ শতাব্দীতে প্রচলিত 'চিত্রনাট' বা 'পটনাট্যে'র ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শঙ্করীর 'বিশ্বকর্মার গঠনে' নানাবিধ অলঙ্কার পরিধান প্রসঙ্গে চিত্রের বর্ণনা চিত্রনাটের অনুরূপ—

ঃ রতনে জড়িত বিশ্বকর্মার গঠন।
তায় লেখা কৃষ্ণ কথা অক্রূর আগমন।।
ব্রজগোপীগণে দিয়া বিরহ বেদনা।
মধুপুরে গেলা কৃষ্ণ সাধিতে সাধনা।।
মধুপুরে বিলম্ব হইল বহুদিন।
ভেবে ব্রজপুর লোক সভে হইল খিন।।
শ্রীকৃষ্ণের বিরহব্যাকুল হয়ে চিত্ত।
ময়ূর ময়ূরী তারা পাসরিল নিত্য।।
কোকিল কোকিলী গান করে নাই আর।
কৃষ্ণ বিনে কেবল হইল কায় সার।।
প্রত্যহ প্রভাতে উঠে শ্রীনন্দ যশোদা।
কান্দেন কৃষ্ণের লেগে চিত্তে পেয়ে রাধা।।
ধেনুগণ সভে শষ্প না কর্য্যা স্পদনে।
উর্দ্ধ পুচ্ছ করে চেয়ে মধুপুর পানে।।
গোকুল কুঞ্জের মাঝে কৃষ্ণে নাই দেখে।
শ্যাম শ্যাম বলে কান্দে শ্রীমতী রাধিকে।।
আর তায় আছে চিত্র অতি সুগঠন।

প্রভাতে যশোদা দধি করেন মন্থন।।
হাত পেতে হেস্যা এসে চক্রপাণি।
দেয় মা যশোদা বলে মাগেন নবনী।।
কোন খানে গোপীগণ কালিন্দীর কূলে।
বস্ত্র আভরণ রেখে নাম্বিলেন জলে।।
আনন্দে করেন ক্রীড়া কৌতুক সাগরি।
হেনকালে কৃষ্ণ বস্ত্র করিলেন চুরি।।
কদম্বের শাখায় রাখিয়া বস্ত্রগুলি।
আনন্দে বিভোল হয়ে বাজান মুরলী।।
হেথা সভে জলক্রীড়া সমাধিয়া সুখী।
বিকল হইল বড় বস্ত্র নাই দেখি।।
লজ্জ বসে বস্ত্র দিয়া নিতম্ব যুগলে।
মুরলীর ধ্বনি শুনে কদম্বের তলে।।
ব্যগ্র হয়ে বচন বলেন বহুরূপে।
বস্ত্র দেয় নচেৎ কহিব গিয়া ভূপে।।
গোবিন্দ কহেন হেসে গোপীগণ আগো।
হরিকে হেরিয়া বস্ত্র হাত তুলে মাগো।।
কোনখানে গোপীগণ বড়ায়ের সাথে।
মথুরাকে যায় দধি বিক্রয় করিতে।।
নটবর বেসে কৃষ্ণ কদম্বের তলে।
সঘনে বাজান বাঁশী রাধা রাধা বলে।।

... ...

কোনখানে আছে লেখা গোপশিশুগণ।
ধেনু লয়ে উষাকালে গোষ্ঠকে গমন।।

... ...

আছে তায় অপর অনেক চিত্র আর।
বিবরে বর্ণিত হয় বড়ই বিস্তার।।[১৯]

বাঘের সঙ্গে লাউসেনের যুদ্ধ প্রসঙ্গে 'চিত্রনাটের' সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে—

ঃ বাঘটা বিক্রোধে দন্ত করে কড়মড়।
ফলঙ্গে ফুলায় গাএ ফলায় কামড়।।

বিশায়ের বনান বিচিত্র চিত্র তায়।
বিমোহিত বৈলজ্জ হইল বাঘরায়।।
একদৃষ্টে ফলাখান করে নিরীক্ষণ।
কৃষ্ণের কৌশল লীলা কালীয় দমন।।
বকাসুরবধ কথা আর দানখণ্ড।
তৃণাবর্তবিনাশ তপনে তালভঙ্গ।।
যমল অর্জুন ভঙ্গ শকটভঞ্জন।
অঘ বৎসাসুর বধ অক্রূর আগমন।।
রাসরসে রাধা সঙ্গে রাজীবলোচন।
বৃন্দাবনে ঋতুকুঞ্জে বেহার বরণ।।
গোপীগণ গৌণ সে গোবিন্দ গুণ গায়।
দশবতারের কথা দেখে বাঘরায়।।
মীনরূপে মধুরিপু মহোদধি নীরে।
বেদ উদ্ধারণ কৈলা ব্রাহ্মণের তরে।।
পঞ্চম বামনরূপে বলিকে ছলন।
সপ্তমে শ্রীরাম রাবণ নিধন।।
ভারত পুরাণ কথা দৈবের ঘটনে।
পরাভব পাশয় পাণ্ডব পঞ্চজনে।।
জৌঘরে প্রবেশ করিলা গিয়ে যবে।
বিদুর বিরলে যুক্তি বলিলেন তবে।।
কৃষ্ণলীলা দেখে কামুদলের তখন।
প্রেমেতে পুরিল অঙ্গ অঝোর নয়ন।।[২০]

চিত্র ও কাহিনীর পারম্পর্য বিচার করে বলা যায়, কবি ভাগবতদৃষ্টে কৃষ্ণকথা-চিত্র বিবৃত করেছেন। এ থেকে এরূপ ধারণাই সঙ্গত যে সেকালে পটনাট্য বা চিত্রনাটে ভাগবতপ্রোক্ত নানা পৌরাণিক ঘটনা প্রদর্শিত হতো। উদ্ধৃতিদ্বয়ে সেকালে চিত্রনাট পরিবেশনের ভাষারীতির খানিকটা আদলও কল্পনা করা যায়।

চিত্রনাটে বর্ণিত বিষয়ের অন্তর্গত সকল চিত্রই যে দেখানো হয় তা নয়। কিছু কিছু প্রধান দৃশ্য এবং চরিত্র চিত্ররূপে পটে অঙ্কিত হয়। একজন গায়েন একা অথবা দোহার সহযোগে চিত্র নির্দেশপূর্বক গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে তা পরিবেশন করে।

চিত্রনাটের অনুরূপ প্রসঙ্গ, শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জোলেখা'য় দৃষ্ট হয়। আসামে চিত্রনাট 'চিহ্ন' বা 'চিহ্নীযাত্রা' নামে পরিচিত এবং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে সে অঞ্চলে চিত্রনাটের প্রচলন থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাজেই বলা যায় চিত্রের মাধ্যমে নাট্যপরিবেশনার-রীতি বাঙলা থেকেই আসামে বাহিত হয়েছিল।

রূপরাম চক্রবর্তী মানিকরামের সমসাময়িক বলে অনুমিত। এ কাব্যে কবির আত্মকাহিনী অংশে আছে—

ঃ উর ধর্ম্ম আসরে আসিয়া শোন গীত।
আপনার নিজগুণে করিবে মোহিত।।
ছন্দেবদ্ধ তাল মান কিছুই না জানি।
আমি উপলক্ষ্য গীত গাইবে আপনি।।
আপনি সঞ্জাবে সভা গীত আর নাটে।
বার দিয়া আপনি বসিবে ধবল খাটে।।[২১]

চৈতন্যবন্দনায় 'নাটশালা'র উল্লেখ দেখা যায়—

ঃ নাটশালা তুল্যা দিল বার দিবার ঘর।
সুবর্ণ পতাকা উড়ে চালের উপর।।[২২]

এ থেকে মনে হয় সেকালে নাট্যশালার চূড়ায় পতাকা স্থাপনের নিয়ম ছিল।

ধর্ম্মমঙ্গলের আরেক কবি খেলারাম চক্রবর্তী। কোনো কোনো পণ্ডিত তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।[২৩] কারো কারো মতে খেলারাম 'গৌড়কাব্য' নামে 'ধর্মমঙ্গল' রচনা করেন। রূপরামের কাব্যে 'খেলারামের' নাম পাওয়া যায়। সেখানে তিনি 'গায়েন' রূপে উল্লিখিত হয়েছেন—

ঃ খেলারাম গায়েন করিল বহু হিত।
হাতে যন্ত্র দিয়া করিল নাটগীত।।[২৪]

ঘনরাম ধর্মমঙ্গলের কবিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর রচিত 'ধর্ম্মমঙ্গল' (১৭১১-১২ খ্রীঃ) সর্বমোট চব্বিশ পালায় বিভক্ত। এগুলি যথাক্রমে—

(১) স্থাপনা পালা (২) ঢেকুর পালা (৩) রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা (৪) হরিশচন্দ্র পালা (৫) শালেভর পালা (৬) লাউসেনের জন্ম পালা (৭) আখড়া পালা (৮) ফলা নির্ম্মাণ পালা (৯) গৌড়যাত্রা পালা (১০) কামদল বধ পালা (১১)

জামতি পালা (১২) গোলাহাট পালা (১৩) হস্তীবধ পালা (১৪) কাঙুর যাত্রা পালা (১৫) কামরূপ যুদ্ধ পালা (১৬) কানড়ার স্বয়ম্বর পালা (১৭) মায়ামুণ্ড পালা (১৮) কানড়ার বিবাহ পালা (১৯) ইচ্ছাই বধ পালা (২০) অঘোর বাদল পালা (২১) পশ্চিম উদয় আরম্ভ পালা (২২) জাগরণ পালা (২৩) পশ্চিম উদয় পালা (২৪) স্বর্গারোহণ পালা। পরিশিষ্টে আছে 'সুরিক্ষার পালা'। বস্তুত চব্বিশ পালায় কাহিনী পরিবেশনের যে কৃত্য ধর্মপূজায় প্রচলিত, ঘনরাম তা সর্বাংশে রক্ষা করেছেন। তাঁর হাতেই ধর্মমঙ্গল কাব্য আঙ্গিক ও কাহিনীগত বৃত্তের বিচারে সম্পূর্ণতা লাভ করে।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতই ধর্মমঙ্গল কৃত্য-পাঁচালি। অর্থাৎ এর পরিবেশনার সঙ্গে কৃত্যের যোগ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কবি তাঁর কাব্যকে 'সঙ্গীতনাট' রূপে আখ্যায়িত করেছেন—

ঃ শ্রীধর্মসঙ্গীত নাটে ঘটে কর ভর।
দাসের আশয় পুর আসর ভিতর।।[২৫]

কৃত্য পাঁচালিতে 'ঘটে' দেবীর অধিষ্ঠান কামনা পরিবেশনারই অঙ্গ। 'সঙ্গীতনাট' আসলে গীতনাট। মঙ্গল পাঁচালি প্রকৃত অর্থেই যে সঙ্গীতনাট বা গীতনাট রূপে মধ্যযুগে পরিচিত ছিল, তাঁর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে উদ্ধৃতাংশে।

স্থাপনা পালায় নৃত্য ও গানের প্রসঙ্গ লভ্য—

ঃ নৃত্য করে অপ্সরা কিন্নরে করে গান।
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী বর্তমান।।[২৬]

দেব সভায় 'নাট' পরিবেশনের নিমিত্তে অম্বুবতী শুচিস্নান করতে যায়। চণ্ডী জরাতি-ব্রাহ্মণীর বেশে ঘাটে আবির্ভূত হলেন। অম্বুবতী তাঁকে দেখে ঘৃণাবশত পথ ছেড়ে দিতে বলল—

ঃ স্নান করে নটী বলে ছাড় বুড়ি পট।
দেবসভা বসিছে দেখিতে মোর নাট।।

রূপসজ্জা গ্রহণপূর্বক অম্বুবতী দেব সভায় প্রবেশ করল—

ঃ অশেষ বিশেষ করিলাম বেশ
নাচিতে চলিল নটী।
মুনি মনোরমা অপর উত্তমা
সঙ্গে সহচরী ছটি (ছয় জন?)

সঙ্গে বাদ্যকর অতিমনোহর
গরবে না চলে পা।

অম্বুবতীর সঙ্গে সহচরী, গায়েন, বায়েন ও দোহার ছিল। এরপর দেব সভায় প্রবেশ করল স্বর্গ-নর্তকী—

ঃ . . . ঘুরায়ে নিতম্ব কুচগিরি কুম্ভ
বামে হেলায় মধ্য গা।।
হেরিতে বদন মোহিত মদন
রতন রঞ্জিত অঙ্গে।
গজেন্দ্র গামিনী প্রবেশে কামিনী
দেবসভা নানা রঙ্গে।।
দেবতা সকলে বন্দি কুতূহলে
মৃদঙ্গে দিলেন ঘা।
দেবসভা ধাই করে রাওয়া রাই
অই নটী নাচে বা।।[২৭]

এ নৃত্যে দেব-বন্দনা ছিল।

অম্বুবতীর নৃত্য শুরু হলো। সে-নৃত্যে শুধু অম্বুবতী নয়, সহচরীরাও অংশগ্রহণ করেছিল—

ঃ রাগিণীর গতি বুঝি অম্বুবতী
নাটে বড় অনুরাগ।

নৃত্যকালে অম্বুবতীর মুখে 'গদগদ বাণী' অর্থাৎ কথাও ছিল।[২৮] কাজেই তা শুধু নৃত্য নয়,'নাট' ও।

হরিশ্চন্দ্র পালায 'পট' ও 'গীতনাটের' প্রসঙ্গ আছে—

ঃ আগে তার ঈষৎ ঈশানে ধর্য্য পট।
দেখ্যে যাবে ধর্ম্মের গাজনে গীতনাট।[২৯]

সেকালে ধর্মের গাজনে 'বেত্র-নৃত্যে'র প্রচলন ছিল—

ঃ গাজনে আমার তনয় তোমার
ভকত সকল সাথে।
ডাকে ধর্ম্ম জয় পদ্য বাদ্য ময়
নাচে লুই বেত্র হাতে।।[৩০]

এ কাব্যে নদীয়া প্রসঙ্গে নাটক-নাটিকার উল্লেখ লভ্য—

ঃ বিদ্যা পড়িবার তরে না কর ভাবনা।
নদ্যা হতে পণ্ডিত এসেছে কত জনা।
অধ্যাপক পণ্ডিত সকল মোর বশ।
নাটক নাটিকা দেখ কাব্যকলা রস।।
তিন সন্ধ্যা যোগাইব গঙ্গাজল চিনি।
দাসী হয়্যা অঙ্গে চামর ঢুলাব আপনি।।
দিবারাত্রি মধুপানে করিবে কৌতুকে।
পালঙ্কেতে তাম্বুল যোগাব চাঁদমুখে।।[৩১]

ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গলে' 'নৃত্য', 'গীত', 'তাণ্ডব' ও 'কৌতুকে'র উল্লেখ আছে—

ঃ কিন্নর সমান গুণী নিত্য কর এস্যা।
গীত শুন তাণ্ডব কৌতুক দেখ বস্যা।।[৩২]

গীত, তাণ্ডব-নৃত্য ও কৌতুক একই আসরে পরিবেশিত হতো সেকালে, তার প্রমাণও মিলছে।

নাটগীত, পুরাণ ও মহাভারত পরিবেশনের প্রসঙ্গ আছে—

ঃ কৃষ্ণপূজা দেখে রায় সভার আলয়।
নাটগীত পুরাণ ভারত কত হয়।।[৩৩]

সেকালে কৃষ্ণপূজার সঙ্গে নানা নাট্যমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে 'হরিশ্চন্দ্রের পালা' অংশ রঞ্জাবতী কর্তৃক বিবৃত হয়। পুত্র সন্তান লাভের বাসনায় রঞ্জাবতী, কর্ণসেনকে ধর্মপূজায় উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্তে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী বলে।

হরিশ্চন্দ্র পালায় কাহিনী বর্ণনার পূর্ব-প্রস্তুতি হিসেবে কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীর উক্তি-প্রত্যুক্তি নিঃসন্দেহে গায়েনের চরিত্রমনস্ক পরিবেশনার দাবি রাখে—

ঃ (রায় কর্ণসেনে পুন বলে রঞ্জাবতী।)
পায়ে পড়ি প্রাণনাথ দেহ অনুমতি।।
যুগপতি চাপায়্যা করিব আরাধনা।
তবে পূর্ণ হবে নাথ মনের বাসনা।।
বার হবে বুকের বিষম বাকশেল।

সোদর বচনে মোর পেটে হল বেল।।

ঃ (রাজা কন) বুঝা না অবোধ তুমি রাণী।
কোন্‌বুদ্ধে বল বাড়া বিপরীত বাণী।।
বিধাতা ফকির মোর কর‍্যাছিল প্রায়।
পুনরপি মায়াজালে তুমি হল্যা তায়।।
কার মনে ছিল আর সংসার বাসনা।
ঘটায়ে দারুণ বিধি করে বিড়ম্বনা।।

... ...

ঃ (পাদুটি ধরিয়া পুন রঞ্জাবতী কয়।)
ধর্ম্মপথে দাঁড়াল্যে সংসারে কারে ভয়।।

... ...

ঃ (শুনি কর্ণসেন বলে) সব কর্ম্মফল।।
হরি ভজ তরিবে তরাবে পিতৃলোকে।

... ...

ঃ (রঞ্জাবতী বলে) নাথ কর অবধান।।
নিরাকার গোসাঁই সাকার ভক্তিবশে।
করিলে একান্ত ভক্তি পাই অনায়াসে।।
ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে নাথ যদি যায় প্রাণ।
বাঁচায়্যা পুরাবে বাঞ্চা প্রভু ভগবান।।

....

এবার সংক্ষেপে রঞ্জাবতী পালার কাহিনী বিবৃত করে—

ঃ ধর্ম্মপূজা দিল রাজা ছিল আটকুড়া।
লুহিশ্চন্দ্র পুত্র যার হল্য বংশচূড়া।।
যে পুত্র আপন হস্তে কাটিল্য রাজন।
মা হয়্যা পুত্রের মাংস করিল রন্ধন।।
ব্রহ্ম সনাতন তার বুঝি ভক্তিবল।
সেই পুত্রে দান দিলা ভকত বৎসল।।
শূন্যা কর্ণসেন তবে কন ভক্তিবশে।
আপনি কাটিল্যা পুত্রে কেমন সাহসে।।

কোনো ভক্তিবশে বা সদয় যুগপতি।
শুনিলে সন্দেহ ঘুচে দিব অনুমতি।।
এত শুনি রঞ্জাবতী করে নিবেদন।
পণ্ডিত গোসাঁই গ্রন্থে বলিল যেমন।।
নূতন মঙ্গল দ্বিজ কবিরত্নে গান।
মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ।।[৩৪]

এরপর হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী বর্ণনা—

ঃ ধর্ম্ম ইতিহাস মতে রঞ্জাবতী জোড় হাতে
প্রাণনাথে করে নিবেদন।
নারী সঙ্গে নরপতি কাননে ভ্রমেন নিতি
দুঃখমতি পুত্রের কারণ।।
একদিন দৈবাধান প্রসন্ন হৈল দিন
প্রবেশে বল্লুকা নদীতটে।
বনবধুগণ রঙ্গে সেবিছে সংঘাত সঙ্গে
ধর্ম্মপদ প্রবাহ নিকটে।।
তা দেখি প্রণতি স্তুতি নত হয়্যা নরপতি
তুষ্টমতি যত তপস্বিনী।
ধর্ম্মপূজা উপদেশ দেখ্যা খণ্ডাইল ক্লেশ
বিশেষ কৃতার্থ নৃপমণি।।
আপনি বল্লুকাবাসী হরিশ্চন্দ্র হাসি হাসি
কন প্রভু সন্ন্যাসীর বেশে।
জ্যেষ্ঠ যে তনয় হবে লুহিশ্চন্দ্র নাম থোবে
বলি দিবে ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে।।
তবে চতুর্বর্গ ফল পাবে রাজা করতাল
সকল্প ভাবেন নৃপবর।
পুত্রের বয়ান হেরি পুন্নাম নরক তরি
পরিণামে যা করে ঈশ্বর।।
এত ভাবি অঙ্গীকারী সঙ্গে লয়্যা নিজ নারী
অনাহারে করে ধর্ম্মপূজা।
কতেক কঠোর তপে যাগ যজ্ঞ পূজা জপে

পুত্রবর পাল্য মহারাজা।।
হইল রাজার বংশ নৃপকূল অবতংশ
লুহিশ্চন্দ্র রাখিল আখ্যান। ৩৫

হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী নারী কর্তৃক বর্ণিত হবার দৃষ্টান্তে ধারণা করা যায়, এককালে এ পালা ব্রতকথা রূপে অন্তপুরবাসী নারীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

নাচাড়ি ছন্দে রচিত এ অংশটুকু গায়েন নৃত্য সহযোগেই পরিবেশন করত।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী প্রাচীনকাল থেকে, মৌখিক রীতিতে ধর্মপূজার কৃত্যরূপে বাহিত হয়ে অষ্টাদশ শতকে এসে পাঁচালিরূপে পূর্ণতা লাভ করে। পালা নামে আখ্যায়িত হলেও এ শ্রেণীর কাব্যের পরিবেশনারীতি পাঁচালি থেকে ভিন্ন— ধর্মমঙ্গল কাব্যের পরিবেশনারীতি দৃষ্টে তা বলা যায়। এ সঙ্গে, এ কথা পুনরায় উল্লিখিত হওয়া দরকার যে, সমগ্র পালার মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীই সর্বপ্রাচীন। এ কাহিনীতে বৌদ্ধ সহজিয়াতন্ত্র ও নাথ দর্শনের প্রভাব আছে। পরবর্তীকালে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম-দর্শনের প্রভাবে এ কাব্যের নানা স্থলে গৌর-বন্দনা ও কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। বাঙালির দুই প্রধান ধর্মদর্শনের যুগলচিহ্ন একমাত্র ধর্মমঙ্গলেই আছে। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মারমাদের মধ্যেও যাত্রা-পালার আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়ে থাকে।

ধর্মমঙ্গলে বীররসের প্রাধান্য আছে। এ কাব্যের কবিরা যুদ্ধ বর্ণনায় চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শিতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। বিশেষত ঘনরামের কাব্যে যুদ্ধ বা বীরের যুদ্ধসজ্জা বর্ণনা সর্বাপেক্ষা পরিণত।

তা সত্ত্বেও বলা যায়, ধর্ম, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি প্রধান এবং অপ্রধান ধারার কোনো কোনো মঙ্গলকাব্যে যে যুদ্ধ বর্ণনা প্রত্যক্ষ করি তা ধ্রুপদীকাব্যে বিবৃত যুদ্ধ বর্ণনার তুলনায় শোভন, গম্ভীর ও সর্বব্যাপী নয়। সচরাচর মঙ্গলকাব্যে যুদ্ধ বর্ণনা যুদ্ধ সম্পর্কিত লৌকিক ধারণারই প্রতিফলন বলে মনে করা যায়। ব্যক্তিগত বীরত্বের স্ফীতকায় দম্ভ, প্রবল দৈবনির্ভরতা প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যে দৃষ্ট হয়। এ ধরনের যুদ্ধ বর্ণনায় অবশ্য কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। কৃত্তিবাসও রামায়ণে যুদ্ধ সম্পর্কে বাঙালির লৌকিক অভিজ্ঞতা ও কল্পনাকে অবলম্বন করেছিলেন।

মঙ্গল-পাঁচালির পরিবেশনায়, এই যুদ্ধ বর্ণনা রৌদ্ররসে উদ্বেলিত হতো, সন্দেহ নাই।

মনসামঙ্গল

মনসামঙ্গলের উল্লেখযোগ্য কবি বিজয়গুপ্ত। তাঁর 'পদ্মাপুরাণ' বা 'মনসামঙ্গল' ১৪৮৪-৮৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রচিত।[৩৬]

বিজয়গুপ্ত তাঁর কাব্যকে 'গীত' ও 'পাঁচালী গীত' রূপে উল্লেখ করেছেন—

ঃ জোড় হস্তে গুণিনের করি পরিহার।
গীতের জত দোষ না লবা আমার।।
সভার পাঁচালী গীত নানা দোষময়ে।
তার দোষ না লইবা পণ্ডিত যত হয়ে।।

এ হচ্ছে গীতের প্রস্তাবনা। গায়েন জোড় করে আসরের সম্মুখে বিনয় প্রকাশ করেছেন। একই অধ্যায়ের পর বাষট্টি সংখ্যক পদের নিম্নরূপ পাঠান্তর দেখা যায়—

ঃ বিজয়গুপ্ত বোলে গাইন হও সাবহিত।
পয়ার এড়িয়া পাই গীতে দাও চিত।।
বিজয়গুপ্তে রচে পুথি মনসার বর।
স্বপ্ন আদ্যা পালা গাহিলাম এই খানি সোসর।।[৩৭]

এ হচ্ছে পরবর্তীকালে গায়েনের প্রক্ষেপ। কিন্তু তাতে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, পয়ারের পর গীত প্রয়োগের মাধ্যমে রস সৃষ্টি সম্পর্কে গায়েন সতর্ক (সাবহিত=সহ-অ-বহিত)। 'সোসর' কথাটা হচ্ছে, সম-স্তর। অর্থাৎ সমান সমান।

বক্ষ্যমাণ পদের অন্তে বলা হচ্ছে এখানে (বা এইটুকু) স্বপ্ন আদ্যা 'পালা' সম্পূর্ণরূপে গীত হলো। এই আঙ্গিক-সচেতনতা এ কাব্যের সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। স্বপ্নাধ্যায় পালায় পদ্মা স্বয়ং নির্দেশ দিচ্ছেন কবিকে—

ঃ ছিকলির ছন্দে পয়ার মধ্য লাচারি।
গীতের আগে রচিও গোসাইর পুষ্পবাড়ি।।[৩৮]

বিজয়গুপ্ত যে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ছকে কাব্যটি রচনা করেছেন, তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। পাঁচালির শৈলী তখন সর্ববঙ্গে প্রচলিত হয়েছিল এবং তা যে একটি নান্দনিক শৃঙ্খলা হিসেবে গৃহীত হয়েছিল পঞ্চদশ শতকে, তার প্রমাণও এ থেকে লভ্য। উদ্ধৃত পদ থেকে দেখা যায় 'ছিকলি' বা শিকলির ছন্দে পদ বা পয়ারের মাঝে মাঝে 'লাচারি' প্রয়োগ এবং চাঁদ সদাগরের পুষ্পবাড়ি বর্ণনা গীতের পূর্বে রচনার কথা বলা হচ্ছে। এ কাব্যে 'ধুয়া' ঘটনা বর্ণনার অংশ হিসেবে প্রযুক্ত—

ঃ মনসার প্রভাবে চণ্ডী জিল আরবার।
ডাকিনী যোগিনী দিল জয়ে জোকার।।[৩৯]

ত্রিপদী মাত্রই লাচারি নয়—একথা মানিকদত্ত প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। এখানেও পয়ার ছন্দে লাচারির নির্দেশ রয়েছে—

'লাচারি'

ঃ পঞ্চস্বরে বাদ্য বাজে মনোহর।
বিবাহের মঙ্গল স্নান করে মুনিবর।।
কার হাতে আইয় সরা কার হাতে দীপ।
শতে শতে আইয় গেল মনির সমীপ।।
পতি পুত্রবতী যত দেবতার নারী।
বরণের সজ্জা লইয়া দাঁড়াইল সারি সারি।।[৪০]

কাজেই পাঁচালিতে নানা পন্থায় নির্দেশিত পরিভাষাগুলো গীত রচনার সঙ্গে পরিবেশন-কৌশল হিসেবেও বিবেচ্য। বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর সঙ্গেও লাচারি'র প্রয়োগ দেখা যায়—এ কাব্যে 'মঙ্গলরাগ'ভিত্তিক লাচারি আছে।[৪১]

বিজয়গুপ্তের কাব্যের গঠনকৌশল পর্যালোচনাপূর্বক এর পালাভিনয়রীতি অনুধাবন করা যায়। 'স্বপ্নাধ্যায় পালা' ও 'মনসার জন্মপালা' অবলম্বনে নিচে এর একটি পরিচয় তুলে ধরা হলো—

'স্বপ্নাধ্যায় পালা' ও 'মনসার জন্মপালা'

বন্দনা ঃ এতে আছে দেবতা বন্দনা ও দর্শকদের সম্বোধন। এরপর স্বপ্নাধ্যায় পালা—দেবীর মুখনিঃসৃত সংলাপ-পাঁচালি রচনার নির্দেশ। এ হচ্ছে শিকলি বা পদ। এরপর মনসার জন্মপালা—সংলাপ ও বর্ণনার মিশ্রণে পদ। তবে সংলাপের

তুলনায় বর্ণনা বেশি। তারপর লাচারি—এতে আছে পুষ্পবনের বর্ণনা অর্থাৎ এ হচ্ছে বর্ণনার সঙ্গে নৃত্য। পরবর্তী পদ পয়ার বন্ধে রচিত, এতে উক্তি-প্রত্যুক্তি আছে। এ পদের বিষয়বস্তু—মনসার জন্ম, লাবণ্যময়ী মনসাকে দেখে শিবের বিস্ময়—মনসার প্রতি শিবের অভিভূত জিজ্ঞাসা। এর পরেই লাচারি। এতে আছে কামার্ত শিব কর্তৃক আত্মজা মনসাকে নিবেদন। এই লাচারি পদটি সম্পূর্ণত শিবের উক্তি। ফলে বর্ণনাত্মক পদের ধারায় স্থান-কাল-ঘটনা অনুসারে তা নাট্যধর্মী কৌশল হিসেবে বিবেচ্য। পরবর্তী পদও পয়ারবন্ধে মনসার উক্তি। মনসা শিবকে প্রত্যাখ্যান করে। এরপর আছে লাচারি—মনসার শিবস্তুতি ও পিতার কাছে আত্মপরিচয় দান। সম্পূর্ণ পদটি সংলাপাত্মক।

দেখা যায়, নিবেদন বা বন্দনা থেকে গঠন কৌশলের কারণে পালা-গায়েন ধীরে ধীরে ঘটনার নানা মাত্রায় নিজেকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ পাচ্ছেন। এর ফলে গায়েনের পক্ষে কোনো বিশেষ উক্তি বা সংলাপের ধারায় চরিত্রানুগ হাব ও ভাব প্রদর্শন করাও সম্ভব।

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে 'নৃত্যশালা'র উল্লেখ আছে—

ঃ মোর পুত্র ধনপতি গুণের তরঙ্গ।
নৃত্যশালা আছে তার চারিটা মৃদঙ্গ।।
তার একটা মৃদঙ্গ লইয়া দিব তারে।
নৃত্য গিয়া কর তুমি শিবের গোচরে।।

বেহুলাকে মৃদঙ্গ সহযোগে নৃত্য করার পরামর্শ দিচ্ছে নেতাই। বিশেষ ধরনের কোনো কোনো নাচে (মণিপুরী) গলায় মৃদঙ্গ ঝুলিয়ে তা নাচের ছন্দে নায়ক বা নায়িকা নিজেই বাজিয়ে থাকে—

ঃ নানা বেশ করে বেউলা কটাক্ষের ছান্দে।
ধনপতির মৃদঙ্গ তুলিয়া লইল কান্ধে।।[৪২]

তারপর শিবের সভায় নৃত্যের শুরুতে গীত—

ঃ সাত পাঁচ ভাবি বেউলা স্থির করে হিয়া।
মধুর স্বরে বলে গীত মৃদঙ্গ টোকা দিয়া।।

সে গীতে 'রাগ' ও 'দিশা'র উল্লেখ আছে—

ঃ যত কাল যাবত গেল অনিরুদ্ধ উষা।
তদবধি না শুনি হেন রাগ দিশা।।[৪৩]

রাগভিত্তিক গীত ধ্রুপদী নৃত্যের ইঙ্গিতবহ।

অতঃপর মূল নাট্যের শুরু—

ঃ বুঝিয়া শিবের মন বেউল্যার কৌতুক।
আরম্ভিল নৃত্যগীত শিবের সম্মুখ।।
কোকিলের রব যেন বলে মধুর স্বরে।
মধুর স্বরে গায়ে গীত পায়ে নাটপুরে।।
হাতে বাদ্য বাজায়ে বেউলা সুখে গায় গীত।
নানা বিধি গাহে গীত শুনি সুললিত।।[৪৪]

মনসামঙ্গলের প্রাচীন কবি বিপ্রদাস পিপিলাই '১৪৯৫-৯৬ খ্রীস্টাব্দে' মনসা বিজয় বা মনসামঙ্গল রচনা করেন।[৪৫] ভূমিকায় কবি বলেছেন—

ঃ পাঁচালী রচিতে পদ্মা করিলা আদেশ।
সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ।।

এ কাব্য 'ব্রতগীত' রূপে উল্লিখিত হয়েছে—

ঃ হেনকালে রচিল পদ্মার ব্রতগীত।
শুনিয়া ত্রিবিধ পরম গীরিত।।[৪৬]

মনসাবিজয়ের শুরুতে কবি তার কাব্যকে বলেছেন 'মঙ্গলগীত'।—

ঃ সংক্ষেপে পদ্মার ব্রত কহিল মঙ্গলগীত।
বিস্তারে কহিব সপ্তনিশি।।[৪৭]

এ কাব্যটির সপ্তপার্বিক হবার কথা। কিন্তু এতে প্রাপ্ত ত্রয়োদশ পালাদৃষ্টে গবেষকগণ মনে করেন যে, বাকি পালাসমূহ পরবর্তীকালে লিপিকার ও গায়েনদের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত রচনা।[৪৮] এ কাব্যে বেহুলা বিদ্যাধরী। শিব তার নাচে মুগ্ধ হয়ে প্রেম নিবেদন করে।[৪৯]

বিপ্রদাসের মনসাবিজয় বা মনসামঙ্গলের যে পূর্ণাঙ্গরূপ দৃষ্ট হয় তার প্রামাণিকতা সম্পর্কে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ সংশয় প্রকাশ করেছেন।[৫০]

নারায়ণদেব ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের কবি বলে অনুমিত।[৫১] তাঁর কাব্য 'পদ্মাপুরাণ'। এ কাব্যে ঘটনাপরম্পরা অস্পষ্ট। ফলে কাহিনী-শৈথিল্য দৃষ্ট হয়।

'পদ্মাপুরাণ' মোট তিনখণ্ডে বিভক্ত। প্রথমাংশে কবির 'আত্মনিবেদন', দ্বিতীয় অংশে 'স্বর্গীয় কাহিনী' এবং তৃতীয় অংশে 'বেহুলা লখিন্দরের' কথা।

'পদ্মাপুরাণে' বেহুলা লখিন্দরের স্বর্গ থেকে ফিরে পুনরায় স্বর্গে প্রত্যাবর্তন নারায়ণদেবের কাব্যকে যর্থাথই করুণ রসসিক্ত করে তুলেছে। এ কাব্যে চাঁদসদাগর পূজালোভী মনসাকে শেষ পর্যন্ত বেহুলা-সনকার অনুরোধে, মাত্র বামহাতে পিছন ফিরে পুষ্পার্ঘ প্রদান করে। চাঁদসদাগরের এই দার্ঢ্য অন্য কোনো কবির রচিত মনসামঙ্গলে দেখা যায় না।

নারায়ণদেব জনপ্রিয় কবি, এজন্য তাঁর পাঁচালিতে নানা কালের গায়েন বা লিপিকরের প্রক্ষেপ দৃষ্ট হয়। মুদ্রিত কাব্যের বিভিন্ন ভণিতায় প্রায় আট-নয়জন কবি ও গায়েনের নাম লভ্য। এঁদের মধ্যে আছেন—

বংশীদাস, জানকীনাথ, যদুনাথ, ষষ্ঠীবর, শিবানন্দ প্রমুখ—

ঃ ক. শিবের বিলাপ কথা কহন না যায়।
লাচাড়ী প্রবন্ধে দ্বিজবংশীদাসে গায়।।

খ. কহে ষষ্ঠীবর মধুর ভারতী।
সোমেশ্বরী পদে মোর বাহুল ভকতী।।

গ. মনসা চরণে আশ কহে শিবরাম দাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে গীত গায়।।

ঘ. অপরূপ নৃত্য করি মোহিলেন ত্রিপুরারি
পণ্ডিত জানকী নাথে গায়ে।।[৫২]

বিভিন্ন নামের ভণিতা থেকে দেখা যায় নারায়ণদেবের 'পদ্মাপুরাণ' পাঁচালি কাব্য। এতে পদ পয়ার লাচারি দিশা—সর্বত্র দৃষ্ট হয়। 'লাচারি প্রবন্ধ' কথাটা অন্যত্র সুলভ নয়।

'পদ্মাপুরাণে'র পদ বা পয়ার লাচারি ও দিশার নমুনা নিচে উদ্ধৃত হলো—

পয়ার ঃ লক্ষ চুম্ব দিয়া তারে নেতালো সুন্দরী।
বিপুলাকে লইয়া চলিল নিজ পুরী।।
কাপড় লইয়া নেতা চলিল সত্বর।
আনিয়া দিলেক বস্ত্র পদ্মার গোচর।।
কাপড় দেখিয়া পদ্মা হরষিত মন।

আজি কেন ভাল ধৌত হয়েছে বসন।।
আর দিন ধৌত হয় রক্তিম বরণ।
শ্বেত হংস প্রায় আজি হল কি কারণ।।
কাপড় খসায়ে দেখে জয় বিষহরী।
ছয়ে পুত্রে লিখিয়াছে চাঁদ অধিকারী।।
সুমিত্রাকে লিখিয়াছে শাহে নৃপবর।
পদ্মার চরণ চাঁদ শিরের উপর।।
লিখিছে ভাশুর ষষ্ঠ প্রভু লক্ষ্মীন্দর।
আপন বিনয় ধনী লিখেছে বিস্তর।।[৫৩]

লাচাড়ি : 'লাচাড়ী, ত্রিপদী, পটমঞ্জুরি রাগ'

কার্ত্তিক গণেশে দেখি, বিষহরী বলে ডাকি,
আজি শিব যত্ন কি কারণে।।
দুষ্ট বেটা চন্দ্রধর, কাকালী ভাঙ্গিল মোর,
জ্বর হল সেই বিষটনে।।
রাত্রি দিবাষ্ট প্রহর, গাত্রে হল ভয় জ্বর,
শুনহ নারদ মহামুনি।।
বিষম জ্বরের তাপে, উভ হতে মাথা কাঁপে,
কল্য না খেয়েছি অন্নপানি।।
নারদ সময় পেয়ে, বলে গায়ে হস্ত দিয়ে,
এই জ্বরে তোমার মরণ।।
মুনি বলে পদ্মাবতী, বুঝিনু জ্বরের গতি,
এই বার সঙ্কট তরণ।।[৫৪]

দিশা : দেব সভার মাঝে রে,
আরে রাজসভার মাঝে রে;
আর নৃত্য করে বিপুলা সুন্দরী।[৫৫]

অন্যান্য মনসামঙ্গল কাব্যের মতো একাব্যেও স্বর্গপুরে বেহুলার নৃত্য প্রসঙ্গ আছে। তবে নারায়ণদেব তাকে উষারূপেই অভিহিত করেছেন। প্রথমে নৃত্য বা নাট্যের আহার্য—

: পূর্ব্বাপর যত কথা সকল কহিয়া।
সুবেশ করিতে কন্যা গেলেন চলিয়া।।

বিদ্যাধরীগণ আসি উপনীত হৈল।
বেশভূষা তরে উষা তখনে বসিল।।
দুইকর্ণে সোনার কুণ্ডল প্রকাশিত।
বৃহস্পতি শুক্র যেন চন্দ্রের সহিত।।
কটিতে ঘুঙঘুর দিল অতি পরিপাটি।
বলয়া কঙ্কণ পরে সোনার বাউটি।।
সাজিয়া রহিল কন্যা বিদ্যাধরী যোগে।
চিত্র যেন সাজাইল শঙ্করের আগে।।

এরপর দেব-সভায় সকলের আগমন ও ঊষাসহ নৃত্য পটিয়সী বিদ্যাধরীগণের প্রবেশ—

ঃ দেবসভা সুসজ্জিত হইল বিশেষ।
বিদ্যাধরীগণ কৈল্য নৃত্যেতে প্রবেশ।।
যার যেই যন্ত্র হাতে লইয়া সংযোগ।
গীত বাদ্য আরম্ভিলা তাল যন্ত্ররাগে।।
বিদ্যাধরি অপ্সরা গন্ধর্বে গীত গায়।
আপনি যে চিত্রসেন মৃদঙ্গ বাজায়।।[৫৬]

এ রীতির নাট্য বা নৃত্যবর্ণনা মধ্যযুগের নানা গেয়কাব্যে বহুস্থলে আছে। উদ্ধৃতাংশে দেখা যায় যে, উষার নৃত্যস্থল ও আসর বিশেষভাবে সুসজ্জিত। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র যথাযোগ্য হাতে অর্পিত হলো, যন্ত্রও সংযুক্ত হলো নৃত্যের সঙ্গে। সে নৃত্য গীতযুক্ত। এতে সকল নৃত্য-নাট্য কুশলীদের সমাবেশ ঘটেছিল। নৃত্যে মৃদঙ্গ ব্যবহারে নিপুণ বাদকের উল্লেখও মিলছে।

সেকালের নাট্যে নর্তকীদের প্রবেশের ক্রম নারায়ণদেবের 'পদ্মাপুরাণ' ব্যতিরেকে আর কোথাও উল্লিখিত হতে দেখা যায় না—

ঃ নানা বেশ সুবেশ করিয়া অনুক্রমে।
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা আসিল প্রথমে।।
তার অবশেষে নাচে জয়া ও বিজয়া।
দেবগণ মোহপায় দেখে যার মায়া।।
চিত্রা শচী বিদ্যাধরী নাচে তার পাছে।
যার পানে দেবসভা এক দৃষ্টে আছে।।

এরপর ইন্দ্র কর্তৃক উষাকে নৃত্যে আহ্বান—

ঃ অবশেষে সুরপতি উষারে আদেশে।
নাচিবারে উষা তবে সভাতে প্রবেশ।।

উষারূপী বিপুলার নৃত্যে, 'মৃদঙ্গের' সঙ্গে 'ঢাক' ব্যবহারের প্রসঙ্গ আছে—

ঃ বিদ্যাধরগণ ঢাক মৃদঙ্গ বাজায়।
প্রবেশ করিয়া নাচে সুন্দরী উষায়।।

গীত, বাদ্য ও নৃত্যের—চারটি প্রবেশক্রম গণনা করে বলা যায়, এ ধরনের নৃত্যক্রম সেকালে প্রচলিত ছিল। এ নৃত্য উচ্চকোটি সমাজের—আরও বিশদভাবে বলতে গেলে সেকালের রাজদরবারের।

নারায়ণদেব পাঁচালি গায়েনের নৃত্যের পদে অর্থাৎ 'লাচাড়ী'র সঙ্গে বিপুলার নৃত্য বর্ণনাকে যুক্ত করেছেন—

ঃ নাচে সুন্দরী বেহুলা অলক্ষিতে করে খেলা,
নানা মতে করে অঙ্গভঙ্গ।
নয়ন কটাক্ষে চায়, প্রাণ কাড়ি নিয়ে যায়,
অপরূপ মদন তরঙ্গ।।
খঞ্জন গমন গতি, চলিতে শোভিত অতি
ঘন ঘন অঙ্গুলি হেলায়।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে অতি সুললিত বেশে,
ঝনুঝুনু মন্দিরা বাজায়।।
সুললিত গীত গায়, সংযোগেতে তান বায়,
ময়ূরে পেখম তাহে ধরে।
সুর মুনি আদি যত, সব হৈলা বিমোহিত,
কামবাণে দহিল শরীরে।।
কোকিলা জিনিয়া রব, নৃত্য করে অসম্ভব,
ক্ষীণকটি সদায় হেলায়।
অপরূপ নৃত্য করি, মোহিলেন ত্রিপুরারি
পণ্ডিত জানকী নাথে গায়।।

এই নৃত্য অঙ্গভঙ্গি ও দৃষ্টিভেদে রচিত ধ্রুপদী নৃত্যকলা-সম্ভূত এবং তা লাস্যশ্রেণীর। গীতের সঙ্গে তানও ছিল—বিপুলা ময়ূর-নৃত্য প্রদর্শন করেছিল দেবসভায়।

একটি সংস্করণে বেহুলার নৃত্যসজ্জা ও নৃত্যবিষয়ক ভিন্নতর বর্ণনা দৃষ্ট হয়। বেহুলা নেতাকে বলল নৃত্যসজ্জা আনতে। 'ধনা' অর্থাৎ ধনপতি আদিষ্ট হয়ে ভাণ্ডার থেকে বসন- অলঙ্কারাদি এনে দিল। বেহুলা তখন বলল, মৃদঙ্গ বাদক চাই। কারণ, 'বিনা মৃদঙ্গের ধ্বনি নাচিতে না পারি'। তখন দুজন গন্ধর্ব এল, নাম 'বিদ্যাবিনোদ' আর 'বিদ্যাভূষণ'। তারা বিপুলাকে দেখে তার মর্তজীবনের বিড়ম্বনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল—

ঃ বিপুলাকে দেখি দোঁহে সচকিত মন।
এত বিড়ম্বনা কিসের কারণ।।

বেহুলা ব্যক্তিজীবনের দুঃখ আড়াল করে শিল্পীর ধৈর্যে উত্তর দিল—

ঃ বিপুলায় বলে সে কহিব পশ্চাতে।
শিবের আদেশে আগে যাইব নাচিতে।।

এরপর রূপসজ্জার বর্ণনা, যবনিকা বা পটের আড়ালে বিপুলার অলঙ্কার পরিধান—

ঃ শিবপুরে যায় নেতা বিপুলাকে লয়ে।
অলঙ্কার পরাইল অন্তঃপট দিয়ে।।

এতে সাজঘরের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সাজসজ্জার পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা নিম্নরূপে দিয়েছেন নারায়ণদেব—

ঃ বিনাইয়া বান্ধে কেশ দেখিতে সুন্দর।
কেশের গোড়াতে বান্ধে প্রবাল পাথর।।
যুগল কর্ণেতে পরে সুবর্ণ কুণ্ডল।
কুণ্ডলের তেজে মুখ করে ঝলমল।।

অপূর্ব বর্ণনা কবির। স্বর্ণ-কুণ্ডলের বিচ্ছুরিত আলো এসে পড়ছে বিপুলার গণ্ডদ্বয়ে। তারপর—

ঃ সুবর্ণ কঙ্কণ পরে, সুবর্ণের তাড়।

স্বর্ণ-কণ্ঠ মালা পরে গজমুক্তা হার।।
সুবর্ণের চুড়ী পরে দুই হস্ত ভরি।
দশম অঙ্গুলে পরে কনক অঙ্গুরী।।
বিচিত্র কাঁচলি দিয়া ঢাকে পয়োধর।
সংসারের চিত্র আছে তাহার উপর।।

বলাবাহুল্য 'সংসারের চিত্র' অর্থ এখানে তাবৎ কিছুর চিত্র। এতে পুরাণ বর্ণিত বিশ্বকর্মা অঙ্কিত কাঁচুলি চিত্রের প্রভাব আছে। তারপর বসনাদি কাচ—

ঃ বিপুলা ইজার পরি কোমর কাঁচিল।
পঞ্চরঙ্গি নিতম্বেতে ঘাঘরা বান্ধিল।।[৫৭]

'ইজার' ফার্সি শব্দ এবং 'পঞ্চরঙ্গি ঘাঘরা' হলো পঞ্চবর্ণ ঘাঘরা। এ ঘাঘরা 'উত্তর ভারতের বিশেষত রাজপুতনার মেয়েদের ঢিলা গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলযুক্ত পরিধেয়' বসন।[৫৮]

নাথসাহিত্যে গোর্খনাথ নর্তকীর ছদ্মবেশে ঘাঘরা পরেছিলেন—সেকথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাদ্য, অলঙ্কার ও নৃত্য-বসনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সর্বভারতীয় প্রভাব দৃষ্ট হয়। বিপুলা পায়ে পরেছিল তোড়ল। নারায়ণদেবের বর্ণনায় দেখা যায়, বিপুলা দুপাশে গন্ধর্বদের বাদ্যসহ মঞ্চে প্রবেশ করেছে—

ঃ নাচনের সাজধনী করি সমাধান।
নাচিবারে দেবপুরে করিল পয়ান।।
দুই পাশে গন্ধর্ব্বেরা মৃদঙ্গ বাজায়।
বিপুলা শিবের কাছে নাচিবারে যায়।।

এ ছিল সেকালে কৃত্য-নাটের রীতি। বেহুলার নৃত্য দেবসভার উপভোগ্য, কাজেই নর্তকী ও বাদ্যানুগমনের বিষয়টি কৃত্যেরই অংশ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মনসাপূজায় বাদ্যভাণ্ড সহকারে শোভাযাত্রার কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

বিপুলা 'অন্তঃপট' অর্থাৎ সমগ্র রূপসজ্জার উপর একটি আবরণ পরেই শিব সকাশে গিয়েছিল, সে অন্তঃপট উন্মোচনপূর্বক নৃত্যারম্ভ হয়েছিল—

ঃ অন্তঃপট দূরে করি নৃত্যে দিল মন।
কর যোড়ে প্রণমিল শিবের চরণ।।

'আর্যাসপ্তশতী'তে সেকালে নাট্যে 'পট' ব্যবহারের উল্লেখ আছে। অতঃপর নৃত্য বর্ণনা—

ঃ বিপুলা সুন্দরী নৃত্যে হ'ল আগুসার।
মৃদঙ্গ হুঙ্কার দিয়া কৈল নমস্কার।।
কবি নারায়ণ রচি সরস পয়ার।
কহে এক লাচাড়ী নর্ত্তনে বিপুলার।।

ঃ (শিবের নিকট বিপুলার নৃত্য ও দেবগণকে আনিতে নন্দীর প্রতি শিবের আদেশ।)

লাচাড়ী, ত্রিপদী।
নৃত্যেতে বিপুলা হরষিত।।

ঃ হরষিত কর যোড়ে প্রণমিল মহেশ্বরে,
দেবগণ দেখি সানন্দিত।।
আড় নয়নেতে চায় প্রাণ হরি ল'য়ে যায়,
মোহিল মদন কাম বাণে।।
শুদ্ধ মতে নৃত্য করে দেবসভার ভিতরে,
প্রাণহরে কটাক্ষ চাহনে।।
সম্মুখ বিমুখ করি নাচে বিপুলা সুন্দরী,
ভঙ্গিমা করিয়া নটবেশে।।
দেখিয়া নয়নটান, মোহ যায় দেবগণ,
সবাকে মোহিত করে লাসে।।
কাঁচা শরায় দিয়াপা, নাচে চমকিয়াগা,
পাক ফিরে ভ্রমর আকার।।
নাচে উষা পাক ফিরি, নয়ন চমকে হেরি,
নৃত্যেতে মোহিল ত্রিসংসার।।
নন্দী নামে শিব দ্বারী, ডাকি বলে ত্রিপুরারি,
ঝাটে ডাকি আন দেবগণ।।
নারায়ণ দেব কয়, সুকবি বল্লভ লয়,
বিপুলার দেখিতে নাচন।।৫৯

এখানে 'লাস' কথাটা ধ্রুপদী নাট্যের 'লাস্য' অর্থে গ্রহণ করলে দেখা যায়, 'ভরতশাস্ত্রে' কাঁচা সরার উপর নৃত্যের কোনো নির্দেশ নেই। সেজন্য 'লাস'-লীলায়িত ভাবভঙ্গি অর্থে গ্রহণই শ্রেয়।

নারায়ণদেব বাঙালি কবি হলেও, অসমীয় সাহিত্যে পূর্ণাঙ্গরূপে গৃহীত হয়েছেন। 'পদ্মাপুরাণ' আসামে একান্তরূপে গৃহীত হবার কারণ মধ্যযুগে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বাঙালার লোকায়ত মনসাপুরাণের কাহিনী ও পাঁচালী রীতির অপ্রতিহত বিস্তার। অসমীয় ভাষায় গায়েন অর্থে 'ওঝা' ও দোহার অর্থে 'পালি'। আদি মধ্যযুগের কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' 'পালি' শব্দের প্রয়োগ আছে (বাঁশী বাজাইয়িল যবে কাহ্নে/কোকিল কৈল পালি গানে/আগুণি জালিল দেহে তখন দক্ষিণ পবণে।।-রাধাবিরহ খণ্ড)। মানিকদত্তের 'চণ্ডীমঙ্গলেও' 'পালি'র উল্লেখ দেখা যায়।

সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ 'মনসার ভাসান' বা 'মনসামঙ্গল' রচনা করেন। এ কাব্যে পালার সংখ্যা পাঁচ। পালাগুলি যথাক্রমে—মথন, উষাহরণ; রাখালপূজা, ধন্বন্তরি ও বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর।

ক্ষেমানন্দ আসরে পরিবেশনের জন্যই মনসার গীত রচনা করেছিলেন—

ঃ কেতকায় বলে যত মনসার মায়া।
করগো করুণাময়ী গায়কের দয়া।।

কবি একে 'মনসা ভাসান' বলেও অভিহিত করেছেন—

ঃ মনসা ভাসান গীত হৈল সমাপন।
হরি হরি বল সবে ভরিয়া বদন।।

'ভাসান' কথাটা বিশেষভাবে মনসামঙ্গল সংশ্লিষ্ট পরিভাষা। তা মৃত লক্ষিন্দরের শবের সঙ্গে কলার মান্দাসে নদীপথে বেহুলার অনুগমন অর্থে প্রযুক্ত। এখনও বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে (টাঙ্গাইল) নদীপথে বেহুলার শবানুগমনের নাট্যমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বেহুলার পুনরুজ্জীবনের ঘটনাই মনসামঙ্গলের প্রাণ। সুতরাং 'ভাসান' শব্দটি ক্রমে ক্রমে মনসামঙ্গলের সমার্থক হয়ে উঠে। আদিতে 'মনসা ভাসান' ও 'ভাসান গান' এই নামে তা অভিহিত হতো। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যাত্রার

উদ্ভবের পর এই ভাসান চরিত্রমূলক নাট্যে রূপান্তরিত হয় এবং তা 'ভাসান-যাত্রা' নামে পরিচিত লাভ করে।

কেতকাদাসের সমগ্র কাব্যে বর্ণনার চেয়ে সংলাপের আধিক্য দৃষ্ট হয়। আঙ্গিকগত বিচারে দেখা যায়, এই কাব্য উক্তি-প্রত্যুক্তি—পদ ও নাচাড়িতে প্রায় সমভাবে বিন্যস্ত। 'চাঁদবেনের সহিত কাঠুরিয়ার সাক্ষাৎ' শীর্ষক পদের কিছু অংশ এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হল—

ঃ মিতার বাটতে সাধু পাইল অপমান।
বিষাদ ভাবিয়া মনে বনে বনে যান।।
বিপদের কালে কেহ নাহি মোর সখা।
কাঠুরিয়া সহ তার হইল দেখা।।
চাঁদসদাগর বলে শুন ভাইসব।
কোন কার্যে চলিয়াছ করি কলরব।।
এতেক শুনিয়া তারা বলিল বচন।
কাষ্ঠ কাটিবারে মোরা করি যে গমন।।
নগরে বেচিলে পাব পণ সাত আট।
জাতির স্বভাব মোরা নিত্যভাঙ্গি কাঠ।।
চাঁদ বলে তোমা হৈতে আমি বলে তেজা।
একবারে লব আমি দুজনের বোঝা।।
কাঠুরিয়া বলে তবে দুঃখ কেন পাও।
আমা সভা সনে আসি কাষ্ঠ বেচে খাও।।
... .
কাষ্ঠবোঝা লয়ে সাধু আগে আগে যায়।
রথ হৈতে বিষহরী দেখিবারে পায়।।
বুদ্ধি বল নেতা গো উপায় বল মোরে।
কাষ্ঠ বেচি খাইতে গেল চাঁদসদাগরে।।
কাষ্ঠ বেচি খাইয়া যদি সাধু যায় দেশে।
আমাকে দিবেক গালি মনে যত আসে।।
নেতা বলে বিষহরী যুক্তি কেন ভোল।
পবনের পুত্র হনু তারে তবে বল।।
হনুমান পড়ুক উহার বোঝার উপরে।

ঐ বোঝা সাধু যেন বহিতে না পারে।।
শুনিয়া সখীর বোল মনসাকুমারী।
পবন পুত্রের ডাক দিল ত্বরা করি।।
মনসার আজ্ঞায় আইল হনুমান।
দেবীর পদেতে আসি করিল প্রণাম।।
দেবী বলে হনুমান পবনকুমার।
বাপের সম্বন্ধে তুমি অনুজ আমার।।
সীতার উদ্ধার কালে পবন-নন্দন।
রামহিতে রাবণের সনে কৈলে রণ।।
কাষ্ঠবোঝা লয়ে দেখ চাঁদবেনে যায়।
তুমি গিয়া চাপ তার কাষ্ঠের বোঝায়।।
অধিক না দিও ভার সাধু পাছে মরে।
তবে ত আমার পূজা হবে না সংসারে।।৬০

সংলাপের এই ধারা ভাসান কাব্যের নাট্যরস ঘনীভূত করে তুলতো সন্দেহ নেই। কেতকাদাস তাঁর কাব্যকে 'মনসার ভাসান'রূপে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে দেখা যায় মনসামঙ্গলের পাঁচালি ধারা থেকে ভিন্ন আঙ্গিকে 'ভাসান-গীত', 'ভাসান-পালা' সপ্তদশ শতকেই প্রচলিত হয়েছিল। তা থেকে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে নাট্যপালারূপে 'ভাসান যাত্রা'র সৃষ্টি একথা পূর্বে উক্ত হয়েছে।

ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গলের অগ্রজ কবিদের রীতিতে স্বর্গ সভায় বেহুলার নৃত্য-নাট্যের বিবরণ দিয়েছেন—

দেবতা সভায় গিয়া মৃদঙ্গ মন্দিরা লইয়া
নৃত্য করে বেহুলা নাচনী।।
যতেক দেবতা দেখি যেন মত্ত হয়ে শিখী
গায় যেন কোকিলের ধ্বনি।।
ঘন ঘন তালে অঞ্চলে বয়ান ঢাকে
হাসি হাসি বদন দেখায়
মুখে গায় মিষ্টবোল খদির কাষ্ঠের খোল
তাথই তাথই ঘন বায়।।
আগুতে পেছুতে গিয়া নাচে ঘনপাক দিয়া

চরণেতে বাজিছে ঘুঙ্গুর।।
নবীন কোকিল যেন অহরহ ঘন ঘন
মুখে গায় বচন মধুর।।
একপাশে থাকি নেত দেখে নৃত্য অবিরত
ভাল নাচে বেহুলা নাচনী।
মুখে মৃদুমৃদু হাসি ক্ষণে উঠি ক্ষণে বসি
যেন দেখি ইন্দ্রের নটিনী।।
করে কাংস্য করতাল বলে ধনী ভাল ভাল
কটিতে কিঙ্কিণী ঘন বাজে।
আসিয়া ইন্দ্রের কাছে বেহুলা নাচনী নাচে
প্রাণপতি জিয়াবার কাজে।।
থেকে থেকে পদ ফেলে মরাল গমন চলে
মুখ যিনি পূর্ণিমার শশী।
খদির কাষ্ঠের খোল বেহুলার মিষ্ট বোল
মোহ্ গেল যত স্বর্গবাসী।।
একদৃষ্টে দেবগণ সবে করে নিরীক্ষণ
বেহুলা নাচেন সুরপুরে।
নাহি তাল ভঙ্গ মনে বড় বাড়ে রঙ্গ
প্রমত্ত ময়ূরী যেন ফিরে।।
রঙ্গে ভঙ্গে হস্ত নাড়ে ত্রিভঙ্গ হইয়া পড়ে
এইরূপে নাচে বিনোদিনী।
নৃত্যগীতে মন মোহে যতেক দেবতা কহে
ভাল নাচে বেহুলা নাচনী।।
দেবতা সভায় শিব জিজ্ঞাসেন দিয়া দিব্য
বেহুলার পূর্ব পরিচয়।
কেন নাচ সীমন্তিনী কোন দেশ-নিবাসিনী
সত্য কহ না করিহ ভয়।।
হেন প্রশ্ন শুনি রামা নৃত্য গীতে দেয় ক্ষমা
দেবতা সভায় কহে কথা।
মনসামঙ্গল গীত ক্ষমানন্দ বিরচিত
নায়কের হও বরদাতা।।[৬১]

—১৫

বেহুলার ময়ূর-নৃত্য নারায়ণদেবের পাঠান্তরেও লভ্য। তবে ক্ষেমানন্দের নৃত্যের ক্ষিপ্রতা বর্ণনা নিঃসন্দেহে অসাধারণ। এ কাব্যে বেহুলার নৃত্যাভিনয়ে প্রথমে মৃদঙ্গের উল্লেখ থাকলেও পরে তা 'খদির কাষ্ঠের খোল' রূপে অভিহিত হয়েছে। 'খদির কাষ্ঠ' হলো 'খয়ের কাঠ'। সেকালে মৃদঙ্গের খোল ছিল খয়ের কাঠের তৈয়ার। এ সঙ্গে বাদ্যযন্ত্ররূপে 'কাংস্যকরতালে'র উল্লেখও আছে। এ হচ্ছে লৌকিকধারার নৃত্য।

দ্বিজবংশীদাসের মনসার ভাসানের কিছু অংশ 'দস্যুকেনারামের পালা'য় উদ্ধৃত হয়েছে। সম্পাদকের মতে গাথাটি '১৫৭৫-১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের' মধ্যে রচিত।[৬২] উদ্ধৃত মনসার ভাসান অংশে দ্বিজবংশীদাসের সঙ্গে নারায়ণদেবের ভণিতাও আছে—

ঃ সুকবি নারায়ণদেবের সুরস পাঁচালী।
পয়ার প্রবন্ধে বলি এক যে লাচারী।।[৬৩]

এ থেকে এরূপ ধারণা অসঙ্গত নয় যে—দ্বিজবংশীদাস নারায়ণদেবের কাব্য অবলম্বনেই মনসামঙ্গল রচনা করেছিলেন।

দেবসভায় ঊষার নৃত্য প্রসঙ্গে কাঁচা মাটির 'সরা'র উপর নৃত্য পারঙ্গমতা প্রদর্শনের উল্লেখ এখানেও লভ্য—

ঃ কাঁচা মৃত্তিকার সরা তাতে ভর করি।
দেবের মোহিতে নাচে ঊষা যে সুন্দরী।।

এ থেকে ধারণা করা হয় যে প্রাচীনকালে এদেশে 'কাঁচা মাটির সরার উপর' নৃত্য দেখান হতো।[৬৪]

এ পালায় আছে, দস্যুকেনারাম কর্তৃক মনসার গান শিখে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করার কাহিনী। দীক্ষান্তে এই দস্যু বাড়ি বাড়ি গিয়ে মনসার গান পরিবেশন করত। এ থেকে দেখা যায়, মনসার ভাসান একালে চারণিক চরিত্রও লাভ করেছিল। সে ক্ষেত্রে অনুমিত হতে পারে যে, এ ধরনের গান সুবৃহৎ মনসামঙ্গলের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ।

ষষ্ঠীবরের মনসামঙ্গলে বেহুলার নাটুয়া বেশ প্রসঙ্গ আছে—

ঃ নেতায় বলয়ে কন্যা থাক এই মনে।
কালি সাজাইমু কন্যা নাটুয়ার সাজনে।।

অর্থাৎ নাটুয়ার বেশ পরানো হবে বেহুলাকে স্বর্গসভায় নৃত্যের নিমিত্ত—

ঃ এই মতে ধোপার ঘরে পোষাইল রজনী।
শয্যা হৃণে গাও তুলে চন্দ্রবদনী।।
পাটারী হৃণে খসাইল যত অলঙ্কার।
বিপুলারে সাজাইল বিশেষ প্রকার।।

নাটুয়ার সাজের জন্য 'পেটরা' অর্থাৎ রূপসজ্জার পেটিকা-প্রসঙ্গ জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে আছে, চর্যাপদেও নট-পেটিকার উল্লেখ দেখেছি। এবার বেহুলার রূপসজ্জা—

ঃ বান্ধিল মোহন খোঁপা নয়নে কাজল।
গলায় মুকুতা হার করে ঝলমল।।
পাটবস্ত্র পৈরিলেক চরণে নেপুর।
যত দ্রব্য পৈরিলেক প্রচুরে প্রচুর।।[৬৫]

ষষ্ঠীবরের কাব্যে বেহুলার নৃত্য-প্রারম্ভিক নমস্ক্রিয়ার উল্লেখ আছে—

ঃ করজোড় নমস্কার প্রদক্ষিণ সপ্তবার
অন্যে অন্যে শিরিতে বন্দিয়া।

এ কাব্যেও কাঁচা মাটির সরার উপরে বেহুলার নৃত্য সম্পর্কিত বর্ণনা আছে—

ঃ সচকিত মনকরি নৃত্যকরে সুন্দরী
আওয়া সরাতে ভর দিয়া।।

গীত এবং তাল সহযোগে পরিবেশিত এই নৃত্যে বেহুলা ইঙ্গিত ও কটাক্ষে যেন কথা বলে—

ঃ ক্ষণে নানা গীত গায় কর্ণে নানা তাল বায়
ইঙ্গিতে কটাক্ষে কহে বাত।[৬৬]

'সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পর' জগজ্জীবন তাঁর 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। জগজ্জীবন উত্তরবঙ্গের কবি। তাঁর কাব্যে কবি তন্ত্রবিভূতির প্রভাব রয়েছে। বিশেষজ্ঞের মতে 'কবি তন্ত্রবিভূতি বিরচিত মনসামঙ্গলকে জগজ্জীবন বহুলাংশে আত্মসাৎ' পূর্বক এ কাব্য রচনা করেছেন।[৬৭] জগজ্জীবন তাঁর কাব্যকে পাঁচালি বলে উল্লেখ করেছেন—

ঃ জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদ ছন্দে পাঁচালী করিল প্রকাশ।।[৬৮]

এ কাব্যে পদ-পয়ার, ত্রিপদী, নাচাড়ি ধুয়া আছে, তবে দিশা বা ধুয়ার সুছন্দ রীতি উল্লেখযোগ্য। বেহুলা পূর্ববঙ্গীয় নববধূ বা বালিকার সমার্থক শব্দ 'বালী'রূপে আখ্যাত—

ঃ বালী বোলে না কান্দ না শুন সদাগর।[৬৯]

জগজ্জীবনে বেহুলার নৃত্যসজ্জা ও নৃত্য বর্ণনা ভিন্ন ধরনের। সকল কবি কেবল দেবসভায় বেহুলার নৃত্যগীতের বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু জগজ্জীবন আগে নেতার সামনে বেহুলার পরীক্ষামূলক নৃত্যের উল্লেখ করেছেন। সে নৃত্য যে অভিনয়পূর্ব মহড়া ছিল তা নিঃসংশয়ে বলা যায়—

ঃ নেতার অগ্রেতে কন্যা নৃত্য করে ভাল।
মুখে গায় হাতে বাজায় পায়ে ধরে তাল।।

শূন্যে লাফিয়ে নৃত্য প্রদর্শন করেছিল 'বালী'—

ঃ নেতার অগ্রেতে নৃত্য করে বিপরীত।
শূন্যতে সঞ্চারে কন্যা করে নানা নৃত্য।।

নানা রকমের নৃত্য সেকালে প্রচলিত ছিল। এ ধরনের নাট্যাভিনয় জারিগানেও আছে। তাতে গায়েনের গীতের সঙ্গে দলবদ্ধ নৃত্যে উল্লম্ফন ও ঘূর্ণনের মাধ্যমে কারবালা-কাহিনীর নৃত্যরূপ পরিবেশিত হয়।

নেতার সামনে পরিবেশিত নৃত্য-শুধু নৃত্যই নয়, এ ছিল বেহুলার আকস্মিক বৈধব্যের কারুণ্যমাখা অভিনয়—

ঃ কোকিল গঠন গলা যখন করে ধ্বনি।
হিয়া গদগদ হয়, চক্ষে পড়ে পানি।।

নেতা বেহুলার এই বেদনার ভার বইতে পারে না ; সেজন্য—

ঃ নেতা বোলে বিদ্যধরী নৃত্যক্ষেমা কর।।[৭০]

নেতার সামনে নৃত্য মহড়ার পর বেহুলা এবার দেব সভায় নৃত্য পরিবেশনের প্রস্তুতি নেয়। সে প্রস্তুতিতে দেখা যায় গীতবাদ্যের জন্য দোহারের প্রয়োজন হচ্ছে—

ঃ বালী বোলে একেশ্বর নাচিব কেমনে।
ডাক দিয়া আন যত বিদ্যধরীগণে।।[৭১]

বেহুলার রূপসজ্জার সুবিস্তৃত বর্ণনা মনসামঙ্গল কাব্যে একমাত্র জগজ্জীবন ঘোষালেই লভ্য। এতে সেকালের নাটুয়া নারীদের সাজ-ভূষণের পরিচয় আছে।

বেহুলা বলল 'সখী নাচের পেটারি আন' তৎপর পেটিকা আনা হল—

ঃ পেটারি আনিয়া বালী ঘুচাইল ঢাকুনী।
হস্ততে ধরিল বালী কনক দর্পণী।।
দর্পণ ধরিয়া বালী করে নানা বেশ।
নাচিবে দেবের আগে শিবের আদেশ।।

এরপর রূপসজ্জার উপকরণ—

ঃ চাকি কোড়ি মকর কুণ্ডল কর্ণমূলে।
নাসিকায়ে বেসরফুল করে ঝলমল।।
হিয়ায়ে কাঁচুলী পহ্রে কি কহিব আর।
গলায়ে প্রবাল মালা ঝিলিমিলি হার।।
চাকি বোলি মকর কুণ্ডল শ্রুতি মূলে।
নাসিকায়ে বেসর মুকুতা ফুল দুলে।।
কনক কঙ্কন হার বাহুতে কেজুর।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী পহ্রে চরণে নপুর।।
গুজরাটি ঘুঙ্গুর করিল পরিধান।
উপরে উড়ানি দিল দুর্লভ বসন।।
মেঘ ডম্বুর শাড়ি তবে পরে বাণিয়ানী
উপর অঙ্গতে দিল কুসুম উড়ানি।।[৭২]

কানের আভরণ বর্ণনা দুবার আছে। গুজরাটি নূপুরের উল্লেখ থেকে মনে হয় এ নৃত্য ধ্রুপদী অঙ্গের। শাড়ির উপর বাড়তি উড়ুনি, 'দুর্লভবসন' বা পুষ্পখচিত 'কুসুম উড়ানি' নিঃসন্দেহে সপ্তদশ শতকের মসলিন। শাড়ির উপর উড়নির এই ব্যবহার গুজরাটী রীতি। এরপর দেবসভায় বেহুলা-বালীর নৃত্য—

ঃ অঙ্গভঙ্গ করি নাচে বিদ্যাধরী
থমকে থমকে চলে।

এ নৃত্য ঘূর্ণন সঞ্চরণ ও শূন্যে বিচরণ—

ঃ শূন্যতে ধরে পাক যেন কুম্ভারের চাক
সমুখে সঞ্চরে আকাশে।

আকাশে উড়ে উড়ে নৃত্যের প্রসঙ্গ পাই মারমা নৃগোষ্ঠীর 'পাজ্খু' নাটক 'মনরি মাংৎসুমুইতে' (দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সে নাট্যের অভিনয়ে অবশ্য মারমা-কুমারীরা পাখির মতো ডানামেলে বঙ্কিম চলন রেখায় উড়ার অভিনয় করে। কাজেই এখানে আক্ষরিক অর্থে 'সঞ্চারে আকাশে' বলেন নি কবি তা নিশ্চিত।

সে নৃত্যে বাক্য বা সংলাপ ছিল—

ঃ চাহে কটাক্ষ নয়ানে যেন মদনের বাণে
হাসিয়া হাসিয়া বাক্য বোলে।।[৭৩]

এ থেকে স্পষ্টতই দেখা যায়, বেহুলার নৃত্য মূলত নাটক। দেবসভায় বেহুলা নাটুয়ার শিল্পধর্ম রক্ষা করেছিল। সে নেতার সামনে করুণ রসের অভিনয় করে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কিন্তু দেবসভায় ব্যক্তিগত দুঃখ বর্ণনা করে নি। শিল্প-রচনার আড়ালে স্বীয় বেদনাকে গোপন রেখেই দেবসভায় নেচেছিল বেহুলা। কাজেই একে 'বাঈজী' নাচানো মনে না করাই শ্রেয়।

মনসামঙ্গলের কোনো কবি দেবসভায় বেহুলার করুণ-রসাত্মক অভিনয়ের কথা উল্লেখ করেন নি। কিন্তু কেন? নিত্য স্বর্গীয়-আনন্দ-আস্বাদে পরিপূর্ণ দেবসভায় শিল্প রচনার কৌশলকে দেবতা ভজনার উপায় রূপে দেখেছিলেন তাঁরা। এ ছিল পূজা, 'কাঞ্চাচুলে রাঁড়ী' বেহুলার শব পুনরুজ্জীবনের সাধনা।

সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উড়িষ্যার কবি দ্বারিকাদাস পাঁচালি রীতিতে বাঙলা ভাষায় মনসামঙ্গল রচনা করেন। তাঁর জন্ম ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে। অবশ্য এ কাব্যে বাঙলা ভাষার সঙ্গে ওড়িয়া শব্দের 'মেলবন্ধন' দৃষ্ট হয়।[৭৪]

মিথিলায় পঞ্চদশ শতকেই 'নাটগীত মনসাপূজা'র ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়।[৭৫] তা সত্ত্বেও দ্বারিকাদাসকে বাঙলা পাঁচালি ধারার অনুসারী কবি বলে মনে হয়।

কাব্যের প্রধান ছন্দ অক্ষরবৃত্ত। একাবলী ছন্দ এ কাব্যে 'একপদী রূপে' উল্লিখিত হয়েছে। কাব্যের পদশীর্ষে রাগ-রাগিণী প্রায় দৃষ্ট হয় না। তবে কয়েকটি অধ্যায়ের শীর্ষে 'করুণা' ও 'মঙ্গল' রাগের নির্দেশ আছে।[৭৬]

দ্বারিকাদাস তাঁর কাব্যকে 'গীত' (মনসামঙ্গল গীত করিবারে কন), 'সঙ্গীত' (দ্বারিকা দাসেতে সঙ্গীত গায়) রূপে উল্লেখ করেছেন।

এ কাব্যে বেহুলার নৃত্যের সুবিস্তৃত বর্ণনা লভ্য। বেহুলা 'নেতু'র আঁচল ধরে 'সুমেরু-উপরে' দেবের পুরীতে যাত্রা করে। একে একে স্বর্গের পথে নানা দ্বার অতিক্রমপূর্বক তারা উপস্থিত হয় দেবসভায়। দেবগণের অনুমতিক্রমে বেহুলা নৃত্য শুরু করে—

ঃ বন্দিয়া মনসা চরণ রজে।
নৃত্য কৈল রামা দেবের মাঝে।।
ঝুন ঝুন নূপুর বলে।
বামাস্বরে গায় পঞ্চম তালে।।
দ্রিমিক দ্রিমিক মৃদঙ্গ ধ্বনি।
তাথই তাথই নাচয়ে ধনী।।
শূন্যে পাক ধরে চরণ রাখে।
মনসা মনসা রাখগো ডাকে।।
ইয়া তাইয়া তাইয়া তাতা ধিনাতা।
নেতা তাল রাখে না টলে পা।।
চক্রসম রামা ফিরয়ে দৃঢ়ে।
নৃত্য ভরে তনু ভাঙ্গিয়া পড়ে।।
কংসাল রসাল লইয়া হাতে।
বাজায়্যা ঝাঁঝর অশেষ মতে।।
বাহুর বল্যানি হেলানি অঙ্গে।
রাখে তাল তার না হয় ভঙ্গে।।
লোটন কপোত যেমন লোটে।
শূন্যে পাক ধরি গগনে উঠে।।
অঙ্গে আভরণ সে সব তালে।
এক সুরে মিশি মধুর বলে।।
চরণে নূপুর মৃদঙ্গ ভূজে।
কেশরী মাঝরে রসনা বাজে।।
করে করতাল মুখেতে বেনু।
সুমধুর ডাকে ঝটকে তনু।।
শেষে সারদার ধরিল বীণা।
সারি সারি গম বাজে বাজনা।।

তাতা ধিয়া তাতা তাথেই ধিনা।
ইয়া ইয়া খিড়ি খিড়ি দেখেনা।।
গজেন্দ্র গামিনী বেহুলা নারী।
মোহিত করিল অমর পুরী।।
স্বর্গ বিদ্যাধরী লজ্জিত হৈল।
ভোলে ভোলানাথ বিভোল ভেল।।
ইন্দ্র দিল পারিজাতের মালা।
ধন্যগো নাচনী জন্মেছ বালা।।
নারদ সারদ দুজনে মিলি।
বেহুলাকে কোলে ধরিল তুলি।।[৭৭]

বেহুলার এই নাট্যে উড়িষ্যার দেবমন্দিরে পরিবেশিত নৃত্যের প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়।

মনসামঙ্গল পরিবেশনায় বাইশারীতি গড়ে উঠেছিল মধ্যযুগে এবং সে ধারা তৎপরবর্তীকালে অব্যাহতরূপে চলে এসেছে। গায়েনগণ ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন কবির পদ 'সঙ্কলন সম্পাদন'-পূর্বক পাঁচালি পরিবেশন করতেন। 'বাইশা' বা বাইশ কবির মনসামঙ্গলের অর্থ এই নয় যে আক্ষরিক অর্থে তা বাইশজন কবিরই রচনা। গবেষকের মতে 'বাইশ শব্দ বহু অর্থবাচক'। মধ্যযুগে বাংলাদেশের বরিশাল, শ্রীহট্ট, মৈমনসিংহ এবং পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে 'বাইশা' রীতির মনসামঙ্গল পাঁচালি প্রচলিত হয়।[৭৮]
শ্রাবণ থেকে দীর্ঘ চার মাস ধরে মনসাপূজার শাস্ত্রীয় বিধি রয়েছে। এতে প্রত্যহ যথাবিহিতরূপে সর্পকুলের উদ্দেশ্যে ভোজ্য নিবেদন করা হয়ে থাকে। মনসামঙ্গলের কাহিনী একমাসব্যাপী 'আষাঢ় সংক্রান্তি' থেকে শ্রাবণ-সংক্রান্তি পর্যন্ত পরিবেশিত হতো। কাজেই পালা পরিবেশনার সময় পরিধি বিচারে সকল মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসামঙ্গলই আকারে 'বৃহত্তম'। দীর্ঘ একমাসব্যাপী পালানুক্রমিক পরিবেশনের কারণে গায়েন ও কবিগণ মনসামঙ্গলের মধ্যে কাহিনী বহির্ভূত, লোকসমাজে প্রচলিত মিথসমূহ গ্রহণ করেন। নানা প্রসঙ্গ সমাহৃত হবার ফলে কাব্যের কলেবরও বৃদ্ধি পায়। তা সত্ত্বেও, এ কাব্যের মূল কাহিনী চাঁদ-লখিন্দর-বেহুলার। দর্শক-শ্রোতার কাছে এই আখ্যানই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের পরিবেশনায় মূলত একটি বিশেষ রীতি অনুসৃত হয়। কিন্তু মনসামঙ্গলের ক্ষেত্রে নানা রীতির পরিবেশনা প্রচলিত আছে।

প্রথমত, পূজা উপলক্ষে ঘট স্থাপনপূর্বক গৃহাঙ্গনে মনসার পালা পাঠ বা পরিবেশনা। এ নিতান্ত পারিবারিক অনুষ্ঠান। এর 'পাঠক নারী' এবং শ্রোতাও নারীমণ্ডলী। 'বিক্রমপুর, বরিশালে' এ ধরনেব কাব্য পাঠের নিয়ম প্রচলিত আছে।

দ্বিতীয়ত, 'বৃহত্তর' রূপে মনসামঙ্গলের পালা পরিবেশনা। 'গ্রামের বারোয়ারীতলা' অথবা 'চণ্ডীমণ্ডপে' গায়েন-দোহার মিলে মৃদঙ্গ ও মন্দিরা সহকারে সামান্য অঙ্গভঙ্গিসহ কখনও কখনও রূপসজ্জা গ্রহণপূর্বক মনসামঙ্গলের এক একটি পালা একমাস ধরে পরিবেশন করে। এর অন্য রূপে আছে শুধু কাব্যপাঠ।

তৃতীয়ত, 'বরিশাল অঞ্চলে রয়ানী দল' নামে আখ্যাত 'গীতি-সম্প্রদায়' মনসামঙ্গল পরিবেশন করে। বিশেষজ্ঞের মতে 'রয়ানী' 'রওয়ানা' বা যাত্রা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু জাগরণ পালা হিসেবে কারো কারো মতে 'রয়ানী' অর্থ 'রজনী'। রয়ানী দল 'সাতদিন'-'পাঁচদিন কিংবা আড়াই দিনে' সমগ্র পালা পরিবেশেন করে। এই দলগত পরিবেশনায় অধিকতর নাট্যকৌশল প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও অর্থ ব্যয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 'রয়ানী' দলে একজন গায়েন ও নারী পুরুষ মিলে দোহার থাকে। 'হাতে চামর' ও 'পায়ে নূপুর' পরে গায়েন নৃত্যসহকারে এই পালাভিনয় প্রদর্শন করে। গায়েনের সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ 'কখনও ধুয়া ধরে', আবার 'কখনও গানের সমস্ত পদই' গেয়ে থাকে।

চতুর্থত, মনসার কাহিনী সংবলিত 'ভাসান যাত্রা'। এ হচ্ছে চরিত্রানুগ ও দোহারকেন্দ্রিক নাট্যাভিনয়। বিশেষজ্ঞের মতে এর উদ্ভব 'কৃষ্ণযাত্রা থেকে'।[৭৯] কিন্তু 'কৃষ্ণ-যাত্রার' অস্তিত্ব ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে ছিল না, সেকালে ছিল 'কৃষ্ণলীলা'। 'ভাসান-যাত্রা' নাট্যরীতি হিসেবে যাত্রার উদ্ভবের কালেই লীলানাট্যের ধারায় জন্ম নিয়েছিল, এরূপ মতই যুক্তিযুক্ত। লীলা বা যাত্রার মতোই ভাসান দ্বি অথবা ত্রিচরিত্রবিশিষ্ট লোকনাট্য।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে মনসামঙ্গল কাব্য সংক্ষিপ্ত গীতরূপে 'মনসার ভাসান' নামে অভিহিত হতো। ভাসানের নাট্যরূপের অঙ্কুর সেখানেই।

পঞ্চমত, কথকতারীতিতে মনসার ভাসান 'লখিন্দারের হাস্তর' নামে পরিচিত। এই পালা সম্পূর্ণত গল্পকথনরীতিতে মুসলমান গায়েন ও পালাকর কর্তৃক অভিনীত হয়। বৃহত্তর ঢাকার মানিকগঞ্জ অঞ্চলে, গায়েনদের পরিবেশনায় 'গোলে বকৌলি', 'লালমণি সবুজমণি' প্রভৃতি হাস্তরের সঙ্গে 'লখিন্দারের হাস্তর'ও রয়েছে। এর সঙ্গে কৃত্য বা বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক নেই।

'লখিন্দারের হাস্তর' বৈঠকি অথবা দাঁড় দু'রীতিতেই পরিবেশিত হয়। দাঁড়-রীতিতে গায়েন উজ্জ্বল বর্ণের শাড়ি ফতুয়া বা পাঞ্জাবির সঙ্গে হালকা মুখ-প্রলেপ গ্রহণ করে। এ রীতি 'হাস্তর' পাঁচালিরই নামান্তর। বৈঠকিরীতি একেবারেই অনানুষ্ঠানিক, দৈনন্দিন পোশাকেই পালাকথন চলে। এতে দোহার ও গায়েনের সরস উক্তি-প্রত্যুক্তি আছে। এ পালার অন্যতম বৈশিষ্ট্য গীতনির্ভর সংলাপ। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে আছে, ঢোলক-জুড়ি। দাঁড়রীতিতে গায়েন নূপুরও পরে থাকে। মনসার কৃত্য-পাঁচালি যে বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদাযের গণ্ডীর বাইরে একটি পূর্ণাঙ্গ মানবীয় রসের গল্পে পরিণত হয়েছে তা কোনো কোনো গায়েনের পরিবেশিত কাহিনী দৃষ্টে বোঝা যায়। পালায় আল্লারসুলের বন্দনার সঙ্গে লক্ষ্মী-সরস্বতীর বন্দনাও আছে।

এ পালায় শিবের কৌতূহলোদ্দীপক দাম্পত্যজীবন, নেত-মনসার জন্ম কথা, ক্ষুধার্ত মনসার মণ্ডুকভক্ষণ, চাঁদের হাস্যকর ক্রিয়াকলাপ, বেউলা-লখিন্দারের পূর্ব পরিচয়, কপট ঝগড়া, গাঙে শবসঙ্গী বেহুলাকে চিরিঙ্গাগুদার প্রণয়নিবেদন, নেতার সঙ্গে বেহুলার কূটচাল, কাপড় কেচে শিবের বরলাভ, মৃত স্বামীর পুনরুজ্জীবনের পর বেহুলার বেদেনীরূপ এবং চাঁদ সদাগরের কাছ থেকে তার অনিচ্ছায় ও কৌশলে পূজা গ্রহণের কাহিনী পরিবেশিত হয়। এ নিঃসন্দেহে মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী থেকে ভিন্নতর। এ পালায় বেহুলার দেবসভায় নৃত্যের প্রসঙ্গ নেই (গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'লখিন্দারের হাস্তর' গানের সংক্ষিপ্ত রূপ দ্রষ্টব্য)।

চণ্ডীমঙ্গল

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি রচয়িতা দ্বিজমাধব মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী কবি। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'। কাব্যের রচনাকাল ১৫৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দ।[৮০]

চণ্ডীমঙ্গলের রীতি অনুযায়ী এ কাব্য ষোড়শ পালায় রচিত। পালাগুলি যথাক্রমে— বন্দনা (১ম পালা), মঙ্গলচণ্ডী (২য় পালা), মর্ত্ত্য লীলার সূচনা (৩য় পালা), কালকেতু (৪র্থ পালা), স্বর্ণগোধিকা (৫ম পালা), ভাঁড়ুদত্ত (৬ষ্ঠ পালা), শাপমুক্তি (৭ম পালা), উজানী ও ইছানী (৮ম পালা), লহনার কুমতি (৯ম পালা), খুল্লনার দেবী-পূজা (১০ম পালা), মিলন (১১শ পালা), অগ্নি-পরীক্ষা (১২শ পালা), কমলে-কামিনী (১৩শ পালা), শ্রীমন্তের বাল্যলীলা (১৪শ পালা), শ্রীমন্তের মশান (১৫শ পালা) ও প্রত্যাবর্ত্তন (১৬শ পালা)।

দ্বিজমাধব তাঁর কাব্যকে বলেছেন 'সারদা চরিত'—

ঃ ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজমাধব গায় সারদা চরিত।।[৮১]

বন্দনা অংশে আছে—

ঃ ডাকিনী যোগিনী বন্দোঁ ধর্ম্মের সভায়ে।
গাইন গুণীন বন্দোঁ গুরুজনের পায়ে।।
গাইতে বন্দনার গীত হয়ে অনুক্ষণ।
স্তুতি করি বন্দোঁ স্থান দেবতা চরণ।।
আমার আসরে অশুদ্ধ গায়ে গান।।
তার দোষ ক্ষমিবা যে-কর অবধান।।
তোমার চরণে মাগোঁ এই পরিহার।
শ্রুতি-তাল-ভঙ্গদোষ না লইবা আমার।।[৮২]

এ কাব্য আসরে গায়েন কর্তৃক পরিবেশিত হতো। কাব্যের সৃষ্টি কথায় দেবীর উৎপত্তি অংশে 'শূন্যপুরাণে'র প্রভাব দৃষ্ট হয়। পদশীর্ষে 'পাহিরা', 'পট-মঞ্জরী', 'মল্লার', 'ধানশী', 'ভাটিয়াল', 'টোরীবসন্ত', 'মায়ূর' প্রভৃতি রাগের উল্লেখ আছে। দ্বিজমাধব বিষয় বিবরণের জন্য পয়ার এবং চরিত্রের অন্তর্গত আবেগ অথবা উক্তির জন্য ত্রিপদী, নাচাড়ি ও একাবলীর 'গতি বৈচিত্র্য' অবলম্বন করেছেন।[৮৩] এ থেকে দেখা যায় এ কাব্যের পরিবেশনা একটি সুনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত নাট্যরূপ লাভ করত আসরে।

বিবরণাত্মক 'ত্রিপদী' ও 'একাবলী'র গীতসমূহ উক্তি-প্রত্যুক্তির আকারে গায়েন-কণ্ঠে গীত হবার ফলে তা চরিত্রানুগ হয়ে ওঠে। কাজেই গায়েন

চরিত্রানুযায়ী অভিনয়ের আশ্রয়ে বিশেষ বিশেষ চরিত্রের ভাব ও রস সৃজনে সক্ষম হন।[৮৪] এ হচ্ছে সকল মঙ্গলপাঁচালির নাট্যকৌশলাশ্রয়ী পরিবেশনারীতি।

দ্বিজমাধবের 'চণ্ডীমঙ্গলে' 'বিষ্ণুপদ' নামে নতুন ধরনের পদের সন্ধান পাওয়া যায়। খুল্লনার বাসর প্রসঙ্গে একটি বিষ্ণুপদের অংশবিশেষ নিম্নরূপ—

ঃ কহ কহ কলাবতী কাহারে পয়ান।
ও রূপ বাজস যেন পঞ্চবাণ।।
রূপে ডগমগ গোরিয় গাতে।
অঙ্গের সৌরভ গগনে সুজাতে।।[৮৫] ... ...

চণ্ডীমঙ্গলের প্রচলিত পাঁচালিরীতির পরিবেশনায় এধরনের পদ আবৃত্তি, নাচাড়ি ও শিকলির মধ্যে বৈষ্ণবীয় গীতলতার সঞ্চার করত, সন্দেহ নেই। উল্লেখ্য যে রাঢ় ও বরেন্দ্র অঞ্চলের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 'বিষ্ণুপদ' দৃষ্ট হয় না।[৮৬] এ কাব্যের দ্বাদশ পালা দৃষ্টে জানা যায় যে 'ঋতুবতী' নারীকে কেন্দ্র করে সেকালে মহোৎসবের আয়োজন হত। এই উৎসবে নারীরা নৃত্য, 'মঙ্গলগীত' ও 'সারিগান' পরিবেশন করত। উল্লেখ্য যে এধরনের স্ত্র্যাচারে নগ্ননৃত্যের প্রচলন থাকার প্রমাণ আছে—

ঃ নাচে ত দুবলী দিয়া করতালি
আনন্দে বোলয়ে ঘন ঘন।।
অম্বর দূর করি লজ্জা পরিহরি
শুনিয়া বেয়াল্লিশ বাজন।।

দ্বিজরামদেব ও দ্বিজমাধব, অভিন্ন ব্যক্তিরূপে অনুমিত।[৮৭] দ্বিজরামদেবের কাব্য 'অভয়ামঙ্গল' নামে পরিচিত। এ কাব্যও আসরে গেয় পাঁচালি। অবশ্য পয়ার অর্থেও কবি 'পাঞ্চালী' ব্যবহার করেছেন, যেমন—

ঃ অথপর পাঞ্চালী।[৮৮]

এ কাব্যে 'উৎসবমঙ্গল' অংশে 'মঙ্গল আচারে' সরোবরের পাড় ও জলে নৃত্য-গীতের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। রম্ভার কন্যাদানের কৃত্যে দেখা যায় সমবেত নারীদের জলকেলী ও নাটুয়াদের 'পঞ্চসরোবরে'র চতুষ্পার্শ্বে নৃত্য—

ঃ সখিগণ কুতুহলি পানিএ পানি কচালি
অর্ঘ্য দিয়াছে সব্ব বেঢ়ি।

তারপর—

ঃ জল ভরি তীর কাছে চৌদিকে নাটুয়া নাচে
ফিরএ পঞ্চ সরোবরে।।

মধ্যযুগে এই জলক্রীড়ার নাম ছিল 'কয়া'। চৈতন্যদেব প্রসঙ্গে তা উল্লিখিত হয়েছে। এ কাব্যে 'নাটমন্দিরে'র উল্লেখ পাওয়া যায়—

ঃ নাটমন্দির বান্ধে অতি মনোহর।[৮৯]

দুবলা, লহনা ও সখীদের স্ত্র্যাচার নৃত্যমুখর পরিবেশনা—

ঃ নাচে দুবলা চেড়ীরে।
মধুর মুরজ তানে নাচে দুবা কুতূহলে
দশন বিকট অট্টহাসিরে।।
বিহৃতি হইয়া নাচে দুবা তালে বৈআ
বসন খসন রসভরে।
গরজে মুরজে ঝাঁক সঘন বাজাএ ঢাক
লহনারে চাপি লৈয়া পড়ে।।[৯০]

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে'র রচনাকাল ১৬১০-১২ খৃষ্টাব্দ।[৯১] তিনি তাঁর কাব্যকে, 'গীত' ও 'নাট' রূপে অভিহিত করেছেন—

ঃ বিশ্রাম দিবস আট শুন গীত দেখ নাট
আসরে করহ অধিষ্ঠান।।[৯২]

কবি চিত্রাঙ্কিত ঘটে দেবীর অধিষ্ঠান কামনাপূর্বক উচ্চারণ করেছেন এই প্রার্থনা. বাণী—অনুনয় করে বলছেন দেবীকে গীত শ্রবণ ও নাট দেখার জন্য। অর্থাৎ কবি তার কাব্যকে বলছেন 'গীতনাট'। এ হচ্ছে মধ্যযুগের গায়েন-কবির দেশজ নাট্য পরিভাষা। মুকুন্দরামের উক্তি থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, মঙ্গল শ্রেণীর পাঁচালি আসলে মঙ্গল-গীতনাট। এর শ্রবণ-দর্শন-রূপ তাঁরা সচেতনভাবেই. সৃষ্টি করেছেন। উপরন্তু আজকের সাহিত্যের পরিভাষায় আমরা যে সকল রচনাকে মঙ্গলকাব্য বলি, মধ্যযুগের কবিরা সেগুলোকে 'পাঁচালি' ও 'গীতনাট' হিসেবেই জানতেন।[৯৩]

কবিকঙ্কণ কথিত 'গীত' ও 'নাট' হচ্ছে মূলত 'গীতনাট'। এই 'গীতনাট' মঙ্গলকাব্যেরই বিশিষ্ট পরিবেশনরীতিতে পরিণত হয়েছে। তা 'নাটগীত' থেকে ভিন্ন রীতির। [দ্রঃ ১৭৭ পৃ.]

কবি তাঁর কাব্যকে পাঁচালি রূপেও অভিহিত করেছেন—

ঃ হেনরূপে দিনে দিনে বাড়েন খুল্লনা।
শ্রী কবি কঙ্কণ কৈল্ল পাঁচালি রচনা।।[৯৪]

অবশ্য মধ্যযুগে অনেক কবির মতই তিনি পয়ার ছন্দে রচিত পদকে 'পাঁচালি' বলেছেন—

ঃ রচিয়া নানা ছন্দ পাঁচালি প্রবন্ধ
শ্রী কবি কঙ্কণ গান।[৯৫]

এ ছাড়া কবি তাঁর কাব্যকে 'নতুনমঙ্গল', 'নতুনগীত', 'রসগান', 'গৌরীমঙ্গলের গাথা', 'মধুর ভারতী' প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করেছেন।

মুকুন্দরাম নিজেই পাঁচালি গায়েন ছিলেন এবং স্বয়ং শিষ্যদের তা শিখাতেন। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি দৃষ্টে এর প্রমাণ মিলে—

ঃ অনভিজ্ঞ তালমানে কেমনে শিখাব আনে
দোষগুণ সকল তোমার।[৯৬]

'চণ্ডীমঙ্গলে'র বন্দনায়, গীতনাটের যে প্রতিশ্রুতি মুকুন্দরাম ব্যক্ত করেছেন—সমগ্র কাব্যমধ্যে আদ্যোপান্ত তার পরিচয় অস্তিমান। কালকেতু উপাখ্যানের প্রায় সর্বত্র, গায়েনের নিজস্ব বর্ণনার চেয়ে নানা চরিত্রের নাটকীয় সংঘাত ও উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে কাহিনী পরিবেশনের কৌশল সচেতনভাবে অনুসৃত হয়েছে। এর প্রমাণ নিদয়ার সাধভক্ষণ, কালকেতুর বিবাহের অনুবন্ধ, অরণ্যচারী পশুগণের প্রসঙ্গ, চণ্ডীর ছলনা, কালকেতু ফুল্লরার উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়, কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি ও মুরারি শীল, গঙ্গা ও চণ্ডীর সপত্মকলহ ও ভাঁড়ুদত্ত প্রসঙ্গে লভ্য।

কালকেতু উপাখ্যানের অন্তত তিনটি অংশে কবির কাহিনী পরিকল্পনা চূড়ান্ত নাট্য-কৌশলের আশ্রয়ে রূপায়িত হয়েছে। এ অংশগুলো—কালকেতুর শিকারপর্ব থেকে অঙ্গুরী লাভপর্ব, দেবীর ইচ্ছায় কলিঙ্গে বন্যা, কলিঙ্গ রাজার সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধ ও দেবী চণ্ডীকার বরে মুক্তিলাভ।

এর মধ্যে নাট্য ঔৎসুক্যে, গতিশীল ঘটনার পারম্পর্যে, পশুগণের সঙ্গে কালকেতুর সংঘাত থেকে অঙ্গুরী বিক্রয় পর্যন্ত অংশই সর্বশ্রেষ্ঠ। সমগ্র মধ্যযুগের অন্যকোনো কাব্যে ঘটনার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাহিনীর এই অদ্বৈতরূপ সচরাচর দেখা যায় না। ধনপতি উপাখ্যানে ধনপতির পায়রাবাজি, খুল্লনার বিবাহ প্রস্তাব ও সপত্ন্যু বিবাদ অংশে নাট্যসংঘাত ও সংলাপের প্রাচুর্য বিদ্যমান। সামগ্রিক রচনা কৌশলের বিচারে বাঙলা উপন্যাসের পূর্বসঙ্কেত যদি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে লভ্য হয়[১৭] তবে সেই সঙ্গে এ কথাও নিশ্চিতভাবে বলা যায়, মধ্যযুগে পাঁচালি রীতির নাট্যকৌশলের উচ্চতম বিকাশও এ কাব্যে সংসিদ্ধ হয়েছিল।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের বিভিন্ন অধ্যায়ে যে-সকল নৃত্য ও নাট্যপ্রসঙ্গ পাওয়া যায় এবার সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

রত্নমালার নৃত্যবেশ গ্রহণ প্রসঙ্গে 'নাট' শব্দটি উল্লেখ আছে—

ঃ দেখিতে তোমার নাট চান পশুপতি।[১৮]

এ কাব্যে রত্নমালার নৃত্য বর্ণনায় 'তাণ্ডব' নৃত্যের উল্লেখ পাই—

ঃ ধরি মনোহর লীলা নাচে বামা রত্নমালা
তাণ্ডব দেখিলা দেবগণ।

এই 'মনোহর লীলা' হচ্ছে চরিত্রানুগ আহার্য। 'তাণ্ডব' 'ভরত নাট্যশাস্ত্রো'ক্ত নাট্য। এ হচ্ছে শিবের সৃষ্টি ও ধ্বংসের লীলানাট।

এ নৃত্যের বোল ও বাদ্যযন্ত্র ধ্রুপদী নাট্যের অনুষঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে—

ঃ তা থৈ তা থৈ থিনি মৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি
ঘন বাজে রতন কঙ্কণ।

অর্থাৎ এ নৃত্যে স্বর্ণবলয়ও মৃদঙ্গ মন্দিরার সঙ্গে বাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মহেনজোদারো-হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে প্রাপ্ত নৃত্যপরা সালঙ্কারা নগ্ন নারী মূর্তির হাতের চুড়িও নৃত্যে বাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতো বলে উল্লিখিত হয়েছে। বলয়ের এ ব্যবহার তাই কবিকল্পিত নয়।

বীণা এবং গীত সহযোগে রত্নমালা নৃত্য পরিবেশন করেছিল—

ঃ হৈয়া অতি সাবহিত নারদ গায়েন গীত
বীনাগুণে তরল অঙ্গুলি।

দেবসভার নৃত্য, তাই নারদও সাবধানী। বীণার তারে তাঁর আঙ্গুল তরল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এর পরেই যে বাদ্যযন্ত্রের নাম উল্লিখিত হয়েছে তার মধ্যে অন্তত দুটি ধ্রুপদী নাট্যে ব্যবহৃত হবার কথা শোনা যায় না। 'ডম্ফ' ফারসী 'দফ' এর ধ্বন্যাত্মক রূপান্তর, 'খমক' লোক বাদ্যযন্ত্র।

রত্নমালার বেশ ও অভিনয় অর্থে 'কাচ' কথাটার উল্লেখ করেছেন মুকুন্দরাম—

ঃ ভুবন মোহন কাচে রঙ্গিণী তাণ্ডব নাচে
গান মুনি গান্ধার নিষাদ।

সে নৃত্যে পায়ের ছন্দ অপরূপ তালে বিন্যস্ত হয়েছিল—

ঃ মুখর নূপুরশালী ঘনদেই পদতালি
দেবগণে করে সাধুবাদ।।

নাট্যে রত্নমালা শাড়ি পরেছিল। তার দুহাতে ধরা ছিল শঙ্খ—

ঃ পরিধান পাট শাড়ী কনক রচিত চূড়ী
দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ।[৯৯]

শঙ্খ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের প্রতীক। এ থেকে রত্নমালা পরিবেশিত নাট্যের বিষয়বস্তুও অনুধাবন করা যায়। তবে একটি পাঠান্তর এরূপ—

ঃ ভুবন মোহন কাচে ধ্রুপদ তাণ্ডব নাচে
গান মুনি রাধার বিষাদ।।[১০০]

এ স্থলে 'রাধার বিষাদ' রাধার বিরহ অর্থে গ্রহণ করা যায়। রত্নমালার নৃত্য উচ্চাঙ্গের। প্রাচীন গৌড়বঙ্গে উচ্চাঙ্গ গীতবাদ্য ও নৃত্যের প্রচলন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়।[১০১]

ধনপতির সিংহল যাত্রা প্রসঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলে 'গীতনাটে'র উল্লেখ আছে—

ঃ ধৌত হরিপদ দ্বন্দ্ব বাহিল অলকানন্দ
কুতূহলে আইনু গীত নাটে।[১০২]

এ হচ্ছে জল পথে ভ্রাম্যমাণ গীতনাট। মধ্যযুগে নৌকায় এ ধরনের 'গীতনাটে'র ব্যবস্থা ছিল। নদীপথে নাট্যাভিনয়ের জন্য বিশেষ ডিঙির ব্যবস্থাও ছিল—একে বলা হতো 'নাটশালা'- (আর ডীঙ্গার নামে নাটশালা)।

গুজরাট প্রসঙ্গে 'গীতনাটে'র উল্লেখ আছে—

ঃ রায়, দেখিলাঙ গুজরাট প্রতিঘরে গীতনাট
অভিনব জেন দ্বারাবতী।

গুজরাট প্রসঙ্গে 'ঝাপান' গানের উল্লেখও লভ্য। তাল, গীত ও নাট্য ব্যাখ্যাও যে সেকালে ছিল—'তালগীত নাটের বাখান' পংক্তিটি থেকে তা প্রমাণিত হয়।[১০৩]
চণ্ডীমঙ্গলের ষষ্ঠ দিবসের পালায় কৃষ্ণলীলার 'কালিয়দমন' অভিনয়ের পূর্ণাঙ্গ বিররণ লভ্য—

ঃ সুরপুরে কৈল হর কালিয়দমন
নাচে মালাধর নৃত্য দেখে দেবগণ।

শিবের আমন্ত্রণে 'কালিয়দমন'নাট অভিনয় করল মালাধর— তা দেখলেন দেব-দর্শকগণ। এতে, নাট্যের আয়োজক, নাট্যের নাম, অভিনেতা ও দর্শক প্রসঙ্গ পাওয়া যাচ্ছে। উল্লেখ্য এখানে নৃত্য প্রসঙ্গে 'দেখা' কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য মধ্যযুগে নাট্য প্রসঙ্গে 'দেখা' ও 'শোনা' কথা দুটো সমার্থে 'শোনা' রূপেও ব্যবহৃত হতো।

শিব ও গৌরী নৌকায় কৃষ্ণের 'কালিয়দমন নাট' দেখেছেন নারদ গাইছেন গীত, বিশ্বম্ভর বেশে যেন কৃষ্ণ করছেন অভিনয়—

ঃ গৌরী সঙ্গে ত্রিপুরারি গঙ্গায় সাজিয় তরি
কৃষ্ণকথা কুতূহলে মন।
ভাবে সমাকুল চিত নারদ গায়েন গীত
বিরচয়ে কালিয়দমন।
শ্যামল সুন্দর তনু করাঙ্গুলে ধরি বেণু
আজানুলম্বিত বনমালা
শ্রবণে কুণ্ডলে দোলে কপালে বিজুলি খেলে
বাহুলযুগে হেম-তাড়বালা।
প্রভু বিশ্বম্ভর কায় বশোদা (যশোদা) নন্দনরায়
ডরেভঙ্গ দেই ফণিগণ
ফিরি ফিরি বনমালী দেনপুন করতালি
নাগবধূ লইল শরণ।

উদ্ধৃতাংশে অভিনয় অর্থে 'বিরচয়' এর উল্লেখ লভ্য। এ হল সংক্ষেপে 'কালিদয়মনে'র কাহিনী। পূর্বের আলোচনায় এই কাহিনী ও এর পরিবেশনরীতির বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। এতে দেখা যায়, কৃষ্ণ-করে বেণু ধৃত এবং গায়েন আছেন একজন, পদের বর্ণনানুসারে তিনি নারদ।

এরপব নৃত্য করেন মালাধর—

ঃ তাতিনী তাতিনী তিনি মৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি
ঘন বাজে কঙ্কণ তরল।
গণেশ পাখুজ পাণি তাথই তাথই ধ্বনি
নন্দি ভৃগু ধরে করতাল
হরি পর পদ্মযোনি নাট দেখে মহামুনি
হরিধ্বনি করে বহুকাল।
যশোদা নন্দন কাচে ধ্রুতব তাণ্ডব নাচে
ইন্দ্রের কুমার মালাধর

মালাধর 'ইন্দ্রের নর্তক' সে কৃষ্ণের 'কাচ' কেচেছে এবং ধ্রুতব (ধ্রুপদ?) ও তাণ্ডব নাচছে। কালিয়র শতশীর্ষ কাঠে খোদাই করে কালো রঙ বিলেপন পূর্বক মালাধর মাথায় পরেছে। তার গাত্র বর্ণ উজ্জ্বল, মাথায় ময়ূরের পালক—

ঃ মুখর নূপুরশালী কালি-মাঝে দিয়া তালি
দেখি আনন্দিত পুরহর।
একশত ফণাশালী দারুময় করি কালি
মাথে আরোপেন মালাধর।
গলে শোভে গুঞ্জমাল শিরে শিখি পুচ্ছজাল
গৌর রঞ্জিত কলেবর।

কালিয়দমনের পরিবেশনায় দোহারও ছিল। কৃষ্ণবেশী মালাধর অভিনয় ছলে যে কালিয়-শীর্ষে পদাঘাত করেছিল সে বিবরণও পাওয়া যায়—

ঃ নৃত্য করেন মালাধর
হয়্যা সভে একতালি পঞ্চতানে কর্যা মেলি
গান গীত গোবিন্দমঙ্গল।

নত নহে জেই ফণ নাটছলে নারায়ণ
নম্রতারে কৈল পদাঘাতে
ফণী পড়ে তেজি ফণা শতমুখে বহেফেণা
খরশ্বাস মুখ নাসা হইতে।

এরপর নাট্যের দ্বিতীয় অংশ—

ঃ ভাবেতে আকুল কেশ ধরিয়া নন্দের বেশ
আনন্দে নাচেন পঞ্চানন
যশোদার বেশধরি তাণ্ডব করেন গৌরী
পুলকিত তরু লতাগণ।

ভাবাবেশে শিব ও পার্বতী যথাক্রমে নন্দ ও যশোদার বেশ ধারণপূর্বক কালিয়দমন নাটের পর তাণ্ডব নাট্য অভিনয় করেছিলেন। এ থেকে এরূপ ধারণা অসঙ্গত নয় যে কৃষ্ণকথায় 'নন্দ-যশোদা' নাট্য বা নৃত্যের প্রচলনও সেকালে বিদ্যমান ছিল।

মধ্যযুগে এ ধরনের অভিনয় পেশাদার নট কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে যে প্রদর্শিত হতো তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। শিব 'নাটে তুষ্ট' হয়ে হাড়ের মালা দিলে মালাধর তা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেন নি—

ঃ মণি আভরণ মাঝে হাড়মাল নাহী সাজে
দেখিয়া হাসেন মালাধর।[১০৪]

শ্রীমন্তের বাল্যক্রীড়ায় কৃষ্ণলীলা অভিনয়ের উল্লেখ আছে। অনুরূপ অভিনয়ের কথা 'চৈতন্যভাগবত' প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে।

রামানন্দ যতি বিরচিত 'চণ্ডীমঙ্গলে' (১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ) নীলাচল প্রসঙ্গে রামায়ণ কথকের উল্লেখ পাওয়া যায়—

ঃ দাতা রাম কথক কহেন আরবার।
ইন্দ্রদ্যুম্ন করিলেন যাত্রার প্রচার।।[১০৫]

বলা বাহুল্য এখানে যাত্রা কথাটা তিথিযোগে গমন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কবি তার কাব্যকে 'পালা' ও 'গাথা' রূপে উল্লেখ করেছেন—

ঃ পালা বড় হয় মনে সেই ভয়
কিছু ছাড়্যা করি গাথা।[১০৬]

পদশীর্ষে ধুঁয়া বা দিশায় পদাবলীর প্রভাব সুস্পষ্ট—

ঃ শ্যামের বাঁশী আর ঘরে রৈতে দিলে না দিলে না।
বংশী বাজিল বিপিনে।।

মুকুন্দরামের ত্রুটি উল্লেখ প্রসঙ্গে রামানন্দ তাঁর কাব্যে 'নিমাই চরণ' নামে একজন গায়েনের নাম বলেন—

ঃ নিমাই চরণ রায় প্রতি পদে দোষ গায়
পুস্তকের নাম দোষে নাশ।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের দোষ নির্ণয়পূর্বক রামানন্দযতি তাঁর চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। এ কাব্যে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকে পাঁচালি রূপে উল্লেখ করা হয়েছে—

ঃ চণ্ডী যদি দেন দেখা তবে কি তা যায় লেখা
পাঁচালীর অমনি বচন।[১০৭]

মুকুন্দরামের দোষত্রুটি ধরার নৈয়ায়িক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত যতি বিরচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' শিল্পরসের বিচারে নগণ্য বলেই বিবেচ্য।

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, কৃত্যমূলক পালা। দেবতার প্রখর প্রতাপে এসকল কাব্যের স্বর্গমর্ত নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু তারপরও কখনও বিষয়গুণে কখনও বা প্রতিভাজিৎ কবির স্বীয় প্রণোদনায় এ সকল কাব্য মানবীয় রসে আপ্লুত হয়েছে। বাঙলা কৃত্যমূলক পাঁচালিতে মনসামঙ্গলই বিষয়গুণে করুণরসাত্মক। আবার শাস্ত্রকথা রীতিতে সমস্ত অতিলৌকিক আভরণ খসে গিয়ে এর কাহিনী হয়ে উঠেছে লোককথা-রূপকথার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন।

বাংলাদেশে চণ্ডীমঙ্গল অপেক্ষা মনসামঙ্গলই হিন্দুমুসলমান সম্প্রদায় নির্বিশেষে অধিকতর লোকপ্রিয়। উপরন্তু মধ্যযুগে পূর্ববঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল পরিবেশনা ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিশেষজ্ঞের মতে চণ্ডীমঙ্গলের রচয়িতা দ্বিজমাধবের কাব্য চট্টগ্রামে রচিত হলেও তিনি ছিলেন নদীয়ার বাসিন্দা। এদেশে চণ্ডীমণ্ডপ ও বারোয়ারীতলা সচরাচর পরিদৃষ্ট হয় না।[১০৮] এর নাট্যাভিনয়ও এদেশে

অপরিজ্ঞাত। মনসামঙ্গলের তুলনায় চণ্ডীমঙ্গলের পালা রচয়িতার সংখ্যাও কম। তবে মুকুন্দরামের মতো প্রতিভাধর কবি মনসামঙ্গলেও বিরল। তাঁর হাতে চণ্ডীমঙ্গল নাট্যমূলক পাঁচালিরূপে পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছিল।

উনিশ শতকে 'কৃত্তিবাসের রামায়ণ' মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীকাব্য' এবং ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল'-এর পরিবেশনারীতি সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। মালদহ অঞ্চলে চণ্ডীমঙ্গল দুর্গাপূজার 'বিশিষ্ট অঙ্গরূপে' পরিবেশিত হতো। ধর্মমঙ্গলের কৃত্যের অনুরূপ 'গান' ও 'পাতানৃত্য' দুর্গাপূজায়ও দৃষ্ট হয়। চণ্ডীমঙ্গল পরিবেশনায় কৃত্য ও নাট্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ সম্পর্কে গ্রন্থদৃষ্টে একটি বিবরণ উদ্ধৃত হলো—

ঃ মালাদহের অধীন শিরশী নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় সপ্তমী হইতে আরম্ভ করিয়া দিবস চতুষ্টয় পূজার আসরে মঙ্গলচণ্ডীর গান গীত হইয়া থাকে। ষষ্ঠীর দিন যে কিছু না হয় তা নয়। সেদিনও গণেশ, দূর্গা প্রভৃতি দেবদেবীর এবং গুরু পূজনীয় ব্যক্তির বন্দনাদির পর মঙ্গলচণ্ডীর গানের পূর্বাভাস দেওয়া হয়। তাহাতে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা অর্থাৎ প্রথমে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কিরূপ ছিল, ক্রমে কিরূপে তাহাতে স্থলের সৃষ্টি হইল, পরে কি প্রকারে দেবমানবের সৃষ্টি ও বসবাস হইল, ইত্যাদি পৌরাণিক বিষয়ের বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া হয়। সপ্তমী হইতে মূল পালা আরম্ভ করিয়া দশমীর সন্ধ্যায় 'বহিত' তুলিয়া তাহা শেষ করা হয়। 'বহিত' তোলা ব্যাপারটা কৌতুকপ্রদ। আসরের একপার্শ্বে একটি ছোট পুষ্করিণী কাটিয়া তাহার চারিটী ঘাট করা হয়। পুষ্করিণীর চারি কোণে চারটী কদলী শাখা প্রোথিত করিয়া আলিপনাদির দ্বারা উহার চতুর্দিকে চিত্রিত করা হয়। পরে পুষ্করিণীটী জলপূর্ণ করিয়া ও চারিঘাটে চারিটী গোটাপান ও সুপারি স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাদি সহযোগে তথায় গঙ্গাপূজা করান হয়। এদিকে কাষ্ঠনির্মিত ক্ষুদ্র নৌকা একখানি আলিপনাদির দ্বারা বিচিত্র করিয়া তদুপরি স্বর্ণ রৌপ্য, কড়ি ও চামর রক্ষা করা হয়। একখানি কুলায় পাঁচসের ধান্য ঢালিয়া হরিদ্রা রঙ্গের বস্ত্রখণ্ড দিয়া আবৃত রাখা হয়। বৃন্ত সহিত একটী কুষ্মাণ্ড ও একগাড়ু জলও প্রস্তুত রাখা আবশ্যক। গঙ্গাপূজা শেষ হইলে নায়কদের মধ্যে হইতে অর্থাৎ যাঁহাদের অর্থ সাহায্যে ও উদ্যোগে পূজা হইতেছে দুইজন বালক বা অবিবাহিত যুবককে ডাকিয়া সজ্জিত নৌকাখানি পুষ্করিণীর জলে ভাসাইয়া এঘাট ওঘাট করিয়া চারিঘাটে চারিবার

লাগানর পর হুলুধ্বনি সহকারে একজনের মাথায় তুলিয়া দেওয়া হয়। ধান্যপূর্ণ কুলাখানি অপরের মাথায় দেওয়া হয়। পুষ্করিণী হইতে পূজার ঘর পর্যন্ত এক খণ্ড নূতন বস্ত্র পাতিত করিয়া তাহার উপর দিয়া সর্বাগ্রে একজন জলের গাড়ু লইয়া ধীরে ধীরে জল ঢালিয়া চলিবেন, তৎপশ্চাতে একজন বৃন্ত সাহায্যে কুষ্মাণ্ডটী গড়াইয়া লইয়া যাইবেন, তৎপশ্চাতে ধান্যপূর্ণ কুলা ও সর্বশেষ নৌকা যাইবে। নবমীর রাত্রিশেষে আর একটি কৌতুকাবহ্ ঘটনা ঘটে।

দক্ষিণ পাটনের মশানে উপস্থিত করিয়া শ্রীমন্তের প্রাণদণ্ডের জন্য যখন কোটাল শাণিত খড়্গ উত্তোলন করে, তখন তাহার উদ্ধারার্থ চণ্ডীদেবী পক্ককেশা বৃদ্ধারূপে মশানে অবতীর্ণা হন। আসরে গায়কদের একজন বুড়ীর মুখোষ মুখে দিয়া ঐ অংশ অভিনয় করে। তৎপরে ভৈরবী বেশে দুর্গার আগমন, সর্বশেষে চামুণ্ডারূপে দেবী মশানে অবতীর্ণা হইয়া রাজার সৈন্যসামন্ত সংহার করিতে পারিলে শ্রীমন্তের মুক্তি হয়। এই চামুণ্ডা নামা অংশটী নিম্ব কাষ্ঠে নির্মিত। চামুণ্ডার মুখোষ মুখে দিয়া গায়েনদের একজন অভিনয় করিয়া থাকে। এই অভিনয় ও ঐ মুখোষ খানি তাহারই চিরন্তন নিস্পত্তি। তাহার পিতৃ-পিতামহও ঐ চামুণ্ডা নাচিত, সেও নাচে, তাহার পুত্র পৌত্রও নাচিবে, এই রূপই প্রথা। কোটালের মুখোষ আছে, ভৈরবীর কেবল 'কপালী' অর্থাৎ সোলার মুকুট, মুখোষ নাই। ইহা ব্যতীত গানের মধ্যে মধ্যে হাস্যোদ্দীপক সংও অনেক দেওয়া হয়। দশমীর প্রত্যুষে চামুণ্ডা নাচার পরই গান সাঙ্গ করিয়া আবার বৈকালে আরম্ভ হয় ও সন্ধ্যায় 'বহিত' তুলিয়া একেবারে পালা শেষ করা হয়।[১০৯]

এই কৃত্যমূলক অভিনয়—যেকালে চণ্ডীমঙ্গল সম্পূর্ণত কৃত্যাচারের অধীন ছিল—সেকালের। এ সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হয়, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলেই এ ধরনের পরিবেশনারীতি গড়ে উঠেছিল।

অন্নদামঙ্গল

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য (১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দ) ক্ষীণ ও শিথিলবন্ধে তিনটি ভিন্নপ্রায় আখ্যান সংবলিত কাব্য। এই তিনটি আখ্যান যথাক্রমে—'অন্নপূর্ণামঙ্গল', 'কালিকামঙ্গল' ও 'মানসিংহ কাব্য'। এই আখ্যানে চণ্ডীর ত্রয়ীরূপও সচেতনভাবে পরিকল্পিত। ভবানন্দ মজুন্দারের উপাখ্যানে যিনি অন্নপূর্ণা, সুন্দরের মশান ক্ষেত্রে তিনি কালী এবং দিল্লীতে সর্ববিনাশিনী চণ্ডী।

পাঁচালি কাব্যের ধারায় একই কাব্যে পুরাণ, ইতিহাস এবং প্রণয় কাহিনীর এমন অভিনব সমাবেশ সমগ্র মধ্যযুগে আর কোনো কবির রচনায় দৃষ্ট হয় না। বস্তুত তিনটি আখ্যানের সম্বন্ধ বিচারপূর্বক ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলকে 'ত্রয়ীকাব্য' হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যকে 'পরিপূর্ণ অষ্টমঙ্গলা' রূপে উল্লেখ করেছেন—

ঃ বন্দিয়া গোবিন্দ পায় রায়গুণাকর গায়
পরিপূর্ণ অষ্টমঙ্গলায়।[১১০]

এই নামকরণও অভিনব।

অষ্টাদশ শতকে ক্ষীণকায় মঙ্গলপাঁচালিরও প্রচলন দেখা যায়। বোধকরি কবি এইজন্য পূর্ণাঙ্গ অষ্টমঙ্গলা রচনার কথা উল্লেখ করেছেন।

ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের অন্যান্য কবিদের মতো তাঁর কাব্যকে 'গীত' বলেছেন—

ঃ বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা।।[১১১]

'অন্নদামঙ্গল' পাঁচালি। কবি তারও উল্লেখ করেছেন।

'পাতশার প্রতি মজুন্দারের উত্তর' অংশের ভণিতায় আছে—

ঃ ক্রুদ্ধ হয়ে মানসিংহ চলিল বাসায়।
বিরচিত পাঁচালি ভারতচন্দ্র গায়।।[১১২]

'রাজার সহিত অন্নদার কথা'য় ভারতচন্দ্র যে 'নাট্যশাস্ত্র' বিষয়েও সুপণ্ডিত তা অন্নদা স্বয়ং রাজাকৃষ্ণচন্দ্রকে বলছেন—

ঃ ভুরশিটে ভূপতি নরেন্দ্ররায় সুত।
কৃষ্ণচন্দ্র পাশে রবে হয়ে রাজ্যচ্যুত।।
ব্যাকরণ অভিধান সঙ্গীত নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক।।
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারশী।
দয়া করে দিব দিব্য জ্ঞানের আরশী।।

এ কাব্যের রূপ কি হবে, কে পরিবেশন করবে তারও বিবরণ দিয়েছেন কবি অন্নদার মুখে—

ঃ কৃষ্ণচন্দ্র আমার আজ্ঞার অনুসারে।
রায়গুণাকর নাম দিবেক তাহারে।।
সেই এই অষ্টমঙ্গলার অনুসারে।
অষ্টাহ মঙ্গল প্রকাশিবেক সংসারে।।
ডীউ সাঁই নীলমণি কণ্ঠ আভরণ।
এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন।।[১১৩]

ভারতচন্দ্রের উল্লেখ থেকে গায়েনের নাম পাওয়া যাচ্ছে 'ডীউ সাঁই নীলমণি'। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজদরবারে তিনিই এই 'পরিপূর্ণ অষ্টমঙ্গলের' প্রথম গায়েন।

নীলমণির উল্লেখ অন্যত্রও লভ্য—

ঃ কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজ্ঞায় অন্নদামঙ্গল গায়
নীলমণি প্রথম গায়ন।।

এ থেকে দেখা যায় ভারতচন্দ্র এ কাব্যের রচয়িতা। কিন্তু এর পরিবেশনগত দায়-দায়িত্ব গায়েনের, কবির নয়। পাঁচালি পরিবেশেনায় রচয়িতা ও গায়েনের এই পরিকল্পিত বিভাজন মঙ্গল-পাঁচালির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী।

ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যকে বলেছেন 'পালা'

ঃ কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়
হরি হরি বল সভে পালা হৈল সায়।।

বস্তুত ভারতচন্দ্র কাব্যশিল্পকলা সচেতন কবি। কাব্যের ভাষা, রস, ছন্দ ও অলঙ্কার সম্পর্কে এই সচেতনতা মধ্যযুগে তাঁর পূর্ববর্তী কবি একমাত্র আলাউলের রচনাতে লভ্য।

'অন্নদামঙ্গল' 'ত্রয়ীকাব্য' হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। এরমধ্যে কবির সামগ্রিক শিল্পসিদ্ধির অভিজ্ঞান 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যানেই আছে।

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী এক ক্ষিপ্র নাট্যকৌশলের আশ্রয়ে রচিত হয়েছে। ভারতচন্দ্রের চরিত্র-চিত্রণ, সংলাপের বুনন ও সুপরিকল্পিত বর্ণনায় বিদ্যাসুন্দর পাঁচালির অনুবর্তী হলেও মধ্যযুগের ধারায় তা নাট্য হিসেবেই অভিধান্বিত হবার যোগ্য। বস্তুত এর পরিবেশনারীতিতে 'গীতগোবিন্দ' ধরনের নাট্যকৌশল আশ্রিত হতো বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে।

'বিদ্যাসুন্দর' পরিবেশনায় গায়েন ব্যতিরেকেও নর্তকীর অংশগ্রহণ ছিল—এরূপ অনুমান নিম্নোদ্ধৃত পদদৃষ্টে অসঙ্গত মনে হয় না—

ঃ নব নাগরী নাগর মোহনীয়া।
রতি কাম নটী নট সোহনীয়া।।
কতভাব ধরে কত হাব করে
রস সিন্ধু তরে ভবতারনীয়।
নূপুর রণ-রণ কিঙ্কিণী কণ-কণ।।
ঝঞ্জন ঝন ঝন কঙ্কণিয়া।।
লটপট লটপট ঝপট ঝটপট।
রচিত কুচজট কমনিয়া।।
কুটীল কটুতর নিমিষ বিষভর।
বিষম শর শর দমনিয়া।।
সখী সকল মিলত মধুমঙ্গল গাবত।
ততকার তরঙ্গত সঙ্গত নাচত।।
ঘন বিবিধ মধুর রব যন্ত্র বাজাবত।।
তাল মৃদঙ্গ বণী বনিয়া।।
ধি ধি ধিক্কট ধি ধিক্কট ধি ধি ধেই।
ঝিঁ ঝিঁ তক ঝিমতক ঝিমি ঝমক ঝমক ঝেঁই।।
তত তগুত তা তা থু থুং থেই থেই।
ভারত মানস মাননিয়া।।

এই পদে গীত এবং নৃত্যের যুগল সম্মিলন শুধু যে দৃষ্ট হয় তা নয়, এতে নৃত্যের তালও নির্দিষ্ট রয়েছে। কাজেই এই গীতের সঙ্গে জয়দেব বর্ণিত পদ্মাবতীর নৃত্য পরিবেশনার ধারায় নর্তকীর অংশগ্রহণের সম্ভাবনা নাকচ করে দেওয়া যায় না।

অন্যদিকে পদাবলীর ধারায় গীত পদগুলিতেও নর্তকী বা গায়িকার অংশগ্রহণ সম্ভব। নিম্নলিখিত পদটি এর উদাহরণ হিসেবে গৃহীত হতে পারে—

ঃ কি বলিলি মালিনি ফিরে বল বল

রসে তনু ডগমগ মন টল টল।
শিহরিল কলেবর তনুকাঁপে থর থর
হিয়া হৈল জর জর আঁখি ছলছল।
তেয়াগিয়া লোকলাজ কুলের মাথায় বাজ
ভজিব সে ব্রজরাজ লয়ে চল চল।
রহিতে না পারি ঘরে আকুল পরাণ করে
চিত্ত না ধৈরাজ ধরে পিক কল কল।
দেখিব সে শ্যামরায় বিকাইব রাঙা পায়
ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে ঢল ঢল।।

এ কাব্যে কালীস্তুতিও নৃত্যগীত নির্ভর। এ অংশে 'নৃত্যগীত তালিকা' থেকে তা বোঝা যায়।

চরিত্র-চিত্রণে ভারতচন্দ্রের দক্ষতা প্রসঙ্গে হীরামালিনীর উল্লেখ বহুল পরিচিত—

ঃ কথায় হীরার ধার তার নাম।
দাঁতছোলা মাজাদোলা হাস্য অভিরাম।।
গাল ভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কয় ছলে।।
চূড়া বান্ধা চুল পরিধান সাদা সাড়ী।
ফুলের পাপড়ী কাঁধে ফিরে বাড়ী বাড়ী।।
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।।

এ হচ্ছে চরিত্র বর্ণনা, তা একই সঙ্গে চরিত্রের ব্যাখ্যা । কাজেই গায়েনের চরিত্র বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র রূপায়নও সংসিদ্ধ হতো। পাঁচালির নাট্যধর্মিতার আদ্যোপান্ত কৌশলও হচ্ছে এই।

সংলাপের পারস্পর্য 'বিদ্যাসুন্দরে' কিরূপ বর্ণনাত্মক নাট্যকৌশলে বিন্যস্ত হয়েছে, তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো—

ঃ বসিয়া রয়েছে বিদ্যাপূজার আসনে
ভারত হীরারে কয় ঘূর্ণিত লোচনে।।

তারপরই আছে—চরিত্রগত সংলাপ—

ঃ শুনলো মালিনী কি তোর রীতি
কিঞ্চিত হৃদয়ে না হয় ভীতি।।

চরিত্রভিত্তিক সংলাপের সূত্রটা ভারতচন্দ্র বহুক্ষেত্রে চরিত্রের বদলে, ভণিতার ছলে নিজেই ধরিয়ে দিয়েছেন—

ঃ ডগ মগ তনু রসের ভরে
ভারত হীরারে জিজ্ঞাসা করে—

এর ফলে, গায়েনের বর্ণনাত্মকরীতির মধ্যে একটি নতুন বৈচিত্র্য তৈরি হতো।

'বিদ্যাসুন্দরে' সুন্দরের নানা বেশ ধারণের কথা আছে। ছদ্মবেশী এই রাজপুত্র রাজদর্শনে গিয়ে নানা চরিত্রের অভিনয় করে নিজের প্রকৃত পরিচয় আড়াল করে রাখে। সে কখনও নট কখনও বা বিদূষক কখনও পুরাণ-পাঠক কিংবা গায়ক অথবা গণক—

ঃ কখন নাটক কখন চেটক
কখন ঘটক কখন পাঠক
কখন গায়ক কখন গণক
ভারতের মনোহর হে।।

সুন্দর নাটুয়ার মতই রূপসজ্জাপটু—

ঃ আগে হইতে বহুরূপ জানে যুবরাজ।
নাটুয়ার মত সঙ্গে আছে কত সাজ।।

রাজপুত্রের নটবেশ ধারণের কথা মালাধরবসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' আছে।

'অন্নদামঙ্গলে' হরগৌরী প্রসঙ্গে ভোজনান্তে শিবের নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ লভ্য, শিব-নৃত্যের প্রাচীন ধারার সঙ্গে এর মিলও প্রত্যক্ষ করা যায়—

ঃ জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া। নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢুলিয়া।।
হরিষে অবশ অলস ভঙ্গে। নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে।।

সে ভয়ঙ্কর 'তাণ্ডবনৃত্যে'র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিবরণ দিয়েছেন ভারতচন্দ্র—

ঃ লটপট জটা লপটে পায়। ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায়।।

গর্ গর্ গর্ ফণী। দপ দপ দপ দীপয়ে মণি।।
ধক ধক ধক ভালে অনল। তর্ তর্ তর্ চাঁদ মণ্ডল।।
সর্ সর্ সরে বাঘের ছাল। দলমল দোলে মুণ্ডের মাল।।
তাধিয়া তাধিয়া বাজায় তাল। তাতা থেই থেই বলে বেতাল।।

ইত্যাদি।

সে নৃত্যে তালবাদ্যের সাথে আছে 'ডমরু' 'শিঙ্গা' 'মৃদঙ্গে'র তাল। শিব ঠাকুরের এই 'নাটক' দেখে 'হাসেন অন্নদা মৃদু মধুর'।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' চরিত্রানুগ ভাষাতে উক্তি-প্রত্যুক্তি বা সংলাপ দৃষ্ট হয়। স্থান-কাল ও পাত্র বিচারে সংলাপের যাথার্থ্য রচনায় ভারতচন্দ্র নাট্যকারের কুশলতা প্রদর্শন করেছেন। কাব্যমধ্যে দাসুবাসু, মানসিংহ, পাতশা, মালিনী, কোটাল, বিদ্যা, সুন্দর প্রমুখ চরিত্রের বাস্তবতা অনুসারেই সংলাপের ভাষা-বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে। এ স্থলে প্রমাণস্বরূপ বিদ্যাসুন্দর খণ্ডে রাজা ও ভাটের উক্তি-প্রত্যুক্তি উদ্ধৃত হলো—

ঃ (রাজা) গাঙ্গ কহো ঃ গুণসিন্ধু মহীপতি ঃ
নন্দন সুন্দর ঃ ক্যৌনহী আয়া
জো সব ভেদ ঃ বুঝায় কহা ঃ কি ধোঁ নহী তহঁ
সমুঝায় শুনায়া।। ইত্যাদি।

ঃ (ভাট) ভূপ মৈঁ তি হাঁরো ভট কাঞ্চীপুর জায়কে।
ভূপকো সমাজ-মাঝ রাজপুত্র পায়কে।। ইত্যাদি

সংলাপের এই বাস্তবতা সংস্কৃত নাটকেও লভ্য। উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক পদসমূহ 'অন্নদামঙ্গলে'র সর্বত্রই নাট্যানুবর্তী—একথা বলা যায়।

ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যকে 'ইতিহাস'ও বলেছেন। এতে ইতিহাসের একটি ক্ষীণ প্রসঙ্গ আছে বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কবির কল্পনা প্রবণতার প্রাধান্যে ইতিহাসের যেটুকু রচিত তা অতিরঞ্জিত।

'অন্নদামঙ্গল' পূর্ণাঙ্গ কাব্য হিসেবে আনুষ্ঠানিকভবে রাজগৃহে পরিবেশিত হতো পূজায়-পার্বণে কিন্তু 'বিদ্যাসুন্দর' রাজন্যবর্গের একান্ত উপভোগের জন্য সম্পূর্ণ আলাদাভাবে উপস্থাপিত হতো—এরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত। কারণ ভারতচন্দ্রের

'অন্নদামঙ্গল' থেকে পরবর্তীকালে শুধু 'বিদ্যাসুন্দরে'র পালাটিই পাঁচালি, লোকনাট্য বিশেষত যাত্রায় গৃহীত হয়েছিল। উপরন্তু প্রবাদ অনুসারে এই উপাখ্যানের প্রতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল। এতে দেখা যায় ভারতচন্দ্র আলাদাভাবে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করে তা মহারাজাকে পড়তে দিয়েছিলেন।[১১৪]

অষ্টাদশ শতকে লিয়েবেদেফের 'ছদ্মবেশ' নাটকে বিদ্যাসুন্দরের গান গৃহীত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সেকালে বিদ্যাসুন্দর পরিবেশনার নৃত্যরূপও গানের সঙ্গে বাহিত হয়েছিল মঞ্চে।[১১৫] লিয়েবেদেফের 'ছদ্মবেশ' নাটকের সঙ্গে বিদ্যাসুন্দরে'র একটি অন্তর্গত সাযুজ্য অনুভব করা যায়। ভারতচন্দ্রের আখ্যানে 'সুন্দর' ছদ্মবেশেই 'বিদ্যার' সঙ্গে মিলিত হতো।

ঊনবিংশ শতকের শুরুতে বাঙলা যাত্রার নতুন 'উজ্জীবনে'র ক্ষেত্রেও বিদ্যাসুন্দরের প্রভাব দৃষ্ট হয়।[১১৬] ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর অবলম্বনে পরবর্তীকালে গোপাল উড়িয়া যাত্রার প্রচলন করেন। এর হিন্দী রূপান্তরও হয়, অনুবাদক কবি ভারতেন্দু।

ভারতচন্দ্রের অসম্পূর্ণ নাট্যপ্রয়াস 'চণ্ডীনাটকে'র দুটি উক্তি উদ্ধৃতি হল—

চণ্ডীনাটক

মহিষাসুরের প্রবেশ ঃ

ঃ খট্ মট্ খট্ মট্ খুরোথ-ধ্বনিকৃত জগতীকর্ণ পুরাবরোধঃ
ফোঁ-ফোঁ-ফোঁ-ফেঁতি নাসানিল চলদচলাত্যন্তবিভ্রান্তলোকঃ।
সপ্-সপ্-সপ্ পুচ্ছাঘাতোচ্ছলদুদধিজল প্লাবিত-স্বর্গমর্জ্যো
ঘর্-ঘর্-ঘর্-ঘোরনাদৈঃ প্রবিশতি মহিষ ঃ কামরূপো বিরূপঃ।।
ধো-ধো-ধো-ধো নাগরা গড়-গড়-গড়-গড় চৌঘড়ী-ঘোর ঘর্য্যৈঃ
ভোঁ-ভোঁ-ভোরঙ্গশব্দৈর্ঘন-ঘন বাজে চ মন্দীর নাদৈঃ।
ভেরী-তূরী-দামামা-দগড়-দরমসা-শব্দবিস্তব্ধদেবৈঃ
দৈত্যোঽসৌ ঘোরদৈত্যে ঃ প্রবিশতি মহিশঃসার্ব্বভৌমা বভূব।।

মহিষাসুরের উক্তি—

ঃ শোন্‌রে গোয়ার্ লোগঃছোড়্‌দে উপাস রোগঃ মানুহঁ আনন্দ-ভোগঃ
ভৈষরাজ যোগমে।

আগমে লগাউ ঘীউঃকাহে কৌ জলাও জীউঃ যক্‌রোজ প্যার পিউঃ
ভোগ য়হী লোগমে।।
আপকো লগাও ভোগঃ কামকো জগাও যোগঃ ছোড় দেও যাগ-যোগঃ
মোক্ষয়হী লোগমে।
ক্যা এ গান্ ক্যা বেগান্ঃ অর্থনার আবজানঃ যহীধ্যান য়হী জ্ঞানঃ
আর সর্ব্ব·রোগমে।।[১১৭]

এর কাহিনী চণ্ডীমঙ্গলের পৌরাণিক-পর্ব। কাজেই একে চণ্ডীমঙ্গল ধারার একমাত্র নাট্যপ্রয়াস হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

'চণ্ডীনাটকের' সংলাপে সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষার মিশ্রণ আছে, এর সঙ্গে মধ্যযুগের বাঙলা-মৈথিলী নাট্য-ভাষারীতির সাজুয্য খুঁজে পাওয়া যায়। দ্বিজরামচন্দ্র বিরচিত, 'ললিতকুবলাশ্ব-মদালসোপাখ্যান-শিব-পার্বতী-মহিমা নাটক' এর শুরুটাও খানিকটা এরকম।

এ নাটকের প্রথমে, সংস্কৃত শ্লোকে শিবের নমস্ক্রিয়ায়, এরপর মৈথিলী ভাষায় আছে শিবের প্রশস্তি—

ঃ হর হর তুব কলা বিপরিতি মালা।
নিরকণ্ঠ জটা ধারি শিরে তোয়াধারা।[১১৮]

এবার সুত্রধারের প্রবেশ ও সংস্কৃত শ্লোক ইত্যাদি। 'চণ্ডীনাটকে' মহিষাসুরের প্রবেশ নিঃসন্দেহে অনুরূপ সূত্রধারের উক্তি।

তবে শুরুতে মহিষাসুরের প্রবেশ ও উক্তি থেকে মনে হয় তা মধ্যযুগের পালারম্ভেররীতি নয়। অশুভ অসুরের আগে হরগৌরীর প্রসঙ্গ থাকার কথা, এ নাট্যের প্রারম্ভে তা নেই।

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অবলম্বনে কালিকামঙ্গলের আখ্যান ভাগ গড়ে উঠেছে। মধ্যযুগে কবিরা মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও কালিকামঙ্গল রচনাতে অধিকমাত্রায় উৎসাহবোধ করেছিলেন। এ কাহিনী ফিরোজশাহের 'আগ্রহেই প্রথম রচিত হয়'। সর্বমোট সতেরজন কবি বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অবলম্বনে কালিকামঙ্গল রচনা করেন। এরা হচ্ছেন—দ্বিজশ্রীধর, সাবিরিদ খান, কঙ্ক, গোবিন্দদাস, বলরাম

চক্রবর্তী, কৃষ্ণরাম, প্রাণরাম, রামপ্রসাদসেন, ভারতচন্দ্র, নিধিরাম আচার্য, দ্বিজরাধাকান্ত, কবীন্দ্র, মদনদত্ত, মধুসূদন চক্রবর্তী, ক্ষেমানন্দ, বিশ্বেশ্বর, কবিচন্দ্র। এর মধ্যে সাবিরিদ খান বিদ্যাসুন্দরের প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে 'নাটগীত' রচনা করেন। কঙ্ক রচিত 'সত্যপীরের' পাঁচালিতে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী আছে। কাজেই এ কাব্য 'কালিকামঙ্গল' নয়।[১১৯] সাবিরিদ খান রচিত নাটগীত 'বিদ্যাসুন্দর'ও 'কালিকামঙ্গল' নয়—প্রণয়োপাখ্যান।

কৃষ্ণরাম কালিকামঙ্গলকে 'কালিকাগীত' ও 'কালিকামঙ্গল' বলেছেন। এ কাব্যের রচনাকাল ১৬২৮ খ্রীস্টাব্দ (অন্যমতে ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দ)। 'কালিকামঙ্গলে'র ঘট প্রতিষ্ঠিতা অংশে আছে—

ঃ নৃত্যগীত বাদ্যরসে ভকত জনের বাসে
উর মাতা মঙ্গল এই ঘটে।
গায়েন সুকণ্ঠ কর মঙ্গল আসরে উর
কৃষ্ণরাম বলে করপটে।।[১২০]

নৃত্যগীত বাদ্যরসের উল্লেখ পাঁচালি কাব্যের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। এখানে গায়েন কবির বিশেষ প্রার্থনা, দেবী যেন তাকে 'সুকণ্ঠ' করেন। কবি আরও বলেছেন—

ঃ সঙ্গে করি সখিগণ স্থির মন হইয়া গো
কৌতুকে শুনহ নিজগীত।
গায়েন বায়েন আদি যেবা ইহা শুনগো
পুরাও তাহার মনোনীত।।
সঙ্গীত করিতে মোরে ইঙ্গিত করিলে গো
তুয়া অঙ্গীকারে ইহা গাই।[১২১]

এ কাব্যে বিদ্যার মুখে সংস্কৃত শ্লোক আছে।

রামপ্রসাদসেনের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যও পাঁচালি। তবে তিনি কৃষ্ণরামদাসের অনুবর্তী কবি। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের আদিরস অবশ্য ভারতচন্দ্রের কালিকামঙ্গলের তুলনায় উপেক্ষণীয়। মূলত কালীভক্তের কীর্তনাঙ্গ গান এ কাব্যের পরিবেশনে নতুনতর বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, কালিকামঙ্গলের ধারায় নাট্যগুণে একমাত্র ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর'ই কালোত্তীর্ণ এবং বৈচিত্র্যময় পাঁচালি যা অদূরবর্তীকালের বাঙলা নাট্যরীতি ও নাট্য আখ্যান ধারায় বিপুল প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিল।

অপ্রধান মঙ্গলকাব্য

অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের ধারায় শিবমঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও রায়মঙ্গল পাঁচালি উল্লেখযোগ্য। শিবমঙ্গল 'শিবায়ণ' বা 'শিব সঙ্কীর্তন' নামে পরিচিত। তবে সপ্তদশ শতকের পূর্বে শিবকথার পাঁচালি দৃষ্ট হয়না যদিও এর অধিকাংশ কবি অষ্টাদশ শতকের।

পূর্ণাঙ্গ কাব্যরূপ লাভের বহু পূর্বকাল থেকে ছড়া, গীত, অভিনয়, গাজন ও গম্ভীরা গানের ধারায় শিবকথা দৃষ্ট হয়। এগুলো ছিল পূর্ণাঙ্গরূপে কৃত্যমূলক। সমগ্র জনপদে শিবকেন্দ্রিক নানা অনুষ্ঠানের ব্যাপক চর্চার ফলে এর কাব্যরূপদানের বিষয়টি সকল কালেই গৌণ বলে বিবেচিত হতে থাকে। এ ছাড়া শিবের নানা প্রসঙ্গ প্রায় সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এত বিচিত্র ও বহুপন্থায় গৃহীত হয়েছিল যে, সে সকল বিষয়কে একটি কাব্যের আধারে সঞ্চিত করাও সহজসাধ্য ছিল না। উপরন্তু মধ্যযুগের প্রায় সকল ধরনের কাব্যে শিব-পার্বতীর লীলা সুবিস্তৃতভাবে বর্ণিত হতে দেখা যায়। কতকটা এই কারণেই শিবকথার কাব্যরূপ নির্মাণে কবিরা সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতকের পূর্বে ব্রতী হন নি।

রামকৃষ্ণরায় 'শিবমঙ্গলে'র প্রথম কবি রূপে উল্লিখিত হয়েছেন। তাঁর কাব্য ছাব্বিশ পালার। ষোড়শ সংখ্যক পালাটি লৌকিক কাহিনীনির্ভর, অন্যগুলি আখ্যান পুরাণ থেকে সংগৃহীত।

রামকৃষ্ণরায়ের 'শিবমঙ্গলে' ছড়া, গম্ভীরা, নাটপালা ও গাজনের ভেতরে শিবের যে লোকজ পরিচয়, তা খুঁজে পাওয়া যায় না। উপরন্তু নানা পুরাণ থেকে সংগৃহীত এই আখ্যানে কোনো কেন্দ্রীভূত কাহিনী গড়ে ওঠে নি। বিশেষজ্ঞের মতে এ কাব্য শিব প্রসঙ্গের 'সঙ্কলন'।[১২২]

মূলত বর্ণনাত্মকরীতিতে সমগ্র 'শিবমঙ্গল' রচিত হলেও এ কাব্যে 'গীতধর্মী সুললিত' পদেরও সাক্ষাৎ মেলে। একটি পদে জননী মেনকা উমাকে বলছেন—

ঃ তনুতোর যেন কাঁচলুনি
রোদ্রে মিলাবে হেন জানি।

স্বভাবে তুমি সে কমলিনী।
হিমপাতে হারাবে পরাণি।।
তপেরে না যাইয় মা গ উমা।
গলায় বান্ধিয়া থাক তোমা।।

অন্যত্র—

ঃ যত বিলাসিনী রচিত বেশ
বান্ধিল লোটন কুটিল কেশ
অলক তিল অপরিশেষ
চিত্র বসন ওড়নি।
কনক মুকুর বদন কাঁতি
বসন ভূষণ বিবিধ ভাতি
চলুন বর বরটা পাতি
ভঙ্গিমা কর দোলনী।।[১২৩]

পাঁচালি আঙ্গিকে এ ধরনের গীতের অবকাশ রচনা পরিবেশনকৌশলের অঙ্গ হিসেবেও বিবেচ্য।

পাঁচালি গায়েন কখনও কখনও ঘটনা বা পরিস্থিতি গদ্যে বর্ণনা করে থাকেন। এ অংশটা গায়েন স্বাধীনভাবে রচনা করেন বলে কাব্যমধ্যে এর উল্লেখ থাকে না। কিন্তু শিবমঙ্গলে তা একটু ভিন্নপন্থায় দৃষ্ট হয়—

১। ভাইরে নন্দি গিয়া শিবের সাক্ষাত দুর্গার কেমত রূপ বলিতেছেন অবধান করহ।

২। মহিষ পর্বত গিয়া পূর্বকল্পের কথা ক্রোঞ্চকে কহিতেছেন অবধান করহ।।

৩। ভাইরে নারদের পরিহাসে মেনকা রোদন করিতেছেন এমত সময়ে কেমন স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা সকল আসিতেছেন অবধান করহ।।

৪। অতঃপর তারা প্রভৃতি দেবতারা সকল শিবের তরে প্রহেলিকা প্রবন্ধে গৌরীকে সম্পূর্ণ করিয়া কথোপকাল যাপন করিয়া হরকে ইঙ্গিত করিতেছেন অবধান করহ।।

৫। পার্বতী ভাগীরথী স্নান করিতে গেলেন এতে সময়ে শঙ্কর মনের দুঃখ নারদকে কহিতেছেন অবধান করহ।।[১২৪]

এ ধরনের 'বচনিকা' পাঁচালিকাব্যে দেখা যায় না। 'বচনিকা' ব্যবহারের ফলে গায়েনের সঙ্গে দর্শক-শ্রোতার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠত, পাঁচালি রীতির উপর কিসসা-কথনেরও বর্ণসম্পাত ঘটত।

রামেশ্বরের 'শিব সঙ্কীর্ত্তন' বা 'শিবায়ণ' পালা ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়। 'শিবসঙ্কীর্ত্তন' কাব্য লৌকিক উপাখ্যানের পালা বা পাঁচালি রূপ। ছড়া, গীত, গাজন ও লোককথায় শিবের যে অনুকাহিনীসমূহ প্রচলিত ছিল, কবি সে সকল একত্রে সংগ্রথিত করে কাব্যরূপদিয়েছেন। এ কাব্যে শিবের সঙ্গে কৃষির এক নিবিড় সম্পর্ক চিত্রিত হয়েছে। 'শিবসঙ্কীর্ত্তনে' শস্যক্ষেত্র, কৃষাণ-কৃষাণী, নতুন আবাদে নৈসর্গিক প্রতিবন্ধকতা, হাল, বীজ, লাঙ্গল প্রভৃতি প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। 'শিবায়ণে'র বিষয়সূচী নিচে দেওয়া হলো—

কোঁচিনী পাড়ায় শিব, শিবের ভিক্ষাবৃত্তি, গৌরীর রন্ধন, শিবের ভোজন, শিবরাত্রিব্রত, একাদশী-মাহাত্ম্য, চাষের বিবরণ, হরগৌরীর কলহ, শূলের গুণ ও চাষের সজ্জা, চাষের উদযোগ, চাষ ভূমির পাট্টা, শূলভঙ্গের চেষ্টা, চাষের সজ্জা প্রস্তুত, বীজ ধান্য সংগ্রহ, শিবের চাষ ভূমিতে যাত্রা, চাষ আরম্ভ, ভীম ভৃত্যের ভোজন, শস্যোৎপত্তি, মাছি ডাঁশ প্রেরণ-সিদ্ধান্ত, মাছি ডাঁশ প্রেরণ, মশার উৎপাত, জোঁকের উৎপাত, বাগদিনী পালা আরম্ভ, ভীমের সঙ্গে বাগদিনীর কলহ, শিবের জলসিঞ্চন, শিবের শঙ্খ নির্ম্মাণ, শিবের শাঁখারী বেশ, শাঁখারীবেশী শিবের হিমালয় গৃহে গমন, শঙ্খের জন্য নারীদের গোলযোগ, গৌরী-শাঁখারী সংবাদ, শাঁখারীর সতী ধর্ম বর্ণনা, শাঁখা পরার উদ্‌যোগ, শাঁখা পরার জন্য গৌরীর সজ্জা, শঙ্খ পরিধান আরম্ভ। বিষয়সূচীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায় রামেশ্বর বর্ণিত অধ্যায়সমূহ, শিব সম্পর্কিত লৌকিক ছড়া গীত, গম্ভীরা-নাটেরই পদরূপান্তর মাত্র। সচরাচর মঙ্গলকাব্যে একটি সুনির্দিষ্ট কাহিনী ছক দেব-দেবীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিকল্পনার ধারায় পরিণাম লাভ করে। শিব-বিষয়ক মঙ্গলকাব্যে তা কোথাও দৃষ্ট হয় না। বিষয়সূচী বিচারে লক্ষ্য করা যায়, শিব ও গৌরীর নানা প্রসঙ্গ এ কাব্যেও কতগুলো শিথিল-সম্বন্ধযুক্ত অধ্যায়। বলাবাহুল্য, মনসা-চণ্ডীর পাঁচালি প্রভাবেই শিবমঙ্গল কাব্যের উদ্ভব। এর আখ্যানের মধ্যে আছে ছড়া-গীত-কৃত্যের আদল। শিব-বিষয়ক মঙ্গলকাব্য পাঁচালি রূপে আখ্যাত হলেও তা মঙ্গলপাঁচালি নয়।

এ কাব্যে আসর বন্দনায় রামেশ্বর বলেছেন—

ঃ বন্দিব গন্ধর্ব্ব গায়েনের পায়।
গীতবাদ্য সে রাগরাগিণী সমুদায়।।
দৈত্যদানা প্রেতভূত পিশাচ প্রমথ।
ডাকিন্যাদি সকলে আমার দণ্ডবত।।[১২৫]

গম্ভীরা পূজায় ভূত-পিশাচ পূজার সঙ্গে 'শিবের চাষের পালা' অভিনীত হয়। এর সঙ্গে আছে ভূতাবেশ নৃত্য। গম্ভীরার 'তৃতীয় দিবসে, সূর্যোদয়ের পূর্বে মশান নৃত্য' হয়। এই মশান নৃত্যের পর শবনৃত্য, শবজাগান ও 'পাতা' নামান অনুষ্ঠান। এ পালার সঙ্গে গম্ভীরার আনুষ্ঠানিকতার সম্পর্ক থাকা বিচিত্র নয়।

'শিবায়ণে' কোঁচ নারী প্রসঙ্গে আছে, শিবের মন্মথরূপ ধারণ করে কোঁচ নগরে প্রবেশ—

ঃ কোঁচের নগরে হর করিল প্রবেশ।
ধরিল মন্মথ-অরি মন্মথের বেশ।।
বৃষাসনে ঈশান বিষাণে দিয়া ফুঁক।
আনন্দে গোবিন্দ গান গান পঞ্চমুখ।।
ডিণ্ডিমি ডমরু ডাকে কাড়্যা লয় প্রাণ।
মোহে মহী মদন-মর্দ্দন মহেশান।।

কোঁচ নগরে প্রবেশ করে শিব নৃত্যসহকারে কোঁচ নারীদের আহবান জানায়—

ঃ সুরসাল বাজে গাল নাচে ভালবিধু।
শিঙ্গা গায় দ্রুত আয় আয় কোঁচ বধূ।।

তারপর সবাই ছুটে এল—

ঃ কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বায় যন্ত্র।
কেহ করতালি দেই সবে এক তন্ত্র।।

হাতের 'তাল' 'গালবাদ্য' নৃত্যবাদ্যের অংশরূপে মধ্যযুগের নাট্যপ্রসঙ্গে অন্যত্রও দেখা যায়।

শিবের কামুকবৃত্তি চমৎকার উপমা লাভ করেছে রামেশ্বরের হাতে—

ঃ কোঁচিনী সকল হৈল কুসুম উদ্যান।
শঙ্কর ভ্রমর তায় মধুকরে পান।।[১২৬]

এ কাব্যে চাষের সজ্জা প্রস্তুত অংশে কৃষ্ণলীলা নাটের বিবরণ লভ্য—

ঃ কিন্নরী গন্ধর্ব্বে গান পঞ্চাননে বেড়্যা।
কৃপাময়ী কৃষ্ণের কীর্ত্তন দিল যুড়্যা।।
দেবগণ দোহার গণেশ গান মূল।
কিন্নর গন্ধর্ব্ব গান হৈল অনুকূল।।
যশোদা লইয়া কৃষ্ণে উদুখলে বান্ধে।
গোবিন্দের লীলা শুন্যা গদাধর কান্দে।।[১২৭]

শিবের কৃষ্ণপ্রীতি মুকুন্দরামেও আছে। শিব-পার্বতী কালিয়দমননাট দেখে যথাক্রমে নন্দ ও যশোদারূপে নৃত্য করেছিলেন। এ হচ্ছে চৈতন্য প্রভাবের ফল। গোবিন্দ বা কৃষ্ণলীলা পরিবেশনের ক্ষেত্রে নতুন একটি সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে—রঙ্গস্থলের চারপাশে দোহারদের বেষ্টন। ডঙ্ক নৃত্যেও অনুরূপ দোহার রীতি ছিল।

উদ্ধৃত পদ দৃষ্টে বলা যায়, এ নাট্যের বিষয় ছিল কৃষ্ণের বাল্যলীলা।

ষষ্ঠী মঙ্গল ব্রতকথারূপে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। এই ব্রতকথা পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে ঈষৎ ভিন্নরূপে বিদ্যমান। পশ্চিমবঙ্গের ব্রতকথায়, নোলা দোষে দুষ্ট এক কনিষ্ঠা বধূ ষষ্ঠীমা'র কৃপায় নিখোঁজ ছয় সন্তানকে খুঁজে পায়।

পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ অঞ্চলের ব্রতকথায় এক ব্রাহ্মণীর লোভী পুত্রবধূ ষষ্ঠীব্রতের ভোগ খেয়ে কিভাবে বিপদগ্রস্ত হলো তার কাহিনী আছে। পুত্রবধূ শ্বাশুড়ীর অগোচরে ব্রতের ভোগ খেয়ে ফেলল আর অমনি শুরু হলো নানা দৈব বিপর্যয়—

ঃ দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণীর সংসারে অঘটন ঘটিয়া গেল। পুত্রবধূ অসময়ে মৃত সন্তান প্রসব করিল, গোরুতে বচ্ (গর্ভ) ফেলিল, কুকুরে বচ্ ফেলিল, বিড়ালে বচ্ ফেলিল, কলাছড়ি ভাঙ্গিয়া পড়িল।

এই অঘটন ছয় বছর পর্যন্ত ঘটল। পরে একদিন ধরা পড়ল পুত্রবধূ ষাট চোরণী। তারপর গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে বহু দুঃখ কষ্টের পর যমের সেবা করে ছোট বউ পুত্রবতী হলো। পুত্রের নাম হলো 'ষাঠীর গোবিন্দ'। ষাট-চোরণী, যমের মার সকল ফন্দী কৌশলে জিতে নিয়ে মা ষষ্ঠীর বরে পেল 'ষাঠীর গোবিন্দ' ও তার অন্য ছয়পুত্রকে।

মানিকগঞ্জে এর সঙ্গে গল্পের আরও কিছু বাড়তি অংশ যুক্ত হয়।[১৮]

'ষষ্ঠীমঙ্গলে'র রচয়িতা কৃষ্ণরামদাস। এ কাব্য ব্রতকথার ছাঁদে রচিত। কাজেই 'মঙ্গল' নামে আখ্যাত হলেও ষষ্ঠীমঙ্গল ব্রতকথা রীতিকে অতিক্রম করে পরিপূর্ণ মঙ্গলকব্যের আঙ্গিক লাভে সমর্থ হয় নি। তাঁর রচিত 'শীতলামঙ্গল', 'কমলামঙ্গল' সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য।

'শীতলামঙ্গলে' রামায়ণ কথকতার প্রসঙ্গ আছে। কর্ণধার নৌকা বাইতে বাইতে 'অপূর্ব কাহিনী রামায়ণ' বর্ণনা করে। ষষ্ঠী, শীতলা ও কমলামঙ্গলের শ্রোতা মূলত অন্তঃপুরবাসী নারীগণ।

কৃষ্ণরামদাসের অপর কাব্য 'রায়মঙ্গল'। তৎপূর্বে ব্রতকথারূপে দক্ষিণাঞ্চলের রাজা দক্ষিণরায়কে নিয়ে রচিত 'মাধবাচার্য্যের' পাঁচালি গান ছিল। কিন্তু কবির ভাষায় তা ছিল চাষা ভুলানো 'গীত'। সেজন্য দেবতা দক্ষিণরায় স্বপ্নযোগে কবিকে 'রায়মঙ্গল' রচনার আদেশ দেন—

ঃ পাঁচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার।
আঠারো ভাটীর মাঝে হইব প্রচার।।
পূর্ব্বে করিল গীত মাধব আচার্য্য।
না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য্য।।
মশান নাহিক তাহে সাধু খেলে পাশা।
চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা।।

'ভাষা'র অর্থ এখানে আঞ্চলিক বাঙলা। গীত থেকে কৃষ্ণরামদাস তাঁর রচনাকে পাঁচালি প্রবন্ধে উন্নীত করেন। কবির এই অনুযোগের সঙ্গে বিজয়গুপ্তের হরিদত্ত-নিন্দার খানিকটা সাদৃশ্য আছে।

প্রচলিত রায়মঙ্গলও জাগরণ পালারূপে পরিচিত ছিল—

ঃ মোর গীত না জানিয়া যতেক গায়ন।
অন্যগীত ফিরাইয়া গায়ে জাগরণ।।

তারপর সে 'জাগরণ' পালার অভিনয় রীতি ও শ্রোতার পরিচয়ও দিয়েছেন—

ঃ ফাকুটী নাকুটী আর করে রঙ্গীভঙ্গী।
পরম কৌতুকে শুনে মউলা মলঙ্গী।।

কবি তার কাব্যকে বলেছেন 'কবিতা'—

ঃ তোমার কবিতা যার মনে নাই লাগে।
সবংশে তাহারে তবে সংহারিবা বাঘে।।[১২৯]

এ কাব্যে গাজীপীরের সঙ্গে দক্ষিণরায়ের দ্বন্দ্ব ও পরে দুজনের মধ্যে সন্ধি হবার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। (গাজীপীর প্রসঙ্গে আলোচনা নবম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। 'রায়মঙ্গল' কাব্যে সম্পূর্ণ হিন্দী ভাষায় চরিত্রানুগ সংলাপ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত আছে। দক্ষিণরায়ের বাঘেরা গাজীর বাঘদলের উপর আক্রমণ করেছে, এ সংবাদ শ্রবণান্তে ক্রোধান্বিত গাজী বলেন—

ঃ ভাগ গীয়া বেটীচোদ এবে কিআ কর আব।
হোগা হারামজাদ খানেখারাব।।
শোন্তে হো দক্ষিণরায় এসা দাগাবাজী।
বাঁধকে লে আনেছে তবে হাম গাজী।।
কানান সেবক তোড়নে কহে কান।
শীতাব দেখনে চাই কেছাই সয়তান।।
আদিমীকু উপর রুক্তায় হররোজগাটা।
খাড়ায় মুলুক লৌটে বড়ি বড়ি পাট্টা।।
কহে জাকে তিনকি মোকাম শীতাব করোকে ধোঁড়।
উনকি মুরতি তোম সব ইতি বেরি তোড়।।[১৩০]

এ ধরনের মিশ্রভাষার সংলাপ পরবর্তীকালে ভারতচন্দ্রেও দেখা যায়। 'রায়মঙ্গলে'র রচনাকাল ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দ বলে মনে করা হয়।

মঙ্গলপাঁচালির ধারা আঙ্গিক ও পরিবেশনারীতির আলোকে বাঙলা নাট্য ইতিহাসে গৃহীত হওয়া উচিৎ। এই কৃত্য-পাঁচালির গড়ন ও পরিবেশনারীতির সঙ্গে নাটকের ঘনিষ্ট সাদৃশ্য আছে।

আধুনিককালের বাঙলা নাট্যধারায়ও 'মঙ্গল' নামটি গৃহীত হতে দেখা যায়, যথা—গিরিশঘোষের 'বিল্বমঙ্গল'। 'বিল্বমঙ্গল' কৃষ্ণ বা চৈতন্যমঙ্গলের বৈষ্ণবীয় ভাবরসসিক্ত নাটক।[১৩১]

টীকা

১. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ জানুয়ারী ১৯৯১, পৃঃ ১৫৮।

২. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস,* ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৭৫ (বঙ্গাব্দ ১৩৮১) পৃঃ ১৫।

৩ সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), প্রথম আনন্দ সংস্করণঃ জানুয়ারী ১৯৯১, পৃঃ ১৫৮।

৪. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস,* ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৭৫ (বঙ্গাব্দ ১৩৮১) পৃঃ ২১।

৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯।

৬ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১।

৭ সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (২য় খণ্ড),প্রথম আনন্দ সংস্করণ : ১লা বৈশাখ ১৩৯৮, পৃঃ ১৮১।

৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২১।

৯ অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রাদেব সম্পাদিত, *ময়ূরভট্ট, ধর্ম্মমঙ্গল,* প্রথম প্রকাশ ১৩৮১, পৃঃ ১৭।

১০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮।

১১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯।

১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬-৪৭।

১৩. শ্রী বিজিতকুমার দত্ত ও সনন্দা দত্ত সম্পাদিত, *মাণিকরাম গাঙ্গুলি বিরচিত ধর্ম্মমঙ্গল,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬০, পৃঃ ২৮।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৯।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৯।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬৩।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩০-১৩১।

২০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০১-২০২।

২১. শ্রী সুকুমার সেন ও শ্রী পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, *রূ* সভা বর্দ্ধমান ১৩৫১, পৃঃ ১৭।

২২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।

২৩. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২য় খন্ড) পৃঃ ৩৬।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭।

২৫. শ্রী পীযুষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, *ঘনরাম বিরচিত* ১৯৬২, পৃঃ ৯।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১৯।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১৮

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৩৩।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮-৩০।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০-৩১।

৩৬. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম* ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃঃ ৪১৬।

৩৭. শ্রী জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত এম. এ সম্পাদিত, *কবি* বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২, পৃঃ ৯।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৩।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭৯।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮০।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮১।

৪৫. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খণ্ড)*, প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৮৫, ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃঃ ৪২৪।

৪৬. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৭৫ (বঙ্গাব্দ ১৩৮১) পৃঃ ৩৪৪।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৫।

৪৮. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খণ্ড)*, প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৮৫, ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃঃ ৪২৪।

৪৯. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯১, পৃঃ ১৭৫।

৫০. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৭৫ (বঙ্গাব্দ ১৩৮১ পৃঃ ৩৪৩।

৫১. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (২য় খণ্ড)* প্রথম প্রকাশ ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯০, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৭৪৯।

৫২. সুকবি নারায়ণদেব ও পণ্ডিত জানকীনাথ, দিলীপ রায় প্রকাশিত *পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল* ৬ষ্ঠ সংস্করণ-১৩৯১, পৃঃ ৫।

৫৩. *শ্রী শ্রী পদ্মাপুরাণ বাইশ কবি মনসা* নামের চলতি বাজার সংস্করণের গ্রন্থ থেকে গৃহীত। প্রকাশক-শ্রী অমূল্য রতন শর্ম্মা, ৩০ নং ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন, কলিকাতা পৃঃ ৩৫৪।

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৯।

৫৫. সুকবি নারায়ণদেব ও পণ্ডিত জানকীনাথ, দিলীপ রায় প্রকাশিত, *পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল* ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৩৯১, পৃঃ ২২৮।

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৭।

৫৭. *শ্রী শ্রী পদ্মাপুরাণ বাইশ কবি মনসা* নামের চলতি বাজার সংস্করণের গ্রন্থ থেকে গৃহীত। প্রকাশক শ্রী অমূল্য রতন শর্ম্মা, ৩০ নং ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন, কলিকাতা, পৃঃ ৩৫৫-৩৫৬।

৫৮. কাজী আবদুল ওদুদ (এম. এ.) *ব্যবহারিক শব্দকোষ (১ম খণ্ড)*। দ্বিতীয় সংস্করণ-ভাদ্র-১৩৬৭, পৃঃ ২৯৬।

৫৯. *শ্রী শ্রী পদ্মাপুরাণ বাইশ কবি মনসা* নামের চলতি বাজার সংস্করণের গ্রন্থ থেকে গৃহীত। প্রকাশক-শ্রী অমূল্য রতন শর্ম্মা, ৩০ নং ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন, কলিকাতা পৃঃ ৩৫৬।

৬০. শ্রী বিজন বিহারী ভট্টাচার্য সংকলিত ও সম্পাদিত *মনসামঙ্গল*, সাহিত্য আকাদেমী ১৯৬১, পৃঃ ১০-১১।

৬১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯-৭০।

৬২. শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন (রায় বাহাদুর বি, এ, ডি লিট)-সম্পাদিত, *মৈমনসিংহ গীতিকা* (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা), ১৯৭৩, পৃঃ ২২৫।

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৮।

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৫।

৬৫. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৬২, পৃঃ ২২৯।

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩০।

৬৭. শ্রী সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, কাব্যতীর্থ ও শ্রী আশুতোষ দাস কর্তৃক সম্পাদিত, *কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল,* ১৯৬০, পৃঃ ১।

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৫।

৭০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯১-২৯২।

৭১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৫।

৭২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৬।

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৭।

৭৪. শ্রী বিষ্ণুপদ পাণ্ডা সম্পাদিত, *দ্বারিকা দাসের মনসামঙ্গল,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম প্রকাশ ২৩শে জানুয়ারি, ১৯৮০, পৃঃ ৫৫।

৭৫. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ জানুয়ারি ১৯৯১, পৃঃ ১৬০।

৭৬. শ্রী বিষ্ণুপদ পাণ্ডা সম্পাদিত, *দ্বারিকা দাসের মনসামঙ্গল,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১ম প্রকাশ ২৩শে জানুয়ারি ১৯৮০, পৃঃ ৫৯।

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৩-১২৪।

৭৮. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮২, পৃঃ ৩।

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

৮০. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২য় খণ্ড) প্রথম প্রকাশ ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৭৩৪।

৮১. শ্রী সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *মঙ্গল চণ্ডীর গীত,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৫, পৃঃ ৪

৮২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

৮৫. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, সপ্তম সংস্করণ ডিসেম্বর-১৯৮১, পৃঃ ৪৯৬।

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯৭।

৮৭. 'আমাদের ধারণা দ্বিজরামদেব কোনো স্বতন্ত্র কবি নন। কবি যশলোভে দ্বিজমাধবের কাব্যের এখানে সেখানে সামান্য পরিবর্তন বা সংযোজন করে ভণিতায় স্বনাম বসিয়েছেন তিনি'। আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২য় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৭৪৩।

৮৮. আশুতোষ দাস (এম ডি ফিল) সম্পাদিত, *দ্বিজরামদেব অভয়ামঙ্গল*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭, পৃঃ ৩।

৮৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩২।

৯০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৬।

৯১. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২য় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৭৩৯।

৯২. সুকুমার সেন সম্পাদিত, *চণ্ডীমঙ্গল*, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৮২, পৃঃ ৫।

৯৩. শ্রী সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কবি কৃষ্ণরামদাসের গ্রন্থাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮, পৃঃ ৩

৯৪. শ্রী বিজন বিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *কবি কঙ্কণ চণ্ডী মঙ্গল* (ধনপতি উপাখ্যান) ১৯৬৬, পৃঃ ১১

৯৫. সুকুমার সেন সম্পাদিত চণ্ডীমঙ্গল, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ-১৩৮২, পৃঃ ১৭০।

৯৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।

৯৭. 'মুকুন্দরামের' কবি কঙ্কণ চণ্ডীতে স্ফূটোজ্জ্বল বাস্তব চিত্রে, দক্ষচরিত্রাঙ্কনে, কুশল ঘটনা সন্নিবেশে, ও সর্বোপরি আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপনে আমরা ভবিষ্যত কালের উপন্যাসের বেশ সুস্পষ্ট পূর্বাভাষ পাইয়া থাকি'। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* পঞ্চম পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ১৩৭২, পৃঃ ১১।

৯৮. শ্রী বিজন বিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *কবি কঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গল (ধনপতি উপাখ্যান)* ১৯৬৬, পৃঃ ৩।

৯৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪।

১০০. সুকুমার সেন সম্পাদিত, *চণ্ডীমঙ্গল*, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮২, পৃঃ ১০৮।

১০১. শ্রী জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ*, সান্যাল এণ্ড কোম্পানী, প্রথম প্রকাশ রাস পূর্ণিমা-১৩৭৮, পৃঃ ৯৫।

১০২. শ্রী বিজন বিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *কবি কঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গল (ধনপতি উপাখ্যান)* ১৯৬৬,পৃঃ ৩১০।

১০৩. সুকুমার সেন সম্পাদিত, *চণ্ডীমঙ্গল*, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৮২, পৃঃ ৮৫।

১০৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭০-১৭১।

১০৫. অনিল বরণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, *রামানন্দ যতি বিরচিত, চণ্ডীমঙ্গল*, ১৯৬৯, পৃঃ ৩১০।

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭১।

১০৭. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, সপ্তম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃঃ ৫৫৯-৫৬০।

১০৮. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২য় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৭৩৩।

১০৯. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), প্রথম আনন্দ সংস্করণঃ জানুয়ারি ১৯৯১, পৃঃ ৪৫৭-৪৫৮।

১১০. ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল* ২য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ ১৯৬৯, পৃঃ ২৯৬।

১১১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০১।

১১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৬।

১১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০০।

১১৪. 'কথিত আছে, বিদ্যাসুন্দর কাব্যখানি রচনা করিয়া ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট তাহা উপস্থিত করেন। কৃষ্ণচন্দ্র তখন কার্যান্তরে ব্যাপৃত ছিলেন, পুঁথিখানি কবির হাত হইতে লইয়া তাহা না দেখিয়াই পার্শ্বস্থ উপাধানের উপর হেলান দিয়া রাখিয়া তিনি নিজের কাজ করিতেছিলেন। ভারতচন্দ্র কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন, পুঁথিখানি এই ভাবে রাখিবেন না, ইহার রস গড়াইয়া পড়িবে'। শুনিয়া কৃষ্ণচন্দ্র পুঁথিখানি খুলিয়া দুই একটি পাতা পড়িলেন, পড়িয়া হাস্যমুখে কবিকে বলিলেন, 'বাস্তবিকই যে রস তুমি সৃষ্টি করিয়াছ, তাহা গড়াইয়া পড়িবারই মত'।

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৭৫ (বঙ্গাব্দ ১৩৮১), পৃঃ ৮১৪।

১১৫. "সুতরাং লেবেতেফের নাটক অভিনয় করার পূর্বে যদি এই সকল নটনটীর কোননা কোনো যাত্রার দলে অংশ গ্রহণ করার অভিজ্ঞতা না থাকত তাহ'লে এত অল্পকালের মধ্যে গান, সংলাপ প্রভৃতিতে নিজেদের উপযুক্তরূপে প্রস্তুত করে তুলতে পারত না। পূর্ব হইতেই ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের বহুল প্রচারিত গানগুলি তাদের ভাল করে জানা ছিল এবং মহলার সময় সংক্ষেপের জন্যই যে লেবেতেফ ঐ গানগুলিকে উক্ত নাটকে সন্নিবেশিত করেছিলেন একথা যুক্তিসংগত।"

১৭৯৫-এর ৫ই নভেম্বর Calcutta Gazette-এ প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে আমরা দেখতে পাই The words of the much admired, poet Shree Bharat Chandra Roy are set to music'.

অহীন্দ্র চৌধুরী, *বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র*, মাঘী পূর্ণিমা, ১৩৬৫ সাল, পৃঃ ৩৩।

১১৬. 'ভারতচন্দ্রের সময়ে শিশুরাম অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রার খুবই খ্যাতি হয়। জানা যায় শিশুরাম যাত্রাভিনয়ের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করার জন্য অনুষ্ঠান পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। পরে কোলকাতার নববাবুদের মধ্যে যাত্রার বাহুল্য বেড়েছিল। তার মূলে ছিল বিদ্যাসুন্দরের আখ্যায়িকা। বলা চলে, বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী বাঙলার যাত্রায় উজ্জীবনের প্রেরণা এনে দিল। অজস্র দল গড়ে উঠলো। এই একটিমাত্র কাহিনীকে আশ্রয় করে।'

মুরারি ঘোষ, *প্রাক-আধুনিক বঙ্গসংস্কৃতি*, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৮৩, এ মুখার্জী এণ্ড কোং, পৃঃ ৪৯।

১১৭. শ্রী মদন মোহন গোস্বামী সম্পাদিত, *ভারতচন্দ্র*, সাহিত্য আকাদেমী ১৯৬১, পৃঃ ১০১।

১১৮. বিজিত কুমার দত্ত, *প্রাচীন বাঙ্গালা-মৈথিলী নাটক*, প্রথম প্রকাশ ১৪ই জুলাই ১৯৮০, পৃঃ ৩।

১১৯. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২য় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৭৬৩।

১২০. শ্রী সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮, পৃঃ ২।

১২১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।

১২২. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৭৫ (বঙ্গাব্দ ১৩৮১) পৃঃ ২১২।

১২৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৬।

১২৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৮।

১২৫. শ্রী যোগীপাল হালদার সম্পাদিত, *রামেশ্বরের শিব সঙ্কীর্তন বা শিবায়ণ*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৭, পৃঃ ১৪।

১২৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫–৯৭।

১২৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৭।

১২৮. শ্রী কামিনী কুমার রায়, *বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার*, প্রথম প্রকাশ কার্তিক- ১৩৮৭, নভেম্বর ১৯৮০, পৃঃ ৩৯-৪৮।

১২৯. শ্রী সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৫৮, পৃঃ ১৬৭।

১৩০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৮।

১৩১. মৎ প্রণীত *'কেরামতমঙ্গল'* নাটকটির কথাও এখানে উল্লেখ করা যায়। উক্ত নাটকের গঠন ও পরিকল্পনায় মঙ্গলকাব্যের অনুপ্রেরণা আদ্যোপান্ত সক্রিয় ছিল। মঙ্গলকাব্যের আরাধ্য দেবতার মত এ নাট্যের প্রধান পুরুষ আদম সুরত অর্থাৎ কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জ। 'কেরামতমঙ্গল' রচনাকাল ১৯৮৩-'৮৪, নির্দেশনা নাসির উদ্দিন ইউসুফ, প্রযোজনা ঢাকা থিয়েটার-১৯৮৫।

সপ্তম অধ্যায়

[প্রণয়মূলক পাঁচালি ও নাটগীত—শাহ মুহম্মদ সগীর—'ইউসুফ জোলেখা', দ্বিজশ্রীধর ও সাবিরিদ খানের 'বিদ্যাসুন্দর', দৌলত উজির বাহরামের 'লাইলী মজনু', মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী', কাজী দৌলত—'সতীময়না ও লোর চন্দ্রাণী', মাগনঠাকুরের 'চন্দ্রাবতী', আলাউল—'পদ্মাবতী', 'হপ্তপয়কর', দোনাগাজী—'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল', আব্দুল হাকিম—'ইউসুফ-জোলেখা', 'লালমোতি সয়ফুলমুলুক'—এসকল কাব্যের পরিবেশনারীতি ও কাব্যে উল্লিখিত নাট্যপ্রসঙ্গ।]

কৃত্য ও ধর্মীয় আখ্যানমূলক পাঁচালি ধারায় পঞ্চদশ শতকে বাঙলায় প্রণয়মূলক পাঁচালির উদ্ভব ঘটে। কৃত্যপাঁচালি-গায়েনের নৃত্যগীতাভিনয়ের অংশই প্রণয়কাব্যের পরিবেশনায় গৃহীত হয়। পাঁচালির আঙ্গিকগত লক্ষণ যে সকল উপাদান যেমন, বন্দনা, ধুয়া, পয়ার, নাচাড়ি এ শ্রেণীর কাব্যে তা দেখা যায়। এছাড়া, কৃত্যপাঁচালির মত পদশীর্ষে রাগরাগিণীর নির্দেশ প্রণয়মূলক পাঁচালিতেও অনুসৃত হয়েছে। উপরন্তু মঙ্গলকাব্য বা অন্যবিধ কাব্যের আঙ্গিকের সঙ্গেও এর মিল বিদ্যমান। কৃত্যমূলক পাঁচালির কাহিনী বিন্যাসের সঙ্গে প্রণয়মূলক পাঁচালির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য আলাউলের 'পদ্মাবতী', 'হপ্তপয়কর' ও দোনাগাজীর 'সয়ফুলমুলুকের মত কোন কোন কাব্যে, 'কথাসরিৎসাগর' বা ইরানীয় গল্প-কথন রীতির প্রভাবও দেখা যায়।

তবে আদর্শগত বিচারে প্রণয়মূলক পাঁচালির সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের তুলনা চলেনা। মঙ্গলকাব্যের লক্ষ্য—ক্রুদ্ধ, পুজামনস্ক দেবতার অনুগ্রহ লাভ, প্রণয়মূলক পাঁচালির উদ্দিষ্ট, নিরালম্ব শিল্পরস পিপাসু দর্শক। মঙ্গলকাব্যের নায়ক-নায়িকা স্বর্গচ্যুত হয় ইচ্ছামতি দেবতার লীলায়, প্রণয় পাঁচালির নায়ক-নায়িকা দুর্মর প্রেম-কামের স্বপ্নে আত্মবিস্মৃত।

মঙ্গলকাব্য বা উপাখ্যানের ধারা—এর উপাদান এবং উপস্থাপনা ও পরিবেশনা কৌশল বাঙলা কাব্যরীতিরই বিবর্তনের ফল। প্রণয়পাঁচালির লেখকরা সেই

আঙ্গিকের ধারার সার্থক উত্তরাধিকার। ধর্মতান্ত্রিক দৈবচেতনার পরিবর্তে তাঁরা এক নবতর কাহিনীর আস্বাদ সংযুক্ত করলেন বাঙলা কাব্যধারায়। দৈব নির্ভর ভক্ত-পূজক মানবের স্থলে এল স্বপ্নমূর্চ্ছনায় তরঙ্গিত প্রেমের অভিসারী মানব। কল্পজগতের নারীর আহবান তাকে প্রাসাদের ঐশ্বর্য ও সুখ-স্বস্তি থেকে টেনে নেয় সমুদ্র সঙ্কুলতায়, গহীন অরণ্যে, রাক্ষস-প্রেত-পিশাচের ভৌতিক জগতে, মায়াবী পরীর স্বপ্ন-পুরীতে।

বাঙলা প্রণয়মূলক-পাঁচালিতে বন্দনা আছে, রসুল-আসহাব-পীর প্রশস্তি আছে, এমনকি প্রেম ব্যাকুলতাকে স্থানে স্থানে সুফীতত্ত্বে রঞ্জিত করার প্রয়াসও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তা নিমিত্ত মাত্র। এ সকল কাব্য-কাহিনীতে, পুরুষের শৌর্য ও রুচি, নারীর সৌন্দর্য এবং প্রেমার্ত-প্রাণের মিলনে প্রতিবন্ধকতা এক আশ্চর্য শিল্পরূপে অভিষিক্ত হয়েছে। বাঙলা আখ্যান কাব্যের ধারায় লাউসেনের বীরত্ব, হরিশ্চন্দ্রের ধর্মসাধনা, নাথ-সিদ্ধাদের আত্ম-কৃচ্ছ্রতা, কালকেতুর ভোজন ও শিকার, ফুল্লরার বারমাস্যা, রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলার পাশাপাশি স্থান করে নিল জোলেখার কাম ও প্রেম, সয়ফুলের সমুদ্রযাত্রা, যুদ্ধ ও বীরত্ব, গহীন অরণ্যে মজনুর আর্তনাদ, লোরের প্রণয়াভিসার, বিবাহিত চন্দ্রাণীর অবৈধ প্রণয়। বাঙলা কাব্যে পিশাচ-দৈত্য-ভূত-এবং গন্ধর্ব-কিন্নরীদের পাশে সহজেই ঠাঁই করে নিল রাক্ষস-খোক্কস, জ্বীন, মায়াবী-নারী, অতিলৌকিক সী-মুর্গ, কোহকাফের পরীরা।

প্রণয়মূলক আখ্যানের ধারা পাঁচালির চিরায়ত আঙ্গিক ও রীতিকে অবলম্বন করেই অভিজাতদের আসরে উঠে এল। ফলে এর ভাষা-রুচি ও প্রয়োগকৌশলে বৈচিত্র্য সাধিত হল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতচন্দ্র পূর্বকালে নারীর সৌন্দর্য বর্ণনার ধ্রুপদীরীতি একমাত্র প্রণয়পাঁচালিতেই লভ্য। সেই সঙ্গে উচ্চ ও অভিজাতদের শিল্পস্পৃহা, সামজিক ও পারিবারিক চিত্রের দুর্লভ সঙ্কেতও এধরনের কাব্যে রয়েছে। উপরন্তু প্রণয়াখ্যানের ক্ষেত্রে গায়েন-দোহার কেন্দ্রিক পাঁচালি পরিবেশনারীতি অনুসৃত হলেও, কৃত্যপাঁচালির মাঙ্গলিক উপাদানগুলো আসরে বা মঞ্চে ব্যবহৃত হবার প্রয়োজন ফুরালো।

প্রণয়পাঁচালির আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এধরনের কাব্যেই প্রথম কাব্যভাষা সচেতনতার উন্মেষ ঘটে। দৌলত কাজী, বাহরাম খান, আলাউল ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবি, বাঙলা কাব্যভাষাকে এক অভূতপূর্ব উচ্চতা দান করেন। চিরাচরিত পাঁচালিকাব্যের শিথিল ছন্দ ও শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এল বৈচিত্র্য। পাঁচালি

হয়ে উঠল বিদগ্ধ শ্রোতা-দর্শক ও নাগরিক রুচির প্রতীক। প্রচলিত পাঁচালি-পরিবেশনা প্রণয়পাঁচালির ধারায় স্থান করে নিল সমাজের উচ্চকোটিতে।

এ শ্রেণীর পাঁচালির সঙ্গে কৃত্যপাঁচালির আরও একটি পার্থক্য আছে। তা হলো এই যে, সমগ্র মধ্যযুগে প্রায় সর্বত্র পাঁচালিকার ও গায়েন অভিন্ন। অর্থাৎ যিনি কাহিনী উপস্থাপন করবেন তিনিই মূলত সে-পাঁচালির প্রথম গায়েন। ভারতচন্দ্রে এসে আমরা দেখতে পাই কবি ও গায়েন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। প্রণয়মূলক উপাখ্যানসমূহের রচয়িতা ও পরিবশেনকারী কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন। এর কারণ, পাঁচালি তখন শুধুমাত্র মৌখিকরীতি নির্ভর নয়—স্বয়ং কবি পূর্বে কাব্যটি রচনা করছেন, তারপর তা পরিবেশিত হচ্ছে। আবার এসকল কাব্য পাঁচালি হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো কবি একে বলেছেন 'পোথা' 'পুস্তক' 'কাব্য' 'কবিতা'। সুতরাং তা কেবল সেকালে পাঁচালি হিসাবে নয়, পাঠ্য রূপেও গ্রাহ্য হয়েছিল।

বাঙলা প্রণয়মূলক-পাঁচালির বিষয় ও ভাবসম্পদ ইরান-ইরাক-আরব-তুরস্ক ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত কাব্য বা কাহিনী থেকে গৃহীত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এ শ্রেণীর কাব্যে বর্ণিত চরিত্র, কিংবা ভৌগোলিক পরিমণ্ডল পূর্ণত বাঙলার। আজকের দিনে যে-অর্থে আমরা অনুবাদ কথাটা বলি এসকল কাব্য তা নয়। অধিকাংশক্ষেত্রে দেখা যায়, এ শ্রেণীর কাব্য রচয়িতাগণ তাঁদের দেশকাল এবং নিজস্ব কবি প্রতিভার সংযোগেই বিদেশী কাহিনীকে পাঁচালির আঙ্গিকে রূপান্তরিত করেছেন। ধারণা করা যায়, এই রূপান্তরের একটি অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল। প্রণয়মূলক কাব্য আসরের সামগ্রী, অর্থাৎ তা সঙ্গীত-নৃত্য ও অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশন করা হতো, কাজেই এধারার কবিদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল আসর ও দর্শক। সে-কারণে তাঁরা, পাঁচালির আঙ্গিকে বিদেশী কাব্য বা কাহিনীর অন্তর্গত চরিত্র ও ঘটনাকে দেশজ পটভূমিতে সংস্থাপন করেন।

প্রণয়মূলক পাঁচালির ধারায়, প্রথম কাব্য শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জোলেখা'। এ কাব্য, 'সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রীঃ) রাজত্বকালে রচিত হয়'।[১] কারো কারো মতে 'ইউসুফ-জোলেখা' আব্দুর রহমান জামীর (১৪৮৩ খ্রীঃ)[২] কাব্যের অনুবাদ। তবে তুলনামূলক বিচারে প্রমাণিত হয়েছে যে, কবি সগীর মূলত কোরান শরীফে বর্ণিত ও লোকমুখে প্রচলিত ইউসুফ-জোলেখার কাহিনী অবলম্বনপূর্বক তাঁর কাব্য রচনা করেন।

এ কাব্যের 'পুস্তক রচনার কথা' পদে আছে—

ঃ পুরাণ কোরান মধ্যে দেখিলুঁ বিশেষ।
ইছুফ জলিখা বাণী অমৃত অশেষ।।
কহিমু কিতাব চাহি সুধারস পুরি।
শুনহ ভকত জন শ্রুতি-ঘট ভরি।।[৩]

এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, আসরে পরিবেশনের জন্যই 'মোহাম্মদ ছগির' তাঁর কাব্য রচনা করেছেন।

ইউসুফ-জোলেখার 'বিবাহ ও বাসর' অধ্যায়ে কবি তাঁর কাব্যকে 'পদ' ও 'পয়ার' রূপে উল্লেখ করেছেন—

ঃ কহে শাহা মোহাম্মদ ইছুফ জলিখা পদ।
দেশীভাষে পয়ার রচিত।।[৪]

'দেশীভাষে পয়ার' রচনা পাঁচালির ইঙ্গিত দেয়। কাব্যের অন্তে, 'ইবনে আমীনের সস্ত্রীক মিশর গমন' শীর্ষক পদে আছে—

ঃ পোথার বৃত্তান্ত জেবা চিত্ত দিয়া শুনে।
আদি অন্ত শুনিলে সে ভাব হয় মনে।।
ইছুফ জলিখা কিচ্ছা কিতাব প্রমাণ।
দেশী ভাষে মোহাম্মদ সগীরিএ ভণে।।
একচিত্তে শুনে জে এ সব পরস্তাব।
পুণ্য বাড়ে দুক্ষ হরে জশ কীর্তি লাভ।।[৫]

কবি তাঁর এই প্রেমকাব্যকে বলেছেন 'পোথা'। পাঁচালিকাব্যে বহুস্থলে ব্যবহৃত 'প্রবন্ধে'র পরিবর্তে সম্ভবত এখানে 'পরস্তাব' বা 'প্রস্তাব' কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। উপরন্তু এ কাব্যের শুরুতে 'আল্লা ও রসুল বন্দনা মাতাপিতা ও গুরুজন বন্দনা' এবং শেষে, কাব্যপাঠের ফলশ্রুতি বর্ণনা খানিকটা হলেও পাঁচালিকাব্যের পূর্ববর্তী ধারা অর্থাৎ কৃত্যপাঁচালি রীতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

ইউসুফ-জোলেখা কাব্যে, পঞ্চদশ শতকে উচ্চকোটি সমাজে প্রচলিত নানা ধরনের নৃত্য ও নাট্যপ্রসঙ্গ দেখা যায়। 'জোলেখার জন্ম বৃত্তান্তে' আছে—

ঃ কেহ নৃত্য করে কেহ বাহে কপিনাস।
পুলকে পুরল তনু অধিক উল্লাস।।

'আজিজ মিছিরের উদ্দেশ্যে জলিখার যাত্রা' প্রসঙ্গে 'নানা বাদ্য ভান্ডে'র সাথে 'নৃত্যগীত'-এর কথা উল্লিখিত হয়েছে। 'জোলেখা আজিজের বিবাহোত্তর বিড়ম্বনায়' নৃত্য-গীতের সুবিস্তৃত বিবরণ লভ্য—

ঃ মৃদঙ্গ তবল বাজে দুন্দুভি নিশান।
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে বিবিধ বিধান।।
নৃত্যগীত আনন্দে নাচএ নৃত্যক রে।
এ ঝাম ঝাঝরি ধ্বনি বাজে ঝনকারে।।
জেন বিদ্যাধরী নৃত্য সুচরিত কলা।
নাচএ গাবএ ছন্দ পদবন্ধ মেলা।।[৬]

এস্থলে মধ্যযুগের নাট্যে প্রচলিত 'বিদ্যাধরী-নৃত্যে'র উল্লেখ পাওয়া যায়। 'গুপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' গ্রন্থে এবিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ লভ্য।

নৃত্যগীত, ছন্দ ও পদবন্ধেই মধ্যেযুগের 'নাট' পরিবেশিত হতো। অনুরূপ নৃত্যনাটের বর্ণনা আছে, 'জোলেখার যৌবন প্রাপ্তি ও বিবাহ' অধ্যায়ে—

ঃ জয়তুর সর্মগুলা জন্ততন্ত্র পুর।
নৃত্যগীতে নৃত্যক নাচএ যেহ্ন সুর।।
ঝনঝনি ঝাঁঝরি ঝুমুরি ঝনকার।
বাঁশী কাঁসী চৌরাশী বাজল অনিবার।।
সানাই বর্গোল বাজে ভেউর কর্ণাল।
করতাল মন্দিরা বাজএ সুমঙ্গল।।
বিপঞ্চী পিণাক বাজে অতি মৃদুস্বর।
কপিনাস রুদ্র বাজএ নিরন্তর।।

বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের তালিকার সঙ্গে আছে, উচ্চাঙ্গ-নাটের বর্ণনা—

ঃ বিদ্যাধরী কুমারী নাচএ নানা ছন্দে।
সুর সিন্ধু শৃঙ্গার মদন রস বন্দে।।[৭]

অর্থাৎ সিন্ধুরাগে পরিবেশিত এই 'শৃঙ্গার-নৃত্যে' প্রেমকথা বন্দিত হচ্ছে।

'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যে 'জোলেখার যৌবন নিবেদন ও ব্যর্থতা' অধ্যায়ে চারটি, 'কারাগারে ইউসুফঃ শিশুর সাক্ষ্য' অধ্যায়ে ছয়টি, পদশীর্ষে 'দৃশ্য' কথাটা

উল্লিখিত হতে দেখা যায়। পাঁচালি কাব্যে এধরনের উল্লেখ ইতোপূর্বে আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না।

পদগুলির শিরোনাম নিম্নরূপ, প্রথম দৃশ্য—জোলেখার যৌবন নিবেদন ও ব্যর্থতা, দ্বিতীয় দৃশ্য—জোলেখার গান, তৃতীয় দৃশ্য—কামান্ধ জোলেখা, চতুর্থ দৃশ্য—মিথ্যা অপবাদে ইউসুফের শাস্তি।

এরপর প্রথম দৃশ্য—কারাগারে ইউসুফের সাক্ষ্য, দ্বিতীয় দৃশ্য—জোলেখার কলঙ্ক মুক্তি প্রয়াস, তৃতীয় দৃশ্য—বিলাস-কারায় ইউসুফ, চতুর্থ দৃশ্য—জোলেখার অনুশোচনা, পঞ্চম দৃশ্য—ইউসুফ সন্দর্শনে জোলেখা এবং ষষ্ঠ দৃশ্য—স্বপ্ন ব্যাখ্যাতা ইউসুফের কারামুক্তি।

দু'অধ্যায়ে দৃশ্য সংখ্যা দশ।

এই 'দৃশ্যে'র পূর্বসূত্র হলো এই যে, বিবাহিত জোলেখা ইউসুফের সঙ্গে অবৈধ সম্ভোগে মিলিত হতে চায়। কিন্তু ধর্মপ্রাণ ইউসুফ কিছুতেই এই পাপকর্মে সম্মতিজ্ঞাপন করেন না। জোলেখা তখন এক বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করল। নির্মিত হলো এক 'কামোদ্দীপক' টঙ্গী, টঙ্গীর অভ্যন্তরে বিচিত্র ফল, ফুল, তরুলতা ও পশুপাখির চিত্রের সঙ্গে রয়েছে, নারী-পুরুষের বিভিন্ন সঙ্গমাসন—

ঃ চিত্রেতে লেখিত জথ অঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ।
শৃঙ্গার করএ সুখে রতি রস রঙ্গ।।
কামভাব বলে তাক করে আলিঙ্গন।
খেনে খেনে ক্রিয়াছলে চুম্বয়ে বদন।
কোহ্ন চিত্র মুরতি অধর রস পান।
করে করে গলে গলে সুদিঢ় সন্ধান।।
কোহ্ন চিত্র মুরতি শৃঙ্গার রসপুর।
রতি রসে কামাতুর দুহোঁ প্রেমে ভোর।।
জলিখাক কোলে বসাইল ধরি বলে।
বিবিধ বন্ধনে কেলি করে নানা ছলে।।
কোহ্নচিত্রে অঞ্চলে ধরএ কাম রঙ্গে।
খেনে ধাএ খেনে চাহে খেনে বসে সঙ্গে।।
কাহাক খাওয়াএ কেহো কর্পূর তাম্বুল।
কাকে কেহো পৈরায়ন্ত নানাবর্ণ ফুল।।

জে সকল সখী আছে জলিখার সাথী।
ইছুফের পরিচর্যা করে নানা ভাতি।।
কনক কটোরা ভরি মধু মিষ্ট সুখে।
জলিখা তুলিয়া দেন্ত ইছুফের মুখে।।
হেনহি মুরতি সব বিচিত্র আকার।
চালে বেড়ে লেখিয়াছে বিবিধ সুসার।।
রতি রস আলস্য নিদ্রাএ মতি ভোর।
গলে গলে বুকে বুকে বন্দে জোড়।।
কেহো মুখ বিমুখ ভাবন্তি মন দুখী।
কেহো কেহো হাসে কেহো অবনত মুখী।।
বাহু ছাট করে মনুরঙ্গ আশা।
খেনে পৃষ্ঠে খেনে দৃষ্টে খেনে রঙ্গ হাসা।।
হেনহি বিচিত্র সব চিত্রেত লেখিত।
কিবা খাট পালাঙ্গি বিচিত্র চমকিত।।

এই বিচিত্র চিত্র-দর্শনের নিমিত্তে জোলেখা ইউসুফকে নিয়ে এল সপ্তখণ্ড টঙ্গীতে। তার পরেই দৃশ্যারম্ভ, প্রথম দৃশ্যে কবির বর্ণনা এবং জোলেখার উক্তি, দ্বিতীয় দৃশ্য সম্পূর্ণরূপেই জোলেখার উক্তি, এ দৃশ্য নাচাড়ি ছন্দে লেখা অর্থাৎ তা নৃত্যসহযোগে পরিবেশনযোগ্য। এর অন্তত দুটি পাঠান্তর সম্পাদিত পুথিতে আছে, একটি চৌপদী অন্যটি ত্রিপদী। চতুর্থ দৃশ্যে আছে বর্ণনা ও উক্তির মিশ্রণ। পরের তিনটি দৃশ্যে উক্তি ও বর্ণনার মিশ্র-উপস্থিতি দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ দৃশ্যের প্রথম পংক্তি কবির বর্ণনা, অতঃপর নাচাড়িতে রচিত সম্পূর্ণ পদই জুলেখার উক্তি, পঞ্চম দৃশ্যও নাচাড়ি, তবে এতে জুলেখার উক্তির চেয়ে বর্ণনাংশই বেশি। ষষ্ঠ দৃশ্য পয়ার ছন্দে—কবির বর্ণনা।

দৃশ্যসমূহের মধ্যে উক্তির ততটা প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় না বলে, সমগ্র পাঁচালি থেকে আলাদাভাবে দৃশ্য-নামাঙ্কিত এই দশটি অধ্যায় চরিত্রাভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত হতো—এরূপ সম্ভবনা নাকচ করা যায়।

এক্ষেত্রে দেখা যায়, কামটুঙ্গীকে কেন্দ্র করেই জোলেখার প্রেমাবেগ ধাবিত হয়েছে। যৌনচিত্র সংবলিত সপ্তখণ্ড কামগৃহে জোলেখা-ইউসুফকে নিয়ে যায় বিশেষ উদ্দেশ্যে, রমণের রভস জাগ্রত করার জন্য। মধ্যযুগে উচ্চকোটি সমাজে, যৌন-

সম্ভোগের নানা আসন সংবলিত পটচিত্রের প্রচলন ছিল (দোনাগাজীর 'সয়ফুলমুলুক' কাব্যে সয়ফুলের চিত্রদর্শন ও চিত্রের সঙ্গে রক্তমাংসের নারীর মতো ব্যবহার, 'সতীময়না লোর চন্দ্রানীতে' চন্দ্রানীর পট)। 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যের এই অংশটুকুর সঙ্গে ব্যর্থকাম জোলেখার প্রতিশোধগ্রহণ, ইউসুফের কারাবাস ও কারা থেকে মুক্তির মূলে আছে সপ্তখণ্ড টুঙ্গীতে সংঘটিত ঘটনা। কবি 'টঙ্গী নির্মাণ' শীর্ষক পদে বলেছেন—

> টঙ্গী দেখি জলিখা বহুল মনে হাস।
> ইছুফ জলিখা মূর্তি লিখিত প্রকাশ।।[৮]

এর পাঠান্তরে 'লিখিত' স্থলে আছে 'উৎঝল' অর্থাৎ 'উজ্জ্বল'। যদি 'লিখিত প্রকাশে'র স্থানে 'উজ্জ্বল প্রকাশ' আসে, তবে এর অর্থ, ইউসুফ ও জোলেখার মূর্তি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছিল দেয়ালে। তবে 'লেখা' কথাটা 'চিত্রে'র সঙ্গেও ব্যবহৃত হবার দৃষ্টান্ত আছে, যথা—'চিত্রলেখা'।

এই দশটি দৃশ্য নিঃসন্দেহে 'পটনাট' বা পটচিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত হতো—এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়। এর প্রমাণ, দশটি পদের শীর্ষে 'দৃশ্য' কথাটার ব্যবহার। এ যদি শুধু জোলেখা-ইউসুফের সপ্তখণ্ড কাম-টঙ্গী দর্শনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো, তবে সাধারণভাবে ধরে নেওয়া যেত, পদশীর্ষে 'দৃশ্য' দেয়াল-চিত্র নির্দেশক, কবি বা গায়েন চিত্র সংবলিত পদগুলিকে আলাদাভাবে 'দৃশ্য' নামেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 'মিথ্যা অপবাদে ইউসুফের শাস্তি', 'কারাগারে ইউসুফঃ শিশুর সাক্ষ্য' প্রভৃতি পদশীর্ষেও 'দৃশ্যে'র উল্লেখ আছে। কাজেই এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, এই অংশগুলো সে-কালে প্রচলিত 'পটনাট' বা চিত্রনাটের আকারে পরিবেশিত হতো।

কিন্তু একটি পাঁচলিকাব্যের নিয়ম মাফিক পরিবেশনা স্থলে হঠাৎ করে চিত্রনাটের ব্যবহার অস্বাভাবিক। পঞ্চদশ শতকে কিংবা তৎপূর্বকালে পাঁচালির ক্ষেত্রে এ ধরনের মিশ্র উপস্থাপনার কোনো দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে নেই। কাজেই এই 'দৃশ্য' সঙ্কেত সংযোজন পরবর্তীকালে লিপিকরের বলেই মনে হয়। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, পটনাট বা চিত্রনাট, সমগ্র কাহিনীর একটি বিশেষ অংশকে অবলম্বন করেই রচিত হয়। কোন কাহিনীর বিশেষ বিশেষ চরিত্র ও ঘটনা অবলম্বনপূর্বক রচিত পটচিত্রই গায়েন-দোহার চিত্রনাটরূপে উপস্থাপন করে থাকে। 'ইউসুফ-জোলেখা'র সমগ্র কাহিনীর মধ্যে কামাবেগের সঙ্গে সাধুতার সংঘর্ষ

অধিকতর চিত্তগ্রাহী। কাজেই জননন্দিত এ অংশটুকু আলাদাভাবে সেকালে চিত্রনাট রূপে পরিবেশিত হতো এরূপ অনুমানই সঙ্গত। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, দশটি দৃশ্য সঙ্কেতযুক্ত পদের অন্তে কোথাও শাহ্ মুহম্মদ সগীরের ভণিতা দৃষ্ট হয় না।

এক্ষেত্রে যদি এরূপ প্রমাণিত হয় যে, 'দৃশ্য' কথাটি পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ নয়, তাহলেও বলা যায়, 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যরূপ পরিগ্রহ করার পূর্বে, স্বতন্ত্রভাবে 'কামটঙ্গী' অংশের 'চিত্রনাট' প্রচলিত ছিল।

যদি এরূপ বিবেচনা করা যায়—এই দৃশ্য মূলে স্বয়ং কবির রচনা, তাতেও একথা প্রমাণিত হয় না যে, কাব্য মধ্যে পরিবেশনের লক্ষ্যে তিনি চিত্রনাট নির্দেশক দৃশ্যের সন্নিবেশ ঘটিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে এরূপ অনুমানই সঙ্গত যে, সমগ্র কাব্য পাঁচালি রূপে পরিবেশনকালে দৃশ্যাঙ্কিত পদসমূহ পাঁচালিরীতিতে এবং অন্যত্র শুধুমাত্র তা পটচিত্রনাটের মাধ্যমে আলাদাভাবে পরিবেশিত হত।

ষোড়শ শতকে, মধ্যযুগের বাঙলা নাট্যরীতির ধারায় দ্বিজশ্রীধর কবিরাজ (১৫২০-৩২ খ্রীষ্টাব্দ) ও সাবিরিদ খান (১৫১৭-৮৫ খ্রীষ্টাব্দ)[৯] রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

শ্রীধর ও সাবিরিদ খানের 'বিদ্যাসুন্দুর' পাঁচালি ধারার কাব্যের অন্তর্গত এবং তা প্রণয়মূলক আখ্যান। কিন্তু আঙ্গিকগত বিচারে দু'জনের কাব্য আসলে 'নাটগীত'। দু'কবির রচনার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দৃষ্টে পণ্ডিতগণের অনুমান এই যে, অপরিজ্ঞাত কোনো সংস্কৃত নাটক অবলম্বনেই তাঁরা উভয়ে 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করেন।[১০]

শ্রীধরের 'বিদ্যাসুন্দর', সম্পাদক কর্তৃক 'গীতিনাট্য' রূপে উল্লিখিত হয়েছে। কবি তাঁর কাব্যের আঙ্গিক ও পরিবেশন রীতির ইঙ্গিত দিয়েছেন এভাবে—

ঃ এহার সকল তত্ত্ব কহি অনুবন্ধে।
গীত রূপে গাহিমু রচিয়া পদবন্ধে।।
সাবধান নরলোকে পায় যেন মতে।
দেশীভাষে পদবন্ধে গাহিব পরাকৃতে।।
রাজার আদেশ শিরে রাখিআ যতনে।
ছিরিধর কবিরাজ দ্বিজবরে ভণে।।

কবির এই উক্তির সঙ্গে, বাঙলা পাঁচালি ধারার কবিদের ভণিতার মিল আছে। গীতরূপে পদবন্ধ পরিবেশন পাঁচালিতেও দেখা যায়। 'দেশীভাষে পদবন্ধে' ও 'প্রাকৃতে' গাহনের অনুরূপ সংকল্প আমরা মালাধরবসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ও অন্যান্য পাঁচালিতেও দেখেছি। কিন্তু তাসত্ত্বেও, এ পাঁচালি নয়, নাটগীত শ্রেণীর রচনা। কারণ, উদ্ধৃত অংশের পরেই সংস্কৃত ভাষায় আছে রাজকুমার সুন্দরের দেশের বিবরণ। তা গীতযোগ্য নয়, আবৃত্তিমূলক—

ঃ অস্তি উত্তর দেশে রত্নাবতী নাম দিব্যাপুরী।
তত্র রাজা সর্বগুণ বিভূষিতো গুণসারো নানা শাস্ত্র সুনিপুনো
ধর্মপরায়ণস্তস্য কলাবতী নাম্নী ভার্যা সর্বগুণশালিনী।

তস্যাঃগর্ভে সুতো জাতঃকালিকায়াঃপ্রসাদাৎ। সাক্ষাৎকামঃ সর্ব শাস্ত্রবিশারদ।

এ গায়েন-সূত্রধারের উক্তি, তারপর পয়ার ছন্দে বিস্তৃত আকারে সংস্কৃতেধৃত উক্ত কথাগুলি পুনরায় বিবৃত হয়েছে—

ঃ অতি উত্তর দেশ বিজয়া নগরী।
রত্নাবতী নামে জান অতি দিব্য পুরী।।
তাহাতে নৃপতি হৈল রাজা গুণসার।
সকল ভূপতি জিনি রাজা ব্যবহার।।

....

মহাদেবী আছে তান নামে কলাবতী।
ব্রতধর্ম পরায়ণ মহাদেবী সতী।।

....

ভাবিআ দুঃখ রাজা কালিকার।।
ভার্যা সমে সেবন্ত চরণে গুণসার।

এরপর রাজা পুত্রলাভ নিমিত্তে যজ্ঞের আয়োজন করলেন। তখন কালিকাদেবীর আবির্ভাব ঘটল—

ঃ বিদিতা কালিকাদেবী কথয়তি (অধ্যায়)।

এখানে আসরে সম্ভবত স্বয়ং কালিকাদেবীর আবির্ভাব ঘটত অথবা গায়েন-সূত্রধার স্তবের মাধ্যমে কালিকাপূজা করতেন। এ ধরনের অনুমানের পক্ষে যুক্তি এই যে,

একই বিষয় নিয়ে নেপালে রচিত 'বিদ্যাবিলাপ' নাটকের ঠিক এ পর্যায়ে (কালিকার পরিবর্তে) 'চণ্ডিকা'র আবির্ভাব ঘটত।

শ্রীধরের 'বিদ্যাসুন্দরে' কালিকা-স্তব ও কালিকার আবির্ভাবের পর গায়েনের বর্ণনা বিদ্যমান—

ঃ প্রত্যক্ষ হইআ বোলে কালিকা গোসাঞি।
বর মাগ নরপতি মনের বাঞ্ছানি।।
লোমাঞ্চিত হই রাজা অষ্টাঙ্গে প্রণাম।
সংসারে ঘুচউক মোর অপুত্রক নাম।।[১১]

এরপর সুন্দরের শৈশব ও কৈশোর বর্ণনা, এও গায়েনেরই বর্ণনা। এ পদের ভণিতায় আছে—

ঃ মহাকবি রচিলেন্ত শ্লোক পঞ্চশত।।
কহিলাম সুন্দরের জন্ম কথা জথ।
ষোড়শ বরষ আসি হৈল উপগত।।
বিধির যোজনা দেখ যার যেই কাজ।
বিদ্যারে করিব বিভা এহি যুবরাজ।।
করজোড় করি বলি শুন সাধুজনে।
অশুদ্ধ হইলে পদ শুধিবা যতনে।।
কোন ঘটে না লইবা তাল-ভঙ্গ-দোষ।
সাবধানে শুনিলে হইবা পরিতোষ।।
নৃপতি নসির সাহা তনয় সুন্দর।
নাম ছিরি ফিরোজ সাহা রসিক শেখর।।
দ্বিজ ছিরিধর কবি রচিলেক শুনি।
পয়ার প্রবন্ধে রচে চৌরের কাহিনী।।[১২]

এখানেও 'পয়ার প্রবন্ধে চৌরের কাহিনী' রচনার কথা বলেছেন শ্রীধর। অর্থাৎ পাঁচালির চলতি রীতিকে খানিকটা স্বীকার করছেন কবি। কারণ পরের অংশটুকু বিদ্যার জন্মকথা। একটি পদেই বিদ্যার পিতৃপরিচয় থেকে, জন্ম ও 'অষ্টম বরিষে যৌবনের প্রকাশ' পর্যন্ত উল্লিখিত হলো। পরের পদে বিদ্যার 'পণ' প্রচার। দেশে দেশে ভাট প্রেরিত হলো, ভাট প্রেরণের পর প্রথমবারের মতো সুন্দরের প্রবেশ

ঘটেছে, অর্থাৎ কালিকামূর্তির আবির্ভাবের পর এই প্রথম নাটকের প্রধান চরিত্র সুন্দরের প্রবেশ—

ঃ অথ সুন্দর প্রবিশতি।

শুধু তাই নয়, সুন্দরের রূপসজ্জার বিবরণও দিয়েছেন কবি একই শ্লোকে—

ঃ 'চন্দিচর্চ্চিত দেহ সুবেশ গতি বিচিত্র'। 'বিচিত্র' গতি অর্থাৎ নৃত্যসহকারে আসরে প্রবেশ করছে সুন্দর।

কাঞ্চন কুণ্ডলধারী সুগতি স্বচ্ছন্দঃ বিলাসঃ। নৃত্যকলা বিশারদঃ অভিনব কামো যথা পর্যটনপরোভূমি পুরন্দরঃ। এই শ্লোকের পরে আছে—

ঃ প্রতাপে আনল সত্যে যুধিষ্ঠির শ্রীরাম।
রূপেত ধরণী তলে অভিনব কাম।।
বিক্রমে ভীমসেন আচার্য বিদ্যাএ।
ভূতলে অমৃত নিধি যেন দ্বিজরাএ।।
আইল রাজার সুত সানন্দে সুন্দর।
নানা শাস্ত্রে বিশারদ নৃপতি কুমার।। [১৩]

এ অংশটুকুর শীর্ষে অন্যান্য পদের মতই রাগ বা রাগিণীর ('ধানশ্রী') উল্লেখ আছে। এ সূত্রধারের না চরিত্রের উক্তি সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। প্রচলিত নিয়মে, উদ্ধৃত পদটি গায়েন-সূত্রধারের পক্ষেই খাটে। কিন্তু পরবর্তীকালে রচিত বাঙলা-মৈথিলী নাটক 'বিদ্যাবিলাপে' চরিত্রের আত্মপরিচয় এভাবেই লভ্য—

ঃ সুগন্ধমালিনী প্রবেশ।।
ন াট।।
দুয়ি একতালি

সুগন্ধি মালি জাতি কয়ল পবেশ
লোক নাগর জন মোহিয় সুবেশ।।
গঁথয়চ্ছি ভলে ভাতি কসুম সযানি।
মহিতলে কেও নহি ভূপতীন্দ্র বাণি।। [১৪]

কৃষ্ণদেবকৃত 'মহাভারতে' ধৃতরাষ্ট্রও ঠিক এ পন্থায় আত্মপরিচয় দিয়েছেন—

ঃ নরপতি ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারি সহিতে, ভীষ্ম উদারে।
পাণ্ডু বিদুর প্রবীণে, নয়বিদ সংজয় গুণক অধারে।।
শশিতুল মোর যশ, পুরল দিগন্ত ধবলিত ভেল।
সবে ত্রিভুবন রাজ্য প্রতাপতাপিতরিপু, চহ্‌দিশ গেল।।
কুন্তি-মাদ্রি-সংযুত, শকুনি সুবীর,
ভূপতীন্দ্র কহকি আনরাজে।।[৮]

এই উক্তির পরেই 'মহাভারতে'আছে 'ধৃতরাষ্ট্রাদি নিস্‌সার' (প্রস্থান)। কাজেই এ উক্তি ধৃতরাষ্ট্রের। আত্মপরিচয়ে 'মোর' কথাটা নিশ্চিতভাবেই চরিত্রোক্তি। কিন্তু শ্রীধরের 'বিদ্যাসুন্দরে' এ ধরনের শব্দ না থাকাতে নিশ্চিতভাবে তা সুন্দরের উক্তি কিনা বলা যায় না।

সুন্দরের পরিচয় বিবৃত হবার পরেই দেখা যায় তার বিবিধ বিদ্যায় পটুত্ব ও সুশোভন পোশাক দূর থেকে নিরীক্ষণ করছে বিদ্যার পিতা কর্তৃক প্রেরিত ভাট—

ঃ অথান্তরং মাধব ভাট নৃপতি তনয় সুন্দরং
বিবিধবিদ্যা বিনোদভূষং দৃষ্টা সুদর্শনং
সুন্দর স্থানে বিদ্যায়া রূপগুণ কথয়তি।

সূত্রধারের এই উক্তি থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হচ্ছে, আসরে প্রবেশপূর্বক আত্মপরিচয়দান ছাড়াও সুন্দর 'বিবিধবিদ্যা' প্রদর্শন করেছিল। ঠিক এরকমটি দেখা যায় বাঙলা-মৈথিলী নাটকে।

কাশীনাথকৃত 'বিদ্যাবিলাপে' (রাগরাগিণীভিত্তিক) দু'টি গানের মধ্যবর্তী অংশে কখনও সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতমাত্র, কখন বা শুধু 'পৈসার-নিসসারে'র উল্লেখ আছে। এই দুই গানের মধ্যবর্তী অংশে যে তাৎক্ষণিকভাবে সংলাপ ও নানাবিধ ক্রিয়া তৈরি করা হতো—সে বিষয়ে দশম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এখানেও দেখা যাচ্ছে, পরিচয়জ্ঞাপক গীতটির অব্যবহিত পরে সুন্দরের বিবিধবিদ্যা প্রদর্শন দেখেছে মাধবভাট, কাজেই এ অংশটুকু আসরে, নাট্যমধ্যে উল্লেখিত হওয়া ছাড়াই অভিনীত হতো—এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়।

এ অভিনয়ের বিষয় কি ছিল তাও অনুধাবন করা যায়। সুন্দরকে শ্রীরাম ও ভীমসেনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কাজেই মঞ্চে বীরত্বব্যঞ্জক অভিনয় করত

সুন্দর এরূপ ধারণা যৌক্তিক। বলাবাহুল্য—পুরোটাই নৃত্য-সহকারে, কারণ সূত্রধারের উক্তিতেই আছে সুন্দর 'নৃত্য-বিশারদ'।

ভাটের মুখে বিদ্যার রূপ বর্ণনা বিষয়ক পদে দুটি ভাগ আছে, এক ভাগ মাধব ভাটের অন্যভাগ সুন্দরের। পদটি একটানা, অর্থাৎ তার মধ্যে দু'চরিত্রের জন্য দুটি সংলাপের ভাগ নির্দেশিত হয় নি—

রাগ সিন্ধুরা

(মাধবঃ) শুনহ রাজসুত করি নিবেদন।
উজানী নগর রাজ-সুতার কথন।।
'বিদ্যা' নামে শশীমুখী অবোলা কমলা।
গুরুমুখে জানিলেক সর্বশাস্ত্রকলা।।
নানা শাস্ত্র পড়ি কৈলা প্রতিজ্ঞা হৃদএ।
যে তানে জিনিতে পারে করি পরিণএ।।
সেই সে তোমার যোগ্য মনে কৈলুম সার।
শাস্ত্রবাদে যদি তানে পার জিনিবার।
কথকৈমু বিদ্যারূপ শুন যুবরাজ।
তান সম রমণী নাহিক মহী মাঝ।।
(সুন্দরঃ) কহ কহ মাধব যে বচন স্বরূপ।
কি রূপ যৌবন বিদ্যা চিকুর কিরূপ।।
নয়ান তাহান ভুরুযুগ দৃষ্টিপাত।
বদন অধর কিরূপ দর্সন ললাট।।

এরপর রূপ বর্ণনা। প্রণয়মূলক পাঁচালিতে রূপ বর্ণনা অবশ্যম্ভাবী। পয়ার বন্ধে এখানেও উক্তি-প্রত্যুক্তির ধারায় তা রক্ষিত হয়েছে—

(মাধব ঃ) নবীন ঘনের পুঞ্জ যেন কেশভার।
ধরণী বিলোটাএ সে লম্বিত অপার।।
বিদ্যার বদন শশী যেন অববান্ধা।
খঞ্জন জিনিয়া দুই নয়নের ছন্দা।।

(সুন্দর ঃ) কহত মাধব ভাট স্বরূপ উহার।
শ্রুতিনাসা কুচযুগ কিরূপ আকার।।
কুচযুগ মধ্যদেশ কুহরের ছন্দ।
উরুযুগ নিতম্ব কেমন প্রবন্ধ।।[১৬]

উল্লেখ্য যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' কৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তরে বড়ায়ি রাধার রূপ বর্ণনা করে। সুন্দরের প্রশ্নের উত্তরে, পয়ার পদবন্ধে পুনরায় মাধব ভাটের উক্তি, এবার পূর্ণপদ 'কেদার' রাগে। অতঃপর আরেকটি সম্পূর্ণ পদে মাধবের প্রতি সুন্দরের উক্তি। পদের মধ্যভাগে কবির বর্ণনা—

ঃ এই মত বাক্য শুনি মাধব যে ভাট
বরিখনে যেহেন বৃষ্টি হৈল বাট।।

এরপর পুনরায় মাধবের উক্তি—

মাধব ঃ ... মর জিঅ এক কথা শুনহ গোঁসাই।।
সপ্ত জন্মে যদি সে তোমার থাকে ভাগ।
তবে সে পাইবে গিআ বিদ্যার লাগ।।[১৭]

এরপর যথাক্রমে বিদ্যার উদ্দেশ্যে সুন্দরের যাত্রা, সুচরিতা নামের এক মালিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ—প্রথমে মালিনীর পরিচয়জ্ঞাপক বর্ণনা, নিয়মমতে এ উক্তি মালিনীর হওয়াই সম্ভব। ঠিক এরপর 'কেদার' রাগে সরাসরি মালিনীর উক্তি—

ঃ জগতে বিদিতা হের উজানি নগরী।
তাহাতে প্রচণ্ড রাজা বিক্রম কেশরী।।
পুরুষ বিদ্বেষী বিদ্যা রাজার কুমারী
তেকারণে কুমার তোমাকে পরিহরি।।[১৮]

মালিনী, সুন্দরকে এড়াতে চায়। অথচ তার পরিচয় ও উক্তির মধ্যে নাট্যক্রিয়ার কোনো বিবরণ নেই। কেন? নিঃসন্দেহে এই দুই পদের মধ্যবর্তী স্থলে সুন্দর ও মালিনীর মধ্যে গদ্যে (বা ইঙ্গিতে) কথোপকথন ছিল। এবং গদ্য বলেই তা, ('বিদ্যাবিলাপ', 'মাধবানল-কামকন্দলা' প্রভৃতি নাটকের মতো) নাট্যমধ্যে উল্লিখিত হয় নি।

এখানেও সুচরিতা-মালিনী চরিত্রের প্রবেশের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এমনকি তার বেশভূষারও ইঙ্গিত আছে। প্রবেশের পরেই বর্ণনা—সুতরাং ধারণা করা যায়, এ উক্তি চরিত্রকর্তৃক উক্ত হতো।

এই নাটগীতে নারী চরিত্রও অংশগ্রহণ করত—এরূপ অনুমানই সঙ্গত।

দ্বিজশ্রীধর ফিরোজ শাহের নির্দেশেই বিদ্যাসুন্দর নাটগীত রচনা করেছিলেন—

ঃ রাজার আদেশ শিরে রাখিআ যতনে।
ছিরিধর কবিরাজ দ্বিজবরে ভণে।।[১৯]

নাট্যমধ্যে তিনি ফিরোজ শাহের প্রশস্তি গেয়েছেন—

ঃ নৃপতি নসির সাহা তনয় সুন্দর।
নাম ছিরি ফিরোজ সাহা রসিক শেখর ।।[২০]

সচরাচর নাট্যকলার প্রতি মুসলিম রাজা-বাদশাহ্‌দের যে অনাগ্রহ বা বিদ্বেষের কথা জনশ্রুতির আকারে শোনা যায় বক্ষ্যমাণ দৃষ্টান্তে আশা করি তার খণ্ডন হবে।

সাবিরিদখান তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর'কে বলেছেন, 'নাটগীতি'—

ঃ ... সাবারিদ খানে ভণে বিজ্ঞজন স্থানে।।
এ নাটগীতিতে তাল না করিবা ভঙ্গ।
এক মনে শুনিলে বাড়িবে মনোরঙ্গ।।[২১]

এ হচ্ছে দর্শকদের উদ্দেশ্যে কবির নিবেদন।

মধ্যযুগে আর কোথাও কোনো কবি তাঁর রচনাকে সরাসরি 'নাটগীতি' রূপে উল্লেখ করেন নি। নাটগীতের প্রচলিত যে ধারা ষোড়শ শতকে বিদ্যমান ছিল, সাবিরিদ খান তাকেই শিল্পরূপ দান করেছেন। দ্বিজশ্রীধরও তাই করেছেন তার রচিত 'বিদ্যাসুন্দরে'।

'নাটগীতি' বা 'নাটগীত' সংস্কৃত নাট্য শিল্পরীতির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। কারণ 'ভরতনাট্যশাস্ত্র', ধনঞ্জয়ের 'দশরূপক', বা সাগরন্দীর 'নাটকলক্ষণ-রত্নকোষে', 'গীতনাট', 'নাটগীতি' বা 'নাটগীতে'র কোনোরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না। এ

বাঙলা নাটকের নিজস্ব পরিভাষা। এর আঙ্গিকও মধ্যযুগের কবিদের নিজস্ব উদ্ভাবনা।

অজ্ঞাত কোন সংস্কৃত নাটক দৃষ্টে সাবিরিদ খান ও দ্বিজশ্রীধর তাঁদের নাট্য রচনা করেছেন এরূপ অনুমান স্বীকার করা যায়। কিন্তু সে নাটকের রীতি, দুটি 'বিদ্যাসুন্দরে' কোন মাত্রায় অনুসৃত হয়েছে তা নির্ণয় দুঃসাধ্য। উপরন্তু দু'কবির কাব্যে সংলাপ, বর্ণনা—পাঁচালি রীতিরই অনুবর্তী। দু'জনের রচনাতেই পয়ার ও নাচাড়ির প্রাধান্য।

সাবিরিদ খান পাঁচালিকারদের মতই ভণিতায়, 'পয়ার' রীতির উল্লেখ করেছেন—

ঃ সাবিরিদ খানে ভণে মধুর পয়ার।
শুনিআ রোসাঙ্গ জন হরিষ অপার।।২২

মধুর পয়ার শুনে 'রোসাঙ্গজন' অপার আনন্দ লাভ করছেন।

সাবিরিদ ও শ্রীধরের নাটগীতি 'বিদ্যাসুন্দরে' পাঁচালিরীতির প্রাধান্য। লোকনাট্যে প্রচলিত নাটগীতির ধারাতেই তাঁরা পাঁচালির বৈশিষ্ট্যসমূহ গ্রহণ করে ভিন্ন স্বাদের কাব্য আঙ্গিক সৃজনে ব্রতী হয়েছিলেন।

কাজেই দু'কবির 'বিদ্যাসুন্দর', পাঁচালির চরিত্রাভিনয় রূপান্তর রূপেও বিবেচিত হতে পারে। এর অর্থ, পাঁচালির রীতিটাই নাটগীতের আঙ্গিকে মিশ্রিত হয়ে মধ্যযুগের বাঙলা নাট্যরীতিতে এক স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করেছে।

সাবিরিদ খাঁ-র 'বিদ্যাসুন্দরে'র সঙ্গে শ্রীধরের 'বিদ্যাসুন্দরে'র ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু দু'জনের আঙ্গিকগত কৌশল খানিকটা ভিন্ন। এখানে 'চণ্ডীর' (নেপালের 'ভাষা নাটক' বিদ্যাসুন্দরে চণ্ডিকার আবির্ভাব ও সাবিরিদ খাঁ-র নাটকে 'চণ্ডিকা'র উল্লেখ তুলনীয়) আর্বিভাবে মন্ত্রপাঠ নেই, উল্লেখ মাত্র আছে—

ঃ ভার্যা মুখে শুনি রাজা পূর্ব সঙ্কথন।
ভক্তিভাবে পূজে নিত্য গিরিজা চরণ।।
বিবিধ প্রকারে উপচার বলিদানে।
বিশেষ রুধির দিয়া পূজে একমনে।।
দেবী পদে স্তবি যজ্ঞ করন্তি রাজন।

দ্বাদশ বরিষে যজ্ঞ হৈল সম্পূরণ।।
সাক্ষাৎ হইয়া দেবী দিলা বরদান।
সন্ততি জন্মিবে তোর ভুবন প্রধান।।
বিশেষ পাইছ আস্কার উদ্দেশে।
বাঞ্ছাসিদ্ধি বর দিলুঁ থাক মনতোষে।। ২৩

উদ্বৃতাংশে দেখা যায় চণ্ডীর প্রত্যক্ষ আবির্ভাব বর্ণনামূলক, দ্বিজশ্রীধরে তা নাট্যক্রিয়ার আধারে পরিবেশিত। সাবিরিদ খান, একটি মাত্র অধ্যায়ে সুন্দর ও বিদ্যার জন্ম, বয়ঃপ্রাপ্তি বিদ্যার পণ প্রচার এবং বিদ্যার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে কবিদের পরাজয়ের কথা বর্ণনা করেছেন।

বিদ্যার পণ প্রচার নাচাড়িতে, সুতরাং তা গায়েন কর্তৃক নৃত্যের আধারে উপস্থাপিত হবার কথা।

'মাধবভট্ট কর্তৃক সুন্দরের নিকট বিদ্যার রূপ-গুণ বর্ণনা অধ্যায়' থেকে দেখা যায় এ কাব্যে চরিত্রাভিনয়ের রীতি রক্ষিত হয়েছে। 'প্রথমে বিদ্যার রূপ-গুণ বর্ণনায় রত্নাবতীপুরের উল্লেখ—

ঃ চতুর্দিকে ভট্ট সব করিলা পয়াণ।
বিদ্যার প্রতিজ্ঞা বাণী কহে স্থানে স্থানে।।
উত্তরে মাধব ভট্ট অনুক্রমে চলে।
ছয় মাসে যাই রত্নাবতীপুরে মিলে।।--

এরপর গায়েন-সূত্রধারের উক্তি। এ ধরনের উক্তি 'গীতগোবিন্দে'ও আছে। সেখানে মূল গায়েন—রাধা, কৃষ্ণ বা সখীর সংলাপের পূর্বে, প্রয়োজনমতো শ্লোকের মাধ্যমে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব, পরিবেশ, ঘটনা বা কাহিনীর ইঙ্গিত প্রদান করে।

সাবিরিদ খাঁ রচিত শ্লোকে আছে—

ঃ অথান্তরং পর্যটন সুন্দরঃ পুরীং প্রবিশতি স্নাত চন্দনচর্চিত সুবসন। তাহলে পূর্ববর্তী উক্তি ভাটেরই হবার কথা। সূত্রধার শ্লোকের বাকি অংশে বলে—

ঃ ..... ন্যাসৈর্বিচিত্রঃ কাঞ্চন কুণ্ডলধারী
মৃগমদতিলক চন্দ্রপদ দৃশ্যভালঃসুমধুর গায়নো
নৃত্যকলাবিদঃঅভিনব কামো যথা পর্যটন পরো
ভূমিপুরন্দরঃ পুরদ্বারং প্রবিশতি শ্রীসুন্দরঃ সুন্দরঃ ।।

শ্লোকের দ্বিতীয় অংশ নগরদ্বারে সুন্দরের প্রবেশ সংক্রান্ত। সে নৃত্যে পারদর্শী, সুমধুর কণ্ঠে গাইতে পারে। এই শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা কবি নিচে দিয়েছেন—

ঃ পরাক্রমে ভীমসের আচার্য বিদ্যাএ।
শীতল অমৃত নিধি যেন দ্বিজরাএ।।
....
আগত ভূপতি-সুত স্বরূপ সুন্দর।
সর্ব শাস্ত্রে বিশারদ ক্ষিতি পুরন্দর।।[২৪]

এ উক্তি সুন্দরের অনুমান করা যায়। এরপর আরেকটি শ্লোক, এতে আছে সুন্দরের উদ্দেশ্যে মাধবভট্টের উক্তি। এর অর্থ মঞ্চে সুন্দরের উপস্থিতি বিদ্যমান।

মাধবভাটের উক্তির পর একই পদে আছে সুন্দরের উক্তি এবং এইভাবে উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং শেষের দিকে মাত্র দুস্থলে বর্ণনা। আমরা নিচে সংলাপ ও বর্ণনা বিভাজনপূর্বক সম্পূর্ণ পদ উদ্বৃতি করছি—

(মাধব ঃ) আএ রাজসুত মোর শুন নিবেদন।
উজানী নগরপতি পুত্রী সঙ্কথন।।
অবলা রতনা বিধুমুখী বিদ্যা নাম।
অভ্যাসিয়া সর্ব শাস্ত্র বিদগধা উপাম।।
শাস্ত্রেত পারগ অতি জানে সর্বকলা।
সুচরিতা রূপযুতা কুমারী অবলা।।
সত্য কৈলা রাজকন্যা বিদগধা সতী।
শাস্ত্রবাদে জিনে যেই সেই তার পতি।।
সেই রাণী তোহ্মা যোগ্য অনুমানি চিতে।
শাস্ত্রের বিচারে যবে পার পরাজিতে।।
কথ কহিমু বিদ্যাবতী রূপগুণ সাজ।
কুমারীসদৃশ নারী নাহি মহী মাঝ।।
(সুন্দর ঃ) কন্যার প্রতিজ্ঞা শুনি পুছএ স্বরূপ।
কহত কুন্তল বেশ যৌবন কিরূপ।।
কৈছন তাহার ভুরুযুগ দৃষ্টিপাত।

কৈছন বদন কৈছন ললাট।।

(মাধব ঃ) মেদুর বরণ কেশভার বিলম্বিত।
মহীতলে বিলোটএ সুগন্ধি পুরিত।।
মুখ-বিধু পূর্ণ ইন্দু কিএ অরবিন্দ।
মৃগবংশ-নেত্র কিবা লীলামত্ত ভৃঙ্গ।।
বালে জিনিয়া ভাল শ্রীমন্ত উজ্জ্বল।
বান্ধুলি প্রসূন নিন্দি অধর সুগোল।।
রদ পাতি জুতি বাচ্ সুমধুর।
ভুরুভঙ্গে কামশর নিঃসরে প্রচুর।।
কণ্ঠরেখা ত্রসি কম্বু জলধি মজ্জিল।
কমল-কলিকা-কুচ হৃদয় উগিল।।

(সুন্দর ঃ) কৈছন অঙ্গের লীলা কৈআর স্বরূপ।
কৈছন নাসিকা শ্রুতি কর ভুজযুগ।।
কৈছন কুমারী মধ্যভাগ পাদছন্দ।
কৈছন নিতম্ব উরু জঙ্ঘের প্রবন্ধ।।

(বর্ণনা ঃ) কাম-শর-ঘাত-চিত্ত বাণী তার শুনি।
কহএ মাধব ভট্ট বাখানি কামিনী।।

(মাধব ঃ) সাবধানে শুনগো বলিএ যুবরাজ।
শ্রুতিযুগ সুছন্দ নিন্দিল গৃধরাজ।।
ঈষৎ উন্নত কুচ হেম-বিম্ব-রঙ্গ।
অঙ্গের লাবণ্য পেখি অতনু অনঙ্গ।।
নাসা তিলফুল খগরাজ-চঞ্চুজিৎ।
নিতম্ব পীবর রম্ভা উরু সুবলিত।।
কাঞ্চন মৃণাল জিনি ভূজ যন্ত্রী খণ্ড।
করতাল লোহিত খঞ্জন অনুবন্দ।।
তন্বি-কটী ক্ষীণ পেখি পারীন্দ্র উদাস।
তে কারণে পর্ব্বত গহ্বরে করে বাস।।
পাদ-পদ্ম রক্তস্থল কমলে পূজিল।
পদনখে নবচন্দ্রশ্রেণী উপজিল।।

জঙঘযুগ নিউপাম সর্বাঙ্গ সুন্দর।
জিনি রাজহংসী কিবা গমন কুঞ্জর।।

(সুন্দর ঃ) ভট্ট হে মাধব পুছম তোহ্মারি।
পুনি কিছু বিদ্যারূপ কহ পরচারি।।

(মাধব ঃ) কাব্যরসে নায়ক নায়িকা ষড়তন্ত্র।
কুমারী বিদিত সব বীণা বেণু যন্ত্র।।
সঙ্কেত প্রবন্ধে দেব তাহা সনে রঙ্গ।
সিন্দু-সুধা মধ্যে যেন উদিত শশাঙ্ক।।
দর্শনে দেবেন্দ্র মোহে মন অনুরাগী।
বচনেকে বোলৌঁ গোঁসাই শুন মন লাগি।।
বিদ্যাবতী বেশ-লাস রতি অবতার।
বিদগধ মদন তুহ্মি যোগ্য অভিসার।।

(সুন্দর ঃ) শুনরে মাধব ভট্ট না করিঅ রোষ।
শাস্ত্র-বাদে ধনি জিনি কোন্ পরিতোষ।।
যোষিতা হইলে ধীর সুরগুরু তুল।
যদি আহ্মি যাই তথি দর্প হৈব চূর।।
অধীর চপলা বালি জিনি কোন্ কাজ।
অবহেলে তছু গুরু জিনি দিমু লাজ।।
যে দেশে নিবসে বিদগধ বরনারী।
যাইমু গোপত বেশে কথনে তোহ্মারি।।

(বর্ণনা ঃ) বিদ্বান কুমার বোলে তুষ্ট ভেল ভাট।
বৃষ্টি জলে যেহেন পবিত্র হএ বাট।।
সুন্দরের বাক্য লেশ অমৃত সমান।
শুনিয়া মাধব ভাট শান্ত হৈল প্রাণ।।

(সুন্দর ঃ) (কুমার অগ্রেত পুনি বোলে ভাটরাএ)।
কহিতে কথন কিছু মনে বাসি ভএ।।
সপ্তজন্ম-পুণ্য ফলে যদি আছে ভাগ।
সহজে পাইব গিয়া বিদ্যাবতী লাগ।।

(বর্ণনা ঃ) 'চাণক্য-বচনে' পুনি বুলি ভাটরাএ।
খবর কহিতে অন্য রাজ্য চলি যাএ।।

সাবিরিদ খানে ভণে মধুর পয়ার।
শুনিআ রোসাঙ্গ জন হরিষ অপার।।[২৫]

এ নাটকেও স্পষ্টভাবে মালিনীর প্রবেশ উল্লিখিত হয়েছে—

'অথান্তরং মালিনী প্রবিশতি', এরপর গায়েন সূত্রধার বলছে—

ঃ মালিনী মালিনিরক্তা সুরক্তাধর রাগিণী।
সুন্দর সুন্দরস্যার্থে প্রবিবেশরসাম্বুদা।।

অতঃপর মালিনীর পরিচয়—

ঃ বিনোদ কবরী পরি কুসুম্বিত হার।
বিহাস-বয়ান-বাণী অমৃত সঞ্চার।।
বঙ্কিম-নয়ন-দৃষ্টি বেকত যে হাস।
বিদ্যাক যোগাএ মালা উজানী নিবাস।।
আগত মালিনী হের সুচরিতা নামা।
অঙ্গে রঙ্গে বেশ-লাস রূপে অনুপমা।।
মালাকারিণীক দর্শি গুণসা-কুঙর।
মন্থর গমনে গেলা পুছিতে উত্তর।।

এরপর প্রসঙ্গমতে গুণসা—কুঙরের উক্তি হওয়াই উচিত। কিন্তু বাস্তবে একটি সংযোজক শ্লোকের পরেই আছে মালিনীর প্রশ্ন—

(মালিনীঃ) অবণী-মোহনী রূপ পেখি নিউপাম।
বিহায়সি হোন্তে কি নামিল পুষ্পবাণ।।
বিদ্যাধর-সুত কিবা গন্ধর্ব-কুঙর।
বুঝিলুঁ লক্ষণে তুহ্মি রাজপুত্রবর।।
কোন হেতু চাট বেশে ভ্রম পরিতোষে।
কোন কার্যে আগমন তোহ্মার এই দেশে।।
শাস্ত্রবাদে বিদ্যাবতী জিনিবার তরে।
সুকুমার যথ আইল ভূপতি গোচরে।।
না পারি জিনিতে জায়া পুনি গেল ঘর।
না দেখিলুঁ তথি এক তোহ্মা সমসর।।
সুধীর সর্বজ্ঞ তুহ্মি কান্তি বিলক্ষণ।
স্বরূপে কৈআর বাচ্ আপে কোন্ জন।।

বচনে তুষ্টিল তাক রাজসুত গুণী।
বিদ্যাক যোগাএ মালা এই সে মালিনী।।
বিক্রমকেশরী নাম জগ প্রতিষ্ঠিত।
বিচিত্র নগর এই উজানী নিশ্চিত।।
আএ পরদেশী মোর সুচরিতা নাম।
এ নগরে বসতি সুখদ অভিরাম।।

(কুমার ঃ) পুছিএ স্বরূপে সুবদনি বোল মোরে।
পুষ্পমালা দেঅ তুহ্মি কার কার তরে।।

(মালিনীঃ) সুকুমারী বিদ্যাবতী আছিল অবোলা।
সে অবধি যোগাই কুসুম পঞ্চমালা।।

(কুমার ঃ) পন্থশ্রম শান্তি ভেল তুয়া মিষ্টালাপে।
প্রমোদা, প্রমোদে বাসাখানি দেঅ মোকে।।[২৬]

দুটি নাটকের কোথাও 'ধ্রুবা' দৃষ্ট হয় না। পুথিদ্বয় খন্ডরূপে প্রাপ্ত হওয়াতে এদুটি নাটকের পরিবেশনায় চরিত্রাদির অংশগ্রহণ সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। তবে এ ধরনের নৃত্যগীত সংবলিত নাটকে দোহার থাকা স্বাভাবিক। কাজেই অনুমান করা যায় বিদ্যাসুন্দরে গায়েনের সঙ্গে দোহার ছিল।

দ্বিজশ্রীধর ও সাবিরিদ খাঁ রচিত 'বিদ্যাসুন্দরে' বিশেষ কোনো সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিক অনুসৃত হয়েছে বলে মনে হয় না। এ নাট্য-আঙ্গিক সহস্র বছরের বাঙলা নাট্যরীতির ধারায় অনুসন্ধানযোগ্য। 'বিদ্যাসুন্দর' 'গীতগোবিন্দের' আঙ্গিকজাত— এতে বাঙলা পাঁচালির প্রভাবও অনস্বীকার্য। পরবর্তীকালে, রামানন্দ রায় রচিত 'জগন্নাথবল্লভে'ও বাঙলা নাট্যরীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ খানিকটা দৃষ্ট হয়।

নেপালে বাঙলা-মৈথিলী নাটকের আঙ্গিকের সঙ্গে দ্বিজশ্রীধর ও সাবিরিদ খাঁর 'বিদ্যাসুন্দরে'র আঙ্গিকগত মিল বিদ্যমান। দ্বিজশ্রীধরের 'বিদ্যাসুন্দরে' বিদ্যার একটি উক্তির সঙ্গে কাশীনাথকৃত 'বিদ্যাবিলাপে' বিদ্যার উক্তি তুলনীয়। দ্বিজশ্রীধর—

ঃ না মারিঅ রে কোটোয়াল ভাই।
রাজার সাক্ষাতে নেঅ যে করে গোঁসাই।।
তাহান সাক্ষাতে যত্ন-কর উপকার।
এবার বাঁচিলে প্রাণ শুধিবেক ধার।।
কান্তি অঙ্গে মারি তবে কুমারে ভমএ।
তুহ্মি প্রাণনাথ বিনে জীবন সংশএ।।

আজি হোন্তে শুন্য মোর হৈল দশ দিশ।
দিনমণি অস্ত যেন কমলিণী-ঈশ।।
বিফল হইল মোর পয়োধর ভার।
কুমুদ কলিকা যেন মোর মুখে ছার।।
বিমল হইল মোর নাভি সরোবর।
ভিঙ্গারের নাদ পুনি হৈল অন্তর।।
অধর অমৃত মোর হৈল বিফল।
প্রাণনাথ বিনে মোর সকল বিকল।।
কি লাগি পাপিষ্ঠ মোর বিধি নিদারুণ।
পাঞ্জর ভেদিআ মোর লৈল প্রাণধন।।

কাশীনাথ—

ঃ বিদ্যোক্তি-দণ্ডক।।
বস্ত্রমণ্ডির মা।।
বরাড়ি।। রূপক বাধা

দেখিঅ এহাক বিলাপে।
ভেল মোরে (ল) অহসান দারুণ তাপে।
ধৈরজ করহ পহুন করু সতাপে।।
(গোচর সু নু হে সর)
বিহি লিপি মেতি ন জায়।
রাখ এক জিব তুঅ করব উপায়।
নারিক ভূষণ সবে তুহি পহিরায়।।
নৃপ ভূপতীন্দ্র এহো ভান।
জতনে বাচত জানু তোহর পরাণ।।

বিদ্যোক্তি-বিনতিমে।।
মরহঠী।। একতালি।।
সুনহ সুচিয়া তোহে, বিনতি হমারি।
লয় জনু জাহ অবিচারি।
রূপগুণ গৌরব রাজকুমারী।
মোর এহি জিবন অধারি।।
(হে শিব হে শিব সর)
জত অচ্ছ ভুষণ লেহ গুণমান।

মানহ বচন সুজান।।
লেবয় উচিৎ নহি হিনক পরাণ।
নৃপ ভূপতীন্দ্র ভান

নেপালে বাঙলা-মৈথিলী নাটক সপ্তদশ শতকের পূর্বে রচিত হয় নি। কাজেই এ শ্রেণীর নাটকে বাঙলা 'বিদ্যাসুন্দর' নাটগীতের প্রভাব পড়েছিল এরূপ ধারণা অসঙ্গত নয়।

শ্রীধর ও সাবিরিদ খাঁ-র বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কোনোটির পূর্ণাঙ্গ পুঁথি পাওয়া যায়নি। যদি তা কোনোদিন পাওয়া যায়, তবে দু-অঞ্চলের এই শ্রেণীর নাটকের যথার্থ তুলনামূলক আলোচনা সম্ভব হবে।

ষোড়শ শতকে প্রণয়মূলক পাঁচালি কাব্যের ধারায় দৌলত উজীর বাহরাম বিরচিত 'লাইলী-মজনু' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ বিয়োগান্ত রসের কাব্য।

'লাইলী-মজনু' কোনো বিশেষ কাব্যের অনুবাদ নয়। মুসলমান সমাজে প্রচলিত লাইলী-মজনুর লোকশ্রুতিমূলক উপাখ্যান অবলম্বনে দৌলত উজীর তাঁর কাব্য রচনা করেছেন।

এ কাব্যের বহুস্থলে সেকালে প্রচলিত নাট, গীত-নৃত্য প্রভৃতির উল্লেখ আছে। কবির বংশ পরিচয়ে 'নটক' ও 'গাইনে'র উল্লেখ দেখা যায়—

ঃ নটক গাইন জনে সত্য যথ কৃতি ভণে
প্রকাশ হইল সর্বদেশে।[৮]

এখানে 'নটক' অভিনেতা ও নর্তক অর্থে গ্রহণযোগ্য।

লাইলীর বিরহ বিলাপ অধ্যায়ে আছে—

ঃ কেহ করে নৃত্য কেহ গায় গীত
কেহ বসি রঙ্গ চাএ।
লাইলী যুবতী বিষাদিত মতি
এক মনে নাহি ভাএ।[৯]

মঙ্গল-উৎসবে 'নাট' পরিবেশনের প্রসঙ্গ আছে 'ইব্‌নেসালাম পুত্রের সঙ্গে লাইলীর বিবাহ' অধ্যায়ে—

ঃ ....
স্থাপিল রসাল পত্র সুবর্ণের ঘট।।
উচ্চরব দামা সব গর্জিত আকাশ।

পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজে শুনিতে উল্লাস।
শানাই বিগুল বাজে বিউর কন্নাল।
অনেক মধুর বাদ্য বাজএ বিশাল।।
অবলা সুন্দরীগণ সুবেশ উত্তম।
কৌতুকে করএ নাট অতি মনোরম।।[৩০]

এ হচ্ছে 'কৌতুক-নাট' বা কৌতুক নৃত্য।

প্রণয়মূলক-পাঁচালির বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো কোনো প্রসঙ্গ কেবল চরিত্রভিত্তিক উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে রচিত। 'লাইলী-মজনু', 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' প্রভৃতি কাব্যে গীতের আকারে উক্তি-প্রত্যুক্তি পরিলক্ষিত হয়। 'লায়লী হেতুবতী সংবাদে' এক নাগাড়ে বারটি উক্তি-প্রত্যুক্তি রয়েছে।

হেতুবর্তী বসন্ত বর্ণনা দিচ্ছে, নব নাগর এনে দিবে সে লাইলীকে—

ঃ নাগর অতি নব তুরিতে মিলাওব
কেলি করাওব তুহু সঙ্গে।[৩১]

লাইলী তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে—

ঃ ওহে সখি, এ'সা বচন মত বোলা। ধূ।
উঞ্চল পর্বত দোলে কদাচিত
কুলবতী যুক্ত নহি দোল।[৩২]

এরপর পরবর্তী উক্তি 'নিদাঘ' কালের—
হেতুবতী লায়লীকে বলে—

ঃ যৌবন রূপ অকারণে যাএ।
নিদয়া কান্ত পলটি নহি আএ।।
কামং হুতাশনে দহএ দেহা।
ভজ ধনি সুন্দর নাগর নেহা।।[৩৩]

লাইলী অস্বীকার করে—

ঃ এ সখিয়া ছোড় কুবচন তোহ্মারি।
কোন দিন কুলবতী হওএ দোচারিণী।।[৩৪]

এরপর বর্ষা। বর্ষা সমাগমে কামবাণ বিদ্ধ হয় সকল যৌবনবতী, সুতরাং লাইলীর উচিৎ সুন্দর নাগরের সঙ্গে মিলিত হওয়া। হেতুবতী সে কথা বলে লাইলীকে—

ঃ সুন্দর নাগর সঙ্গে কেলি করহ রঙ্গে
কেলি কলা মানে মান।

পদুত্তরে লাইলী ক্ষিপ্ত হয়—

ঃ এ সখি চেতাওসি মোহে। ধ্রু।
হম ধনি কুল-জনী কামিনী বিরহিনী
পাপ-পরশ নহি শোহে।[৩৫]

এবার শরৎকালের সৌন্দর্য বর্ণনাপূর্বক হেতুবতী লাইলীকে বশ করতে চায়। সে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর উদাহরণ টানে—

ঃ দ্রৌপদী পঞ্চস্বামী সুভোগল
সুখ বহুত মন মানি
সীতা একপতি জনম রহি
গেল পাতাল পসতানি।[৩৬]

কিন্তু লাইলী অটল। সে জানে—

ঃ ..... দুর্জন প্রেম রহত কাল সাপ
উপর মিঠল লাগে বড়।।[৩৭]

এবার হেমন্ত, হেতুবতী আশা ছাড়ে না। সে বলে—

ঃ .... খেদে তোর পঁহু দূরদেশে রহু
তুছ প্রেম কোন কাজ
মদন বেদন তরণ কারণ
ভজ সুনাগর রাজ।[৩৮]

লাইলী উত্তরে বলে—

ঃ এ সখি কোন বিহিত অব কাজ
তোর কুট মন মোহে ডুবাওল
পাপ পয়োনিধি মাঝ। ধ্রু।
বিষ মিলাওসি মধু পিলাওসি
মোর জিউ বধ লাগি
শীতল চন্দন অঙ্গে বিলেপন
হৃদে লাগাওস অগি।[৩৯]

এরপর শীত। হেতুবতী ও লাইলীর উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক শেষ দুটি পদ—

রাগ ধানশী

হেতুবতী ঃ এ সুন্দরী বিরহীর অবশেখ
প্রবল ষট ঋতু নাথ বিছেদ
সরোরুহ ভেল মলিন
দীরঘ যামিনী দিবস ভএ ক্ষীণী
ঝাপন তপন তুহার।
বারিদ চাহে বরিখে জলধার
আনল তোলি দোলাই
হিয়া ন মাত বিরহিণী রাই
হীন উজির ইহ রস ভাণ।

পদুত্তর—

রাগ শ্রী

লাইলী ঃ এ সখি ন কর বহুত চাতুরাই
পুনি মত বোলসি ধরম দোহাই। ধু।
তিল এক বহে যুগ চারি
কোন উপাএ অব হম নারী।
নয়ান পুষ্পক বণি
যুগ দরশন ভিখ মাগি
যামিনী দিবস ন গেল রোই
কি দিশ যামিনী দিবস গোঞাই।
যৈসে পিউ চাহে সো যোগিনী হোই
বালম বিনে নহি জানি
আন পুরখ দেখো খসম ন মানি।
আসা উদ্দীন সুধীর
ছয়ঋতু বোলন্ত হীন উজীর।[৪০]

ষড়ঋতুর বৈচিত্র্য ও নায়িকার মনোভাব পূর্ণাঙ্গরূপে সংলাপনির্ভর সে কারণে তা যথার্থই নাট্যমূলক হয়ে উঠেছে। আসরে এই পদ-পদুত্তর নিঃসন্দেহে নাট্যরসের সৃষ্টি করত। উপরন্তু এই পদুত্তর বৈষ্ণবীয় ভাষা ও গীতি-আবহপুষ্ট, ফলে এ কাব্যের পরিবেশনায় বাহিত হত পদাবলী কীর্তনের লালিত্য।

প্রসঙ্গত লক্ষ্য করা যায় যে, ষোড়শ শতক থেকে প্রণয়মূলক আখ্যানকে কেন্দ্র করে ক্রমেই পাঁচালির শিল্পরীতি ও আঙ্গিকগত উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে।

মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী' রূপকথামূলক প্রণয়োপাখ্যান। এ কাব্যের উৎস সম্পর্কে দুটি ভণিতায় দুরকমের উক্তি দেখা যায়—

ঃ মোহাম্মদ কবিরে কহে মন কুতূহলী।
আছিল ফারসি ছন্দ রচিল পঞ্চালি।।[৪১]

ঃ এহিসে সুন্দর কিচ্ছা হিন্দিতে আছিল।
দেশি ভাষাত মুঞি পঞ্চালি ভণিল।।[৪২]

দুক্ষেত্রেই কবি তাঁর কাব্যকে 'পঞ্চালি' অর্থাৎ পাঁচালিরূপে উল্লেখ করেছেন।

মনোহর ও মধুমালতীর প্রণয়কথাকে কবি 'সুরঙ্গ রসের কথা' রূপেও উল্লেখ করেছেন—

ঃ . . . রঙ্গিমা রসের ডোরে গুম্ফিলা মধুরে।।
সুরঙ্গ রসের কথা কহিল কবীরে।[৪৩]

'মনোহরের অভিষেক' শীর্ষক পদে মঙ্গলোৎসবে 'নাটগীত' পরিবেশনের সংবাদ দিয়েছেন কবি—

ঃ আর দিন যুবরাজ কৌতুকের কৈল সাজ
পুরী মধ্যে করিতে মঙ্গল।।
রাজ্যে যথ লোক ছিল মঙ্গলা শুনিয়া আইল
নাটগীত বাদ্যের কল্লোল।।
মন্দিরা মৃদঙ্গ কাড়া শিঙ্গা ঢাক দো-তারা
শঙ্খ সানাঞি কর্ণালফুকারে।।
মধু বেলি চঙ্ক বাঁশি নানা বাদ্য রাশি রাশি
যথ বাদ্য বাজে জোরে জোরে।।

তারপর-

ঃ নর্তকীর দেখি সাজ মোহ যাএ দেব রাজ
নাচে যেন স্বর্গের ইন্দ্রাণী।

মধু হাসি বঙ্কে চাহে মুনিমন লইযাএ
আনে কি ধরিবা বল প্রাণি।।
কেহো নাচে কেহো গাএ কেহো হাসি যন্ত্র বাহে
রঙ্গ ঢঙ্গ কৌতুক অপার।[৪৪]

পায়মার বিবাহ উদ্যোগে 'নারী-ধামালি'র উল্লেখ দেখা যায়—

ঃ কেহো হাসি করে অঙ্গে পড়ে টলি টলি।
ধরাধরি ঠেলাঠেলি খেলএ ধামালী।।
কেহো থোকারে চাহে কেহ পুষ্প হাতে।
কেহো ছড়া বেঢ়ি দিছে কেহো গুঞ্জে মাথে।।
কেহো কারে পুষ্প হানে কর গল মালা।
কার হার হৃদে দোলে কুচে মারে ঠেলা।।
কেহো ধরে কেহো ক্ষেপে কার মুখে বুকে।
আবীর ফাগের গুঁড়া কেহো উড়াএ কৌতুকে।।
কেহ নাচে কেহো গাএ মদন মাতালি।
নানা যন্ত্র নানা বাদ্য কেহো হাতে তালি।।[৪৫]

পরবর্তীকালে নারী-ধামালি 'গোপিনী খেলা'য় রূপান্তরিত হয়।

'মনোহর ও মধুমালতীর পরিচয় ও প্রণয়' অধ্যায়ে মধু-মনোহরের সংলাপে প্রথম পরিচয়ের বিস্ময়, আনন্দ ও প্রেমের অধিরতা ব্যক্ত হয়েছে—

(মধু ঃ) শুন শুন যুবরাজ কহ মহাশএ।
তুহ্মি কোন্ হও মোত দেঅ পরিচএ।।
আকাশের চন্দ্র কিবা দিবসের মণি।
ইন্দু পুরন্দর কিবা জগতে মোহনী।।
মদন জীবন্ত কিবা তুহ্মি নরেশ্বর।
কিরূপে কিসের আইলা মন্দিরেতে মোর।।
একেতে অবোলা আহ্মি রাজার নন্দিনী।
শুনি লোকে দিব লজ্জা হৈলুঁ কলঙ্কিনী।।
কি মুখে বসিমু মুঞি নারীর সভাত।
প্রমাদ ঠেকাইলা কুমার আসিয়া এথাত।।
শুনিলে জনকে মোর লইব পরাণি।

সত্য করি কহ তুহ্মি কোন রূপমণি।।
কথাত বসতি তোহ্মার কহ জাতিকুল।
আচম্বিত পরশিলা ফুটিতে কলিফুল।

(বর্ণনা ঃ) কুসুম্ব বয়ানী বাণী শুনিয়া কুমার।
কহন্ত যে কুমার আপনা সমাচার।।

(মনোহর ঃ) শুন আএ শশীমুখী কমল নয়ান।
তোহ্মার অঙ্গের ছন্দে বান্ধিলা পরাণ।।
সুরঙ্গ অঙ্গের রূপে মদন মোহিত।
কার শক্তি আছে প্রাণ ধরে পৃথিবীতে।।
নহি আহ্মি চন্দ্র সূর্য নহি বিদ্যাধর।
অবশ্য শুনিছ তুহ্মি কঙ্গিরা শহর।।
কঙ্গিরা রাজ্যেতে জান সূর্যভান রাজা।
কমলা সুন্দরী নামে তাহান যে ভার্যা।।
তাহান তনয় আহ্মি নামে মনোহর।
বিদিত সংসারে আছে এ সব উত্তর।।
শুন শুন পদ্মমুখি পুণ্যবতী কলা।
চক্ষেত ধরএ জুতি তুয়া অঙ্গলীলা।।
এমত সুন্দরী তুহ্মি কাহার নন্দিনী।
এহি কোন রাজ্য হএ বোল সুবদনী।।
আরত কি নাম তোহ্মার কহত সুন্দরী।
উড়িল পিঞ্জর শুয়া রাখ বন্দী করি।।

(বর্ণনা ঃ) এথ শুনি চন্দ্রমুখী কহে মন্দ মন্দ।
পূর্ণশশী মুখে যেন ঝরে মকরন্দ।।
তবে সে কামিনী কহে (শুন মহাশএ।।)

(মধু ঃ) অবশ্য শুনিছ তুহ্মি কাহার মুখএ।।
মহারস নামে রাজ্য গর্ব অবতারি।
ধার্মিক বিক্রম রাজা তথে অধিকারী।।
তাহান মহিষী নাম রূপসমঞ্জরী।

তান সুতা আহ্মি মধুমালতী সুন্দরী।।
রাজার নন্দিনী আহ্মি সর্বজনে জানে।
পরাণে বধিলা মোরে তুয়া অঙ্গবাণে।।
ধরাইতে না পারি চিত্ত তোহ্মা রূপ হেরি।
ধড়ফড় করে প্রাণ না দেখিলে মরি।।
দরশনে প্রাণ মোর ধাএ কিবা রএ।
না জানম কোন্ হেতু আইলুঁ তুয়া পাশ।।

(মনোহর ঃ) (কুমারে বোলন্ত) শুন কমল নয়ানী।
অধিক সুন্দর তোহ্মা চন্দমুখ বাণী।।
তোহ্মা আহ্মা ললাটে লেখিছে পূর্বকালে।
তেকারণে তুহ্মি আহ্মি হৈছি একমেলে।।
না জানম কোন্ হেতু আইলুঁ তুয়া পাশ।
এক তিল তুহ্মি বিনে জীবন নৈরাশ।।
তিলেক বিমন নহি তোহ্মারে পাসরি।
তোহ্মা রূপ লৈল আখি পলক বিস্মরি।।
তুহ্মি মোর প্রাণেশ্বরী অতি শ্রধাশএ।
অহ্মি পরে থুই তোহ্মা ঘুরিমু সদাএ।।

....

(মধু ঃ) (কুমারক বোলে বালি) রহ ধৈর্য ধরি।।
তুহ্মি যথ কৈলা বাণী মোরে মনে লএ।
তোহ্মা প্রেম আনলে দহএ হৃদএ।।
তোহ্মা আহ্মা প্রেমগুণ না যাউক ছিণ্ডন।
সদাএ না ছাড়উক না হউক খণ্ডন।।
তুহ্মিহ আপনা মন কভু না টলাইবা।
আহ্মি তোহ্মা দাসী, প্রেম মনেত রাখিবা।।
তুহ্মি আহ্মি দুই তনু প্রাণি এক জন।
সদাএ হউক প্রেম হউক কল্যাণ।।
এ রূপ-যৌবন তোহ্মা পদের নিছন।
তুহ্মি তরু আহ্মি লতা সর্বাঙ্গে জড়ান।।৪৭

এ শ্রেণীর পদ নিঃসন্দেহে নাট্যমূলক। দ্বিজশ্রীধর ও সাবিরিদ খান রচিত 'বিদ্যাসুন্দরে'র সঙ্গে এর নৈকট্য আবিষ্কার সম্ভব।

সপ্তদশ শতকে বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত প্রণয়মূলক আখ্যান সতীময়না ও লোরক রাজার কাহিনী অবলম্বনে দৌলত কাজী 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী' কাব্য রচনা করেন।

কাব্য বা আখ্যানরূপে এ কাহিনী প্রচলিত থাকলেও প্রাচীন কাল থেকে বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে লোকনাট্য ও পটে ময়না-লোরক-চন্দ্রাণীর কাহিনী দৃষ্ট হয়। মৈথিলী কবি জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণরত্নাকরে' 'লোরক নৃত্যে'র উল্লেখ আছে। পটে লোর-চন্দ্রাণীর বারমাস্যার চিত্র দেখা যায়।[৪৮]

এছাড়া লোকগীতিকা ও লোকসঙ্গীতে এই প্রণয় কাহিনী, কাহিনীর নানা অংশ গীত ও পরিবেশিত হয়।

কাজী দৌলত তাঁর কাব্যকে 'পাঞ্চালী' অর্থাৎ 'পাঁচালি'রূপে অভিহিত করেছেন—

ঃ ঠেটা চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে।
না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে।।
দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া বুঝয়ে সানন্দে।।
তবে কাজি দৌলত বুঝিয়া আরতি।
পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী।।[৪৯]

ভিন্ন (অর্থাৎ গোহারী) ভাষায় রচিত এ কাব্যের গঠনরীতি ও গায়েন বা রচয়িতার নাম এতে উল্লিখিত হয়েছে। উপরন্তু এই পাঁচালি কাব্য 'ময়নার ভারতী' নামেও কবি দত্ত অভিধা লাভ করেছে। 'পাঞ্চালীর ছন্দ' বলতে এখানে পাঁচালিরীতির পদ-পয়ার পরিবেশনের কথাই বুঝানো হয়েছে।

এ কাব্যে যোগীর আবির্ভাব শীর্ষক পদে আছে পটচিত্রের প্রসঙ্গ। নির্জন কাননে রাজা নারী সঙ্গহীন দিনপাত করছেন, এমন সময় এল এক যোগী। তার হাতে 'পট' তাতে এক 'বিচিত্র পোতলি' —

ঃ যুগীর হস্তেতে এক সুবর্ণের ঘট।
হাতত বিচিত্র এক পোতলীর পট।।
নানা রূপ রেখা রঙ্গে পোতল রঞ্জিত।
নির্ভয় দৃষ্টির যুগী তাক চাহে নিত।।
সাক্ষাতে অম্বিকা যেন অনুভব করে।
সে পোতলী রাখে চক্ষু-পোতলী উপরে।।
পরম পোতলী-রূপ জগৎ মোহন।
যোগ ধর্ম্ম যুগীর তাহাতে সর্ব্বক্ষণ।।৫০

'পোতলীর-পট' বা 'পুত্তলীর-পট' নারীর চিত্রপট। বর্ণনানুসারে সে নারী-চিত্রের নানান 'রূপ' রেখা ও রঙে রঞ্জিত—এর অর্থ রাজকন্যা চন্দ্রাণীর নানান ভঙ্গির চিত্রপট প্রদর্শন করেছিল যোগী।

এই চিত্রপটের বিবরণ দিতে গিয়ে পটবহনকারী যোগী, চন্দ্রাণীর রূপ-গুণ, দাম্পত্য জীবনের কাহিনী বর্ণনা শুরু করে।

ঃ তাহারি রাজ্যের মোহরা নাম রাজার কন্যা চন্দ্রাণী।

তার রূপ বর্ণনায় প্রকাশ করা যায় না বলেই সে রূপসীর রূপ সকলে প্রত্যক্ষ দেখতে চায়—

ঃ অপূর্ব সে রূপ যদি শুনয় শ্রবণে।
মানস না হয় শান্ত না দেখি নয়নে।।
তেকারণে ইচ্ছে সেরূপ দেখিতে।
শ্রবণ নয়ন মাঝে বিবাদ খণ্ডিতে।।৫১

এ উক্তি, একই সঙ্গে তা চিত্রনাট পরিবেশনের কৌশলও বটে।

'ময়নাবতী'র কাহিনীর নানা অংশ চিত্রনাটরূপে সেকালে পরিবেশিত হতো। এ ধরনের পটচিত্রের সঙ্গে রোসাঙ্গ রাজসভার অমাত্যগণের পরিচয় থাকা স্বাভাবিক।

'সতীময়না ও লোর-চন্দ্রাণী' কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড, অসমাপ্ত ছিল, পরে কবি আলাউল এর সঙ্গে আরও একটি কাহিনী জুড়ে দিয়ে কাব্যের সম্পূর্ণতা দানের চেষ্টা করেন।

এ কাব্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ময়নার বিলাপ, মালিনীর দৌত্য এবং ময়নাকে প্রলুব্ধ করার প্রয়াস বর্ণিত হয়েছে। মালিনী সুকৌশলে বারমাস্যা বর্ণনার মাধ্যমে

ময়নাকে পরপুরুষ সম্ভোগে প্ররোচিত করতে চায়—কিন্তু সতীময়না তা প্রত্যাখ্যান করে।

দৌলত-কাজী রচিত ময়নার বারমাস্যা বিষয়ক সবগুলি পদ উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক। এ ধরনের পদগুলি যথাক্রমে-ময়নার বিলাপ (ত্রিপদী), মালিনীর দৌত্য (পয়ার), বারমাস্যা (ধুয়াসহ গীতিমূলক পদ), মালিনীর মিনতি (ত্রিপদী), ময়নার উত্তর (ব্রজবুলিতে রচিত গীতি), মালিনীর উক্তি (পয়ার, এর শেষ অংশ পদাবলী ধারার গীত), ময়নার উক্তি (ধুয়া ও পয়ার ছন্দে রচিত গীত), এরপর মালিনীর কথা (পয়ার ও ত্রিপদীতে রচিত দুটি গীত)।

এবার ময়নার উক্তি (ধুয়াপদ ও ত্রিপদীতে রচিত গীত, বলাবাহুল্য এতেও ব্রজবুলি আছে), মালিনীর উক্তি(পয়ার ছন্দে রচিত পদ), ময়নার উক্তি (ধুয়াপদ এবং মূলপদ ত্রিপদী ছন্দে রচিত), অতঃপর মালিনীর উক্তি, (পয়ারে রচিত পদের পরেই আছে, ব্রজবুলি ভাষার মিশ্রণে রচিত ক্ষুদ্রগীত) ময়নার উত্তর (ধুয়ার পদ, পদের পরেই আছে পদাবলী গীত), এরপর মালিনীর উক্তি (সম্পূর্ণ পদের অর্ধেক পয়ার ও বাকি অর্ধেক ত্রিপদীতে রচিত অর্থাৎ দুটো স্বতন্ত্র ছন্দের গান), ময়নার পদুত্তর (ধুয়াপদ ও পয়ারে রচিত ক্ষুদ্রগীত), আবার মালিনী ও ময়নার উক্তি-প্রত্যুক্তি, (ময়নার গীতে এখানেও ধুয়া দৃষ্ট হয়, পদটি ত্রিপদী), পুনরায় মালিনীর উক্তি (এতে প্রথমে পয়ার পরে পদাবলী গীতের আকারে ত্রিপদী), পরে আবার ধুয়া সহযোগে একাবলী (?) ছন্দে রচিত গীত, এরপরও মালিনীর উক্তি, (প্রথমে পয়ার পরে ধুয়া সহযোগে গীত), মালিনীর গীতের সংখ্যা এখানে ধুয়া ব্যতিরেকে পাঁচ। ময়নার খেদ, পুনরায় মালিনী (এবারও মালিনীর উক্তি দুটি পদে বিধৃত হয়েছে), ময়না, (ব্রজবুলি মিশ্রিত ত্রিপদী গীত), মালিনী, (পয়ার ও ত্রিপদীতে রচিত দুটি গীত)। ময়নার উত্তর ও মালিনীর অসম্পূর্ণ উক্তি আছে খণ্ডিত পুথির শেষে।

সম্পূর্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক পদের সমষ্টি হচ্ছে ময়নার 'বারমাস্যা'। ইতোপূর্বে ষোড়শ শতকে রচিত 'লাইলী-মজনু' কাব্যেও এ রীতির উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক বারমাস্যা দেখেছি।

এ ধরনের সম্পূর্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক অধ্যায় বাঙলা পাঁচালিকাব্যে নিঃসন্দেহে নতুন। বারমাস্যার ক্ষেত্রে দেখা যায় তা একটি বিশেষ শিল্পরীতি হিসেবে ষোড়শ শতক থেকে পরবর্তী শতকেও বাহিত হয়েছে।

উক্তি-প্রত্যুক্তির এই ধারা নাটগীতেরই আঙ্গিক। সেক্ষেত্রে দেখা যায়, পাঁচালিরীতিতে নাটগীতের এই ধারা ষোড়শ শতকেই গৃহীত হয়েছে। এর ফলে, পাঁচালি পরিবেশনা লাভ করেছে বিচিত্রতর সমৃদ্ধি।

সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম রূপকথামূলক প্রণয় কাহিনী কোরেশী মাগন ঠাকুরের 'চন্দ্রাবতী'। এ কাব্যের পুথি আদ্য-মধ্য-অন্তে খণ্ডিতরূপে পাওয়া গেছে। কাহিনীতে বীরভানের সমুদ্র যাত্রায় 'ঝড়ের মুখে' শীর্ষক পদে কবি পয়ার ছন্দকে 'পঞ্চালী ছন্দ' রূপে উল্লেখ করেছেন—

ঃ গলাগলি করিয়া কান্দএ দুইজন।
রচিল পঞ্চালী ছন্দ কোরেশী মাগন।।[৫২]

'সুত-রূপবতী পরিণয়' বিষয়ক পদে 'নাট'-এর প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়—

ঃ এহি মত মণিপুর নগর মাঝার।
আনন্দ উশ্চব পুনি হইল অপার।।
নটী সব নাট করে প্রতি ঘরে ঘর।
গাইন সব গীত গাহে চাতরে চাতর।।[৫৩]

এ কাব্যেও পট বা 'চিত্র' প্রসঙ্গ আছে—

ঃ কান্দিতে কান্দিতে তবে চিত্র লৈল হাতে
কহিবারে লাগিলেন্ত সুতের সাক্ষাতে।
দেখ দেখ মিত্র তুহ্মি মোর প্রাণ সখা
আকুল হইছি আহ্মি চিত্র পাই দেখা।
শূরপাল রাজার দুহিতা চন্দ্রাবতী
সরন্দ্বীপ নগরেতে আছএ বসতি।
চিত্রমধ্যে নাম আছে দেখহ পড়িয়া
এ বলিয়া দেখাইল চিত্র খসাইয়া।[৫৪]

মধ্যযুগে বাঙলাকাব্যের অভিনব রূপ ও আঙ্গিকের অন্যতম প্রধান স্রষ্টা কবি আলাউল। তাঁর রচিত 'পদ্মাবতী' বাঙলাকাব্যের পরিধিতে এক নবতর শিল্পরীতির সন্ধান দেয়।

প্রণয়মূলক পাঁচালির প্রচলিত ধারাতে তিনি এ কাব্য রচনা করলেও কাহিনী-বিন্যাস, ভাষারীতি, শব্দ প্রয়োগের কুশলতা ও ছন্দের নতুনত্বে তা সাধারণ গেয় বা পরিবেশনামূলক কাব্যের পরিধি অতিক্রমে সমর্থ হয়েছে।

আলাউল একালের বিচারে যতটা কবি, সেকালের ধারায় পাঁচালিকার রূপে ততটা বিবেচ্য নন। আত্মপরিচয়ে কবি বলেছেন—

ঃ কাব্যরত্ন লুটিল যতেক অগ্রগামী।
পৃষ্ঠগামী হৈয়া তথা কি পাইব আমি।।
তবে সে প্রভুর রসভাণ্ড নহে উন।
যত হরে তত বাড়ে এই মহাগুণ।।
এহি ভাব শিরে করি করিলুঁ পয়ান।
ভাল মন্দ বলে কেহ না শুনিনু কান।।
হৃদয় ভাণ্ডার মাঝে যত আছে পুঁজি।
গুপ্ত ব্যক্ত কৈল তাহা জিহ্বা করি কুঁজি।।
বচন পদার্থ অতি রতন অমূল।
ত্রিভুবনে দিতে নারি বচনের তুল।।[৫৫]

কাব্য রচনা সম্পর্কে এই সচেতনতা কবির, পাঁচালিকারের নয়।

আলাউল তাঁর কাব্যকে 'পুস্তক' রূপে উল্লেখ করেছেন—

ঃ তাহান আদেশ মাল্য ধরিয়া মস্তক।
অঙ্গীকার কৈল আমি রচিতে পুস্তক।।
বিমর্ষি চাহিল পাছে আমি অল্পবুদ্ধি।
কেমনে জানিব এই রচনের শুদ্ধি।।

কিন্তু তারপরও 'পদ্মাবতী' মূলত গেয়কাব্য, পাঁচালির উচ্চকোটি রীতি। সমগ্র কাব্যে, পদ-গীতের শীর্ষে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। এর অর্থ, 'পদ্মাবতী'

সেকালে পরিবেশিত হতো। সেই পরিবেশনা দরবারি। এজন্য একে দরবারি-পাঁচালিও বলা চলে। এর দুটো রূপ কল্পনা করা যায়, একটি পরিবেশনমূলক অন্যটি পাঠ বা আবৃত্তিমূলক।

আলাউল সঙ্গীত ও নাট্যবিশারদ ছিলেন। তিনি স্বয়ং 'বহু' অমাত্যজনের 'পুত্র'কে নাট (পাঠান্তর—পাট) গান সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন—

ঃ রোসাঙ্গেতে মুসলমান যতেক আছেন্ত।
তালিব এলেম বলি আদর করেন্ত।।
বহু মহন্তের পুত্র মহা মহানর।
নাট গান সঙ্গীত শিখাইনু বহুতর।।[৫৬]

'নাটে'র পাঠান্তরে 'পাট' আছে। পাট হচ্ছে পালা। যেমন 'ধোবার পাট'', এক অর্থে তা 'অভিনয়'ও বটে।

'পদ্মাবতীর' নানা পদে গীতনাটের প্রসঙ্গ লভ্য। পদ্মাবতীর বিবাহ খণ্ডে আছে—

ঃ পিছল সৌরভ-পঙ্ক হৈল হাটে বাট।
যথাতথা রঙ্গরস দেখি গীতনাট।।
ইন্দ্রজালে শিল্পকারী দর্শায় কুহক।
মধ্যে মধ্যে নানা চঙ্গ করে বিদূষক।।
ক্ষেণে ক্ষেণে বহুরূপী নানা মূর্তি ধরে।
কিবা সত্য কৃত্রিম চিনিতে কেহ নারে।।[৫৭]

বহুরূপীর নানা রূপসজ্জা গ্রহণের উল্লেখও আছে এতে।

'শাস্ত্রের তত্ত্ব সওয়াল জিজ্ঞাসা' অধ্যায়ে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের নাম ও 'দাক্ষিণাত্য' নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়—

ঃ পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে, ভেউর কর্ণাল সাজে,
শানই বিগুল শিঙ্গাবাঁশী।
উরুমর্দ্দ মধুবিণী মুচঙ্গ উপাঙ্গ ধ্বনি,
আওর্জা সুষির রাশি রাশি।।
মুদ্রাকসি করতাল আত্তাজ কর্ণাল ভাল,
বিতত বাজয় বহুতর।
মুরল দুন্দুভি জোড়া বাজয় পেগম কাঁড়া,

ঢাক ঢোল ঘন মনোহর।।
রোবাব দোতারা বীণ কপিনাস রুদ্রবীণ,
সর্ম্মণ্ড বাজয় সুললিত।
তাম্বুরা কিন্নরী বেলা বিপঞ্চি সুস্বর তালা,
বাজে তত তাল রাগ গীত।।
চারি শব্দে মেলি বায় গায়ন্ত সুস্বর রায়,
তালে নাচে বেশ্যা নটীগণ।
পায় দক্ষিণাত্য নাচে নানা ছন্দে কাছে কাছে,
হস্তে নৃত্যে সাধু সম্মিলন।।[৫৮]

'ভরত নাট্যশাস্ত্রে' দাক্ষিণাত্য-নাট্যের প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' 'রামায়ণনাটে'র বর্ণনায়ও এর উল্লেখ দেখেছি।

বিবাহ খণ্ডের অষ্টম পদে 'মঙ্গল-গীতে'র উল্লেখ আছে—

ঃ সখী সবে একা মিলি নানা যন্ত্র বাএ।
কেহ কেহ সুস্বরে মঙ্গল গীত গাএ।।[৫৯]

বসন্তখণ্ডে 'মনুরা' ও 'ঝুমক' গীতের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে—

ঃ করন্ত বসন্ত পূজা হৈয়া পুলকিত।
হাসি খেলি সকলে ঝুমক গায় গীত।।
আজু হাসি খেলি লও দেব কর বশ।
কালি আসিবেক কোথা এই খেলা রস।।
রসকালে রসযুক্ত ভাবি চাহ মনে।
দিন ক্ষণ গণি পুনি আছয় শমনে।।
হুহুলি করিয়া বলে বারে বার।
মনুরা ঝুমক সবে গায়ন্ত সুস্বর।।

একই খণ্ডে 'চাচরি' নৃত্যের প্রসঙ্গ রয়েছে—

ঃ পঞ্চম সুস্বরে গাহে সুন্দর রমণী।
কেহ বীণা বাঁশী বাহে সুমধুর ধ্বনি।।
মন্দিরা মৃদঙ্গ কেহ বাএ করতাল।
পঞ্চ শব্দে বাজন বাজাএ অতি ভাল।।
নাচিছে চাচরি সঙ্গে তিল যথা রহে।

তফাত ফাগুর ধূলি অন্ধ সম হএ।।
সুগন্ধি ফাগুর রেণু উঠিল আকাশ।
শূন্য পরে পক্ষী সব হৈল রক্তবাস।।
রাতুল সকল মহী বৃক্ষপত্র সব।
পরিণত হৈল হেন নবীন পল্লব।।
এই মতে খেলিতে করিতে নৃত্য গীত।
মহাদেব মণ্ডাপেত হৈল উপস্থিত।।[৬০]

'শাস্ত্রের তত্ত্ব সওয়াল জিজ্ঞাসা করা' এবং 'রত্নসেনে জওাব দিবার বয়ান' অধ্যায়ে 'বররুচি' 'ভবভূতি' ও 'কালিদাসের নাম পাওয়া যায়—

৪ সব বলে তান কণ্ঠে ভারতী নিবাস।
কেবা বররুচি ভবভূতি কালিদাস।।
কবি বেদ মহাগুণী প্রাণে অকাতর।
সুরঙ্গর পন্থে কিবা আইল সুন্দর।।
অবশেষে করিলেক সঙ্গীত বিচার।[৬১]

রাজপুরীতে রত্নসেনের আগমন প্রসঙ্গে সুড়ুঙ্গ পথে বিদ্যার কাছে সুন্দরের আগমনের উপমা দিয়েছেন কবি।

ফারসী কবি নিজামীর হপ্তপয়কর অবলম্বনে আলাউল 'সপ্তপয়কর কাব্য' (১৬৫২-১৬৮৪ খ্রীঃ) রচনা করেন। ইরাকের অধিপতি সম্রাট নোমানের পুত্র বাহরাম গোর সপ্তবর্ণের সাতটি টঙ্গী বা প্রাসাদ নির্মাণ করেন। সাতটি টঙ্গীর সাত বর্ণ। বর্ণগুলি আবার সাতটি দিন ও সাত গ্রহের নাম অনুসারে নির্ধারিত করেছেন নিজামী। সাতটি টঙ্গীতে বিভিন্ন দেশের এক একজন করে সাত রাজকন্যা, যেমন—শনিবারের টঙ্গী, কালবর্ণ—রাজকন্যা ভারতীয়, রবিবাসরীয় টঙ্গী, হলুদবর্ণ—গ্রীক রাজকন্যা, সোমবারের টঙ্গী, মূরীয় রাজকন্যা—বর্ণ সবুজ, লালবর্ণের টঙ্গী, রুশদেশের রাজকন্যা, মঙ্গলবারে, খওয়ারিজমের রাজকন্যা বুধবার—ফিরোজা বর্ণের টঙ্গী, বৃহস্পতিবার চন্দন বর্ণের টঙ্গী—চীনা রাজকন্যা, গ্রহ জুপিটার, শুক্রবার সফেদ বর্ণের টঙ্গী, গ্রহ ভেনাস—পার্সী রাজকন্যা।[৬৩]

মূলে আছে যে বাহরাম গোর সাতদিন সাতরাজকন্যার টঙ্গীতে যান এবং প্রত্যেক রাজকন্যার কাছ থেকে একটি করে গল্প শুনেন।

আলাউল বাহরাম গোরের রাজ্যজয় ও সপ্ত রাজকন্যার কাছে সাতটি গল্প শ্রবণের কাহিনী অনুসরণে তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। পিতার মৃত্যুর পর বাহরাম গোর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হলেন। দুই বাঘের মধ্যবর্তীস্থানে রাজমুকুট রক্ষিত হলো, ইরাকের অধিপতি ব্যর্থ হলেন মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে নিজের হাতে মুকুট তুলতে। বাহরাম গোর অবলীলায় তা তুলে নিলেন—

ঃ সপ্ত রাজ্য জিনি সপ্ত রাজকন্যা আনি
সপ্তগৃহে দিল নিশা বাস।
আনন্দ উৎসবে রায় জে দিনে জে গৃহে জাএ
সবে পরে সেই বর্ণ বাস।।
নৃত্যগীত অবশেষে গোঁয়াইলা কেলি রসে
শয়ন সময়ে বাহরাম।
কহে রাজকন্যা প্রতি শুন ২ গুণবতী
কহ এক প্রসঙ্গ উপাম।।
এই মতে সপ্ত রাতি সপ্ত বিজ্ঞা কলাবতী
কহিলেক সপ্ত সুপ্রসঙ্গ।
এই পুস্তকের সূত্র শুন গুণী সাধু পুত্র
রস সিন্ধু অমিয়া তরঙ্গ।।৬৪

একটি পুথিতে গল্পের প্রারম্ভে আছে 'প্রথম কিচ্ছার শুরু'। অর্থাৎ এই কাব্য 'কিচ্ছা' রূপে সেকালে পরিবেশিত হতো।

জার্মান ভাষায় অনূদিত 'হপ্তপয়করে' নিজামীর সাতটি গল্পের কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত 'ইরানীয় 'মিনিয়েচার পেইন্টিং' সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলি পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে অঙ্কিত বলে উল্লেখিত। এই চিত্রদৃষ্টে নিজামীর কালে এবং সপ্তদশ শতক পর্যন্ত ইরানে প্রচলিত নৃত্যগীত ও সঙ্গীতের মাধ্যমে আখ্যান পরিবেশনের রীতি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি চিত্র অবলম্বনে ইরানীয় আখ্যান পরিবেশনের রীতি নিচে বর্ণিত হলো—

ঃ (ক) শনিবার—ভারতীয় রাজকন্যা।

রাজা বাহরাম গল্প শুনছেন রাজকন্যার মুখোমুখি বসে, দুপাশে পরিচারিকা, একজন বসে অন্যজন পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে।

(খ) দ্বিতীয় চিত্রে মঞ্চের বামদিকে দুজন বাদিকা একজনের একহাতে তারযন্ত্র অন্যহাতে ছড়, বামে রাজকন্যা গল্প বলছেন, বাহরাম গোর শায়িত।

(গ) গ্রীক রাজকন্যার গল্পকথনে দেখা যায়, সুসজ্জিত মঞ্চের পিছনে রাজা বা রাজকন্যা বসে আছেন তাদের বেষ্টন করে আছে গায়ক-গায়িকা ও বাদকদল। সম্ভবত এরা গানের দোহার। এই চিত্রে আছে তিনজন উপবিষ্ট নারী, মঞ্চের সম্মুখদিকে, সম্ভবত তারা কাহিনী পরিবেশন করছে।

(ঘ) নৃত্য ও গীতাভিনয়ের মাধ্যমে ইরানীয় আখ্যান পরিবেশনার প্রমাণ পাওয়া যায় আরও একটি চিত্রে। এতে দেখা যাচ্ছে মঞ্চের উর্ধ্বভাগে রাজা ও পার্সী রাজকন্যা বসে আছেন। রাজা ও রাজকন্যার উপবেশন স্থল থেকে নিচে প্রশস্ত মঞ্চের দুপাশে গায়ক ও বাদকদল, মধ্যভাগে এক নর্তকী নৃত্যপর। ৬৫

চিত্রগুলির বিবরণ এই জন্য দেওয়া হলো যে, বাঙলা প্রণয়মূলক পাঁচালির একটি প্রধান উৎস ইরান। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ইরানী সংস্কৃতির প্রভাবই সমধিক। কাজেই সেকালের রাজা-রাজড়া ও রাজদরবারকেন্দ্রিক কবিদের সঙ্গে ইরানীয় আখ্যান পরিবেশনারীতির পরিচয় থাকা (বা চিত্রাদি দৃষ্টে সে সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়া) অসম্ভব ছিল না।

'হপ্তপয়করে'র একটি পুথির ভণিতায় আছে—

ঃ শ্রীযুত ছৈঅদ মাহাম্মদ সুচরিতা।
তাহান আদেস হিন আলাঅলে গাএ।।৬৬

এ থেকে ধারণা করা যায় আলাউল স্বয়ং এ কাব্য সঙ্গীত সহকারে পরিবেশন করতেন।

অষ্টাদশ শতকে রচিত কবি দোনাগাজীর 'সয়ফুল-মুলুক-বদিউজ্জামাল' প্রণয়মূলক পাঁচালির ধারায়, বাঙলার লোকপ্রিয় আখ্যানগুলির অন্যতম। বাংলাদেশের সমুদ্রোপকূলীয় অঞ্চলে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যাত্রা-পালার আকারে এই আখ্যান পরিবেশিত হতো।

'আলফে লায়লায়' বর্ণিত '৭৫৭তম রজনীতে এ গল্পের শুরু এবং ৭৭৮-তম উষাকালে এর সমাপ্তি'।৬৭

'সয়ফুলমুলুক' পাঁচালিকাব্য। এ কাব্যের বিভিন্ন পদশীর্ষে ধুয়ার ব্যবহার দেখা যায়। কহতান রাণীর বিলাপের ধুয়া এক চরণবিশিষ্ট—

ঃ যাও যাও মাতা তুমি জামাতার ঘরে।[৬৮]

'কুমারের বিলাপ' শীর্ষক পদেও এক চরণের ধুয়া—

ঃ দুঃখ কাহিনী প্রিয়াতে কহিব কেবা গিয়া।[৬৯]

ধুয়ার ব্যবহার থেকে দোহারের অস্তিত্ব অনুধাবন করা যায়।

এ কাব্যের কোনো কোনো অধ্যায়ে কাহিনী বর্ণনার রীতি, ইরানীয় আখ্যান রীতির সঙ্গে তুলনীয়। অবশ্য এ রীতি 'কথাসরিৎসাগরে'ও দৃষ্ট হয়। এতে মূল গল্পের সঙ্গে, কৌশলে অন্য একটি আখ্যান এবং সে আখ্যানের সঙ্গে নতুন একটি প্রসঙ্গ বিস্তার করা হয়।

'কাবাইতে' জামালের চিত্র দর্শনে উন্মত্ত সয়ফুলের প্রেমাবেগ ভিন্নমুখে প্রবাহিত করার নিমিত্তে নৃত্যগীত ও গল্প-কথন-পটিয়সী 'যোষী কন্যা'কে আনা হলো—

ঃ সে দেশে আছিল এক যুষীর দুহিতা
চেতাইল কুমারক সেই সুচরিতা।[৭০]

রাজা তাকে অনুরোধ করলেন, সুত-উদ্ধার করে দিতে—

ঃ নৃপ বোলে শুন মাতা যুষীর দুহিতা
সুত উদ্ধার মোর তব্বি মোর সুতা।[৭১]

যুষী ভোলাতে চাইল সয়ফুলকে—

ঃ ... একাকী যুষীর কন্যা কুমারের ঘরে।
লইয়া জানুর পরে কুমারের মাথা
পড়এ কামদ শ্লোক বিরহের কথা।
কহএ কন্দর্প রোগ বিচ্ছেদ বিউগ
গাহএ কামদ গীত আমোদ সম্ভোগ।[৭২]

যুষী, ইউনান শহরের এক প্রেম কাহিনী শোনায় রাজপুত্র সয়ফুলকে।

দোনাগাজীর কাব্যেও চিত্রপটের প্রসঙ্গ আছে। বস্তুত চিত্রপট দর্শনের ফলেই সুদূরের এক অপরিজ্ঞাত নারীর জন্য সয়ফুলের প্রেমাবেগ জাগ্রত হয়। এই চিত্রে শুধু ছবি নয়, লেখাও আছে—

ঃ লিখিছে সুন্দরী নাম বদিউজ্জামাল
কন্যার পিতার নাম নৃপ শাহ্‌বাল।
গোলেস্তা ইবাম দেশের সেই রাজা
ইন্দ্রদেব গন্ধর্বে করএ তারে পূজা।
কুমারীর রূপগুণ মুরতি দেখিয়া
কামাতুর কুমার রহিল নিরক্ষীয়।[৭৩]

ছবি দর্শনে কামাতুর হবার কারণ, জামালের ছবি সেভাবেই অঙ্কিত হয়েছিল। মধ্যযুগে নানাবিধ যৌন-উত্তেজক চিত্রপট প্রচলিত ছিল বলে অনুমিত হয়েছে।[৭৪] এ কাব্যে 'রঙ্গ-ধামালি'র উল্লেখ দেখা যায়—

ঃ গাহএ রসের গীত যথ সোহাগিনী
রঙ্গের ধামানী সহেলা নাচনি।
সুন্দর সুন্দরী সব করি এক ঠাঁই
আইস এরূপ চাহি সোহাগ চড়াই।
জলুয়া খেলে গেরুয়া মেলে মনোহর আঁখি
অপরূপ রূপ চাহি নাচে সব সখী।
নতুন যৌবন সব নব নব বালি
করতালি দিয়া নাচে হেলায়এ কঁখালি।
ঠমকে নাচে গাএ ঠমকে বাড়াএ পাএ
ঠমকে হালিয়া পড়ি ঠমক করি গাএ।
রূপ গাহি গীত গাএ মধুর মধুর
পান খাইয়া উল্কা দিয়া লাগাএ সিন্দুর।
অমিয়া কৌতুক করি মিলি যথ আও (এয়ো)।
সব সোহাগিনী মিলি জলুয়া খেলাও।[৭৫]

ধামালি 'রঙ্গ-ধামালি' রূপেও পরিচিত ছিল সেকালে। এই নাট্যমূলক নৃত্যগীত নারীদের দ্বারা পরিবেশিত হতো। উদ্ধৃতি দৃষ্টে রঙ্গধামালি নৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গিরও পরিচয় লভ্য। এমন কি এর জন্য বিশেষ সাজ-সজ্জা গৃহীত হতো। পান খেয়ে নারীরা ঠোঁট রাঙাত, শরীরে আঁকত 'উল্কা' বা 'উল্কী'। সচরাচর এয়োতিগণ পানি ছিটিয়ে 'রঙ্গধামালি' পরিবেশন করত। এর অন্য নাম 'জলুয়া খেলা'।

দোনাগাজীর কাব্যে—'নটী' ও 'মঞ্চে'র উল্লেখ দেখা যায়। বরযাত্রা উপলক্ষে উৎসবের বিবরণ দিয়েছিন কবি—

ঃ দুম দুমি টিগরা ঢোল নাকাড়ার কোলাহল
মধুর নেপুর শিঙ্গা বাঁশী
ঝাঞ্ঝ কাঁস করতাল তাম্বুরা জম্বুরা ভাল
চারিভিতে শুনিতে উল্লাসী।
দো হারি মোহরি বীণা সবাসুত তস্করী দোনা
সর্বরঙ্গী সুরঙ্গী বাজান
মঞ্জির রবার সানি মৃদঙ্গ সারিন্দা ধ্বনি
কবিলাস বিলাস মদন।
ভাওইয়া ভক্ত বাণী নানা সুরে পুনি পুনি
গাহন্ত গাহন সারি সারি
নটীর মঞ্চ উপরি অপসরা বিদ্যাধরী
আবযথ (আর যথ?) আছে নৃত্যকারী।
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ কার রঙ্গ চাহে
কেহ করে আনন্দ বাজন---[৭৬]

এখানে 'ভাওইয়া' ভাব প্রদর্শনকারী, এর অন্য অর্থ অভিনেতা (অসমীয়-'ভাও')। নটীর নৃত্যাভিনয়ের নিমিত্তে তৈরি 'মঞ্চে'র উল্লেখ মধ্যযুগে আর কোনো কবির রচনায় আছে কিনা সন্দেহ।

দোনাগাজীর কাব্যে পয়ারেরই প্রাধান্য। নাচাড়ির সংখ্যা কম। তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতগুলি এই পাঁচালিকাব্যের পরিবেশনকে অবশ্যই আকর্ষণীয় করে তুলত।

অষ্টাদশ শতকের অপর কবি আব্দুল হাকিম, প্রণয়মূলক পাঁচালির ধারায় রচনা করেন 'ইউসুফ জলিখা' ও 'লালমোতি সয়ফুল মুলুক'। প্রণয়পাঁচালির ধারায় আঙ্গিকগত উৎকর্ষের বিচারে 'ইউসুফ জলিখা' নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এ কাব্যে পয়ার—নাচাড়ির ব্যবহার সুশৃঙ্খল ও পারম্পর্যময়।

কাব্যের দ্বিতীয় পর্বে জলিখার রূপ বর্ণনা ও ইউসুফের স্বপ্ন দর্শনের বিবরণ আছে। এ অধ্যায় পয়ার ছন্দে রচিত। জলিখার স্বপ্নে অবতীর্ণ হয়েছেন ইউসুফ—

ঃ হেনকালে রাজসুতা পালঙ্গ উপর।
নিদ্রায় পীড়িল আঁখি অতি ঘোরতর।।
অচৈতন্যে নিদ্রা যায় ত্রিলোক মোহিনী।
স্বপ্নেত আইল নব কাম গুণমণি।। ৭৭

এরপর 'রূপবান ইউসুফকে স্বপ্নে দেখার পর জলিখার অনুরাগ, জাগরণ ও বিরহঃ ধাত্রির সান্ত্বনা বাক্য' শীর্ষক পদ—দীর্ঘ ছন্দে রচিত—

ঃ এহিমতে নিরন্তর ক্ষেমি উত্তর পদুত্তর
এহি রূপ বির্ষএ মনে।
সেহিরূপ বিনিচিত্ত দগধএ প্রতিনিত্য
ধারা বহে যুগল নয়নে।।--৭৮

পরের পদ আবার 'পয়ার ছন্দ'—

ঃ এহিমতে বিরহে বিনয় নিরন্তর।
অনাহারে অনিদ্রায় গঞ্জিল বছর।।
হেনকালে দৈবগতি নিশি অবশেষ।
কন্যার নয়ানে কৈল্য নিদ্রাএ প্রবেশ।। ৭৯

পরের পদ আবার ত্রিপদী—

ঃ সখী চন্দ্রমুখী মুঞি প্রেম দুঃখী
মোতে কি পুছল বাত।
মোক প্রাণ প্রিয়া দরিশন দিআ
চিত করল উৎপাত।।৮০

এরপর পয়ার ছন্দ—

ঃ কৈন্যার বিরহ ব্যথা শুনি সখীগণ।
মন দুক্ষ ভাবি অতি করএ কান্দন।।
মনে ভাবে সখীগণে কার্য বিপরীত।
হৈল নৃপতি সুতা উন্মত্ত চরিত।।৮১

পরবর্তী পদ 'জলিখা-বিরহে সখীদের সমবেদনা'-ত্রিপদী (দীর্ঘ) ছন্দে রচিত—

ঃ এহি মতে সখীগণ করে কন্যা নিরীক্ষণ
পুছে বাক্য মনহিত আনে।
কহমোতে চন্দ্রমুখী কিরূপে স্বপ্নেত দেখি
হারাইলা হেতু বুদ্ধি জ্ঞানে।।[৮২]

এরপরের পদ পয়ার ছন্দ—

ঃ সখীগণ হোন্তে ধাই হইলা বাহির।
অলক্ষিতে ধায় জেহ্ন ধনু হন্তে তীর।।
প্রাণ নাথ প্রিয় ধাএ সখী সহচরী।
নিজস্থানে নৃপ সুতা সবে আনে ধরি।।[৮৩]

পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের এরূপ সমবন্টন মধ্যযুগের কাব্যে দুর্লভ। কবি আব্দুল হাকিম পাঁচালির পরিবেশনারীতিকে অধিকতর চলমানতা দান করেছেন, একথা বলা যায়।

এ কাব্যেও চিত্রপট দর্শনের প্রসঙ্গ আছে। কামটুঙ্গীর দেয়াল-চিত্র সম্পর্কিত কবির বর্ণনার কিছু অংশ উদ্বৃত হলো—

ঃ নির্মিলেক সে ঘরে সপ্তখণ্ড দূরে করে
স্বর্গ পুরী জেন সপ্তখণ্ড।
প্রতিখণ্ডে সিঙ্গাসন অতিশয় আভরণ
রাজপাট ছত্র নব দণ্ড।।
চন্দ্র সূর্য মণিময় দীপ্তি করে অতিশয়
নক্ষত্র ঝলকে জ্যোর্তিময়।
চিত্রপট লাখে লাখ পশু পক্ষী ঝাঁকে ঝাঁক
দেখিতে পরম শোভাকর।।
পুষ্প বৃন্দা সুশোভিত নানা পুষ্প বিকশিত
মধু পিএ ভোমরাএ পড়ি।
প্রতি পুষ্প বৃন্দা মাঝে ইসুফ জলিখা সাজে
রতিরসে দেহ জড়াজড়ি।।[৮৪]

কবির অপর কাব্য 'লালমোতি সয়ফুলমুলুক'। এ কাব্যের পঞ্চম পর্বে নৃত্যগীত প্রসঙ্গে 'রাজবেশ্যা'র উল্লেখ দেখা যায়—

ঃ চলিলেক সারি সারি যথ রাজবেশ্যা নারী
নৃত্যগীত অতি মনোহর।[৮৫]

বিবাহ উৎসব অধ্যায়ে আছে 'নাটুয়া' ও 'তাফাগণে'র (অর্থাৎ অপ্সরী) নৃত্যের বিবরণ আছে—

ঃ সাজ করে সুকুমার নানা বাদ্য নিরন্তর
নৃত্য করে নটুয়া সোন্দর।
স্থানে স্থানে তাফাগণে নাচএ আনন্দ মনে
নানান কৌতুক মনুহর।।[৮৬]

আব্দুল হাকিম তাঁর কাব্যকে 'পাঞ্চালি' রূপে উল্লেখ করেছেন—

ঃ শাহাবদ্দী মোহাম্মদ চরণ বন্দিআ।
আবদুল হাকিম কহে পাঞ্চালী রচিয়া।।

এ কাব্যে একাবলী ছন্দের ব্যবহার নিঃসন্দেহে পাঁচালির পরিবেশনরীতির বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করত সন্দেহ নেই।

অষ্টাদশ শতকের প্রণয়পাঁচালির অপর কবি সৈয়দ হামযা। এ কাব্যের সঙ্গে মনঝনের 'মধুমালতি'র মিল আছে। সৈয়দ হামযা তাঁর কাব্যকে পাঁচালিরূপে উল্লেখ করেছেন—

ঃ হামজা বলে সকলি করিতে পার তুমি।
মোরে কৃপা কর যে পাঁচালি রচি আমি।।[৮৭]

এ কাব্যে 'নটনটী' ও 'নাটগীতে'র উল্লেখ আছে—

ঃ নটনটী রমজানী গান কোকিলের ধ্বনি,
নৃত্য করে যেন ইন্দ্র নারী।
কিঙ্কর নগর মাঝে মঙ্গল বাজনা বাজে,
সুগন্ধে মোহিত করে পুরী।।
নাট গীত ঠাঁই ঠাঁই আনন্দের সীমা নাই,
নগরের প্রতি ঘরে ঘরে।

তাম্বুরা মঞ্জীর তূরী বেণু বাঁশী খঞ্জরী,
রাগ বাজা সবার দুয়ারে।।
ঢাক ঢোল কাড়া কাশী সারেঙ্গা দোতরা বাঁশী
মৃদঙ্গ মন্দিরা কত বাজে।
বিরস না থাকে কেহ নৃত্যগীত সবে মোহ,
ইন্দ্রের ভুবন যেন সাজে।[৮৮]

পরীগণ কর্তৃক নিশাযোগে মধুমালতীর রাজ্যে মনোহরের আনয়ন অধ্যায়ে রাজপুত্র মনোহরের সামনে নৃত্য ও নাটক ও পরিবেশনের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে—

ঃ একদিন মনোহর করিল আদেশ।
নৃত্য দেখিবার বড় হইল আবেশ।।
রাজার আদেশ পায় পাত্র মন্ত্রীগণ।
নর্ত্তকী নাটুয়া কত আনিল তখন।।
নাচুনী আইল যদি দরবারে।
নাচ বাজী ঠাট কৈল রাজার দুয়ারে।।
বাজীকর করে নানা পরীবন্দ।
ময়ূর পেখমে নাচে দেখি লাগে ধন্দ।।
কত টাকা কত বস্ত্র কৈল পুরস্কার।
কেহবা বসিয়া ছিল সমাজে রাজার।।
গগনে হইল নিশি দ্বিতীয় প্রহর।
নিদ্রায় কাতর হইল রাজা মনোহর।।
নাটুয়া নাটক বাজীগর যত জন।
সবারে বিদায় দিয়া উঠিল রাজন।।[৮৯]

এ থেকে দেখা যায় সেকালে নাটগীত, নাটক ও নৃত্য পরিবেশনের জন্য অর্থ ও পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল।

সৈয়দ হামযা পাঁচালি পরিবেশনায় 'ভঙ্গ রাগ ছন্দে'র ব্যবহার করেছেন—

ঃ মালতীরে পাইয়া কুমার
প্রেমাবেশে মত্ত হইল, আপনি ভুলিয়া গেল,
কহে কিছু করে ধরি তার।।
হের আইস প্রাণের প্রাণ।

দগধে আমার প্রাণে অন্তরে বসিলে কেনে,
কোল দিয়া কর পরিত্রাণ।।৯০

আবদুর রহিমের 'আসল গাজীর পুথি'তে এই ছন্দে রচিত গীত 'খয়েরা' নামে পরিচিত। 'খয়েরা' নৃত্যমূলক গান। এ ছাড়া 'একাবলী' ছন্দের ব্যবহারও আছে এ কাব্যে।

'মধুমালতি' কাব্যে নাটগীতের প্রসঙ্গ অন্যত্রও লভ্য। 'বিবাহ উৎসব' শীর্ষক পদে 'সবার দুয়ারে নাটগীতে'র উল্লেখ দেখা যায়—

ঃ নগরিয়া লোক যত সবে আনন্দিত।
রঙ্গরস সবার দুয়ারে নাটগীত।।৯১

'সবার দুয়ারে নাটগীতে'র কথা মানিকদত্তের' চণ্ডীমঙ্গলে'র কলিঙ্গ প্রসঙ্গে দেখা যায়।

সেকালে বাদ্যযন্ত্রের তালে 'ঘোড়াঘুড়ি' নৃত্যে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল। একই সঙ্গে 'নৃত্যকি' ও 'নাটুয়া' প্রসঙ্গ লভ্য—

ঃ নানাজাতি বাদ্য বাজে তবল দোকড়ি।।
মধুর বাজনে যার নাচে ঘোড়াঘুড়ি।।
জয় ঢোল কাড়াকাশী ভেউর ভুরঙ্গ।
তম্বুরা দোতরা বাজে মাদল মৃদঙ্গ।।
নৃত্যকি নাটুয়া কত নাচে ঠাঞী ঠাঞী।
নগরেতে আনন্দের সীমা সংখ্যা নাই।।৯২

সৈয়দ হামযার কালে প্রণয়পাঁচালি পরিবেশন ছাড়াও গ্রন্থাকারে পঠিত হতো বলে ধারণা করা যায়। কাব্য শেষে কবির আত্মপরিচয়ে 'পুঁথি' কেনাবেচার উল্লেখ আছে—

ঃ যে কেহো রসিক মোর পুঁথি নিবে কিন্যা।
লক্ষ তঙ্কা দান দিবে পুঁথির দক্ষিণা।।৯৩

এ অবশ্য কবির রসিকতাও হতে পারে।

পরিশেষে একথা বলা যায়, বাঙলা নাটকের বিশেষ রীতি—পাঁচালি, প্রণয়মূলক আখ্যানের ধারাকে আত্মস্থ করেই নতুন ও সমৃদ্ধতর শিল্পরূপে পরিণতি লাভ করেছিল।

টীকা

১. মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, *শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত, ইউসুফ-জোলেখা,* প্রথম প্রকাশ মে ১৯৮৪ ইং, পৃঃ পনের।
২. প্রাগুক্ত, পৃঃ একুশ।
৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪-৫।
৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৪।
৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৬।
৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯।
৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৮।
৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮-৯৯।
৯. আহমদ শরীফ, *বিদ্যাসুন্দরের কবি,* সাহিত্য পত্রিকা প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ ঃ ৭৭।
১০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২।
১১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৫-১১৬।
১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৮।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২০।
১৪. শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, *নেপালে বাঙ্গালা নাটক,* প্রকাশ-১৩২৪, পৃঃ ৬ ।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮।
১৬. আহমদ শরীফ, *বিদ্যাসুন্দরের কবি,* সাহিত্য পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ১২০-১২১।
১৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৩।
১৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৫।
১৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ১১৯।
২০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৮।
২১. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *শা'বারিদ খান গ্রন্থাবলী,* প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৭৩, জুন ১৯৬৬, পৃঃ ৮।
২২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।
২৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪ ।
২৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১-১২।
২৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২-১৫।
২৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯-২০।

২৭. শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, *নেপালে বাঙ্গালা নাটক*, প্রকাশ-১৩২৪, পৃঃ ২৮।
২৮. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *দৌলত উজির বাহরাম বিরচিত, লায়লী মজনু*, দ্বিতীয় প্রকাশ, অগ্রহায়ণ-১৩৭৩, ডিসেম্বর ১৯৬৬, পৃঃ ১১।
২৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২।
৩০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫।
৩১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮।
৩২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৯।
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১।
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২।
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪।
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬।
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৮।
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯।
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০।
৪০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১১-১১২।
৪১. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *মুহম্মদ কবীর বিরচিত মধুমালতী*, পৃঃ ৪।
৪২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১।
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।
৪৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯-১০।
৪৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।
৪৮. মযহারুল ইসলাম, মুহম্মদ আব্দুল হাফিজ সম্পাদিত, *সতীময়না ও লোর-চন্দ্রানী*, দৌলত কাজী, প্রথম সংস্করণ-ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯, পৃঃ ৫।
৪৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩।
৫০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮।
৫১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯।
৫২. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *কোরেশী মাগন চন্দ্রবতী*, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৭৪, (অক্টোবর ১৯৬৭), বাংলা একাডেমী, পৃঃ ১৪।
৫৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩।
৫৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬-৭।

৫৫. সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, *আলাওল পদ্মাবতী*, ১ম সং-১৯৬৮ ইং, পৃঃ ৭৩২।

৫৬. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত, *পদ্মাবতী*, প্রথম সং-ভাদ্র ১৩৫৬, পৃঃ৫।

৫৭. সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, *আলাওল পদ্মাবতী*, প্রথম সং-১৯৬৮ ইং, পৃঃ ৫৬৮।

৫৮ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত, *পদ্মাবতী*, প্রথম সং-ভাদ্র ১৩৫৬, পৃঃ ২৮০-২৮১।

৫৯. সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, *আলাওল পদ্মাবতী*, প্রথম সং-১৯৬৮ ইং, পৃঃ ৫৭৫।

৬০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮০-৪৮১।

৬১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত, *পদ্মাবতী*, প্রথম সং-ভাদ্র ১৩৫৬, পৃঃ ২৬৪।

৬২. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত, *পুথি-পরিচিতি*, ১ম সং-ঢা.বি.১৯৫৮, পৃঃ ৫৫৭।

৬৩. Nizami; *The Story of The Seven Princesses*, Translated from the Persian and Edited by DR. R. Gelpke., English Version by Elsie and George Hill. 1976 Bruno Cassirer (Publishers) Ltd. Page No -5.

৬৪. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত, *পুথি-পরিচিতি*, প্রথম সং-ঢা.বি. ১৯৫৮, পৃঃ ৫৫৮।

৬৫. Nizami, *The Story of The Seven Princesses*, Translated from the Persian and Edited by DR. R. Gelpke., English Version by Elsie and George Hill. 1976 Bruno Cassirer (Publishers) Ltd. Page No -6.

৬৬. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত, *পুথি পরিচিতি*, ১ম সং-ঢা.বি.১৯৫৮, পৃঃ ৫৬৩।

৬৭. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *দোনাগাজী বিরচিত সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল*, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৮১, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫, পৃঃ ২।

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬।

৭০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫।

৭১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯।

৭২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮০।

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮।

৭৪. মৎ প্রণীত, *তিনটি মঞ্চ-নাটক*, প্রথম প্রকাশ-মাঘ ১৩৯২, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬, পৃঃ ১৯০।

৭৫. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *দোনাগাজী বিরচিত সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল*, প্রথম প্রকাশ মাঘ, ১৩৮১, পৃঃ ৪৫২।

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮৩।

৭৭. রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত, *আব্দুল হাকিম রচনাবলী*, প্রকাশকাল, জুলাই ১৯৮৯, পৃঃ ৬।

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।

৮০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।

৮১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।

৮২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫-৮৬।

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩।

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৭।

৮৭. সৈয়দ আলী আহ্সান সম্পাদিত, *সৈয়দ হামযা বিরচিত মধুমালতী*, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ-১৩৮০, পৃঃ ৫৫।

৮৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২।

৮৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩।

৯০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৪।

৯১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৭।

৯২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৮।

৯৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩২।

অষ্টম অধ্যায়

[পীরপাঁচালি—বিভিন্ন কবি রচিত সত্যপীরপাঁচালি, শ্রীকবিবল্লভ রচিত 'সত্যনারায়ণের পুথি' গরিবুল্লাহ রচিত 'সত্যপীরের পুথি' তাহির মাহমুদ ও কৃষ্ণহরিদাসের 'সত্যপীরের মাহাত্ম্য কথা', কবি আরিফের 'লালমনের কেসসা', বিভিন্ন কবির গাজী মাহাত্ম্যমূলক কাব্য, কৃষ্ণরামদাসের 'রায়মঙ্গল', শেখ ফয়জুল্লাহর 'গাজীবিজয়', আব্দুর রহিমের 'আসল গাজীর পুথি'। আসাম ও বাঙলাদেশে গাজীরগানের পরিবেশনারীতি, গাজীরগানের মৌখিকরীতি, মানিকপীরের গাথা, খোয়াজখিজিরের পালা, 'বড়পীরের পালা', 'পীরগোরা চাঁদ', 'মাদারপীর' প্রমুখ পীরপালার পরিবেশনারীতি।]

মধ্যযুগে বিভিন্ন পীরের পূজা বা সেবা-কেন্দ্রিক ব্রতকথা ও কৃত্যমূলক-পাঁচালির উদ্ভব ঘটে। এই পীরদের মধ্যে কেউ কেউ বাস্তবে বিদ্যমান ছিলেন, আবার কেউবা লোকমানসের উদ্ভাবনা। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, সত্যপীর, গাজীপীর, মানিকপীর, খোয়াজখিজির, বড়পীর, মাদারপীর প্রমুখ।

পীরবাদের উৎস সপ্তম অষ্টম শতকের ইরান, ইরাক ও সিরিয়া। ইসলামে মরমীবাদের উদ্ভবের ফলে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মাচরণের বাঁধাধরা প্রথার ক্ষেত্রে সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পুনরাবিষ্কৃত হলো। মরমীবাদ যা সুফীতত্ত্ব নামে পরিচিত তাতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক 'মাশুক' 'আশক' বা 'আশেক' ও প্রেমাস্পদের সম্পর্ক। পরবর্তীকালে এই নব্য ধর্মতত্ত্ব পীর-দরবেশ ও তাঁদের অনুসারীদের দ্বারা ভারতবর্ষে প্রচারিত হলো।

বাঙলায় নাথপন্থীদের কঠোর তপস্যা, কঠিন আত্মনিগ্রহমূলক বৈরাগ্য ও অতিলৌকিক ক্ষমতার কল্পকথা প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালী মানসে ছিল দৃঢ়মূল। প্রচলিত ধর্মসংঘের বিরুদ্ধে উদ্ভূত নাথসিদ্ধাদের সহজিয়াপন্থা সেকালে শুধু বাঙলায় নয়, সর্বভারতেও ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। গোরক্ষনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, হাড়িপা প্রমুখ

নাথসিদ্ধা প্রাচীনকাল থেকে সাধনা ও সিদ্ধির মূর্ত প্রতীকরূপেই গৃহীত হয়েছিলেন। সুফীতত্ত্বের সাধক পীর-দরবেশদের সঙ্গে নাথগুরুদের ধর্ম-সাধনাপন্থার খানিকটা ঐক্য আবিষ্কার করা দুরূহ নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দরবেশদের ধর্মসাধনায় হলকায়ে-জিকির, নৃত্য-গীত-বাদ্যসহকারে পরিবেশিত হয়। সুফীতত্ত্বের সাধক 'ঘূর্ণায়মান দরবেশ' এর সঙ্গে নাথসিদ্ধাদের নৃত্যগীতের তুলনা চলে। মীননাথের সম্মুখে গোরক্ষনাথ 'নাটুয়া'র ছদ্মবেশে নৃত্যগীত করেছিলেন। 'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাসে' 'ফকির ও যুগী' সমার্থকরূপে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। আমাদের লোকমানস নাথপন্থার সঙ্গে সুফীতত্ত্বের এক দার্শনিক যোগসূত্র আবিষ্কার করেছিল এবং সেই ধারা আজও লোকায়ত সমাজে বহমান। এর প্রমাণ একালে প্রচলিত 'গোর্খের পালা' 'তোনাই মোনাইর পালা' প্রভৃতি লোকনাট্য।

সুফীতত্ত্বের ধারায়, হলকায়ে জিকির, ধ্যানমগ্নতায় আত্মার নানা রূপদর্শনের প্রয়াসের সঙ্গে বাঙালীর নিজস্ব দর্শন সাংখ্যযোগতন্ত্রের একটি গভীর মিল আছে। অনাত্মবাদী বৌদ্ধ ধর্মদর্শন বাঙলায় সহজিয়া পন্থায় রূপান্তরিত হয়েছিল, এর 'ডোম্বি' বা 'নৈরামণি' তত্ত্বের মধ্যে অনাত্মবাদের প্রভাব নেই বললেই চলে।

কায়াসাধনার যে রীতি সুফিবাদে প্রত্যক্ষ করা যায়, তার সঙ্গে সিদ্ধাচার্যদের কায়াভাবনার মিল আছে। চর্যাপদের শিল্পরীতি ইরানে বাহিত হবার ধারণা যদি সত্য হয় তবে এও বলতে হয় যে ইরানী সুফিবাদে দেহতত্ত্বের যে অল্প বিস্তর প্রভাব তাও বাঙলার।

সপ্তদশ শতকে বাঙলায় পীরপূজাকেন্দ্রিক পাঁচালির উদ্ভব। সুফীতত্ত্বের পীর আধ্যাত্মিকগুরু এবং তিনি আত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে, স্রষ্টার 'দিদার' লাভে শরণাগতের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু বাঙলা পীরপাঁচালি কাব্যে যেসকল পীর-দরবেশের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাদের জীবনকথা, অলৌকিক ক্ষমতা, হিংস্রতা ও ভক্তবাৎসল্যের রূপ, মঙ্গলকাব্যের পূজালোভী দেবদেবীর তুল্য।

পীরকথার আদি নিদর্শন 'সেখশুভোদয়া'য় জালালুদ্দিন তাব্রিজীর মহত্ত্ব, ঔদার্য ও শিল্পকলা প্রীতির যে পরিচয় লভ্য পাঁচালির পীরগণের ক্ষেত্রে তা দৃষ্ট হয় না। উপরন্তু মঙ্গলকাব্যের ভাবগত বা কোনো ক্ষেত্রে আঙ্গিকগত প্রভাব সত্ত্বেও পীরপাঁচালি কাব্যমূল্যের বিচারে মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে তুলনীয় নয়। পীরপাঁচালির কাহিনী পরিকল্পনা গতানুগতিক, এর ভাষারীতিতে কাব্যিক উৎকর্ষ দুর্লভ। দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া পীরপাঁচালির কোথাও মঙ্গলকাব্যের মতো দেশকাল-সমাজের বাস্তব

পরিচয় উদ্ভাসিত হয় নি। এ-রীতির পাঁচালিকাব্যের সর্বত্র এক নিরর্থক অলৌকিকতা মানুষের প্রকৃত পরিচয় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। পীরের ইচ্ছাই জীবনের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি, পীরের পরিতুষ্টিই মোক্ষ, ইহজাগতিক ভালমন্দের তিনিই মূল নিয়ন্তা। পীরগাথা তাই কৃত্যমূলক, ঔপচারিক পাঁচালি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় যে, এসকল পীর-দরবেশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা কৃত্যপাঁচালির ধারা আজও আমাদের জনগণের নাট্যরসপিপাসা নিবৃত্ত করে চলেছে।

পীরপাঁচালি মূলত অসাম্প্রদায়িক মনের সৃষ্টি। পীরের 'সেবা' 'হাজোত-মানোত' প্রভৃতি কৃত্যে হিন্দু মুসলমান সকলেরই সমান অধিকার। এ-শ্রেণীর পাঁচালিতে হিন্দু-মুসলিম পুরাণের একটি সমন্বিত রূপ আবিষ্কারের প্রয়াস আছে। সকল পীরগাথায় তাই ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে আমাদের লোকমানসের একটি বিশিষ্ট দিকের পরিচয় লভ্য। আধুনিককালের রাষ্ট্রব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার উত্থানেরকালে, পাঁচালিকাব্যের এই ক্ষয়িষ্ণু ধারাতেই সাম্প্রদায়িক ঐক্যের এক নিগূঢ় সঙ্কেত পাওয়া যেতে পারে। পীরগাথাগুলি আমাদের সমাজ-মানসের সাংস্কৃতিক-নৃতাত্ত্বিক বিবর্তনের সাক্ষ্যবাহী।

পীরগাথা উদ্ভবের নেপথ্যে আছে, আনুষ্ঠানিক কৃত্য ও ব্রতকথা। যে সকল পীরের অলৌকিক জীবনকথা কাব্যরূপ লাভ করে নি সেগুলো এখনও ছড়া বা ব্রতকথা রূপে লভ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'সত্যপীর' বা 'সত্যনারায়ণ' এবং 'গাজীপীরের' জীবনকথা পূর্ণাঙ্গ পাঁচালি অর্থাৎ কাব্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু 'মাদারপীর' বা 'খোয়াজখিজিরে'র কাহিনী এখনও ক্ষীণাঙ্গ পাঁচালি বা জারি ও ব্রতকথা রূপে বিদ্যমান। লৌকিক দেবদেবীর ক্ষেত্রেও এরূপ দেখা যায়, যেমন 'ত্রিনাথ' (এই দেবতার পূজা আসামেও প্রচলিত আছে) 'মাকাল ঠাকুর', 'আটেশ্বর', 'রঙ্কিণী', 'করম রাজা', 'সিনি দেবী', 'ক্ষেত্রপাল', 'ঘাঁটু দেবতা', 'ওলাবিবি', 'হাঁড়ি ঝি', 'যোগাদ্যা', 'বড়াম', 'রাজবল্লভী'।

সত্যপীর ব্রতকথায় পীরের সিন্নি দিয়ে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ধনবান হবার কাহিনী আছে।[১] সত্যপীরের কাহিনী অবলম্বনপূর্বক সর্বপ্রথম কাব্যচরনা করেন 'গোরক্ষবিজয়' ও 'গাজীবিজয়ে'র রচয়িতা শেখ ফয়জুল্লাহ। এরপর এ ধারায় অজস্র কবির সাক্ষাৎ মেলে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন, ভৈরব ঘটক, ঘনরাম চক্রবর্তী

রামেশ্বর চক্রবর্তী, ফকির গরিবুল্লাহ, শ্রীকবিবল্লভ, দ্বিজরামকৃষ্ণ, তাহির মাহমুদ প্রমুখ। কোনো কোনো কবি উনিশ শতকেও সত্যপীরের কাহিনী রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন ফৈজুল্লা।[২] ভারতচন্দ্র 'সত্যপীরের ব্রতকথা' ও 'সত্যনারায়ণ মাহাত্ম্যকথা' রচনা করেন।

শ্রীকবিবল্লভ রচিত সত্যনারায়ণের পুথি আসলে 'মদনসুন্দরের পালা'। এ কাব্যে বাণিজপুত্র মদন ও রাজকন্যা কুন্তলার প্রণয়কাহিনী রূপকথা ধরনের। সংক্ষেপে এর কাহিনী বিবৃত হলো—

ঃ সদানন্দ ও বিনোদ সদাগর রাজার 'আঙ্গায়' 'মধুকর' সাজিয়ে সফরে যাবার কালে ছোট ভাই মদনের উপর দুই স্ত্রী সুমতি ও কুমতির দায়িত্ব অর্পণ করল। সুমতি 'কণক কঙ্কণ' আর কুমতি 'সুবর্ণের সিথি' আনতে বলল। তারপর—

ঃ পশ্চাত মদন বলে ভাই বিদ্যমান।
আমার কারণে দাদা আনিহ্ সয়চান।।[৩]

'জয়পত্রে' যার জন্য যা আনতে হবে তা লেখা হলো।

যাত্রাপথে, 'হুগলি', 'দেগঙ্গা', 'খড়দহ' ও 'মগরা সাগর' অতিক্রমপূর্বক 'কহর' নামক সাগরে এসে পৌছাল মধুকর। সত্যপীরের ছলনায় সেখানে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখল দু'ভাই—

ঃ সদাগরে বিড়ম্বনা করেন খোদায়।
পাথরের গৌর এক ভাসায় দরিয়ায়।।
নিত্য করে নিত্যকী কীর্ত্তরে গিত গায়।
দরিয়ার বিচেতে অপূর্ব্ব সোভা পায়।।
মৃগছাল পানির উপরে ডালা দিয়া।
চারি ফকির নিমাজ করে পশ্চিম মুখ হয়্যা।।[৪]

এই অভূতপূর্ব দৃশ্য পাছে কেউ অবিশ্বাস করে সেজন্য দুভাই ডিঙার কর্ণধার ও কাণ্ডারগণকে দেখিয়ে সাক্ষী করে রাখল। অতঃপর তারা উপনীত হলো 'বর্ণ্ণেশ্বর নৃপতি'র রাজ্যে। মধুকরে 'গাঠ্যার গাবর'দের গীতবাদ্য শুনে নৃপতি বর্ণেশ্বর কোটালকে পাঠালেন এই বলে যে—

ঃ ঘরদল জদি হয় পৌরুষ করিবে।
পরদল জদি হয় বান্ধিয়া আনিবে।।[৫]

দুভাই 'নৃপতির স্থানে' এল। তারপর কহর দরিয়ায় দেখা সেই অদ্ভুত দৃশ্যের কথা বলল রাজাকে—

ঃ রাজা বলে জদি সত্য তোমার বচন।
তুরঙ্গ বারণ দিব চামর চন্দন।
মিথ্যা হইলে গাঠ্যার গাবরে দিব ষুলী।
তোমারে কাটিয়া সাধু পূজিব বাষূলী।।[৬]

সওদাগর ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে গেলেন। সত্যনারায়ণের ছলনায় সওদাগর তাঁকে কিছুই দেখাতে পারল না। তারপর—

ঃ নৃপতি বলেন দ্বিজ করি নিবেদন।
আপনার সাক্ষে বেটা হারিল আপন।।
কোটালে করিল আঙ্গা বান্ধিল সাধুরে।
লুটিয়া নায়ের মার্ত্তা নিলেক ভাণ্ডারে।।[৭]

এদিকে সুমতি কুমতি শিবপূজা দিতে গিয়ে একদিন 'খোদা' অর্থাৎ সত্যপীরের দেখা পেল।

সত্যপীরের যেন বালকৃষ্ণেরই প্রতিমূর্তি—

ঃ সুমতি বলেন দিদি হর দেখ চায়্যা।
অপূর্ব্ব ফকির এক আছে দাণ্ডাইয়া।।
বয়েস প্রবিন নয় বৎসর বারর।
নবদল শ্যাম যেন নন্দের কিশোর।।[৮]

সত্যনারায়ণ তাদের বললেন 'হও পুত্রবতী'।' স্বামীর অবর্তমানে তারা পুত্রবতী হবে কি করে ?—

ঃ তারা বলে হেন কি পুরিব মনোরথ।
ভগে ভগে জর্ম্ম কি হইব ভগীরথ।।[৯]

'ছেণ্ডা কাঁথা গায়' ফকিরকে দেখে তারা অবজ্ঞা করে—

ঃ ফকীরের পানে ঘন চাহে দুই জায়।
কোথাকার ফকীর দেখ সিব হতে চায়।।

তারপর—

ঃ হর হরি এক তনু বেদে ইহা কয়।
ফকিরে কহেন আমি সেই মৃত্যুঞ্জয়।।

চন্দ্রসূর্য্য তরু লতা সভে হয়্যা সাক্ষী।
পুত্র বরে বাজ পড়ু ত্রিলোচন দেখি।।
হর হরি এক তনু হল্যা আচম্বিত।
পঞ্চ মুখে রাম নাম বলি গান গীত।।
সিঙ্গা বরে রাম নাম ডম্বুরে বলে হরি।
কুচনীর দ্বারে যেন নাচে ত্রিপুরারি।।
দুই জায়ে সত্যপীর হল্য বরদাতা।
কালিয়া দিস্তার গেল গায়ের ছিণ্ডা কাঁথা।।[১০]

অবশেষে দুই 'জা' ডাকিনীমন্ত্র পেল সত্যপীরের কাছ থেকে। মায়াবৃক্ষে ভর করে সর্বত্র আসা যাওয়ার ক্ষমতা লাভ করে তারা, এইজন্য আয়ত্ত করে ডাকিনীসাধনা।

একদিন দুই ভ্রাতৃবধূ সুমতি-কুমতি রাজকন্যা কুন্তলার স্বয়ম্বর সভায় যাবার পরিকল্পনা করে। তারা দেবর মদনসুন্দরকে রাতে বিছানায় শুইয়ে, নিজেরা সাজগোজ করে বেরিয়ে পড়ে 'কুন্তলানগরে'র উদ্দেশ্যে। মদন ঘুমের ভান করে সুমতি-কুমতির পরামর্শ শুনে আগে ভাগে গিয়ে ডাকিনী-বৃক্ষের কোটরে লুকিয়ে থাকে। যথারীতি বৃক্ষ এসে উপনীত হয় স্বয়ম্বর সভায়। সত্যপীরের প্ররোচনায় কুন্তলা একশ বরের কাউকে পছন্দ করল না, সে মালা পরিয়ে দিল মদনের গলায়—

ঃ মদন সুন্দরের গলে কন্যা মালা দিল।
এক সত বর তারা হেট মাথা হল্য।।[১১]

মদনসুন্দরের পরিচয় কেউ জানত না। তাই কন্যা অপরিচিত এক 'কাঙ্গাল'কে বরণ করায় সবাই ধিক্কার দিল। রাজা রাণীও ক্ষিপ্ত হলেন—

ঃ মহারাণি বলে ধিক দারুন বিধাতা।
আমার কপাল দোষে রাখাল জামাতা।।[১২]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবাহ হলো। সবই সত্যপীরের কৃপা—

ঃ নমো নমো সত্যপীর নোঙাইয়া সির।
আহা কি অপূর্ব্ব কলি যুগেতে জাহির।।
সুনহ সকল লোক অপূর্ব্ব কথন।
সত্যপীর ব্রতকথা তুল্য নারায়ণ।।[১৩]

বিবাহের রাতে মদনসুন্দর ও কুন্তলার 'পাসাখেলা' শুরু হলো। খেলায় বাজি ধরা হলো—

ঃ কন্যা বলে কান্তজদি একবার জিনিব।
ছেড়া ধুতি দুখানি তোমার কাড়্যা নিব।।
বর বলে বিধুমুখি না কর গুমান।
জিনিঞা করির তোরে কুপতি সমান।।[১৪]

এমন সময় ক্ষুধার্ত হলো মদনসুন্দর। কুন্তলা তার জন্য 'মঙ্গলা তণ্ডুল হাঁড়ি' নিয়ে রন্ধন করল। কিন্তু রান্না শেষে—

ঃ বিধুমুখি বলে কিবা উপায় করিব।
পত্র পাত্র দুই নাই কিসে অন্ন দিব।।[১৫]

মদন বুদ্ধি দিল দুজনের হাতে দুখানি 'ছামনি পত্র' আছে, তা দিয়েই অন্ন বেড়ে খাবে তারা, কুন্তলা তাই করল। তারপর ভোজন পর্ব সমাধা হলে কুন্তলা ঈশান দিকে 'হাণ্ডী পাঙস-পত্র' পুঁতে রাখে।

রাজকন্যা ঘুমিয়ে পড়ল, মদনও আচ্ছন্ন হলো গভীর ঘুমে। সে স্বপ্ন দেখল— সত্যপীর ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলছে—

ঃ সুনরে বেইমান হিন্দু বাত কহু তোরে।
কত নিদ্রা যাও তুমি পুষ্পের মন্দিরে।।
রাজকন্যা কোলে করি দিলে হল্যে বোধ।
গর্দ্দান তুড়িব তোর সুন বেটী....।।

স্বপ্ন ভেঙে গেল মদনসুন্দরের। ঘুমন্ত কুন্তলার আঁচলে সে লিখল এক পত্র—

ঃ নেতের আচল বর করেতে ধরিয়া।
কজ্জল লতার কালি কলমে তুলিয়া।।
নিজ পরিচয় সব লিখেন বসিয়া।
সতী হলে উদ্দেস করিব মোর গিয়া।।
সপ্তগ্রামে ঘর করি নাম মোর মদন।
ডাকিনীর মন্ত্র জানে জা দুই জন।....[১৬]

মদন নিদ্রাতুর রাজকন্যার আঁচলে লিখল, কেমন করে সে স্বয়ম্বর সভায় এল। তারপর আরও অনেক কথা লিখে সে গিয়ে মায়াবী বৃক্ষের কোটরে লুকিয়ে রইল।

পরদিন বরের নিরুদ্দেশ হবার খবর শুনে 'সতবর' নতুন করে কুন্তলাকে বিবাহের জন্য ফন্দী আঁটল। রাজকন্যা শর্ত দিল—

ঃ সেস রাত্রে প্রভু সঙ্গে জে হয়্যাছে কথা।
সে কথা কহিবে জে সে আসুক হেথা।।

কেউ তা পারল না। কিন্তু একজন মন্ত্রণা করে জানার চেষ্টা করল মদনসুন্দর কি বলেছিল শেষ রাতে। সে পাঠাল মালিনীকে—

ঃ সুন গো মালিনী বুড়ি লক্ষ্য টাকা নে।
বর কন্যার সমাচার মোরে আন্যা দে।।[১৭]

মালিনী খবর সংগ্রহ করে গেল বিবাহ প্রার্থী সেই রাজপুত্রের কাছে। যথা সময়ে পরীক্ষা দিতে এল রাজপুত্র। দুটো কথা সত্য হলো তার, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর হার মানল সে—

ঃ কন্যা বলে বর কহিলে মনের হরিসে।
দুই কথা সত্য বটে ভোজন কৈলে কিসে।।
অনুভব করিয়া রাজার সুত বলে।
অন্ন ব্যঞ্জন দিলে সুবর্ণের থালে।।
সুনিঞা রাজার কন্যা বাড়িল কৌতুক।
পত্র পাত্র নাঞি বর হল্যে অধোমুখ।।[১৮]

রাজকন্যা একশত পাণিপ্রার্থীসহ মধুকর ডিঙায় গঙ্গাতীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। সপ্তগ্রামের ঘাটে ভিড়ল ডিঙা। সে-দেশের রাজার কাছে বিচার চাইল, যে তার প্রকৃত বর, বাসর ঘরে শেষ রাত্রে কুন্তলা ও তার স্বামীর কথাগুলো সে-ই বলতে পারবে। মদন 'ছেড়া ধুতি গায়' দিয়ে এল সভায়। কেউ উত্তর দিতে পারল না। কুন্তলা রাজসভাকে নিন্দা করে আবার ডিঙায় আরোহণ করল—

ঃ এমন সময় বলে মদন সুন্দর।
আমি জিন্যা দিব কন্যা সুন নৃপবর।।
মদন সুন্দরের কথা নৃপতি সুনিঞা।
পুনরপি রাজকন্যায় আনে ফিরাইয়া।।[১৯]

মদন এবার একে একে সকল ঘটনা বিবৃত করল। সভা বিস্মিত হলো। এমন কি সে 'বাসরের ইসানে' পুতে রাখা 'পত্রপাত্রও' তুলে দেখাতে পারে বলে জানাল রাজসভাকে। কুন্তলা আবেগদীপ্ত কণ্ঠে তখন বলে—

ঃ কন্যা বলে হারাইয়া কৃষ্ণ পাইলাম আমি।
না কর কপট হেদে সেই প্রভু তুমি।।
পুনর্ব্বার মালা দিল মদনের গলায়।
এক সত বর তারা পড়িল লজ্জায়।।[২০]

কুন্তলা ঠাঁই পেল মদনসুন্দরের গৃহে। কিন্তু এবার সুমতি-কুমতি মেতে উঠল এক গভীর ষড়যন্ত্রে। কারণ তারা বুঝে ফেলেছে যে, মায়াবী বৃক্ষে তাদের নৈশবিহার কালে গাছের কোটরে থেকে দেবর মদনসুন্দর গোপনে সকল কিছু দেখে ফেলেছে। সুতরাং বিষ প্রয়োগে মদনকে হত্যা করতে হবে। স্বয়ং সত্যপীর এ মুহূর্তে আবির্ভূত হন 'বান্যা'র ঘরে, যাতে করে বণিক সুমতি-কুমতির কাছে বিষ বিক্রি না করে। তারা বিষ না পেয়ে ফিরে আসে যখন, সত্যপীর পথ আগলে দাঁড়ান—সত্যপীর বললেন যে, কাউকে হত্যা করে গোপন করা যায় না বরং আমার কথা শুন, আমি এমন 'ঔষধ' দেব যে, তা খাইয়ে দিলে মদনসুন্দর 'সয়চান' পাখিতে রূপান্তরিত হবে। সুমতি-কুমতি তাই করল।

মদন 'সয়চান' পাখিতে রূপান্তরিত হলো। সত্যপীর বাজপাখি হয়ে তাড়া করে তাকে নিয়ে গেলেন দু'ভাই যে রাজ্যের পাটনে বন্দী হয়ে আছে সে রাজ্যে। ইতোমধ্যে দেওয়ানপীর স্বপ্নে দেখালেন সেদেশের রাজাকে—ভয়ঙ্কর সব দৃশ্য, রক্ত নদীর স্রোত, শহর জুড়ে অগ্নিকাণ্ড। শেষ রাতের স্বপ্ন মিথ্যা হবার নয়, রাজা বন্দীদ্বয়কে মুক্তি দিলেন।

এবার গৃহে প্রত্যাবর্তনের পালা। সদাগর ভ্রাতৃদ্বয়, মদনসুন্দরের সয়চান পাখি নেওয়ার জন্য 'সত টাকা' দিল 'আক্কেটী'কে। কিন্তু সে পাখি আর পাওয়া যায় না। এবারও মুশকিল আহসান করেন পীর—

ঃ এমন সময় পীর কাঁথা দিয়া গায়।
পাবে রে সয়চান পক্ষ মোর সঙ্গে আয়।।
সওয়া সের মিঠাই সিরনি দেহ মোরে।
একিদা করহ সত্য আমার হুজুরে।।[২১]

ব্যাধগণ 'আঠাকাঠি' দিয়ে যে-সয়চান পাখিটি ধরল আসলে সে-ই মদনসুন্দর।

দু'ভাই পাখি নিয়ে গৃহে এল। সুমতি-কুমতি এবার গল্প ফাঁদল, ছ'মাস আগে মদনসুন্দরের মৃত্যু হয়েছে। দু'ভাই শোকার্ত হলো মদনের জন্য। কুন্তলার ঘরে পাঠিয়ে দিল সুবর্ণপিঞ্জরে রাখা 'সয়চান' পাখিটি। কারণ মদন এই পাখিটি চেয়েছিল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের কাছে। পাখি দেখে কুন্তলা যন্ত্রণায় ছটফট করে—

ঃ ... রাজার নন্দিনী কান্দে প্রাণনাথ বিনে।।
প্রভু আনিবার পক্ষ কয়্যা ছিল তোরে।
তাহাতে যন্ত্রণা দিতে তুমি আল্যে ঘরে।।
প্রাণনাথ থাকিত খাইতে তোর মাংস।
হেন বুঝি মোর মাংসে তোর অভিলাষ।।[২২]

সত্যনারায়ণ এলেন এবার কুন্তলার কাছে ভিক্ষা নিতে, কুন্তলা কেঁদে আকুল। সে সেরেক তণ্ডুল পায়, দুই দাসীসহ মাত্র একসন্ধ্যা খায়। পীর বলেন, যদি তা না থাকে তবে সওয়া মুঠি 'খুদ' এনে দিতে, তাতে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। কুন্তলা তাই করল। দাসীর হাতের খুদ 'মুকতা' হলো। সে মুক্তা বিক্রি করে কুন্তলা সত্যপীরের 'সিরিনি' করল। সবার জন্য 'সিরিনি' বাট করে দেবার সময় হঠাৎ মনে পড়ল 'সয়চান' পাখির কথা। কারণ—

ঃ হুকুম কাহারে নাহি করিতে বঞ্চিত।
অতএব পক্ষের মুখে দিলেন তুরিত।।
পীরের সিরনী পক্ষ বদনে লইল।
সুবর্ণ পাঞ্জর ভাঙ্গি চারিখান হল্য।।
পক্ষ মূর্তি তেজি তবে মদনসুন্দর।
ফটিকে স্তম্ভে যেন নন্দের কিসোর।।
নিজপতি পাল্য সতি একিদার মন।
পালা সায় গীত বহে পীরের কথন।।[২৩]

সংক্ষেপে এই হলো কবিবল্লভ রচিত 'সত্যনারায়ণের পুথি'র কাহিনী।

একাব্যে সওদাগর ভ্রাতৃদ্বয়ের সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি অংশে 'চণ্ডীমঙ্গলে'র শ্রীমন্ত উপাখ্যানের প্রভাব আছে। এতদ্ব্যতীত কাহিনীতে নাথপন্থী তন্ত্রসাধনার প্রভাবও দৃষ্ট হয়। গুহ্য সাধনায় অতিলৌকিক রূপান্তরের প্রাধান্য থাকায় মদনসুন্দরের গল্প বৌদ্ধযুগের বলে মনে করা যায়। এ ধরনের আর একটি রূপকথামূলক গল্প

'লালমণি-সবুজমণি'। সে গল্পেও ঔষধের গুণে নায়িকার টিয়াপাখিতে রূপান্তরের কাহিনী আছে।

এ গল্পে পীরের আধ্যাত্মিক সাধনার কোনো গভীর পরিচয় উদ্ভাসিত হয় নি। তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য বা তান্ত্রিক পুরুষের মতই সত্যপীরের আচরণ। সম্ভবত এদেশে প্রচলিত কোনো রূপকথাকে পরবর্তীকালে কোনো কবি, সত্যপীরের অলৌকিকতা যুক্ত করে পীর-মাহাত্ম্য প্রচারের মানসে পাঁচালি রূপ দিয়েছিলেন।

কবিবল্লভের কাব্যে নাচাড়ি বা ত্রিপদী ছন্দের একটি মাত্র অংশ আছে। মনে হয় কবি পাঁচালির বৈচিত্র্য সাধনের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন না। 'পালা'র উল্লেখ থেকে বুঝা যায় এ কাব্য পাঁচালিরূপেই আসরে পরিবেশিত হতো।

সায়ের মুনশী ওয়াজেদ আলী সাহেবের নামে প্রচলিত 'সত্যপীরের পুথি' মূলত ফকির গরীবউল্লাহর রচনা।[২৪] এর অন্য নাম 'মদন ও কামদেবের পালা'। কাব্যমধ্যে—

ঃ হুকুম সত্যের যে অধীন গরীব গায়।[২৫]
ঃ সত্যের কদমে যে হীন ফকির গায়।[২৬]
ঃ অধীন গরীব কহে সত্যপীরের পায়।[২৭] প্রভৃতি ভণিতা দৃষ্ট হয়।

'মদন ও কামদেবের পালা'র সঙ্গে 'মদনসুন্দরে'র কাহিনীর মিল আছে। দু'একটি প্রসঙ্গ ও নামের পার্থক্য ছাড়া দু'কাব্যের গল্প কাঠামো একই। কবিবল্লভের 'মদনসুন্দর' এখানে 'সুন্দর' এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতাদ্বয়, মদন ও কামদেব। গরীবুল্লাহ'র কাহিনীতে সুমতি-কুমতিকে দুষ্কর্মের জন্য হত্যা করা হয়, কবিবল্লভের কাহিনীতে তা নেই। গরীবুল্লাহ'র কাব্যে সুন্দরের স্ত্রীর নাম বিমলা। 'মদন ও কামদেবের পালার' ভাষা কবিবল্লভের চেয়ে উচ্চমানের। এ কাব্যের স্থানে স্থানে মিশ্র ভাষারীতিও দৃষ্ট হয়।

'মদন-কামদেবের পালা'য়, নাচগানের প্রসঙ্গ আছে। রাজকন্যার স্বয়ম্বর সভায় 'বড় বড় রাজার বেটা' এসে উপস্থিত হয়েছে, রাজপুরী আনন্দমুখর—

ঃ নাচগীত আনন্দেতে বৈসে আছে তারা।
সারিন্দা সেতার বাজে ঢোলক মন্দিরা।।
এই রূপে বৈসে যত রাজার নন্দন।

নাটুয়া রোমজানি নাচে করিয়া গমন।।
ঠমকে ঠমকে নাচে হাতে দিয়া তালি।
মস্ত হইয়া ঢোল লইয়া বাজাইতেছে ঢুলি।।
....
রাতি পোহাইয়া যাবে হইবে বেহান।
নাচ গীতে এই মতে যায় কতক্ষণ।।[২৮]

এ কাব্যে সত্যপীর 'গাজী'রূপেও উল্লেখিত হয়েছেন—

ঃ এতেক কহিয়া গাজী দয়ার সাগর।
হজরতি দেস্তা বাঁধে ছেরের উপর।।[২৯]

মূলে গরীবুল্লাহর কাব্য 'গীত' রূপে উল্লেখিত হয়েছে—

ঃ তিন ভাই মছলত করে সিরনির তরে।
অধীন গরীব গায় গীত সত্যপীরে।।

সুতরাং এ কাব্য গীত-পাঁচালি রূপেও পরিবেশিত হতো। তবে কাব্যমধ্যে ধুয়া দেখা যায় না। ষোড়শ শতক থেকে পাঁচালিকাব্যে, পদাবলী ধাঁচের গীতানুবন্ধের রীতি দেখা যায়। গরীবুল্লাহ বা কবিবল্লভের কাব্যে তা নেই। এ দুটো কাব্যে কোনো রাগরাগিণীরও উল্লেখ নেই। তবে এ কাব্যে অন্তত পাঁচ স্থলে ত্রিপদী ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কাজেই ধুয়া, রাগরাগিণী না থাকলেও, ধারণা করা যায় এ কাব্য গোড়াতে নৃত্যাভিনয়ের মাধ্যমে পাঁচালিরীতিতেই পরিবেশিত হতো।

'সত্যপীরের পুথি' সায়ের ওয়াজেদ আলীর ভণিতায় কবিতারূপেও উল্লিখিত হয়েছে—

ঃ হীন ওয়াজেদ আলী কহে সবাকে ছালাম।
এই তক হইল ভাই কবিতা তামাম।[৩০]

এ থেকে মনে হয়, এই কাব্য উল্লিখিত সায়ের এককভাবে সুর করে আসরে পরিবেশন বা পাঠ করতেন।

দুটি কাব্য সচরাচর পাঁচালিকাব্যের মতো বৃহদায়তন নয়। কাজেই এধরনের কাব্যের পরিবেশনের ব্যাপ্তিকাল নাতিদীর্ঘ হবার কথা। সম্ভবত এর সঙ্গে সত্যপীরের জন্মকথা, কৃত্য ও উপাচার প্রভৃতি আনুষ্ঠানিকতা যুক্ত হয়ে আসরে তা দীর্ঘ পালার আকার ধারণ করত।

সত্যপীরের অপর পাঁচালিকার তাহির মাহমুদ, মতান্তরে কৃষ্ণহরিদাস। কিন্তু নানা সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা যায় 'গুরু' তাহির মাহমুদের কাছ থেকে শুনে শুনে এ কাব্য লিপিবদ্ধ করেন কৃষ্ণহরিদাস—

ঃ চৌদ্দ অক্ষরে পদ করিয়া জোটক।
আরদাশ নাহি কিছু বুদ্ধির নাটক।।
কৃষ্ণহরি কলম কাগজে করে বন্দ।
তাহের মামুদে কয় পয়ার প্রবন্ধ।।[৩১]

এ কাব্য লিখিত হবার পরই কৃষ্ণহরিদাস তা গীত বা পাঁচালিরূপে পরিবেশন করেন—

ঃ তাহের মামুদ গুরু শমস-নন্দন।
তাহার সেবক হয়ে কৃষ্ণহরি গান।।[৩২]

তাহির মাহমুদের পাঁচালিতে সত্যপীরের জন্মকথা বিবৃত হয়েছে। এর কাহিনী সত্যপীর কেন্দ্রিক এবং তা উপকথামূলক।

সত্যপীর ময়দানবের কন্যা সন্ধ্যাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সন্ধ্যাবতী একটি অলৌকিক ফুলের গন্ধ নিলে দয়াময়ের ইঙ্গিতে তিনি গর্ভবতী হন। অনূঢ়া কন্যার গর্ভ সঞ্চারের ফলে বিতাড়িত হন সত্যপীরের জননী। ঘোষণা করা হলো রাজকন্যা মৃতা। যথাসময়ে 'ফুলবন' বা 'কুলবনে' সন্ধ্যাবতী 'একটি রক্তপিণ্ড' প্রসব করে সাগরে ভাসিয়ে দেয়। এক সামুদ্রিক কচ্ছপ তা গলাধঃকরণ করে এবং পরে উগরে দেয়। তখন তাঁর বয়স পাঁচ বছর। বালকৃষ্ণের মতোই শিশু সত্যপীর অলৌকিক ক্ষমতা বলে ময়দানবকে 'শাস্তি দেন'।

অতঃপর সত্যপীর কুশল ঠাকুরের গৃহে প্রতিপালিত হতে থাকেন।[৩৩]

অপর কবি আরিফ অষ্টাদশ শতকের শেষে অথবা ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে 'লালমনের কিসসা' নামে সত্যপীরের উপকথামূলক পাঁচালি রচনা করেন।[৩৪] লালমনের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত হলো—

ঃ সৈয়দ জামালের ঘরে লালমনের জন্ম। 'একরোজ' লালমন ছাদে চুল শুকাতে গিয়ে উলঙ্গ হলে, বাদশাপুত্র তা দেখে ফেলে। দেখামাত্র সে লালমনের রূপে উন্মত্ত হয়ে উঠে। দুজনে প্রেমপাশে আবদ্ধ হয়। তারা বাদশার ভয়ে সত্যপীরকে সাক্ষী রেখে অবশেষে আবদ্ধ হলো বিবাহ বন্ধনে।

ধীরে ধীরে সবাই এ বিয়ের খবর জেনে ফেলে। লালমন ও বাদশাজাদা ছদ্মবেশে পালিয়ে গেল। 'কিন্তু পথ ভুল করে তারা পড়ে 'ফাসিয়াড়ার হাতে'। সত্যপীরের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে বাদশাজাদা পূর্বেই শাপগ্রস্ত হয়েছিল, সেই শাপে সে নিহত হলো ফাসিয়াড়ার হাতে।

লালমনের ক্রন্দনে 'সত্যপীর অস্থির হয়ে উঠেন'। সত্যপীরের পরামর্শে সিরনি মানত করতেই বাদশাজাদা বেঁচে উঠল। কিন্তু লালমন তার মানতের কথা ভুলে গেল। আবার শাপগ্রস্ত হলো তারা। এবার ছয়মাস 'বন্দখানা ঘরে' আটক থাকল 'ঘোড়া চুরির অপরাধে'। 'বাদশাজাদাকে মেড়া বানিয়ে বন্দী করে রাখল মালিনী'। 'ছয়মাস পরে সত্যপীর লালমনের প্রতি সদয় হলেন' তিনি এক গণ্ডার পাঠালেন শহরে। সেই গণ্ডার হত্যা করল লাল। লালমন সত্যপীরের জন্য একটা মসজিদ গড়ে দিল। 'মেড়া' রূপী বাদশাজাদা মসজিদের দেয়ালে 'নিজের দুঃখের কাহিনী লিখে গেল', লালমন বুঝতে পারল এ তার স্বামী। সে মালিনীকে শাস্তি দিয়ে বাধ্য করল 'মেড়া'কে মনুষ্যে রূপান্তরিত করতে। লালমন ফিরে পেল বাদশাজাদাকে। এবার সে 'সত্যপীরের শিরনি করল'।[৩৫]

সত্যপীরের পাঁচালি আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া পরিবেশিত হবার কথা নয়। গাজীরগানের মতই এ হচ্ছে কৃত্যমূলক। গাজীপীরের উপকথা ঔপচারিক। কাজেই সত্যপীর কেন্দ্রিক উপকথাগুলোও নির্দিষ্ট কৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশিত হতো বলে ধারণা করা যায়।

সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের পূজা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রচলিত আছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা 'শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা, বিষ্ণুর শালগ্রাম প্রতীকে' সংস্কৃত মন্ত্রে সত্যপীরের পূজা করে থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ পূজায় মুসলমানদের 'পাঁচ মোকাম' ও সত্যনারায়ণের প্রতীক আসনে একটি 'ক্ষুদ্রাকৃতির লৌহ অস্ত্র' (বা আসা) রাখা হয়।[৩৬] এর সঙ্গে আছে 'সিরনি'। মুসলমানদের ক্ষেত্রে সত্যপীরের সেবার রীতি ভিন্ন। সত্যপীরের কোনো কোনো দরগাহে পিঁড়ির উপর একটি 'বৃত্ত এঁকে' তার মধ্যভাগে 'মাটির একটি ক্ষুদ্র স্তূপ

রাখা হয়'। এর উপর থাকে 'ক্ষুদ্র লৌহ অস্ত্র বা ছোরা' এবং সেই সঙ্গে 'ফুলের মালা'।[৩৭]

সত্যপীরের পূজা পূর্ববঙ্গে কখনও ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি বরং এতদঞ্চলে গাজীপীরের প্রভাবই সর্বত্র দৃষ্ট হয়।

বাঙলায় সকল পূজ্য পীরদের মধ্যে গাজীপীরের প্রভাবই ব্যাপকতর। পশ্চিমবঙ্গ, বাঙলাদেশ, আসাম—সর্বত্র আজও কৃত্যপালা হিসেবে গাজীর গান আদৃত। লোকায়ত সমাজে তিনি সর্ববিপদভঞ্জন পীর। শস্যের অনিষ্ট, মহামারী, রোগশোক, যাত্রাপথের বিপত্তি, গর্ভপাত প্রভৃতি ইহলৌকিক সঙ্কটের ত্রাণকর্তা হিসেবে তিনি নিত্য স্মরণীয়। বহু পালা ও গীতিকার বন্দনা অংশে নিত্যই তাঁর নাম উচ্চারিত হয়। গাজীপীরের আখ্যানমূলক পাঁচালি দু' ধরনের, যথা- বড়খাঁ গাজীর জীবনীমূলক আখ্যান, কল্পিত গাজীপীরের প্রণয়কথা ও উপকথামূলক আখ্যান।

বড়খাঁ গাজী ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন বলে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন।[৩৮] জাফরখান, গাজী সফিউদ্দিন, দরাফখান গাজী, ইসমাইল গাজী, খান জাহান আলী খান-প্রমুখ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের কাল্পনিক সংস্করণ হলেন 'বড়খাঁ গাজী' বা 'গাজীপীর'। শেখ ফয়জুল্লাহ ষোড়শ শতকে 'গাজী বিজয়' রচনা করেন। 'গাজী বিজয়' ইসমাইল গাজীর জীবন ও মাহাত্ম্যমূলক কাব্য। অন্যদিকে জাফরখান গাজী বা দরাফখানও 'গাজী' হিসেবে পরিচিত। তাঁর জীবন নিয়ে কোনো পাঁচালি রচিত না হলেও পশ্চিমবঙ্গের 'গায়েন কবিরা' তাঁদের কাব্যে তাঁর বন্দনা করেছেন। ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম 'দফরখাঁ গাজী'র বন্দনা করেছেন। এ ছাড়া 'শা-সুফী সুলতান' এবং 'জঙ্গনামা'য়ও তাঁর বন্দনা আছে।[৩৯] 'শা-সুফী সুলতান' পুথিতে দেখা যায় স্বয়ং গঙ্গা দরাফখাঁ গাজীকে দেখা দিয়েছেন। আবার লৌকিক বা কাল্পনিক গাজীপীরের কাহিনীতে দেখা যায় গাজীর মাসী হচ্ছেন গঙ্গা।

'রায়মঙ্গলে' রায়গাজীর 'যুদ্ধ বৃত্তান্তের ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে' বলেও কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন।[৪০]

এ থেকে মনে হয় যে, বাস্তবে গাজী উপাধি প্রাপ্ত নানা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব লোকপুরাণে সর্বত্যাগী, বীর ও অলৌকিক ক্ষমতার একটিমাত্র প্রতীকরূপে 'গাজী' আখ্যায়িত হয়েছেন।

কাল্পনিক গাজীপীরের অলৌকিক গাথা সচরাচর 'গাজীকালু-চম্পাবতী' নামে পুথির ছাপ লাভ করেছে উনিশ শতকে। আব্দুল গফুর, আব্দুর রহিম এবং 'বিশ শতকে সৈয়দ হাসু মিয়া' 'বড়ে গাজীর কেরামতি' রচনা করেন।[৪১] এ কাব্যের অন্য নাম 'গাজীমঙ্গল'।[৪২] এসকল পাঁচালিকাব্য একালের হলেও সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতেকেই মৌখিকরীতিতে 'গাজীর গাথা' পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছিল।

'রায়মঙ্গলে' গাজীর প্রসঙ্গ এসেছে গল্পকথার ছলে। সদাগর নন্দন বাণিজ্যের কারণে সমুদ্রপথে যেতে যেতে এক ঘাটে পীরের মোকামে ফকিরদের হাজত-সেলাম দেখে কৌতূহলবশত কর্ণধারকে জিজ্ঞাসা করল—

ঃ মূরতি বানান নাহি মৃত্তিকার ঢিবি।
পূজা করে ফকিরেরা কেমন দেবদেবী।।[৪৩]

কর্ণধার এর উত্তরে, প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিতভাবে রায়-গাজীর যুদ্ধের বিবরণ দেয়।

ধনপতি সওদাগর 'পাটনে' যাবারকালে দক্ষিণরায়ের 'বারা' দেখে পূজা দিলেন, এ দেখে বড়খাঁ গাজীর ফকিরগণ গাজীর পূজাও চাইল। কিন্তু সে 'ঢেকা' মেরে গাজীর হাজোত মানোত না দিয়েই চলে গেল। ফকিরগণ গিয়ে নালিশ জানাল গাজীর কাছে—

ঃ কাঁদিয়া পড়িল গিয়া ফকিরেরা সবে।
মল্লুকের খবর না লও বাবা এবে।।
পূজিয়া দক্ষিণ রায় যায় সাধু বেটা।
তোমাকে নাহিক মানে দুঃখ বড় এটা।।
বাঙ্গালী গোয়ার ভয় নাহিক তিলেক।
মারিয়া আমার ঘর খেদাড়ে দিলেক।।
শরমে লোকের আগে নাহি তুলি মুখ।
না লব ফকির পালা আজি হইতে থুক।।

শুধু কি তাই? কালানল নামের বাঘ এসে বলে—

ঃ দক্ষিণরায়ের বাঘে মুড়ি লয় কাড়্যা।
শুনিয়া তোমার নাম সবে দেয় তেড়্যা।।
মহুল্যা মলঙ্গি আর বাউল্যার ঠাঁই।
দোহাই দক্ষিণ রায় বিনে আর নাই।।

এক বেটা মলঙ্গি খাইতেছিলাম রাগে।
ধাইয়া আসিল মোরে তিনকুড়ি বাঘে।।[৪৪]

সব শুনে 'গোসাখান' গাজী শাপ দিলেন সাধুকে। দক্ষিণরায়কে বেঁধে আনার সংকল্প করলেন। শুরু হলো দেবতা ও পীরের লড়াই।

রায় দূত পাঠালেন আপসের জন্য, কাজ হলো না। দুইপক্ষে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। গাজীও তৈরি হলেন, দু'দলেই বিচিত্র সব বাঘসৈন্য। যুদ্ধ শুরু হলো, হীরা বাঘে চড়ে এলেন রায়। প্রথম যুদ্ধে গাজীর ফকিররা পরাজিত হলো। দক্ষিণা রায় পীরের শিষ্য বলে প্রাণে মারলেন না। পরাভূত ফকিরদের নালিশ শুনে গাজী বলেন—

ঃ বেমান কাফের তোম বেসোর কমজাত।
শুনরে আহম্মখ গিধি মেরি এক বাত।।
খাওকে জঙ্গুলি হুয়াকে মাতআলা।
এতবড় কদুরথ দেওএ গালিগালা।।
আভি নাই জান্তেহ বড়েখাঁ গাজীপীর।
খোদায় মাদার দিয়া দুনিয়াকু জাহির।।[৪৫]

গাজী ও রায়ের ক্রুদ্ধ বাদানুবাদের পরই প্রকৃত যুদ্ধের শুরু। কেউ কারো চেয়ে ন্যূন নন। সে-যুদ্ধে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার অবস্থা—

ঃ ক্ষিতি করে টলমল হেন বুঝি যায় তল
বিকল সকল দেবগণ।।

তারপর—

ঃ শুন অপরূপ কথা ঈশ্বর আসিয়া তথা
উত্তরিলা ভাঙ্গিতে বিরোধ।।

ঈশ্বরের মূর্তিও অপরূপ—

ঃ অর্ধেক মাথায় কালা একভাগ চূড়া টানা
বনমালা ছিলিমিলি হাথে।
ধবল অৰ্দ্ধেক কায় অৰ্দ্ধনীল মেঘ প্রায়
কোরান পুরাণ দুই হাথে।।[৪৬]

'রায়মঙ্গলে' বর্ণিত ঈশ্বরের মূর্তির অনুরূপ 'গাজীর গানে' গায়েন-অভিনেতার পোশাকে হিন্দু-মুসলমানি পোশাকের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস লক্ষণীয়। সচরাচর গাজীর গানের গায়েন, শরীরের নিম্নাংশে ধূতি, উর্ধ্বাংশে চাপকান এবং মাথায় মখমলের কিস্তি টুপি পরে থাকে।

'রায়মঙ্গলে' গাজীর প্রসঙ্গ রায়ের যুদ্ধাংশটুকুতেই লভ্য। কিন্তু এ থেকে ধারণা করা যায় যে, রায়-গাজীর যুদ্ধকথা সমকালে প্রচলিত মৌখিকরীতির পাঁচালি থেকেই কৃষ্ণরামদাস গ্রহণ করেছিলেন। সেক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় যে, গাজীর-গাথা 'রায়মঙ্গলে'র পূর্বে বিদ্যমান ছিল এবং কবি তাকে কাব্যরূপ দিয়েছেন মাত্র। বলা-বাহুল্য যুদ্ধ বর্ণনা রায় ও গাজীর বীররসাত্মক সংলাপ আসরে 'রায়মঙ্গলের' নাট্যরস ঘনীভূত করে তুলত সন্দেহ নেই।

গাজীর জন্ম ও প্রণয় সংক্রান্ত যে সকল পুথি পাওয়া যায় তার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত লোকনাট্যে পরিবেশিত কাহিনীর বিশেষ কোনো পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

আব্দুর রহিম বিরচিত 'গাজীকালু-চম্পাবতীর পুথি', পাঁচালি। অর্থাৎ তা আসরে নৃত্যগীত-অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশনযোগ্য কাব্য।

আব্দুর রহিমকৃত 'আসল গাজির পুথি' অবলম্বনে গাজীকলু-চম্পাবতীর কাহিনী বিবৃত হলো—

ঃ বিরাট নগরের রাজা সিকান্দার বলিরাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে ধর্মান্তরপূর্বক বিবাহ করলেন রাজকন্যা অজুপাকে। অজুপার ঘরে জন্ম হলো এক পুত্রের, নাম রাখা হল জুলহাস। জুলহাস পাতালপুরীর 'জঙ্গ-রাজা'র একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করল। রাজা তীর্থে গেলেন, জুলহাস থেকে গেল সেই রাজ্যে। একদিন অজুপা, সাগরে এক ভাসমান সিন্দুক দেখতে পায়। দাসীদের সে তা উঠাতে বলে। সিন্দুক এসে ধরা দেয় অজুপার হাতে। খুলে দেখে এক শিশু আছে তার মধ্যে। অজুপা তাকে মাতৃস্নেহে পালন করতে থাকে। তার নাম রাখা হয় কালু। কিছুদিন পর অজুপার গর্ভসঞ্চার হলো—

ঃ হইলেন পাণ্ডুবর্ণ দুর্ব্বল শরীর।
হেলিয়া পড়িল কুচ হইয়া কালা শির।

যথা সময়ে জন্ম হলো গাজীপীরের। অজুপা তাঁর রূপ দেখে জুলহাসের শোক ভুলে যায়। কালু আর গাজী একসাথে খোদার নাম জপ করে—

ঃ গাজীকালু দুই ভাই রহে এক ঠাঁই।
এক তিল কেহ কারে কভু ভুলে নাই।।
দোহার প্রেমেতে দোহে মজাইয়া মন।
দিবা নিশি জপ করে নাম নিরঞ্জন।।[৪৭]

বাদশা সিকান্দার গাজীকে রাজ্যভার নিতে বললেন। গাজী অস্বীকার করলেন। ক্রুদ্ধ বাদশা তাঁকে হত্যার নির্দেশ দিলেন, কিন্তু অতিলৌকিক ক্ষমতাধর গাজীকে হত্যা করাও সম্ভব নয়—জল্লাদ তাঁর কণ্ঠে তলোয়ারের আঘাত করল—একটুও 'চোট' লাগল না। গাজী অক্ষত রইলেন। হাতির দলন, অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ—তাতেও কিছু হলো না গাজীর। তারপর সমুদ্রে 'মার্কা' দিয়ে সুঁই ফেলা হলো খুঁজে আনতে, খোয়াজখিজিরের কৃপায় তাও সম্ভব হলো। পিতা পরাজিত হলেন গাজীর দৈব ক্ষমতার কাছে।

একরাতে ফকিরি গ্রহণ করে গৃহত্যাগী হলেন দু'ভাই। যেতে যেতে তাঁরা পৌঁছালেন সুন্দরবনে। সাত বৎসর সেখানে কাটল। কিন্তু—

ঃ ফকিরের বিধি নহে থাক এক ঠাঁই।
এ দেশ ছাড়িয়া চল অন্য দেশে যাই।।[৪৮]

দু'ভাই চললেন স্থানান্তরে। যেতে যেতে উপস্থিত হলেন শ্রীরাম রাজার 'ছাপাই' নগরে। দু'জন ক্ষুধার্ত হলেন। শুনতে পেলেন রাজা অন্নদান করেন, দু'ভাই গিয়ে হাজির হলেন রাজারপুরীতে। মুখে 'লা-ইলাহা' বলে রাজার সম্মুখে দাঁড়ালে, রাজা 'যবন' বলে কোতোয়াল দিয়ে অপমান করে পুরী থেকে দিল তাড়িয়ে। ক্ষুধার্ত দু'ভাই-এর জন্য স্বয়ং খোদা খাবার পাঠালেন। কালুর ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে আগুন লাগল 'ছাপাইনগরে'। রাজা ঐশ্বরিক বিপর্যয়ের মুখে সপরিবারে ধর্মান্তরিত হলেন। অবশেষে নানা দেশ ভ্রমণ করে গাজী ও কালু এক দেশে উপস্থিত হলেন। সেখানে এক নিরন্ন পরিবারের আতিথ্য গ্রহণান্তে তাঁরা প্রীত হয়ে চাইলেন তাদের সম্পদশালী করতে। তারপর গাজী নদীর কূলে এসে তিনবার গঙ্গামাসী, গঙ্গামাসী বলে ডাকলেন—

ঃ ডাকিলেন তিনবার দিয়া যে উত্তর তার
গঙ্গা দেবী ভাসিয়া উঠিল।

গঙ্গা বলে যাদু ধন ডাকিয়াছ কি কারণ
বাবা কি বিপদ ঘটিল।
কহে গাজি মধু স্বরে ধন কিছু দেহ মোরে
ডাকিয়াছি ইহার কারণ।

'গঙ্গা' গেলেন পাতালে, পদ্মাবতী অর্থাৎ মনসার কাছে—

ঃ পাতালেতে গিয়া সতী বলে শুন পদ্মাবতী
ভাই এক আইল তোমার।
বৈরাট নগরে ঘর অজুপা ভগিনী মোর
ধন চায় পুত্র আসি তার।।
পদ্মা বলে মাগো শুন আমি যাব লয়ে ধন
দেখিব সে ভাইগো কেমন।
সাত মণ সোনা.আর চান্দুয়া নিশান তার
আর দুই রত্ন সিংহাসন।।
এই বস্তু লয়ে নাগ পরে আরোহিয়ে
গিয়ে পদ্মা গাজির কাছেতে।
হাসিয়া সালাম করে ভগ্নি ভগ্নি বলে তারে
ধরে গাজী লইল কোলেতে।।[৪৯]

এরপর গাজী অরণ্য কেটে নগর পত্তন করলেন শাহাপরীকে দিয়ে। আকাশ থেকে স্বর্ণবৃষ্টি হলো। একটা মসজিদ তুলে দুভাই সেখানেই সিংহাসন স্থাপন করলেন।

একদিন 'কুকাফ' দেশ থেকে ছয় পরীর ঝাঁক নগর ভ্রমণকালে গাজীর রূপ দেখে মোহিত হলো। গাজীর যোগ্য নারী হিসেবে মনোনীত করল তারা 'ব্রাহ্মণা নগরে' মুকুট রাজার কন্যা চম্পাবতীকে। আকাশপথে গাজীর খাট উত্তোলন করে ছ'পরী নিয়ে এল তাকে চম্পাবতীর পালঙ্কের পাশে। তারপর খাট বদল করল দুজনের। ঘুমের ঘোরে গাজীর হাত পড়ে চম্পার বুকে, চমকে জেগে উঠে সে ভাবে দাসীদের মধ্যে কেউ বুঝি তার অলঙ্কার চুরি করছে। তৎক্ষণাৎ খাঁড়া হাতে দাঁড়ায়—কিন্তু বিবস্ত্রা সে। তারপর তার চোখ পড়ে গাজীর দিকে, গাজীর রূপ দেখে মূর্ছিতা হলো রাজকন্যা চম্পাবতী। প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ল সে—

ঃ পরে সতী চম্পাবতী পালঙ্কে বসিয়া।
দেখেন গাজির রূপ স্বচক্ষে চাহিয়া।।

ক্ষণে দেখে চক্ষু ক্ষণে দেখে বুক।
ক্ষণে দেখে হস্তপদ ক্ষণে দেখে মুখ।।
লক্ষ কোটি চন্দ্র যিনি (জিনি) তার মুখখান।
ছটফট করে কন্যা হারাইয়া জ্ঞান।।[৫০]

মুকুটরায়ের নিষ্ঠুরতার ভয় দেখায় চম্পাবতী। গাজী ভীত হন না তাতে। তারপর দু'জন দু'জনকে দুষতে থাকে—

গাজী : আহা মরি প্রাণ প্রিয়া ওগো বিধুমুখী
একি রীত বিপরীত তোমার চরিত্র।।
কত ভয় দেখাইলা যেমন শিশুর খেলা
করিতেছ মোর সঙ্গে অঙ্গে ধুলা মাখি।
বিনা শ্রমে পেলে রত্ন কে করে তাহার যত্ন
ভাল নহে ভাল নহে এত বকাবকি।।

তারপর—

: চাম্পা বলে ধন্য চোর সাহস তোমার।
আসিয়া মন্দিরে মোর এত অহঙ্কার।।
গাজি বলে প্রাণ প্রিয়া চোর নহি আমি।
আমাকে করিয়া চুরি আনিয়াছ তুমি।।
কেমনে আসিনু নৈলে তোমার মন্দিরে।
উলটিয়া চোর বলে চুরি করে মোরে।।
চাম্পা বলে হারে চোর নাহি তোর ভয়।
রজনী প্রভাত হলে যাবে যমালয়।।
গাজি বলে প্রাণ মোর তোমার কাছেতে।
কাহার ক্ষমতা আছে আমাকে মারিতে।।
তুমি যদি মার তবে মরণ আমার।
পীরিতে ডুবিছে প্রাণ ভয় কার আর।।[৫১]

আসন্ন মৃত্যু জেনেও ভীত হলো না দুজন। কিন্তু চম্পা যখন জানতে পারল গাজী মুসলমান সে তখন বলে যে, তার জাত গিয়েছে, গাজীর আর রক্ষা নাই—

: জীবনের আশা কভু না কর কখন।
মৃত্যুকালে জপ কর নাম নিরঞ্জন।।

তোমার সাহস ধন্য আসিলে মন্দিরে।
ত্বরায় বাহিরে যাও না ছুইবে আমারে।।[৫২]

তারপরও চম্পা প্রেমে পড়ল গাজীর। ভবিতব্য গুণে দেখল গাজীই তার স্বামী। আঙটি বদল করল দুজনে। শেষরাতে গভীর ঘুমে মগ্ন হলে কোহ্‌কাফের পরীরা গাজীকে নিয়ে এল আর চম্পা রইল নিজের মন্দিরে। খাট বদল হয়ে গেছে চম্পার। সে শুয়ে আছে গাজীর খাটে।

তারপর জেগে উঠল চম্পা। উন্মাদিনী হলো গাজীর প্রেমে, কাউকে কিছু বলল না সে শতবার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও। শেষে মা লীলাবতীকে খুলে বলল সব। শুনে মা বললেন—

ঃ বিধি যদি লিখে থাকে কপালে তোমার।
তাহা কি খণ্ডাতে পারে শক্তি আছে কার।।
তোমার তাহার যদি থাকেগো লিখন।
অবশ্যই দুইজনে হইবে মিলন।।[৫৩]

এদিকে গাজীর প্রণয়-বেদনায় কালু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি গাজীকে বুঝাতে চান যে, নারী প্রেম খোদার ধ্যানের পক্ষে বাধাস্বরূপ কিন্তু গাজী তা স্বীকার করে না। এইভাবে গাজীর নিরঞ্জন সাধনা ও চম্পাবতীর প্রেম অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলো।

তর্ক-বিতর্কের পর কালু গাজীর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে যেতে এক শর্তে রাজি হলেন—শর্ত হলো এই যে, মুকুট রায়ের দরবারে যাবার আগে চম্পাবতীকে খবর পাঠাবে গাজী যাতে সে নদীর ঘাটে আসে। চম্পাবতী গাজীর আদেশ মানে কিনা তা সে স্বচক্ষে দেখতে চায়। ফেরেশতা এলো স্বপ্নে চম্পার শিয়রে, তার নির্দেশমতো গেল সে 'নয়' মামীর সঙ্গে নদীর ঘাটে। গাজী কৃষ্ণের মতোই কদমতলায় কালুর সঙ্গে বসে আছেন। চম্পা বলে—

ঃ দেখিগো দেখিগো আমি একবার দেখি।
সে কুলে কদম্ব তলে মনচোরা নাকি।।
সখীগো সখীগো সখী ওগো ওগো সখী।
দেখিগো বন্ধুরে আমি দেখি দেখি দেখি।।[৫৪]

কালু প্রস্তাব নিয়ে রাজদরবারে হাজির হলেন। সব শুনে ক্রুদ্ধ মুকুট রায় বন্দী করলেন তাঁকে। গাজীর পাগড়ি খুলে গেল, বুঝলেন তিনি কালু ভাইয়ের বিপদ ঘটেছে!

গাজী তাঁর বাঘ-সেনাদের অলৌকিক ক্ষমতা বলে ভেড়া বানিয়ে সঙ্গে নিয়ে চললেন 'ব্রাহ্মণ-নগরে'র উদ্দেশ্যে। পথে খেয়া, ছিরা-ডোরা দুই মাঝি, গাজীর গন্তব্যস্থল জানতে পেরে সাবধান করে দিল —

ঃ ছিরা বলে মরণের সাধ বুঝি আছে!
একটি ফকির বন্দী আছে কি মরিছে।।
সাধেতে যমের বাড়ী যাহ খুঁজিবারে।
এখনি দক্ষিণা রায় খাইবেন ধরে।।[৫৫]

গাজীর সঙ্গে নেই কড়ি। ছিরা ও ডোরা কড়ি ছাড়া নেবে না অন্য কিছু।

দরদাম নিয়ে তর্কবির্তকের শেষে ক্রুদ্ধ গাজী দুটো ভেড়ারূপী বাঘ মূল্য হিসাবে দিয়ে চলে গেলেন। সেই বাঘ যথা সময়ে স্বমূর্তি ধারণ করল। তারপর পীরের সঙ্গে বেয়াদপির জন্য দুইবাঘে বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি সাধন করল ছিরা ও ডোরার।

গাজীর বাঘ 'ব্রাহ্মণানগর' অবরোধ করল। বিপদগ্রস্ত মুকুটরায় খবর দিলেন দৈত্যরূপী দক্ষিণরায়কে। দক্ষিণরায় প্রস্তুত হলেন যুদ্ধের পোশাক পরে—

ঃ চল্লিশ মণের এক জিঞ্জির কোমরে।
আটিয়া বান্ধিল বীর ধুতির উপরে।।
শত মণ খাড়া খান কাকলে লইল।
আশি মণ ঢাল আনি গরদানে বান্ধিল।।[৫৬]

যুদ্ধ শুরু হলো। কিন্তু বাঘের ভয়ে ভীত দক্ষিণরায় বুঝলেন এ যুদ্ধ সহজ নয়। তাই গঙ্গাদেবীকে কুমির-সৈন্য দিতে বললেন। গঙ্গা প্রথমে গাজীর সঙ্গে সম্পর্কের কথা চিন্তা করে দক্ষিণরায়ের প্রস্তাবে রাজি হলেন না—পরে আত্মহত্যার ভয় দেখালে ভক্তের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। এলো কুমিরের দল। এদিকে গাজীর বাঘেরা প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হলো। কিন্তু গাজীর প্রার্থনায় রৌদ্রতাপ দ্বিগুণ হলে অসহ্য দহনে পালাল কুমিরেরা। এরপর বাঘেরা ঘিরে ধরল দক্ষিণরায়কে। তিনি এমন হাঁক দিলেন যে তাতে—

ঃ যত বাঘ ছিল সব ঢলিয়া পড়িল।
প্রাণ ভয়ে পরীগণ পলাইয়া গেল।।[৫৭]

এবার গাজী 'আসা' ও 'খড়ম' দিয়ে যুদ্ধ শুরু করলেন। দক্ষিণরায় ভূমিতে পতিত হলেন। গাজী কেটে দিলেন তার দুকান। দক্ষিণরায় প্রাণ ভিক্ষা চাইল, গাজী

তাকে বন্দী করলেন। এবার মুকুটরায়ের সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় যুদ্ধ শুরু হলো। রাজসৈন্যদের বাঘদল আক্রমণ করতে বললেন রাজা কামানের সাহায্যে—

ঃ তৎপরে কহে রাজা ডাকিয়া সবারে।
'ফায়ার' করহ তোপ সব একবারে।।[৫৮]

সেদিনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে মুকুটরায় সসৈন্য পরাজিত হলেন। আঠারদিন ধরে চলল এই যুদ্ধ। মৃত সৈন্যদের যেন আর মুকুটরায় বাঁচাতে না পারেন সেজন্য 'মৃত্যুজীব কুঙ্গা'য় গোমাংস ফেলা হলো। কূপের মৃতকে বাঁচানোর শক্তি নষ্ট হলো, হার মানলেন রাজা। কালুপীর মুক্ত হলেন সসম্মানে। গাজী ও চম্পাবতীর বিয়ে হলো।

কালু ফকিরের বেশে গৃহত্যাগ করতে চাইলে গাজী স্থির করলেন চম্পাবতীকে রেখে তিনিও পুনরায় ফকির হবেন। চম্পাবতী সব জেনে সঙ্গ নিল স্বামীর—

ঃ তবেত সাহেব গাজি ভেবে নিরঞ্জন।
চাম্পাকে লইয়া সাথে চলিল তখন।।[৫৯]

তারপর গাজী পাতালপুরীতে গিয়ে জুলহাস ও তার পত্নীকে নিয়ে এলেন। সবাই মিলে উপস্থিত হলেন বৈরাটনগরে। মাতাপিতার সঙ্গে জুলহাস, কালু ও গাজীপীরের মিলন হলো।

আব্দুর রহিম পূর্ববঙ্গের লোক। একটি ভণিতায় এই কবি-গায়েন আত্মপরিচয় দিয়েছেন এইভাবে—

ঃ বিরচিল দীন হীন আব্দুর রহিমে
ময়মনসিংহ জেলা বিচে গলাচিপা গ্রামে।।[৬০]

গাজীরগান 'গাজির গীত' রূপেও আখ্যাত হয়েছে—

ঃ রচিল গাজীর গীত শুন সবে দিয়া চিত
করি কিছু প্রেমের বর্ণনা।।[৬১]

'আসল গাজির পুথি' পাঁচালিকাব্য। গায়েন কবি একে পয়ার পাঁচালিরূপেও উল্লেখ করেছেন—

ঃ আব্দুর রহিম বলে মধুর পাঁচালি।
গাজির জনম কথা শুন সবে বলি।।[৬২]

এ কাব্যের সর্বত্র 'ধুয়া'র ব্যবহার আছে। সুতরাং তা দোহার কণ্ঠে গীত হতো অর্থাৎ এ কাব্যের পরিবেশনায় গায়েন ও দোহারের ভূমিকা স্পষ্টতই নির্দেশিত হয়েছে—

ধুয়া ঃ হায় মরি হায় (২) কি হৈল (২) কি হৈল।
কেমনে এমন বীর তাহাকে ধরিল।।

ধুয়া ঃ বাজিল বাজিল বাদ্য কতবা বাজিল।
সাজিল সাজিল সেনা সাজিয়া চলিল।।

মৌখিকরীতিতে গায়েন পরম্পরায় পরিবেশিত হবার ফলে এ কাব্যে একালের 'ফায়ার' 'মার্কা' প্রভৃতি ইংরেজি শব্দও দৃষ্ট হয়।

'আসল গাজীর পুথি'তে 'খয়েরা' বা খয়রা-গীত এর নির্দেশ আছে একটি গানে—

গীত-খয়েরা

ঃ দিন গেল (২) হায় দিন গেল।
ডুবিল (২) তরী অকুলে ডুবিল।।
ভবের বাণিজ্য এসে মূলধন খাইনু বসে,
কি লইয়া যাব দেশে বল মন বল।।
পথ নাহি পালাইতে মৃত্যু যম হাতে লয়ে
ডোর খাড়া সমুখেতে ধরিল ধরিল।।[৬৩]

'খয়রা' 'নৃত্যের তাল' বিশেষ[৬৪] অর্থাৎ গীতটি আসরে নৃত্য সহযোগে পরিবেশিত হতো।

গাজী ও চম্পাবতীর বিবাহ উপলক্ষে আনন্দ উৎসবের বর্ণনায় আছে—

ঃ নাটুয়া করেন নৃত্য বাইরে (?) করে গান।
নানা জাতি বাদ্য বাজে মধুর সমান।।[৬৫]

এ কাব্যে গাজী-কালুর সঙ্গে চম্পাবতীর প্রথম পরিচয়ে বাদানুবাদ, কালুর সঙ্গে ঈশ্বর ও প্রেমতত্ত্বের বিতর্ক প্রভৃতি প্রসঙ্গে সংলাপের ব্যবহার নাট্যসংঘাতপূর্ণ। এছাড়া বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। একাব্যে সচরাচর নায়ক বা নায়িকার মনোভাব পর পর দুটি গানে অথবা গান ও পয়ার সহযোগে ব্যক্ত হতে দেখা যায়—

(গীত তাল আদ্ধা)

(চম্পা) ঃ এমন পিরীতি বন্ধু শিখিলে কোথায়।
ধিক তারে প্রেম শিক্ষা যে দিল তোমায়।।
আহা মরি একি রীতি যেমন ভৃঙ্গের প্রতি।
খাইয়া ফুলের মধু ফুল ছাড়িয়া যায়।।

তারপর—

ঃ এ বলিয়া চাম্পাবতী কান্দে উভরায়।
ধীরে ধীরে কহে গাজী মধুর ভাষায়।।

(গাজী) ঃ মন্দ কিঁ তোমারে বাসী চিন্তা কেন মনে।
কিছু দিন ধৈর্য ধরি থাক নিকেতনে।।

....

এবার—

ঃ এ বলিয়া চলে গাজি কালুরে লইয়া।
চরণে ধরিয়া চাম্পা কহেন কান্দিয়া।।

(চাম্পাবতী) ঃ যেও না (২) বন্ধু যেও না।
এমন মধুর পিরীতে গরল দিও না।।

এই গানের পরই আছে পয়ার—

ঃ আহা (২) মরি (২) হায় (২) হায়।
কি কহিব প্রাণনাথ বুক ফেটে যায়।।
কিঞ্চিত নাহিক মায়া তোমার অন্তরে।
কেমনে ছাড়িয়া চাহ যাইতে আমারে।।[৬৬]

উক্তি-প্রত্যুক্তি রচনায় আবদুর রহিমের দক্ষতা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। চম্পাবতীর প্রেমে অধীর গাজীর সঙ্গে কালু ঈশ্বর প্রেম ও নারীপ্রেম নিয়ে বির্তকে অবতীর্ণ হলেন—

ঃ কালু বলে সেই হিন্দু তুমিত যবন।
কেমনে তাহার সনে হইবে মিলন।।
গাজি বলে পারে সব খোদায় করিতে।
কত বড় কাজ এই খোদার কাছেতে।।
কালু বলে নারী দিয়া কিবা লাভ হবে।
মায়ার জঞ্জাল আর গলায় পড়িবে।।

গাজি বলে প্রাণ চোখ মোর কাছে নাই।
কাড়িয়া রেখেছে চাম্পা কেমেনেতে পাই।।
কালু বলে পাবে মন চিন্তা দেহ ছাড়ি।
গাজি বলে শান্ত আমি হইতে না পারি।।
কালু বলে নারী ধ্যানে খোদাকে হারাবে।
গাজি বলে এই ধ্যানে খোদা লভ্য হবে।।
কালু বলে নাহি আছে খোদার আকার।
গাজি বলে যত মূর্তি সকলি তাহার।।
কালু বলে চম্পাবতী কোথায় এখন।
গাজী বলে আমি (দেখি) মেলিয়া নয়ন।।
কালু বলে এইভাবে কতদিন রবে।
গাজি বলে ছাড়াছাড়ি আর না হবে।।
কালু বলে এই প্রেমে প্রাণ যদি যায়।
গাজী বলে স্বর্গে গিয়া পাইব তাহায়।।[৬৭]

এই উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে প্রেমের সঙ্গে যোগভেদতত্ত্ব ও সুফীতত্ত্বের ক্রম উন্মোচন আছে। পাঁচালিকাব্যে এ ধরনের উক্তি-প্রত্যুক্তিকে 'বিবরণমূলক সংলাপ' নামেও আখ্যায়িত করা যায়।

'আসল গাজির পুথি'র সর্বত্র কবির বর্ণনার চেয়ে সংলাপের প্রাচুর্যই অধিক। এর ফলে আসরে গায়েনের উপস্থাপনা অধিকতর চরিত্রানুগ রূপ ধারণ করত সন্দেহ নেই। এ কাব্যে বর্ণনাংশ খুব দীর্ঘ নয়, অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পাঁচালির মতো সময়, বর্ণিত বিষয় ও পাত্রপাত্রী ভেদে নাচাড়ির প্রয়োগ দেখা যায়।

পুথিরূপের সঙ্গে পাঁচালির পরিবেশনরীতির ভিন্নতা আছে। আসরের যেকোনো কাব্য মুদ্রণ ছাপ বা লেখ্যরূপ লাভ করলে তা ঘরোয়াভাবে পঠিত হতে পারে। কিন্তু পাঁচালি পরিপূর্ণভাবে আসরের। গাজীর গান শুরুতে মৌখিক রীতিতে রচিত হয়, পরে মুদ্রণে পুথি ছাপ লাভ করে। জঙ্গনামা প্রভৃতি কাব্য মূলত পুথি রূপে রচিত হয়, সুতরাং তা পাঁচালির ছাপ লাভ করে নি। বাঙলা নাট্যরীতির রূপ নির্ণয়ে সে কাব্যের আলোচনাও তাই জরুরি নয়।

গাজীরগানের কাহিনীতে রোম্যান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের প্রভাব আছে। শাহাপরী, কোহ্কাফের পরী প্রভৃতি প্রসঙ্গ থেকে মনে হয় এ প্রভাব ইরানীয়। অন্যদিকে

পীরের সুকঠিন নিরঞ্জন সাধনায় নারীপ্রেমের একটি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেওয়ারও প্রয়াস আছে এই কাব্যে।

মধ্যযুগে গাজী বিষয়ক লোকনাট্যের ধারা মৌখিকরীতিতে একালেও প্রচলিত রয়েছে। (এরূপ একটি সংগৃহীত নাট্যপালা 'পরিশিষ্ট-২'এ সংযুক্ত হলো।)

আসামে গাজীর গান 'গাজীর গীত' নামে পরিচিত। সিলেট, কাছাড়, জৈন্তা, কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চলে এই গীত প্রচলিত আছে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে—

'যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ-কোবঁর-কুবঁরীর প্রেম, ভৌতিক কাহিনী অবলম্বন করি, রচনা করা গ্রাম্য-গীতির অভিনয় হয়। জামা পিন্ধা ওজা জনক গাজী বোলা হয়। তেঁও নাচি-বাগি গীত গায় আরু মাজে সময়ে কথার দ্বারাও কাহিনী ব্যাখ্যা করে। চিলট, কাছাড়, জৈন্তা অঞ্চলত সাধারণতে মছলমানসকলে এনেকুবা গীত গায়। কামরূপর হাজোত গাজীরগীত শুনি বলে পোবা যায়।'[৬]

বাংলাদেশে 'ওজা' বা মূল 'গাতক'কে কখনই 'গাজী' মনে করা হয় না। এতে 'ওজা' কে 'গায়েন' বা 'গাজীর গানের গায়েন' বলা হয়। গাজীর গানের শুরুতে সম্মিলিত বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান সৃষ্টি করা হয়। একে বলে 'ধম্বাইল' বা 'ধুমল'। এ গানে চমরের ব্যবহার দৃষ্টে একে মঙ্গল পাঁচালি বা কৃত্যপাঁচালির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। গাজীরগানে প্রচলিত প্রণয়োপাখ্যানের প্রভাব আছে। বাদশা, বেগম, রাক্ষস-রাজ্য, পাতালনগর, নায়কের দুঃসাহসিক অভিযান সব মিলিয়ে এর প্রণয়ঘন আবহ তৈরি হয়েছে। পীরের অলৌকিকতার প্রভাব শেষ পর্যন্ত এ পালায় প্রধান হয়ে দাঁড়ায় না। এজন্যও পালার শিল্পমূল্য নিঃসন্দেহে এর কৃত্যকে ছাপিয়ে উঠেছে।

গাজীর গানের পরিবেশনায় দোহার ও প্রধান বায়েন অর্থাৎ ঠেটার কাজ গল্পের প্রসঙ্গস্থলে, তাৎক্ষণিক মন্তব্য ও নানা কথার উদ্ভট ব্যাখ্যাদ্বারা হাস্যরসের সৃষ্টি। ঠেটা 'Paradox' সৃষ্টিতে দক্ষ হলে নাট্য আসর জমজমাট হয়ে উঠে। ঠেটার কারণেই জামাল-কামালের গল্প দূরবর্তীকাল থেকে সমকালে উঠে আসে। সে এ পালার নানা ঘটনাকে লোকায়ত অভিজ্ঞতা দ্বারা ব্যাখ্যা পূর্বক পালাটিকে দর্শকের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যে এনে দেয়। ফলে তারা সহজ অভিজ্ঞতায় গল্পরস আস্বাদন করতে পারে।

গাজীর গানে সচরাচর ক্ষুদ্রাকৃতির ঢোল অর্থাৎ ঢোলক, ঝাঁঝ, খোলও মন্দিরা ব্যবহৃত হয়। সঙ্গীত ও নৃত্য ব্যতিরেকে গায়েনের যে কথাটিতে গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন সেখানে ঢোলের প্রয়োগ হয়ে থাকে। এ ছাড়া কোনো দৃশ্য বা

নাটকীয় মুহূর্তকে আকর্ষণীয় করার জন্যও ঢোল ব্যবহৃত হয়। গায়েন কোনো কোনো অঞ্চলে নূপুর পরে থাকে। আসরে ধুতি, আচকান বা ফতুয়া-লুঙ্গির পরিবর্তে গায়েন সাদা পাঞ্জাবি, সাদা লুঙ্গিও পরে থাকে। বায়েনদের পরিধানে থাকে দৈনন্দিন পোশাক।

বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে গাজীর গানে চরিত্রাভিনয়ের খানিকটা ধাঁচ লক্ষ্য করা যায়। ফরিদপুরের নগরকান্দা অঞ্চলে গাজীর গানের উপকাহিনীরূপে পরিবেশিত 'দিদার বাদশার পালা'-য় গায়েন ও দোহারের মধ্যবর্তী অংশে জনমতি, দিদার প্রভৃতি চরিত্র একক রূপে মঞ্চে অবতীর্ণ হয়। তবে এ ধরনের পরিবেশনায় শেষ পর্যন্ত গায়েন ও দোহারেরই প্রাধান্য। নিচে 'দিদার বাদশার পালা'র একটি অংশ উদ্ধৃত হল-

গায়েন ঃ এমন সময় জনমতী কান্না করে বলেছে পিতা, পিতা, পিতা। কে জনমতী? কেন জনমতী ডাকলা তুমি? পিতা, পিতা। কি? পিতা, কান্না করিছেন কেন? কই জনমতী, আমি কান্না করেছি কই? পিতা, কে যেন কান্না কইরাছে, ওরে আমার কি যেন লেইখাছে বিধি কপালে। হক্কেরহাকিম আল্লা রে না হক্কের ফইরাদী। তুমি যদি মারো খোদা কে হইবে বাদী। ওরে আমার.............। ওরে আমার কি যেন লেইখাছো বিধি কপালে।

ঃ দ্যাখো জনমতী, এত কথা কি বলবো?

ঃ না, পিতা বলতেই হবে।

ঃ জনমতী, এ কথা শুনে তুমি আর ঠিক থাকতে পারবা না বাবা। জনমতী, এ কথা বলতে গেলে তোমার দুই পদতল হইতে মাটি সইরা ফাঁক হইয়া যাবে।

ঃ না পিতা

গায়েন/সেকান্দার ঃ বলতেই হবে? জনমতী, বলতেই হবে?
একরোজ আমি মক্কার দশ মুসল্লীকে নিমন্ত্রণ করেছি।

		সামান্য ডেই পিঁপড়াকে নিমন্ত্রণ করিনি বলে হস্তে দিয়া দড়ি, সেইজন্য হইয়াছি আমি দোজখেরই খড়ি। হ্যাঁ পিতা।
		তাই ভেস্তে খাওয়ার কোন পন্থা নাই।
		একমাত্র জনমতী। তোমাকে কোরবানী দিতেই হবে।
জনমতী	ঃ	আমি তৈয়ার,
গায়েন	ঃ	তবে তোমার মার কাছে জেনে আসো।
গায়েন	ঃ	(বর্ণনা দেয়) জনমতী বাদশা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো, একবার মায়ের কাছে জেনে দেখি। আবার চিন্তা করলো, মায়ের কাছে গেলে বাবার মতই বলবে। (তখন সে সতীর কাছে যায়)।
গায়েন/জনমতী	ঃ	কোথায় বিবি পঞ্চতোলা সতী
দোহার/সতী	ঃ	বল বল প্রাণ পতি।
গায়েন	ঃ	দেখ, সতী।
		আইজ আমার পিতা বলেছে, "জনমতী, একরোজ আমি মক্কার দশ মসুল্লীকে নিমন্ত্রণ করে সামান্য ডেই পিঁপড়াকে নিমন্ত্রণ করিনি বলে হস্তে নিযে দড়ি, হয়েছি তাই দোজখেরই খড়ি।"
		ইয়ার কোন পন্থা কি আছে?
দোহার/সতী	ঃ	ওগো স্বামী, আপনি বুঝতে পারেন নি? বড় থাকতে ছোটকে রাজত্ব দিতে পারে না বলে বাদশা একটা ছলনা করেছে। কোথায় শুনেছ যে মানুষ কোরবানী দিয়ে ভেস্তবাসী হতে পারে? এ কোথায় শুনেছ ওগো স্বামী? যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয়, তা হলে এ নগরে যেইয়ে জেনে দেখুন সত্য কিনা মিথ্যা।
গায়েন	ঃ	সত্যি কথা বলছো সতী? এখন নগরে গিয়ে দেখাবো।

দোহার ঃ আমার কথা বিশ্বাস না হয় স্বামী একবার নগরে গিয়া জেনে দেখুন।

(দৃশ্য পরিবর্তন)

(নগরবাসীদের কথপোকথন)

নগরবাসী ঃ একটা কাজ অইয়া গ্যাছে তা জাননি?

কি কাজ?

চল আমরা সকলি যাইরে। ঠাণ্ডার দিন আছে রে ভাই সকলরা। হেই রাজার বাড়িতে কুরবানী হইব আইজ। মানুষ কুরবানী। হেই কুরবানীর খাবার খাইতে অইবো। হেই জন্যের ভাত ডাইল দিয়া খাইতে অইব। মানুষ কুবরানী অইব বুলে।

আমরা চলেছি সেকান্দর বাদশার বাড়ি। বৈরাতনগর।

সেখানে কি অইবে? সেখানে মানুষ কুরবানী হবে। হ্যাঁ বলি হবে।

কাইট্যা বলি?

হ্যাঁ কাইট্যা বলি। হ্যাঁ একেবারে জবো।[৬৯]

এ নাট্যে দোহারের স্থল থেকে কোন কোন দোহার উঠে গিয়ে যথাবিহিত রূপসজ্জা গ্রহণ করে অভিনয় নিমিত্তে পুনরায় মঞ্চে উপস্থিত হয়।

এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট-২ এ, (মৌখিকরীতি থেকে সংগৃহীত গাজীর গানের উপকাহিনী ঃ 'জামাল-কামালের পালা' দ্রষ্টব্য)।

বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মানিকপীরের 'গীত' বা গান প্রচলিত আছে। কারো কারো মতে 'Manikhaios' থেকে বাঙলায় 'মানিক' কথাটা এসেছে। এই নামে একজন ধর্মপ্রচারক দ্বিতীয় বা তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দে জরথুস্ত্রীয় এবং ঈশাই ধর্মের মিশ্রণে এক নতুন ধর্ম মতের প্রচলন করেন। সুফীদের কাছে তিনি পীররূপেই মান্য।[৭০]

কেউ কেউ মনে করেন মানিকপীর হলেন 'দেবকল্প পীর'।[৭১]

সচরাচর বিভিন্ন রোগবালাই নিরাময়কারী পীররূপে তাঁর পরিচিতি। অবশ্য গৃহপালিত পশুপাখির রোগ-প্রতিরোধ ও আরোগ্যের ক্ষেত্রেই তাঁর শরণ নেওয়া হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফকির মুহম্মদ মানিকপীরের পাঁচালি রচনা করেন। এতে পীরের অবয়ব এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

ঃ কালিয় দস্তান পীর বান্ধিল মাথায়
নির্ঘৃণ ফকির মর্দ ছিড়া কাঁথা গায়।
ঘন ঘন মাছিগুলো উড়ে হাতে পায়
আর্বল আষা হাতে নিল উঠাইয়া।
দম দম মাদার বলে যাএ নেকালিয়া।।[৭২]

মানিকপীরের গীতে পীরের অলৌকিক ক্ষমতায় 'দুখাই' নামে এক রাখালের সঙ্গে বীরসিংহ রাজার কন্যার বিবাহের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

এ কাহিনীতে বাঘ সৈন্যের উল্লেখ আছে। মানিকপীরের দয়ায় রাজপুরীতে যাবার সময় 'বৈরাত' হিসেবে মশালধারী 'বাঘবাহিনী' দুখিয়ার সঙ্গী হয়।[৭৩]

ব্রতকথামূলক ছড়া বা গানে মানিকপীরের অবয়বের বর্ণনা দৃষ্ট হয়—

ঃ মাথায় রঙ্গিন টুপি ব্যেধের জাম্বিল
হাতে লয়ে আসাবাড়ি ফেরে মানিকপীর।[৭৪]

লোকবিশ্বাস তাঁর কাছে ব্যাধির পাত্র (ব্যেধের জাম্বিল)। তাঁর অসম্মান হলে তিনি ঐ পাত্র থেকে রোগের বীজ ছড়ান।

'খোয়াজখিজির' নবীকল্প পুরুষ। অমৃতভাণ্ডের খবর তাঁর জানা। সঙ্কট মোচনে বাঙলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে তিনি নিত্যই স্মরণীয়। গাজী-কালু-চম্পাবতীর আখ্যানে, বিভিন্ন কাব্যে তাঁর প্রসঙ্গ মাত্র আছে, পূর্ণাঙ্গ কাহিনী সংবলিত কোন পাঁচালি দেখা যায় না।

তবে ফেণী ও নোয়াখালীর সমুদ্রোপকূলীয় অঞ্চলে 'খোয়াজখিজিরের জারি' নামে একধরনের গীত প্রচলিত আছে। গায়েন এককভাবে একজন মাত্র দোহার সহযোগে গান ও কাহিনী ব্যাখ্যাপূর্বক এই জারি পরিবেশন করে। 'খোয়াজ-খিজিরের জারি'র একটি ধূয়া নিম্নরূপ—

ঃ কি খেলা খেলাইলেন জগতে
আল্লা পাকে

কি খেলা খেলাইলেন জগতে।।
বানাইয়া ওলি নবী এ দুনিয়া করলেন খুবি
এক একজন পাঠাইলেন এক এক ভাবে
আল্লা পাকে..........।।[৭৫]

খিজির, নদী ও সমুদ্রগামীগণের রক্ষক। হিন্দু-মুসলমান জেলে বা মৎস্যজীবী সম্প্রদায়, খিজিরের ভোগ দিয়ে তবে নৌকা ভাসায়।

ফেণী উপকূলীয় অঞ্চলে বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানীর জীবনকথাও 'জারি' নামে পরিচিত। এতে এই মহান ধর্মসাধকের জন্ম, অতিলৌকিক ক্ষমতার নানা কাহিনী বর্ণিত হয়। বড়পীরের জারি পরিবেশনায়ও দোহার মাত্র একজন। গায়েন একতারা সহযোগে, নৃত্যসহকারে এই গান পরিবেশন করে। সচরাচর এতে ঢোল-ডুগি ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না।

বাঙলাদেশে মধ্যযুগ থেকে বাহিত হয়ে এসেছে এরকম আরেক পীরগাথা 'মাদার বাঁশের জারি'। এই পীরকে নিয়ে অঞ্চলভেদে অনুষ্ঠিত হয় 'মাদার মনির গান' ও 'মাদারের গান'।

মাদার অগ্নি-নির্বাপণকারী পীর। গ্রামের মানুষ অগ্নিজনিত দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'সিরনি' দিয়ে থাকে তাঁর 'থানে'।

যে-গ্রামে মাদারপীরের 'থান' থাকে সেখানেই উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসব কালে গ্রামের বাঁশঝাড় থেকে দুটি বিশেষ ধরনের বাঁশ কেটে পানিতে ধুয়ে শালু কাপড় দিয়ে মোড়ানো হয়ে থাকে। বাঁশ দুটির অন্তত একটিতে, গিঁট ও অন্যান্য লক্ষণ মিলিয়ে মানুষের চোখ-মুখ-নাকের মতো কিছু চিহ্ন থাকে। একটি বাঁশ মাদারপীর ও অন্যটি খোয়াজখিজিরের প্রতীক।

সচরাচর মাঘমাসের পূর্ণিমায় মাদারপীরের নৃত্যগীত ও ওরশ বা মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এর নেপথ্য কারণ হলো, ঐ সময় থেকে বর্ষাকালের পূর্বপর্যন্ত অগ্নিকাণ্ডের ভয় থাকে।

এ সময়ে ভক্তরা মাদার বাঁশ নিয়ে গৃহস্থ বাড়ি থেকে 'সিরনি'র চাল-ডাল নগদ-টাকা-কড়ি জোগাড় করেন। এরপর পূর্ণিমায় বড় আকারে মেলায় নানারূপ কৃত্যসহকারে নাচগান পরিবেশিত হয়। সেদিন সকলের মধ্যে 'সিরনি' বাঁটা হয়।

মূল গায়েন দোহার সহযোগে 'মাদারপীরের গান' পরিবেশন করেন। মানিকগঞ্জ থেকে সংগৃহীত এরূপ একটি গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো—

দোহারগণ ঃ আঃ-আঃ-আঃ।

গায়ক ঃ দৌড়াইয়া আসিয়া হরিণী শুইয়া পড়িল
শুইয়া হরিণী তখন প্রসব করিল।।
মাংসপিণ্ড হরিণী তখন প্রসব করিয়া
বনেতে গেল হরিণী হরিণের লাগিয়া।।
এমন সময় আলী শাহ্ মক্কার শহর হইয়া
আসিল সেই গাছের তলে কি জানি ভাবিয়া।।
আসিয়া আলী দেখিল মাংসপিণ্ড এক
ঘাসেতে পড়িয়া আছে কেমুন জানি ভেক।।
হাতে নিয়া হযরত আলী তখনই দেখিল
সেই মাংসপিণ্ডের মধ্যে প্রাণ দেখিতে পাইল।।
নিয়া সেই মাংসপিণ্ড ফাতেমারে দিল
ফাতেমা সেই মাংস তুলাতে জড়াইল।।
তুলাতে জড়াইয়া ফাতেমা তাহারে
বান্ধিয়া রাখিল ফাতেমা আপনার উদরে।।
একদিন দুইদিন করে কিছুদিন গেল
একদিন সেই মাংসপিণ্ডের চোখ ফুটিল।।
আলী তাহার নাম দিল মাদার মণি
সেই তো ভাই হইয়া গেল দুনিয়ার ধনী।।
দমের মাদার নামে তাহার খ্যাতি হইল
নবীজীর সাতে মাদার লুকোচুরি খেলিল।।
একদিন নবী বলিতেছে মাদারের ঠাঁই
লুকোচুরি খেলিব আজি তোমাকে জানাই।।
মাদার বলছে তখন নবীজীর তরে

খেলিব লুকোচুরি বলিলাম তোমারে।।
এই বলিয়া নবীজী লুকাইয়া গেল
আসমান-জমিন-পাতাল মাদার খুঁজিতে লাগিল।।

দোহারগণ ঃ আঃ- আঃ-আঃ।[৭৬]

মানিকপীর বিষয়ক অন্যান্য পাঁচালি হচ্ছে শেখলাল ও শেখ জয়েনউদ্দিন রচিত 'গোরাচাঁদ পুথি' মুনশী মুহম্মদ খোদা নেওয়াজ রচিত 'গোরাচাঁদের কেচ্ছা'।[৭৭]

ফকির মুহম্মদ রচিত পীর মোবারক গাজীর কেচ্ছায় 'অনেক ঐতিহাসিক উপাদান' আছে।[৭৮]

পরিশেষে বলা যায়, পীর পাঁচালিকে কেন্দ্র করেই, মধ্যযুগের বাঙলা নাট্যরীতির একটি বিশেষ রূপ উদ্ভূত হয়েছিল। অবশ্য সকল পীরকথাই যে নাট্য আঙ্গিক লাভ করেছিল তা নয়। বড় খাঁ গাজী, ইসমাইল গাজী, দরাফ খান প্রমূখ পীরের জীবনকথা, সাধারণ পাঁচালিরূপেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে সত্যপীর ও গাজীপীরের মতো, কল্পিত পীরের কাহিনী অধিকতর নাট্যমূলক। এর মধ্যে 'গাজীর গানই' পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপে মধ্যযুগ থেকে একালে বাহিত হয়েছে।

টীকা

১. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড,* প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১লা বৈশাখ ১৩৯৮, পৃঃ ৩৯৮।
২. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড,* প্রথম প্রকাশ ২৯ শে অগ্রহায়ণ ১৩৯০, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৮০৯।
৩. শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত, শ্রী কবিবল্লভ বিরচিত, *সত্যনারায়ণের পুথি,* প্রকাশ ১৩২২, পৃঃ ১।
৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।
৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।
৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।
৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।
৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।
৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।

১০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।

১১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।

১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২

১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮।

২০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯।

২১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩।

২২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬-৪৭।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯।

২৪. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড,* প্রথম প্রকাশ ২৯ শে অগ্রহায়ণ ১৩৯০, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৮১৫।

২৫. সায়ের মুনশী ওয়াজেদ আলী সাহেব, *সত্যপীরের পুথি, মদন কামদেবের পালা,* প্রকাশ ১৩৫৬ সাল, পৃঃ ২।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।

৩১. মুহম্মদ আবু তালিব, অষ্টাদশ শতকের কবি, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯, পৃঃ ৪১।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭-৪৮।

৩৪. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য,* প্রথম প্রকাশ ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৯০, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৮২০।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২০-৮২৩।

৩৬. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, *বাংলার লৌকিক দেবতা দ্বিতীয় সং*-জুন ১৯৮৭, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪, পৃঃ ২৩২।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৯।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭।

৩৯. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য,* প্রথম প্রকাশ, ২৯ শে অগ্রহায়ণ ১৩৯০, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৮৪৬-৮৪৭।

৪০. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস,* ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৭৫ (বঙ্গাব্দ ১৩৮১) পৃঃ ৯২৯।

৪১. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য,* প্রথম প্রকাশ ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৯০, ১৬ইং ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৮৩৩।

৪২. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড,* প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১লা বৈশাখ ১৩৯৮, পৃঃ ৪৭৩।

৪৩. শ্রী সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী,* ১৯৬৬, পৃঃ ১৬৯।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮১-১৮২।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৭।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০১।

৪৭. আব্দুর রহিম কৃত, *আসল গাজির পুথি,* বটতলা সংস্করণ, পৃঃ ৪।

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

৫১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫।

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪।

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১।

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২।

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪।

৬০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬।

৬১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

৬২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

৬৪. কাজী আবদুল ওদুদ (এম. এ.) *ব্যবহারিক শব্দকোষ*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২২৮।

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০।

৬৬. আব্দুর রহিম কৃত, *আসল গাজির পুথি*, বটতলা সংস্করণ, পৃঃ ৭৩-৭৪।

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯-৪০।

৬৮. শ্রীরাজমোহন নাথ বি, ই তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত, *শ্রী শ্রী শঙ্করদেব বিরচিত, কালিয়দমন-নাট*, প্রথম সং ১৮৬৭ শক-১৯৪৫ ইং, পৃঃ ৫৪।

৬৯. আফসার আহমদ, 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বের আলোকে গাজীর গান : দিদার বাদশার পালা'। মৎসম্পাদিত থিয়েটার স্টাডিজ ৩য় সংখ্যা ১৯৯৫, পৃ : ৫০-৫১।

৭০. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম আনন্দ সংস্করণ* ১লা বৈশাখ ১৩৯৮, পৃঃ ৪০৮।

৭১. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৯০, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৮৪২।

৭২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৪৩।

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৪৪।

৭৪. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, *বাংলার লৌকিক দেবতা, দ্বিতীয় সংস্করণ* জুন ১৩৮৭, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪, পৃঃ ২০১।

৭৫. মৎপ্রণীত *হাত হদাই নাটকে গৃহীত*, নোয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চল থেকে সংগৃহীত, প্রযোজনা ঢাকা থিয়েটার, নির্দেশনা-নাসিরউদ্দিন ইউসুফ, ১৯৮৯।

৭৬. মোহাম্মদ সাইদুর সম্পাদিত, *লোকনাট্য*, লোকসাহিত্য সংকলন-৪৫, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৯১, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫, পৃঃ ১২৯-১৩০।

৭৭. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৯০, ১৬ ই ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৮৫০।

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫১।

নবম অধ্যায়

[মধ্যযুগের বাঙলা নাট্যরীতির আলোকে পূর্ববঙ্গ গীতিকা। গীতিকার পরিবেশনরীতি 'মহুয়া', 'মহুয়া' গীতিকার বিভিন্ন রূপ, গীতিকার কৃত্যরূপ, 'কাঞ্চন কন্যা' বা 'ধোপার পাট', মনসুর বয়াতির 'দেওয়ানা মদিনা', চন্দ্রাবতীর 'দস্যু কেনারামের পালা' প্রভৃতি।

নাট্যরূপে যাত্রার উদ্ভব, লীলানাটক ও যাত্রা, কথকতারীতিতে 'নিমাই সন্ন্যাসের পালা', ঢপ কীর্তনের আঙ্গিক।

মোহাম্মদ খানের 'মক্তুল হোসেন', গরীবউল্লাহর 'জঙ্গনামা', জোনাব আলীর 'আদি ও আসল সহিদে কারবালা', এ সকল কাব্যের পরিবেশনারীতি। 'জারিগান', জারির লোকনাট্যরূপ, 'ঘাটু', 'ঝুমুর', 'আলকাপ', 'কাঠুরিয়ার আলকাপ', বাংলাদেশের উপজাতীয় নাট্যরীতি গারো ও মারমা সম্প্রদায়ে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের নাট্য।]

পূর্ববঙ্গীয় গীতিকার উদ্ভবকাল ষোড়শ শতক বলে অনুমিত হয়েছে। সচরাচর এসকল আখ্যান 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' নামে পরিচিত। বস্তুত গীতিকাগুলো প্রথমদিকে বৃহত্তর মৈমনসিংহ থেকে সংগৃহীত হওয়ার জন্যই সেগুলো অঞ্চল বিশেষের নামে নামাঙ্কিত হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, মৈমনসিংহ অঞ্চল ছাড়াও মধ্যযুগে সমগ্র পূর্ববঙ্গে এ ধরনের গীতিকা রচিত ও পরিবেশিত হয়েছিল।

অন্যদিকে প্রাপ্ত গীতিকাগুলোর কোনো কোনোটি বৌদ্ধযুগের বা চতুর্দশ শতাব্দীর বলে মনে করা হলেও সকল গীতিকা প্রাচীনকালের নয়।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার'[১] বিভিন্ন খণ্ডে ধৃত অনেক পালা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের। এমনকি কোনো কোনো পালা একালেও গীতিকার ধারায় রচিত হতে দেখা যায়। সে কারণে আলোচনার সুবিধার্থে আমরা একে 'পূর্ববঙ্গীয় গীতিকা' বা 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে অভিহিত করার পক্ষপাতী।

ষোড়শ শতকেই গীতিকা একটি সুনির্দিষ্ট আঙ্গিকে রূপলাভ করেছিল। কৃত্যপাঁচালি বা প্রণয়পাঁচালির রীতি থেকে এ একেবারে ভিন্ন। গীতিকা, পাঁচালি বা কথকতার মতো নিতান্তই আসরের সামগ্রী। এর অন্তর্গত কাহিনীর আঙ্গিক, নাট্যমূলক উপস্থাপনা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, মধ্যযুগের বাঙলা নাটকের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে পূর্ববঙ্গীয় গীতিকা নিঃসন্দেহে এক স্বতন্ত্রধারার নাট্যরীতি রূপে বিবেচ্য। মধ্যযুগের ধর্মতান্ত্রিক পাঁচালির ধারায় মানবের যে পরিচয় উদ্ভাসিত হতে দেখা যায়, তা সামাজিকের সমষ্টিগত ধর্মদর্শনেরই অভিজ্ঞানবাহী। নাথগীতি, মঙ্গল-পাঁচালিতে মানুষের ব্যক্তিপরিচয়, তান্ত্রিক পুরুষের মহিমা ও দেবতার অতিলৌকিক লীলার আড়ালে প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। প্রণয়মূলক পাঁচালি, মধ্যযুগের অভিজাততন্ত্রের শিল্পরস পিপাসার ফসল। তাতে নায়ক-নায়িকা উচ্চকোটি সমাজের। রাজকুমার ও রাজকন্যার প্রেমোন্মাদনা স্বর্গ-মর্তের সকল প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে নিতে দেখা যায় সে সকল পাঁচালিতে।

কিন্তু পূর্ববঙ্গীয় গীতিকা, একান্তভাবেই পল্লীজীবনের নৈসর্গিক পরিমণ্ডলের সম্পদ। এর আখ্যানের পাত্রপাত্রীদের মানবীয় আনন্দ-বেদনার কোথাও স্বর্গলোকের দয়া ও করুণার ছায়াপাত ঘটে নি। তাদের স্বীয় আকাঙক্ষার স্রোতোস্বিনী—সমাজ ও প্রতিবেশের খাত কেটে আনন্দ-বেদনা, উচ্ছ্বাস-পতনের সংঘাতে লাভ করেছে এক অভূতপূর্ব মানবীয় পরিণামমুখি গতিধারা। সেই পরিণামকে তারা গ্রহণও করেছে জীবনের অনিবার্য ফলশ্রুতিরূপে।

পূর্ববঙ্গীয় গীতিকা রচিত হয়েছে মুখে মুখে। আগেই বলা হয়েছে, গীতিকার যে আঙ্গিক আমরা বর্তমানে প্রত্যক্ষ করি, তার সূচনা পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক থেকে। কোনো কোনো গীতিকা, কিংবদন্তী বা সত্যমূলক ঘটনা, তৎকালপূর্বেও উদ্ভূত হতে পারে। গল্প-কিস্‌সার আকারে সেগুলো লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। পরে সে সকল কিংবদন্তী বা সত্যমূলক (অথবা কাল্পনিক) ঘটনা গীত-নৃত্যাভিনয়ের আশ্রয়ে পূর্ণাঙ্গ গীতিকা বা 'লোকগীত-কথা'য় পরিণাম লাভ করে।

আবার এই গীতিকা, এককালে যখন পরিবেশনের ক্ষেত্রে চরিত্রমূলক উপস্থাপনার তাগিদ এল, তখন পূর্ণাঙ্গ নাট্যমূলক পালায় হলো রূপান্তরিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'কাজলরেখা'—মূলত প্রাচীন বাঙলায় এর কাহিনী

পরিবেশিত হতো বৈঠকীরীতিতে, পরে তা গীতিকার আঙ্গিকে 'দাঁড়'রীতিতে বা 'বৈঠকী'রীতিতে এবং অষ্টাদশ শতকের শেষে এই আখ্যানই চরিত্রমূলকনাট্যে রূপান্তরিত হলো। এখনও কিশোরগঞ্জ এলাকার কোনো কোনো দল, পালার আকারে, খানিকটা চরিত্রানুগ রূপসজ্জা গ্রহণপূর্বক 'কাজলরেখা' পরিবেশনা করে থাকে।

'মহুয়া' সম্পর্কে এই ধরনের তথ্য থাকলে, 'চন্দ্রকুমার বাবু'র সংগৃহীত মহুয়ার পালাটি সম্পর্কে আমাদের বিভ্রান্তির অবকাশ থাকত না।

যে-কালে চন্দ্রকুমার এ পালা সংগ্রহে ব্রতী হন তখন বিংশ শতকের শুরু। পূর্ববঙ্গ গীতিকার কোনো কোনোটি তখন পূর্ণাঙ্গরূপে নাট্যপালার অধীনে রূপান্তরিত হয়েছে।

পরবর্তীকালের সংগ্রাহকগণ 'মহুয়া'র যে বিকল্প পাঠ উদ্ধার করেছেন তা পূর্ববঙ্গীয় গীতিকা নয়। ঘাটুর দল বা ঘাটুগানের দল নামে অভিহিত পালা পরিবেশনকারী দলের অভিনেতা বা দলীয় প্রধানের কাছ থেকে সংগৃহীত পাঠ। সংগৃহীত মহুয়ার কাহিনী অবলম্বনে রচিত দু'টি পালা দেখলেই একথা বোঝা যায়।[২] দুটি পালাতেই দেখা যায়—মূল কাহিনীটা ঠিক রেখে সর্বত্র প্রয়োজন বা ইচ্ছামত নতুন নতুন চরিত্র ও ঘটনা সংযোজিত হয়েছে। একই কাহিনীতে নানা মাত্রায় ঘটনা ও প্রসঙ্গ সংযোজিত হবার দৃষ্টান্ত গাজীরগানেও আছে। সে পার্থক্য এতদূর যে দেখে বিস্মিত হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফরিদপুরের নগরকান্দা অঞ্চলে প্রচলিত গাজীরগানে চরিত্রাভিনয়ের রীতি খানিকটা গৃহীত হলেও, মানিকগঞ্জ অঞ্চলে তা পূর্ণাঙ্গ রূপেই গায়েন-দোহারের পাঁচালি। একমাত্র 'ঠ্যাটা' ছাড়া সে পালায় দ্বিতীয় কোনো চরিত্রের অস্তিত্ব নেই।

চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত 'মহুয়া'র যে-নামান্তরই পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হোক না কেন, তা থেকে এই গীতিকার আদি, মধ্য ও অন্ত সম্পর্কে সন্দেহ করা চলে না। উপরন্তু সম্পূর্ণ মৌখিকরীতি নির্ভর কোনো আখ্যান বা রচনার সঠিক পাঠ নির্ণয় দুঃসাধ্যও বটে।

গীতিকা সম্পর্কে এরূপ বলা হয়েছে যে, 'বিশেষত; মুসলমানগণ' এই গান গায়, 'আর শতশত চাষা লাঙ্গলের উপর বাহুভর' দিয়ে তা শোনে।[৩] এই বিবরণ অনুসারে দেখা যায়, এ শ্রেণীর গীতিকা-পালা, সংক্ষিপ্ততম আকারে পরিবেশিত

হতো। প্রকৃতপক্ষে আখ্যান পরিধির যে রূপ সম্পাদিত গ্রন্থসমূহে দৃষ্ট হয় তা পূর্ণাঙ্গভাবে পরিবেশন করতে গেলে অবশ্যই দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন।

সেজন্য ধারণা করা যায়, পূর্ববঙ্গীয় গীতিকার কোনো কোনোটির সংক্ষিপ্ততম রূপ সেকালে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে প্রচলিত ছিল। এ ছিল একক পরিবেশনা।

প্রকৃতপক্ষে গীতিকার পরিবেশনা আসরকেন্দ্রিক এবং তা স্থান নির্বিশেষে নদীতীর, বাজার, গৃহস্থ বাড়ির আঙিনা প্রভৃতি স্থানে পরিবেশিত হতো। এর মধ্যে অধিকাংশ পালাই সারা রাত্রিব্যাপী গেয়। এর কারণ গীতমধ্যস্থ ধুয়া, যা দোহার কণ্ঠে পৌনপুনিক আবৃত্ত হতো। অন্যদিকে গীতের সুরগুলি ছিল দীর্ঘ লয়ের, উজান, ভাটিয়ালী, মুর্শিদী প্রভৃতি গ্রাম্য সুরে গেয়। এ সকল পালায় গায়েন গীতের আগে ও পরে ঘটনা চরিত্র বা পরিস্থিতি গদ্যে ব্যাখ্যা করতেন। উল্লেখ্য যে, গীতিকা-পালায় সচরাচর ধুয়া নির্দিষ্ট থাকে না এ শ্রেণীর পালায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গায়েন কোনো বর্ণনামূলক অংশের গান ধরার সঙ্গে সঙ্গে, দোহারগণ তাতে অংশগ্রহণ করে। এ ফাঁকে গায়েন, নৃত্য বা হাবভাব প্রদর্শন করে অথবা স্বল্পক্ষণের জন্য অবসর নেয়। গীতিকা-পালায় দেখা যায়, চরিত্র অনুসারে সংলাপমূলক গীতগুলি কখনও কখনও গায়েন ও দোহারের মধ্যে কেউ কেউ ভাগ করে নেয়। এর ফলে তা নাট্যমূলক হয়ে ওঠে। 'কাজলরেখা' শ্রেণীর গীতিকায়, গায়েন গদ্যের অংশ পুরোটাই বলে, গানের ধুয়া ধরে দোহার। দোহারকর্তৃক উক্তি-প্রত্যুক্তির ব্যবস্থাও থাকে গীতে। তবে সে পাঁচালির ঠ্যাটার মতো হাস্যরস সৃজন বা 'Paradox' তৈরি করে না। পাঁচালির সঙ্গে গীতিকা-পালার পরিবেশনার পার্থক্য অনেক।

পাঁচালির কৃত্যমূলক ধারায় গায়েনের হাতে থাকে 'চামর'। সচরাচর গীতিকার গায়েন দুটো বালিশ বা তাকিয়ার সাহায্যে কখনও বসে বা কখনও দাঁড়িয়ে নানাবিধ অভিনয় প্রদর্শন করে।[৪] বালিশ দুটো সরাসরি তাল প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। ঢোলের সঙ্গে এই তাল শ্রবণ সুখকর।

উল্লেখ্য যে, কোনো গীতে গায়েন বালিশ ব্যবহার নাও করতে পারেন।

পূর্ববঙ্গ গীতিকা মূলত যে নাট্যমূলক তা বোঝা যায় গায়েনের রূপসজ্জারীতি থেকে। সচরাচর গায়েনের নিম্নাংশে পুরুষের পোশাক যেমন লুঙ্গি ও ঊর্ধ্বাংশে ফতুয়ার উপর শাড়ি বা উড়ুনি জড়ানো থাকে। ধরা যাক, মহুয়ার চরিত্রে তিনি ঊর্ধ্বাংশের শাড়িকে ঘোমটার মতো করেছিলেন আবার নদ্যারচাঁদের ক্ষেত্রে দেখা

গেল শাড়ি বা উড়নিকে কোমরে পেঁচিয়ে নিয়েছেন। পুরুষ চরিত্রের ক্ষেত্রে যথার্থ হাবভাব ফুটিয়ে তোলা সহজ কিন্তু গুণশালী গায়েনের পরিচয়, তিনি স্ত্রী চরিত্র কতটা অনুপুঙ্খরূপে ফুটিয়ে তুলতে পারেন।

গীতিকায় গায়েনের অঙ্গাভরণ বা অলঙ্কার বলতে থাকে গলায় বিশেষ ধরনের মালা। এটিকে গায়েন নানাভাবে নানা অলঙ্কারের সমতুল্য করে তোলেন। দাসীকে রাণী যে মালা দিল সে মালাই রাজা দিলেন রাণীকে।

পাঁচালির সঙ্গে গীতিকার পদ রচনা এবং এর পরিবেশন কৌশলের পার্থক্যও দুস্তর।

কৃত্য বা প্রণয়মূলক পাঁচালির পদসমূহ প্রায় সকলক্ষেত্রেই রাগ-রাগিণী নির্ভর। এর মধ্যে ছন্দোগত বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। প্রধানত পয়ার ও নাচাড়ি বা ত্রিপদী ছন্দে পাঁচালির পদ রচিত হয়। পরবর্তীকালে নানান সংস্কৃত ছন্দের প্রয়োগও পাঁচালি কাব্যে দৃষ্ট হয়। 'দীর্ঘছন্দ', 'একাবলী', 'খয়েরা' প্রভৃতি ছন্দের প্রয়োগে পাঁচালি নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধতর গেয়কাব্য রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। পাঁচালিতে গায়েনের অভিনয়, শিকলি, নাচড়ি, কথা, বোলাম প্রভৃতি পদপার্বিক-রীতি, শতশত বৎসরের অনুবৃত্তির ফলে, এক বিশিষ্ট শিল্পরীতি হিসেবে গ্রাহ্য।

গীতিকা সচরাচর স্বরাঘাত-প্রধান গ্রাম্যছন্দে রচিত। এই ছন্দের নিয়মের ভিতরেই পালাকারদের খানিকটা বৈচিত্র্য সঞ্চারের প্রয়াস আছে বটে কিন্তু তা কখনও লোক-ছন্দের সীমা অতিক্রম করে নি। সচরাচর কয়েকটি লোকগীতির সুর অবলম্বনে গীতিকা পরিবেশিত হতো। পরিচিত লোকসুরসমূহ এই ছন্দে পরিবেশন সহজতর ছিল।

গীতিকার বন্দনা অংশ খুবই সংক্ষিপ্ত। একটিমাত্র পদেই, আল্লা-রসুল, কখনও কখনও একই সঙ্গে সরস্বতী, পীর বা অন্যান্য দেবদেবী ও গুরু বন্দনা দিয়ে পালা আরম্ভ করা হয়।

অন্যদিকে কৃত্যমূলক এমনকি প্রণয়মূলক পাঁচালিতেও নানা প্রসঙ্গে বন্দনা, স্তুতি দৃষ্ট হয়। দু'ধরনের পাঁচালিতেই বন্দনার নানা স্তর শেষ পর্যন্ত অবশ্যকরণীয় রূপে বিদ্যমান।

পাঁচালির মত গীতিকা সম্পূর্ণত আসরে পরিবেশিত হবার জন্য রচিত হয়। পাঁচালি বা গীতিকার পাঠ থেকে কখনই এর নাট্যভিনয়ের কৌশল পুরোপুরি উদ্ধার করা সম্ভব নয়। সাদা চোখে আপাতত যে সকল অংশ খুবই সাধারণ বলে মনে

হয়, গায়েনের দক্ষতা অনুসারে সে সকল অনুজ্জ্বল অংশও দ্যুতিময় হয়ে ওঠে আসরে।

দ্বিজ কানাইর নামে প্রচলিত 'মহুয়া', বিয়োগান্তমূলক গীতিকা। একই কাহিনী সংবলিত নাট্যপালায় মহুয়ার নাম 'চন্দ্রা'। এ ছাড়া এতে অন্য দুই প্রধান চরিত্র 'হুমরা বাইদ্যা' ও 'নদ্যার চাঁদের' নাম আছে।

চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত 'মহুয়া'র পালার কাহিনীতে আছে, গারো অঞ্চলের বাজিকর বাইদ্যা সম্প্রদায় সমতল ভূমিতে এসে এক ব্রাহ্মণের 'ছয় মাসের শিশু কন্যা'কে চুরি করে নিয়ে লালন-পালন করে। সে শিশুর নাম রাখা হলো মহুয়া। সে বড় হলো, খেলা কসরৎ শিখল। তার রূপ দেখে 'মুনির টলে মন'। চুল তার এত দীর্ঘ যে, পায়ের গোড়ালিস্পর্শ করে।

গীতিকার সরল অথচ সচল বর্ণনারীতির উৎকৃষ্ট নমুনা হিসেবে মহুয়ার বয়ঃসন্ধি কালের রূপ বর্ণনার এ অংশটুকু উদ্ধৃত হতে পারে—

ঃ ছয় মাসের শিশু কইন্যা পরমা সুন্দরী।
রাত্রি নিশাকালে হুমরা তারে করল চুরী।।
চুরী না কইর‍্যা হুমরা ছার‍্যা গেল দেশ।
কইবাম্ সে কন্যার কথা শুন সবিশেষ।।
ছয় মাসের শিশুকন্যা বচ্ছরের হৈল।
পিঞ্জরে রাখিয়া পঙ্খী পালিতে লাগিল।।
এক দুই তিন করি শুল বছর যায়।
খেলা কছরত তারে যতনে শিখায়।।
সাপের মাথায় যেমন থাইক্যা জ্বলে মণি।
যে দেখে পাগল হয় বাইদ্যার নন্দিনী।
বাইদ্যা বাইদ্যা করে লোকে বাইদ্যা কেমন জনা।
আন্দাইর ঘরে থুইলে কন্যা জ্বলে কাঞ্চা সোনা।।
হাট্টীয়া না যাইত কইন্যার পায়ে পড়ে চুল।
মুখেতে ফুট্টা উঠে কনক চাম্পার ফুল।।[৫]

'মহুয়া'র উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক অংশগুলি সংক্ষিপ্ত অথচ তাতে নাট্যসংলাপের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। নদ্যার ঠাকুরের সঙ্গে মহুয়ার জলের ঘাটে দেখা অংশে বর্ণনা ও উক্তি-প্রত্যুক্তি আলাদা করে দেখান হলো—

(বর্ণনাঃ) একদিন নদ্যার ঠাকুর পন্থে করে মেলা।।
ঘরের কুনায় বাতি জ্বালে তিন সন্ধ্যার বেলা।।
তাম্‌সা কইরিয়া বাদ্যার ছেড়ী ফিরে নিজের বাড়ি।
নদ্যার ঠাকুর পথে পাইয়া কহে তড়াতড়ি।।

(নদ্যার চাঁদঃ) শুন শুন কইন্যা ওরে আমার কথা রাখ।
মনের কথা কইবাম আমি একটু কাছে থাক।।
সইন্ধ্যা বেলায় চান্নি উঠে সূরুয বইসে পাটে।
হেন কালেতে একলা তুমি যাইও জলের ঘাটে।।
সইন্ধ্যা বেলা জলের ঘাটে একলা যাইও তুমি।
ভরা কলসী কাঙ্কে তোমার তুল্যা দিয়াম আমি।।

(বর্ণনাঃ) কলসী করিয়া কাঙ্কে মহুয়া যায় জলে।।
নদ্যার চান ঘাটে গেল সেইনা সইন্ধ্যা কালে।।

(নইদ্যার চাঁদঃ) জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ মন।
কাইল যে কইছিলাম কথা আছে নি স্মরণ।।

(মহুয়াঃ) শুন শুন ভিনদেশী কুমার বলি তোমার ঠাই।
কাইল বা কি কইছলা কথা আমার মনে নাই।।

(নদ্যার চাঁদঃ) নবীন যইবন কইন্যা ভুলা তোমার মন।
এক রাতিরে এই কথাটা হইলে বিস্মরণ।

(মহুয়াঃ) তুমি ত ভিন দেশী পুরুষ আমি ভিন্ন নারী।
তোমার সঙ্গে কইতে কথা আমি লজ্‌জায় মরি।।

(নদ্যার চাঁদঃ) জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ ঢেউ।
হাসি মুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ।।
কেবা তোমার মাতা কইন্যা কেবা তোমার পিতা।
এই দেশে আসিবার আগে পূর্ব্বে ছিলি কোথা।।

(মহুয়াঃ) নাহি আমার মাতাপিতা গর্ভ সুদর ভাই।
সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই।।
কপালে আছিল লিখন বাইদ্যার সঙ্গে ফিরি।
নিজের আগুনে আমি নিজে পুইর‍্যা মরি।।

এই দেশে দরদী নাইরে কারে কইবাম কথা।
কোন জন বুঝিবে আমার পুরা মনের বেথা।।
মনের সুখে তুমি ঠাকুর সুন্দর নারী লইয়া।
আপন হালে করছ ঘর সুখেতে বান্দিয়া।।

(নদ্যার চাঁদঃ) (ঠাকুর বলে) "কইন্যা তোমার শানে বান্ধা হিয়া।
মিছা কথা কইছ তুমি না কইরাছি বিয়া"।।
"কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার প্রাণ।
এমন যইবন তোমার যায় অকারণ।।

(মহুয়াঃ) "কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার হিয়া।
এমন যইবন কালে নাহি দিছে বিয়া।।"

(নদ্যার চাঁদঃ) "কঠিন আমার মাতাপিতা কঠিন আমার হিয়া।
তোমার মত নারী পাইলে করি আমি বিয়া।।"

(মহুয়াঃ) "লজ্জা নাই নিলজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর।।"

(নদ্যার চাঁদঃ) "কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুব্যা মরি।।[৬]

শুধু গীতিকায় নয়, প্রণয়মূলক আখ্যান বা আখ্যান মধ্যে অন্যত্রও, যেমন বেউলা-লখিন্দারের পালায়, প্রথম দর্শনে প্রায় এ ধরনের উক্তি করে নাম চরিত্রদ্বয়। কাজেই এ কারো হস্তক্ষেপের নিদর্শন নয়।

উদ্ধৃত অংশে এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক কৌশল লক্ষণীয়। মহুয়া মূলত নদ্যার চাঁদের বৈবাহিক অবস্থা জানতে চায়, তাই সে পূর্বাপর পরিকল্পিত ভাবেই 'সুন্দর নারী' নিয়ে নদ্যার চাঁদের সুখে দিন যাপনের কথা বলছে। নায়িকা কপট রাগে নায়ককে গলায় কলসী বেঁধে মরতে বলে। এরপরই প্রেমের গভীর গাঙরূপে প্রেমিকা উপমিত হওয়ায় নায়কের মনোভাবে এক ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

এ পালার কোনো কোনো অংশ অভিনয় ক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হতো বলে মনে করা যায়। সম্পাদিত গ্রন্থে মহুয়ার আত্মহত্যা ও নদ্যার চাঁদকে হত্যা করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে—

ঃ (মহুয়ার নিজ বক্ষে ছুরিকা-আঘাত ও পতন। হুমরার আদেশে বেদের দল কর্তৃক নদের চাঁদের প্রাণবধ)।

এ অবশ্য প্রচলিত নাট্যপালা বা গদ্যে প্রদত্ত গায়েনের বিবরণ দৃষ্টে উল্লিখিত হয়েছে। কারণ গীতিকার পরিবেশনায় বিভিন্ন চরিত্রানুযায়ী অভিনয়ের রীতি থাকার কথা নয়।

মহুয়া প্রভৃতি পালার বিয়োগান্ত পরিণাম সম্পর্কে সন্দেহ করার কোনো অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।[৭] নদ্যার চাঁদ মহুয়াকে নিয়ে পালিয়ে গেলে হিংস্র বেদের দলের রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে, কাজেই মহুয়ার দলের পক্ষে নদ্যার চাঁদকে হত্যা করা ছাড়া আর কি পন্থা অবলম্বন করা উচিত ছিল তা ভাবা যায় না। মহুয়ার আত্মহত্যা কেন মূলে থাকবে না, তাও বোঝা যায় না। মহুয়ার আত্মহত্যা, তার প্রেমের তীব্রতারই ফলশ্রুতি। তা'ছাড়া, অন্যান্য পালাদৃষ্টেও বলা যায় মহুয়ার আত্মহত্যা নতুন কোনো ঘটনা নয়। কাঞ্চনকন্যা গাঙে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে, মদিনার অনাহারে ও উন্মাদিনীরূপে মৃত্যু আত্মহত্যারই নামান্তর।

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের সুবিশাল ধারায়, বিয়োগান্ত পরিণাম মাত্র দুটি পাঁচালিতে দেখা যায় মনসামঙ্গলে, বেহুলা-লক্ষীন্দরের উপাখ্যানে এবং দৌলত উজিরের 'লাইলি মজুন' কাব্যে।

সেক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গীয় গীতিকার বিয়োগান্ত আখ্যানগুলো নিঃসন্দেহে আমাদের রস উপভোগের চিরাচরিত প্রথায় এক নতুন আস্বাদ বয়ে এনেছে, একথা স্বীকার্য।

১৩২২ সালে সংগৃহীত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের পালাটি গীতিকা নয় পালানাট্য। সেখানে মহুয়ার 'মেওয়া' নাম সম্পর্কে বলা যায়, মৈমনসিংহ অঞ্চলে ঘোষ-মহাপ্রাণ ধ্বনি অঞ্চলবিশেষে ঘোষ-অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। খাওয়া-হাওয়া, সাহু-সাউ, এরূপে 'মহুয়া' শব্দটি মূলে 'মেওয়া' হতে পারে আবার মূলে মহুয়া শব্দটি 'মেওয়াতে'ও রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব।

মূল নামটি হয়ত চন্দ্রকুমার দে পরিবর্তন করেছিলেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে মূল পালাটির নাম 'বাইদ্যানীর গান' হলেও তাতে প্রমাণিত হয় না যে, নীতিগতভাবে চন্দ্রকুমার দে গীতিকার নামকরণের প্রচলিত ধারাকে ভঙ্গ করেছেন। 'কাজলরেখা', 'কাঞ্চন কন্যা', 'দেওয়ানা মদিনা' প্রভৃতি নাম গাথার নায়িকার নামানুসারেই প্রচলিত ছিল।

পূর্ণচন্দ্র সংগৃহীত পালায় জলের ঘাটে মহুয়ার সাক্ষাৎ নিম্নরূপ—

ঃ বেদেরা বাড়ি ঘর তুলিয়া শাকবেগুণের বাগান করিয়া স্বচ্ছন্দে সেখানে আছে। একদিন সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি আসিবার পথে মেওয়া নদ্যার চান্দের দেখা পাইল। নদ্যার চান্দের ইচ্ছা ছিল কিছু কথাবার্তা হয়, কিন্তু তখন মেওয়ার অবসর নাই। তাই সে মেওয়াকে বলিয়া দিল,

সন্ধ্যা বেলায় জলের ঘাটে একলা যাইও তুমি
ভরা কলসী কান্খে তোমার তুল্যা দিবাম আমি।
তোমার সাথে কৈবাম কথা মনের কোনায় বান্ধা
তোমার মনের কথা কৈয়া দূর কৈরা দিও ধান্ধা।

সন্ধ্যায় নদীর ঘাটে দেখা হইল। নদ্যার চান্দ বিবাহ প্রস্তাব করিলে মেওয়া বলিল, বেদের মেয়েকে বিবাহ করিবে, তাও কি হয়? তুমি—

লাজ ধর্ম সকল ছাড়ছু ছাড়ছু দেশের ডর
গলায় কলসী বান্ধ্যা জলে ডুব্যা মর।

নদ্যার চান্দ উত্তর দিল,

কৈ পাইবাম কলসীরে কন্যা কৈ বা পাইবাম দরি
তুমি হও গহিন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি।[৮]

এর সঙ্গে, কিশোরগঞ্জের 'নগুয়া গ্রাম' থেকে সংগৃহীত 'বাইদ্যানীর গানে' ঠিক এ অংশটি নিম্নরূপ--

নইদ্যার চান ঃ সাপ মারবাম সাপুনী মারবাম মনি লইলাম হাতে,
মনের ঘরে প্রাণটি দিয়া প্রেম করলাম তার সাথেরে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।
জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ ঢেউ
হাসি মুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ রে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।

চন্দ্রা ঃ তুমি হইলা ভিন্ন পুরুষ আমি ভিন্ন নারী
কি করিয়া কইব কথা হায়রে আমি লজ্জায় মরি রে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।

নদ্যার চান ঃ তুমি বল ভিন্ন ভিন্ন আমি ভিন্ন নই
তুমি আমি এক হইলে কিসে ভিন্ন হই রে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।

চন্দ্রা ঃ একেলা পাইয়া নাগর আর কর চাতুরালী
উমরা বাইদ্যা লাগুল পাইলে মাথায় দিব বাড়ী রে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।

নদ্যার চান ঃ কারবা খাইলাম টেকা পইসারে
কার বা খাইলাম কড়িরে
কার বাপের শক্তি আছে মাথায় দিত বাড়ী রে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।

নদ্যার চান ঃ জল ভরগো সুন্দর কইন্যা জলে দিছ ঢেউ
উপুর অইয়া বোড়াও কলসী বুকে লাগে ঢেউ রে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।

চন্দ্রা ঃ লাজ নাই নিলজ্জা পুরুষ সরম নাইরে তর
গলায় কলসী বাইন্ধ্যা জলে ডুইব্যা মররে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।

নদ্যার চান ঃ কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী
তুমি হওনা গহীন গঙ্গা তাইতে আমি ডুইব্যা মরি রে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।

চন্দ্রা ঃ প্রেমের সাগর গহীন সাগর নামলে উঠা দায়
আমার সাথে করলে পীরিত কানব তোমার বাপ মায় রে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।

নদ্যার চান ঃ আমার নাইরে মাতা নাইরে পিতা নাই সুদ্দর ভাই
তুমি কইন্যা বিনে হায়রে ডাকের লইখ্য নাই রে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।

চন্দ্রা ঃ কেমন তোমার মাতা পিতা কেমন তোমার হিয়া
অত শিয়ান অইছ নাগর না করাইছে বিয়ারে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।

নদ্যার চান ঃ ভাল আমার মাতা পিতা ভাল তাদের হিয়া
তোমার মত সুন্দরী আমি করব বিয়ারে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।[৯]

পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য সংগৃহীত 'বাইদ্যানী পালার' শেষাংশ নিম্নরূপ—

ঃ এদিকে বেদেরা দুইজনকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেইখানে আসিয়া তাহাদের সন্ধান পাইয়া চারিদিকে বেড়িয়াছে। তাহাদের বাঁশীর সানে মেওয়া তাহাদের সান্নিধ্য বুঝিল। স্বামীকে সে সব কথা বলিল। সে যে ব্রাহ্মণ কন্যা সে পরিচয়ও দিল। সে বলিল আজ ঘুমাইব না, তোমার কোলে শুইয়া রাত কাটাইব।

পলানের পথ নাই গায়ে নাহি বল
তোমার কোলেতে দেহ হউক শীতল।

অবিলম্বে বেদেরা আসিয়া পড়িল। উন্দর‍্যা মেওয়ার হাতে বিষ মাখানো ছুরি দিয়া বলিল,

এই লও মা দিলাম ছোরা আছে জবর ধার
তোর হাতেই দেখ্যা লৈতাম দুশ্‌মনের মার।
বাঘের ঘরে চুরি কৈরা জাইত খোয়াইল মোর
আমার পালক পুত সুজন খেলোয়ার—
তোমারেত দিবাম বিয়া সহিতে তাহার।

মেওয়া উন্দর‍্যার হাত হইতে ছুরি লইয়া নিজের বুকে বসাইয়া দিল। নদ্যার চান্দ দুই হাত দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। অমনি বেদেরা তাহার উপর অস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিল। অবশেষে দুইজনকে এক সঙ্গে কবর দিয়া বেদেরা চলিয়া গেল। কিন্তু পালনসখী সে স্থান হইতে নড়িল না।

সন্ধ্যাতে জ্বালাইয়া বাতি কবরেতে দিয়া
কতনা করুণা গাহে কান্দিয়া কান্দিয়া।
পালং সইএর চক্ষের জলে ভাসে বসুমাতা
এতদূরে সাঙ্গ হৈল নদ্যাচান্দের কথা।।[১০]

পরবর্তীকালে সংগৃহীত 'বাইদ্যানীর গানে'র শেষাংশ নিম্নরূপ—

উমরা।। (একটি ছুরি চন্দ্রার হাতে দিয়া)

আর, যাও যাও চন্দ্রাবলী এইও ছুরি লইয়া যাও

বিষ লইক্ষের ছুরি নিয়া ঠাকুরের বুকেতে বসাও রে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।
আর ছুরিটি বসাইয়া চন্দ্রা দারূণ পাপিষ্টারে মারঅ
সগল জ্বালা ভুইল্যা তুমি চল আমার ঘরঅ রে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।

(দু'জনের প্রস্থান। কিছুক্ষণ পর চন্দ্রাও নাইদ্যার চান আসরে আসবে)

চন্দ্রা ।। আর, শুন শুন প্রাণের ঠাকুর ঠাকুরে তোমারে জানাই
উমরা বাইদ্যা পাইছে মোরে উপায় দেখি নাইরে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।

নইদ্যার চান ।। আর শুন শুন শুন চন্দ্রা বিপদ দেখি ভারী
উমরা বাইদ্যা পাইছে মোরে উপায় দেখি নাইরে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।

চন্দ্রা ।। না যাইবাম, না যাইবাম ঠাকুর না যাইবাম উমরারে ছাড়িয়া
শিশুকালে পালাপোষ্য করছে আরও বুকের মাঝে লইয়ারে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।
আর ঘরে ফিইরা যাও ঠাকুর মায়ের কোলের ধন
এই বিষ লইক্ষের ছুরি দিছে তোমায় মারবার কারণ রে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।

নইদ্যার চান ।। আর, কি শুনাইলা চন্দ্রাবলী কি শুনাইলা কানে
ঘরে না ফিরবাম আমি মরবাম এইও খানেরে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।
আর, কও কত চন্দ্রাবলী হাইস্যা কথা কও
বিষ লইক্ষের ছুরি নিয়া আমার বুকেতে বসাও রে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।
আর তোমার হাতে মরলে কইন্যা না পাইবাম দুখ
হাইস্যা হাইস্যা মরবাম আমি দেইখ্যা তোমার মুখরে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।

চন্দ্রা ।। আর
কি আছিল নছিবে গো আল্লা পড়লাম বড় ফেরে

কারে থুইয়া কারে ছাড়ি না পাই বুঝিবারে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।
এমন নিদানের কালে আমার তরাইবার কেহ নাই
নিজের বুকে ছুরি মাইরা সকল জ্বালা জুড়াইরে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।
আর, শুন শুন ঠাকুর তুমি ফিইরা যাও বাড়ী
দেইখ্যা শুইনা কইরও সাদী আরও সুন্দর নারীরে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।
আর, যাও যাও যাও ঠাকুর যাও যাও ফিইরা বাড়ী
অভাগিনী চন্দ্রাবলী এই খানেতে মরিরে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।

(চন্দ্রা এ বলেই নিজের বুকে ছুরি মারিয়া পড়িয়া গেল)

নইদ্যার চান ।। কি করলে কি করলে চন্দ্রা বুঝিতে না পাই
এই ছুরি তুইল্যা আমি নিজের বুকেতে বসাইরে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।

(চন্দ্রার বুক থেকে ছুরি নিয়া নইদ্যার চানও নিজের বুকে ছুরি বসাইয়া পড়িয়া গেল)

(উমরা বাইদ্যার আগমন)

উমরা।। হায়-হায়-- কি হইল, কি হইল। আমি নিজের বুকে নিজে ছুরি মারলাম।
(গান)

আর, কি করলাম কি করলাম আমি অন্তর যায় ফাড়িয়া
নিজের ঘর পোড়লাম আমি নিজেই আগুন দিয়ারে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।
কই গেলা মানিক ভাইরে ও ভাই আমার লইক্ষ নাই
কি করলাম সংসার জমিন আমি বনে ছইলা যাইরে
প্রাণ আমার যায় যায় রে।।[১১]

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অঞ্চলভেদে 'মহুয়া'র নানারূপ বিদ্যমান ছিল, এখনও আছে। এবং এ ধরনের কোনো কোনো গীতিকা পরবর্তীকালে পূর্ণাঙ্গরূপে চরিত্রমূলকও হয়ে উঠেছিল।

মহুয়ার পালানাট্যে চরিত্র সংখ্যা অনেক বেশি, সংখ্যায় সতেরটির কম নয়। এ সকল চরিত্র, ধর্ম, অধর্ম, কালিঙ্গীর মহারাজ, আইধর বাইদ্যা, মানিক বাইদ্যা, কেনাই মোড়ল, আনন্দ বৈদ্য, নদ্যার চান—(শান্তিপুরের জমিদার), কালাচান—(শান্তিপুরের জমিদারের ভাই), নাছির বাইদ্যা—মাতব্বর, ঘরামী, মাইট্যাল, গরু বিক্রেতা, সরকার, কালিঙ্গীর রাণী, চন্দ্রা-(উমরা বাইদ্যর পালিতা), লবজান (চন্দ্রার বোন সম্পর্কিত), ব্রাহ্মণী, (উমরা বাইদ্যার মা), মোড়লের স্ত্রী।

এ পালায় ধর্ম ও অধর্মের সংলাপ নিম্নরূপ,

অধর্ম ঃ জয় অধর্মের জয়! জয় অধর্মের জয়!

ধর্ম ঃ একি শুনলেম ঃ আমার ধর্মের রাজ্যে অধর্মের জয়।
আচ্ছা তবে যাই, একটু অগ্রসর হয়ে শুনি, কে করে অধর্মের জয়ধ্বনি।
(অগ্রসর হয়ে)
কে, কে, তুমি? আমার ধর্মের স্থানে অধর্মের জয়ধ্বনি দিতেছ?

অধর্ম ঃ হ্যা, আমি অধর্ম। তোমার মধ্যস্থানে আমি অধর্ম করতে এসেছি।
আমি দেখব কে ছোট, কে বড়? আমি মনে করি আমিই বড়।

ধর্ম ঃ কি, তুমিই বড়? তুমি আমার ধর্মরাজ্য হতে অন্যথানে চলে যাও।
আমার ধর্ম-রাজ্যে তুমি স্থান পাবে না।[১২]

'কাঞ্চন কন্যার' পালার অপর নাম 'ধোপার পাট'। পাট হচ্ছে গেয়-গীত, পালা বা গান তা একই সঙ্গে চরিত্রাভিনয়ও বটে।

'কাঞ্চন কন্যার' রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দী বলে অনুমিত হয়েছে।[১৩] এ পালায় আদ্যোপান্ত বিলাপের সুরই প্রধান। উক্তি-প্রত্যুক্তিসমূহ দীর্ঘ গানের আকারে। 'মহুয়া'র সঙ্গে এই এক বিষয়ে এর প্রভেদ আছে। দীর্ঘ গীতমূলক সংলাপ মধ্যযুগের নাটগীত ও পাঁচালি কাব্যেও দেখা যায়—

কাঞ্চন কন্যা ঃ পরাণ বন্ধু রে
কোন বনে আইলাম রাইতে আমি। -ধুয়া।
অইন্দকারে বনের পথ
না দেখি না চিনি।।
নদীর পাড়ে কেওয়া বন

বনে ফুইটা রইছে ফুল।
হস্ত ধইরা লও রে বন্ধু,
সেইনা নদীর কূল

রাজকুমার ঃ শুন পরাণ পিয়া গো,
এই বনে থাকন নাইত যায়।
বাপের জমিদারী এই না
আছে দারুণ ভয় লো পিয়া
এই বনে থাকন্ নাইত যায়।।
আর একটু যাও লো কন্যা,
এই না বাপের মুল্লুক ছাড়ি।
বাপের মুল্লুক ছাইড়া আমরা
হইবাম দেশান্তরী।।[১৪]

এ পালায়ও গায়েন বর্ণনায় আশ্রয় নিত—

ঃ নিঃসন্তান তমশা গাজী দুঃখিনী কাঞ্চনমালাকে আপন কন্যার মতো আদর করে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন, কিন্তু তার মুখ থেকে কোনো পরিচয় বা পূর্ববর্তী ঘটনা শুনতে পেলেন না; সেদিন্ থেকে কাঞ্চন নির্বাক।

তমসা গাজীর বাড়ীতে কন্যা গীরকাম করে
ভাত রান্ধিতে কন্যার দুই আঞ্খি ঝুরে।
উঠান ঝারিতে কন্যার হয় উনমতি।
কন্যার চউক্ষের জলে ভাসেন বসুমতি।।

কিছুদিন পরে সদাগর তমশা গাজী আবার বাণিজ্যে যাওয়ার সময়ে কাঞ্চনকে কাছে ডেকে আদর করে জিজ্ঞাসা করলেন--

বাণিজ্যে যাইবাম্ লো কন্যা মোরে দেও কইয়া
কিবা চিজ আনবাম্ আমি তোমার লাগিয়া।।
তুমিত ধর্মের ঝি আমরা বাপ মাও।
না পাইয়া পাইয়াছি ধন খোদার দোয়ায়।।
এই না কথা শুইনা কাঞ্চন কান্দিতে লাগিল।
কিবা ধন চাইব কন্যা খুইজা না পাইল।।
যে ধন হারাইছে কন্যার কওন না যায়।

আর কিবা ধনের কথা কইব বাপ মায়।।
পিঞ্জিরা ফালাইয়া পঙ্খী গিয়াছে উড়িয়া
বনের পঙ্খী বনে আল্‌গা পাইয়া।।
সেইনা পঙ্খী ধইরা আনব এমন কেউত নাই।
কোন বা দেশে গেল রে পঙ্খী কারে বা শুধাই।।

তমশাগাজী ও তাহার স্ত্রী শত চেষ্টা করেও কাঞ্চনের দুঃখের কারণ জানতে পেলেন না, শুধু দেখেন তার চোখে জল। দিন মতো গাজী বাণিজ্যযাত্রা করলেন। তারপর—

তিন মাস তের দিন গুজুরিয়া গেল।
নানা দব্ব লয়্যা গাজী বাড়িতে ফিরিল।।
ঝিনাইয়ের ফুল আইনাছে কটরা ভরিয়া।
মোতির মালা আইনাছে গাজী কন্যার লাগিয়া।[১৫]

....

'কাঞ্চন কন্যা'- শ্রেণীর বিয়োগান্ত পালাগুলি আত্মপ্রবুদ্ধ মানব-মানবীয় প্রণয় কথা হলেও, এগুলোর কোনো কোনোটি বৃষ্টি নামানোর জন্য, লোকজ সংস্কারমূলক কৃত্য সহযোগে পরিবেশিত হতো এককালে। এই জন্য 'পূর্ববঙ্গের গায়েন সম্প্রদায়' বিশেষ যত্ন সহকারে এই পালা পরিবেশন করতেন।

বৃষ্টি নামাবার কৃত্য এখনও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আছে। অবিরল খরার কালে গাঁয়ের যুবকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খুদ ও ডাল সংগ্রহ পূর্বক রাস্তার চৌমাথায় সিরনি বা খিচুড়ি রন্ধনান্তে উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতরণ করে। এই 'খুদমাগনে'র কাজ গ্রামের আইবুড়ো মেয়েরাও করে থাকে। মাগনের জন্য যে বাড়িতে যায় সে বাড়ির সকলে সমবেত মেয়ে বা পুরুষদের গায়ে জলের ছিটা দেয়। বিশ্বাস, এতে বর্ষণ ত্বরান্বিত হবে। এ সময় গীত পরিবেশিত হয়।

এরপর মেয়েদের অনুষ্ঠান। ছোট্ট একটা সদ্যখনিত চৌবাচ্চা ধরনের জলাশয় উঠানের এক কোণে খুঁড়ে তাতে পানি ঢালা হয়। দুটো ব্যাঙ নারী ও পুরুষ চিহ্নিত করে বিবাহ দেওয়া হয়। বুড়ি ও আইবুড়ো মেয়েরা এ সময়ে নৃত্যগীতে অনাগত বৃষ্টিকে আবাহন করে। মধ্যযুগে এই কৃত্যের সঙ্গে সম্ভবত, দিনান্তে 'কাঞ্চনকন্যার পালা' বা অন্য কোনো গীতিকা পরিবেশিত হত।

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, একটি পূর্ণাঙ্গ মানবরসের পালা যেখানে বিশেষ কোনো দেবদেবীর প্রসঙ্গ মাত্রও নেই, তা কিভাবে বৃষ্টি নামানোর কৃত্য হিসেবে গীত হতে পারে। শুধু কাঞ্চনকন্যা নয়, 'মহুয়া', 'দেওয়ানা' মদিনার মতো বিয়োগান্ত পালাগুলিও এই উদ্দেশ্যে পরিবেশন করা হতো নিকট অতীতকালে। বিয়োগান্ত পালার ভেতরে, এক নিষ্পাপ নারীর যে বেদনা ও আত্মাহূতির কাহিনী, তা গীত-নৃত্য-গানে উপস্থাপিত হলে, আকাশও সমবেদনায় বর্ষণমুখর হবে—সম্ভবত এই ধরনের চিন্তা থেকেই এ পালাগুলো পরিবেশিত হতো।[১৬]

প্রকৃতিকে জীবন্ত সত্তারূপে কল্পনা করার যে অনার্যরীতি এ তারই ধারা।

'কাঞ্চনকন্যার পালা'য় সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, গীতমধ্যে দু'এক স্থলে ও গীতের অন্তে বজ্র-বৃষ্টিপাতের ইঙ্গিত আছে—

ঃ নদীকে এই অনুরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনমালার মনে পড়ল, জলে ডোবা মড়াতো ভেসে ওঠে, লোকে দেখে। তার মড়াও তো ভেসে উঠবে। সে মড়া দেখে চিনে লোকে যদি পরাণ বন্ধুকে বলে, তবে তো সে দুঃখ (পাইবে)।

তারপর ঃ এইনা বইলা কাঞ্চনকন্যা
জলে দিল ঝাঁপ।
কোথায় রইল রাজার কুমার
কোথায় রইল বাপ।।
তারা হইল নিমি ঝিমি
সেইনা রাইতের নিশাকালে।
ঝম্প দিয়া পড়ে কন্যা
খুরাই নদীর জলে।।
হায়রে, ডুইবা গেল কাঞ্চনমালা
জল হইল থির।
দেওয়ার ডাকে আকাশ ফাইট্যা
হইল রে চৌচির।।[১৭]

প্রকৃতিকে সম্মোহিত করার এই শিল্পরীতি বিস্ময়কর বলে মানতে হয়।

মধ্যযুগের গীতিকাগুলির অন্যতম 'দেওয়ানা-মদিনা'।

'দেওয়ানা মদিনার পালা' সপ্তদশ শতকে রচিত বলে অনুমিত হয়েছে। পরবর্তীকালে সংগৃহীত সম্পাদিত পালার অধ্যায় ১৪টি। অবশ্য গীতিকায় অধ্যায় বিভাজন পরিবেশনার ক্ষেত্রে আদৌ প্রয়োজনীয় নয়।

এই পালায় আলাল-দুলালের গৃহত্যাগ সামন্তপুত্র দুলালের সঙ্গে কৃষক কন্যা মদিনার প্রণয়, মদিনাকে তালাকনামা প্রদান এবং ক্ষোভে দুঃখে উন্মাদিনী মদিনার মৃত্যু—এক আশ্চর্য শিল্প মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে মধ্যযুগে কৃষি সমাজের শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব 'দেওয়ানা মদিনার' পূর্বে ও পরে আর কোনো পালায়, এত নিখুঁত, প্রাণবন্ত রূপে অঙ্কিত হয়েছে কিনা সন্দেহ।

পালামধ্যে একটি নাট্যমূলক অনুকাহিনী অতি সুন্দরভাবে অভিনয় যোগ্যরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

আলাল দেওয়ানি লাভ করে দুলালের খোঁজে বেরিয়েছে। যেতে যেতে এক অচিন গাঁয়ে (বাস্তবে কাজলকান্দা) উপস্থিত হলো। সেখানে আলাল 'বিছরাম' করছে কোনো এক বৃক্ষ ছায়ায়। রাখাল বালকগণ ঠিক সে মুহূর্তে যে গান গাইল তা আলাল-দুলালের পূর্ব জীবনের ঘটনা। আলাল চমকে ওঠে—

ঃ পরে ত রাখুয়াল সগলে গাহান জুড়িল।
সেই না গাহান শুইন্যা আলালের চমক লাগিল।
এক না দেওয়ানের আরে
দেখ দুই বেটা ছিল।
বাচ্চা বেটা রাইখ্যা রে ভাই
দেওয়ানের বিবি মইর্যা গেল।।
বিবি মইর্যা গেলে দেওয়ান
আরে পড়িল ফাপরে।
ভাইব্যা চিন্তা দেওয়ান সাব
আর এক সাদী করে।।
সেই না দুষ্টু বিবি আইস্যা
আরে কোন কাম করে।
বাইল দিয়া জলে পাঠায়
দুই সতীন পুতরারে।।...
এই না গাহান আলাল আরে যখন শুনিল।

নয়ান হইতে দরদর পানি ঝরিতে লাগিল।।[১৮]

কাহিনীমধ্যে, এ ধরনের ক্ষুদ্র অথচ ইঙ্গিতধর্মী গীতাভিনয়, মনসুর বয়াতির শিল্পরচনা কৌশলের পরিচয় বহন করে।

তালাকানামা লাভের পর মদিনার উক্তি পাঠক-শ্রোতাকে বেদনার্ত করে তুলে, দুলাল তালাক দিয়েছে মদিনাকে অথচ সে তা বিশ্বাস করে না—

ঃ তালাকনামা পাইল যখন মদিনা সুন্দরী।
হাইস্যা উড়াইয়া দিল বিশ্বাস না করি।
"আমারে না ছাড়িব খসম পরাণ থাকিতে।
চালাকি কইর‍্যাছে মোরে পরখ করিতে"

এবং তারপর—

ঃ আইজ আইসে কাইল আইসে এইনা ভাবিয়া।
মদিনা সুন্দরী দিল কত রাইত গুয়াইয়া।।
আইজ বানায় তালের পিঠা কাইল ভাজে খৈ।
ছিক্কাতে তুলিয়া রাখে গামছা বান্ধা দই।। ...
এই মতন কত জিনিস মদিনা বানায়।
হায়রে পরাণের খসম আইস্যা নাই ত খায়।।[১৯]

মদিনা উন্মাদিনী হলো অবশেষে—

ঃ কান্দিয়া কান্দিয়া বিবির
এই না দুঃখে দিন যায়।
খানাপিনা ছাইড়্যা কেবল
করে হায় হায়।।
তারপরে না চিন্তায় শেষে
মদিনা হইল পাগল।
যাইনা মুখো আইসে তাই
সে বকয়ে কেবল।।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে
ক্ষণে দেয় গালি।
ক্ষণে গায় জোকার দেয়
ক্ষণে দেয় করতালি।।[২০]

মদিনা পুত্র সুরুজ্জামালকে পাঠায় বাইনচঙে স্বামী দুলালকে আনতে। সুরুজ্জামাল ফিরে আসে রিক্ত হাতে। কিন্তু প্রেমের কাছে পরাজিত হয় দেওয়ানগিরি, এক গভীর বেদনায় স্মৃতিকাতর দুলাল হঠাৎ বুঝতে পারে, কী ভুল সে করেছে। সে তাই কাজলকান্দা গাঁয়ে ফিরে আসে। কিন্তু মদিনা কই?—

দুলালে জিজ্ঞাসে সুরুজ মদিনা কোথায়।
চোখে হাত দিয়া সুরুজ কয়বর দেখায়।

তারপর ঃ এই মতে কাইন্দা মিয়া কোন কাম করে।
বান্ধিল ডেবুয়া এক কয়বর উপরে।।
এই মত থাকে দুলাল দাওনা হইয়া।
ফকির হইল মিয়া দেয়ানগিরি থইয়া।।[২১]

মানবিক প্রেমের কাছে, সামন্ত প্রভুর আত্মমর্যাদা ও শ্রেণী বিচার ভূলুণ্ঠিত হলো সবশেষে।

'দেওয়ানা মদিনা'র পালায়, খরার পরোক্ষ প্রতীক আছে দুলালের নিষ্ঠুরতায়, তালাকপ্রাপ্ত নির্দোষ ও অসহায় মদিনার অপেক্ষায়। মদিনার এই অপেক্ষা খরারকালে বর্ষণের নিমিত্তে অপেক্ষমান শস্যবপনকারী কৃষকের মতই।

কোনো কোনো পালা বাস্তব চরিত্র অবলম্বনেই রচিত হয়েছে। এর মধ্যে নয়নচাঁদ ঘোষ প্রণীত 'চন্দ্রাবতী', 'রামায়ণ' রচয়িত্রী, দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। এক দারুণ বঞ্চনা ও অভিশাপে চন্দ্রাবতীর জীবন আত্মলীন ধর্ম সাধনার পথে ধাবিত হলেও জয়ানন্দের আত্মহত্যা তাকে করে তোলে উন্মাদিনী।

চন্দ্রাবতী প্রণীত 'দস্যু কেনারামের পালা'য় কাহিনীর মধ্যে, মনসার গীত সংযোজিত হবার ফলে তা এক অভিনব আঙ্গিকে রূপান্তরিত হয়েছে। এ যেন, প্রথাগত মনসামঙ্গলের গীতিকা-রূপান্তর। উদ্যত খাণ্ডা হাতে কেনারাম দ্বিজ বংশীদাসের মুখে মনসার গীত শুনে, জীবনের অনিত্যতা বুঝতে পারে—

ঃ যখন গাহিল পিতা বেউলা হইল রাড়ী।
কেনারামের চক্ষে জল বহে দড়দড়ি।।
শাখে কান্দে পাখীরা পশুরা কান্দে বনে।

বেহুলা হইল রাড়ী কালরাতির দিনে।।
কান্দয়ে সনকা রাণী বুক চাপরিয়া।
'লখিন্দর পুত্র কোথা গেলরে ছাড়িয়া।।[২২]

অতঃপর ঃ যখন গাইল পিতা বেহুলা ভাসান
ফেলিয়া হাতের খাণ্ডা কান্দে কেনারাম।
'গুরুগো কি গান শুনাইলা গুরু ফিরে কও শুনি।
শুনিয়া পাগল হইল পাচণ্ডের প্রাণী।[২৩]

গীতিকার আঙ্গিকে মনসাপাঁচালির এই রূপান্তর নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক।

মৈমনসিংহ গীতিকায় 'কমলা'র পালা' অসম্পূর্ণ। এর আরম্ভণে বৃষ্টি নামানোর গান আছে—

ঃ কানা মেঘারে তুইন আমার ভাই।
এক ফোটা পানী দে সাইলের ভাত খাই।।
সাইলের ভাত খাইতে মুখে হৈল রুচি।
মা লক্ষীর নিয়ড়ে রাখ্য ধান এক খুচি।।
আসন পাতিয়া তাতে দিও পক্ষের আশি।
এই খানে গাইবাম গান কমলার বারমাসী।।[২৪]

পাঁচালিকাব্যের বারমাস্যাও যে গীতিকার রূপ লাভ করেছিল, 'কমলার পালা' তার প্রমাণ। এককালে সমগ্র পূর্ববঙ্গে বিশেষত উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত গীতিকার অভূতপূর্ব প্রসার ঘটেছিল। বর্তমানে বৃহত্তর মৈমনসিংহ ব্যতিরেকেও ঢাকা, ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে গীতিকা-পালা পাওয়া গেছে। এরূপ পালার মধ্যে আছে চট্টগ্রামের 'আমিনা বিবি' ও 'নছর মালুমের পালা' এবং 'মণির ওঝা-মাজুরমাও পালা'। শেষের পালাটি 'ভাওয়াইয়া' ছন্দে 'সাগরী ঝাপ লহরী'তে রচিত। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা অঞ্চলে এ গান এখনও প্রচলিত।[২৫]

উল্লেখ্য যে, পূর্ববঙ্গীয় গীতিকাগুলির সুর পালা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ছিল। একেকটি পালায় সুরের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকত, যা ক্রমে সে পালার পরিচয়জ্ঞাপক সুর হিসেবে স্বীকৃত হতো।

একটি পালার সুর অন্য পালায় সে অর্থে কখনই অনুকৃত হতো না।

পূর্ববঙ্গীয় গীতিকার প্রধান বিষয় প্রণয়। এ সকল আখ্যানে, নানা মাত্রায়, নানা হৃদয়বৃত্তির প্রাধান্যে মানুষের পরিচয় উদ্ভাসিত।

মধ্যযুগের গীতিকাসমূহের অধিকাংশই এখন লুপ্ত। সে-সকল সুরে লোকচিত্তের যে নানা দ্যুতিময় ঐশ্বর্য একদা প্রকাশিত হতো তাও আর নেই। অজস্র প্রাচীন পালার মধ্যে দু'একটি পালা হয়ত খানিকটা আজও টিকে আছে।

অবশ্য আজও কোনো কোনো গায়েন (নেত্রকোনার কুদ্দুস বয়াতী) প্রাচীন পালার পরিবর্তে নিজেরাই গীতিকার ধারাতে পালা রচনা অব্যাহত রেখেছেন। 'মাধব মালঞ্চী', 'কাজলরেখা', বা 'লালমণি সবুজমণি'র মতো কিস্সা-পালার অস্তিত্ব আজও এ সকল অঞ্চলে খুঁজে পাওয়া যায়।

সবশেষে বলা যায় বাঙলা নাট্যরীতির মধ্যযুগীয় পটভূমিতে গীতিকা নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট ধারা।

মধ্যযুগে অষ্টাদশ শতকের পূর্বে নাটক অর্থে 'যাত্রা' কোথাও দেখা যায় না। 'চৈতন্যভাগবতে' আছে—

ঃ কৃষ্ণযাত্রা অহর্নিশি কৃষ্ণসঙ্কীর্তন
ইহার উদ্দেশ্য নাহি জানে কোন জন।[২৬]

বলাবাহুল্য, এখানে 'কৃষ্ণযাত্রা'র অর্থ কৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে 'শোভাযাত্রা' বা 'উৎসব'। এ কাব্যের অন্ত্যখণ্ডের একাদশ অধ্যায়েও 'যাত্রা'র প্রসঙ্গ আছে—

ঃ যাত্রা আসি বাজিল ওঢ়ন ষষ্ঠী নাম
নয়া বস্ত্র পরে জগন্নাথ ভগবান।।[২৭]

এখানে 'যাত্রা' ওঢ়ন ষষ্ঠী উপলক্ষে জগন্নাথের মাণ্ডুয়া বস্ত্র পরার উৎসবকেই নির্দেশ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে প্রকৃতপক্ষে 'যাত্রা' নাটকের প্রচলন হয়। এ সময়ে রচিত একটি পদ্যে সেকালের আসরকেন্দ্রিক পাঁচালি, পালা, জারি, তরজা, মালসা, যাত্রা ও অধুনালুপ্ত কিছু বাংলা গানের সুর সংক্রান্ত বিবরণ পাওয়া যায়, গ্রন্থ দৃষ্টে তা উদ্ধৃত হলো—

ঃ হিন্দুস্থানে শুনি ইহা করিল প্রচার।
বাঙ্গালা দেশের ছাপ ভিন্ন রীতি তার।।

সঙ্কীর্তন নানা ভাঁতি অপূর্ব সুন্দর।
গড়াহাটি রানিহাটি বিরহ মাথুর।।
অভিসার মিলনাদি গোষ্ঠের বিহার।
কবি পশতো তালফেরা শুনিতে মধুর।।
পাঁচালি অনেক ভাতি রামায়ণ সুর।
কত কথা তরজাতে সারিতে প্রচুর।।
ভবানী ভবের গান মালসীমায়ূর।
গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী বিজয়াতে ভোর।
বাইশ আখড়া ছাপ প্রেমে চূর চূর।
গোবিন্দমঙ্গল জারি গাইছে সুধীর।।
চৈতন্যচরিতামৃত প্রেমের অঙ্কুর।
শ্রবণে যাহার গানে ভকত আতুর।।
কালিয় দমন রাস চণ্ডীযাত্রাধীর।
রচিল চৈতন্য যাত্রা রসে পরিপুর।।
সাপুড়িয়া বাদিয়ার ছাপের লহর।
বাঙ্গালার নবগানে নূতন ঝুমুর।।

এখানে 'কালিয়দমন' ও 'রাস যাত্রার' সঙ্গে 'চণ্ডীযাত্রা' ও 'চৈতন্যযাত্রার' উল্লেখও আছে।

'কালিয়দমন' লীলানাটকরূপে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাঙলায় অভিনীত হতো। এ সঙ্গে 'রামলীলা'র কথাও পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। আসামে শঙ্করদেব ভাগবতের নানা স্কন্ধ অনুসারে 'লীলানাট' রচনা করেন ষোড়শ শতাব্দীতে। উদ্ধৃত পদ্যে 'চৈতন্যযাত্রা', মূলে চৈতন্যজীবনলীলা-কাহিনী। চৈতন্য জীবনচরিতের পূর্বে এর অস্তিত্ব ছিল না। চৈতন্য সম্পর্কিত জনশ্রুতি এবং জীবনচরিত অবলম্বনে অষ্টাদশ শতকের শেষে 'নিমাই সন্ন্যাস পালা' যাত্রারূপ লাভ করে। 'চণ্ডীযাত্রা', 'মনসার ভাসানযাত্রা' অষ্টাদশ শতকের পূর্বে যাত্রা ছাপ প্রাপ্ত হয় নি। একথা নিশ্চিন্তভাবে বলা যায়, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক পর্যন্ত মনসা ও চণ্ডীর পাঁচালিই প্রচলিত ছিল সে কথা বৃন্দাবনদাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী বলা যায়—

ঃ ... ধর্ম কর্ম লোকসব এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।।

সেকালে 'গীত' বা পাঁচালির আকারে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল পরিবেশিত হতো।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' বিবৃত 'যাত্রা' কৃষ্ণজন্মতিথি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসব। তাতে 'কাপ'গণের ভাগবতপুরাণ কাহিনীর অভিনয় যাত্রা নামে অভিহিত হলেও, তা ছিল কৃষ্ণলীলা সংক্রান্ত নাট্য অর্থাৎ লীলানাট্য—সে কথা পূর্বে (৫ম অধ্যায়ে) উল্লিখিত হয়েছে।

যাত্রার নাট্য আঙ্গিকরূপে স্বাতন্ত্র্য লাভের ক্ষেত্রে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্ন নাট্যরীতির রূপবৈচিত্র্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। 'গীতগোবিন্দে'র চরিত্রমূলক উপস্থাপনা, আদি মধ্যযুগের কৃষ্ণধামালি, মধ্যযুগে নাটগীতের ধারা, পাঁচালির আঙ্গিক ও পরিবেশনারীতি এবং লীলানাট—'ঢপে'র উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে যাত্রা নাটকের যোগসূত্র অনুসন্ধান করাও প্রয়োজন।

পণ্ডিতগণের মধ্যে কেউ কেউ যাত্রাকে আক্ষরিক অর্থে অনুসন্ধান করতে গিয়ে একে বাঙলা নাটকের প্রাচীনতম রীতিরূপে উল্লেখ করেছেন। এ কথা ঠিক যে, নক্ষত্র, তিথি বা পূজা-পার্বণের দিনক্ষণে অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রা 'যাত্রা' নামে পরিচিত ছিল। অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্য প্রভাবিত নাটকের পাশে এক প্রবল স্বাজাত্যবোধ ও ঐতিহ্য অন্বেষণের প্রেরণায় বাঙলার নিজস্ব নাট্যরীতি খুঁজে বের করার তাগিদ থেকেই সম্ভবত 'যাত্রা'কে বাঙলা নাটকের প্রাচীনতম রূপে দেখার প্রয়াস জন্মলাভ করে। ইউরোপীয় নাটকের চরিত্রমূলক উপস্থাপনার পাশাপাশি অষ্টাদশ শতকের শেষে , যাত্রাই ছিল একমাত্র উল্লেখযোগ্য রীতি। চরিত্রমূলক উপস্থাপনার সঙ্গে ইউরোপীয় নাটকের বেশ খানকটা মিল থাকায়, ধারণা করা হলো যে, যাত্রাই সে অর্থে একমাত্র নাট্যপদবাচ্য।

এমনকি, এ বিষয়েও সংশয় থাকে, যে বিশেষ ধরনের নাটক—শিক্ষিত সমাজে যা 'যাত্রা' নামে পরিচিত—তা প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকেরই নাট্যপরিভাষা কিনা। লোকনাট্যের যে বিশেষ ধারা, লীলানাটকের কৃত্যরীতি থেকে বিনির্গত হয়ে, নব নব বিষয়কে আত্মস্থ করে উনবিংশ শতাব্দীতে পরিপুষ্ট হয়েছিল তা প্রকৃতপক্ষে 'কালিয়দমন', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি আখ্যানানুগ নামে অথবা সাধরাণভাবে 'গান' বা 'পালা' এবং ক্বচিৎ 'যাত্রা' নামে অভিহিত হতো। শুরুতে ঐ বিশেষ ধারার নাট্যে এমন কোনো একটি বিশেষ নাট্যলক্ষণ ছিল না যে জন্য এই শ্রেণীর নাটকের 'যাত্রা' নামে অভিধেয় হবার যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। 'যাত্রা' শব্দটি

শঙ্করদেবের নাটকেও প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে (কালীয়দমন নাট প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য)।

'কালিয়দমনে' কৃষ্ণ একস্থান থেকে অন্যস্থানে এসে কালিয়দমন করেছিলেন বলেই সে নাটকে 'যাত্রা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু 'রুক্মিণীহরণ' নাটক একই আঙ্গিকের হওয়া সত্ত্বেও তাতে 'যাত্রা' শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। এক্ষেত্রে 'যাত্রা' নামকরণের আরও একটি কারণ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। পেশাগত প্রয়োজনে ভ্রাম্যমাণ নাট্যদলের একস্থান থেকে অন্যত্র গমন অর্থে 'যাত্রা' কথাটা প্রযুক্ত হওয়া সম্ভব।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের নানা বিবর্তনমূলক স্তর অতিক্রম করে বাংলা নাট্যরীতির বিশেষ আঙ্গিকরূপে যাত্রা বিদ্যমান রয়েছে। এ কালের আঙ্গিক দৃষ্টে সহস্র বছরের নানা নাট্যরীতিকে একটিমাত্র রূপে বিচার করার প্রবণতার ফলে যাত্রার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে সঠিক চিত্র কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

উপরন্তু যাত্রার যে নাট্যমূলক উপস্থাপনা উনিশ শতকে প্রচলিত ছিল, তাতে সমকালীন ইউরোপীয় থিয়েটারের অনেক উপাদানও গৃহীত হয়। সে হিসেবে আজকের দিনের যাত্রার যে পূর্ণাঙ্গ নাট্যমুলক পরিবেশনা, তার সঙ্গে মধ্যযুগের সম্পর্ক প্রায় ক্ষীণ। এইজন্য, পাশ্চাত্য থিয়েটারের পাশাপাশি বাঙলা নাটকের পূর্ণাঙ্গ ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতি হিসেবে যাত্রা প্রত্যক্ষ করার চেষ্টাও ইতিহাসসম্মত নয়। অন্যদিকে অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতকের যাত্রায় 'নট-নারায়ণ' বা 'বিষ্ণুবন্দনা' প্রভৃতি কৃত্য মধ্যযুগের স্মারক হওয়া সত্ত্বেও এর মধ্যে উনিশ শতকে নতুনরূপে মঞ্চে অবতীর্ণ সংস্কৃত নাটকেরও খানিকটা প্রভাব আছে বলে স্বীকার করতে হয়। 'প্রস্তাবনা' 'নান্দী' 'অঙ্ক' বা দৃশ্য বিভাজনের রীতি সেখানে থেকেই এসেছে। পণ্ডিতগণের অভিমত স্বীকার করেও একথা বলা যায় যে, যাত্রার পূর্ণাঙ্গ নাট্যমূলক উপস্থাপনা উনিশ শতকেই সাধিত হয়েছিল, তার পূর্বে কখনও নয়।

আমাদের নাট্যরীতিতে যাত্রার 'কোনোও একটা সুস্পষ্ট আদর্শ বা কাঠামো' কোনোদিনই গড়ে ওঠে নি। জনগণের মধ্যে 'সহজাত নাটকীয় বোধের দ্বারা যত রকমের অভিনয় পদ্ধতি' বিকশিত হয়েছিল- সে সকল পদ্ধতি বা রীতির ক্ষেত্রে 'আমরা শিথিলভাবে যাত্রা কথাটি' প্রয়োগ করি।[২৯]

পাঁচালি থেকে 'যাত্রার উদ্ভব', এই মত গ্রহণ করলেও যাত্রানাটককে আদৌ প্রাচীন বলা যায় না।[৩০] ইতোপূর্বে অবশ্য আমরা দেখিছি যে, পাঁচালি ধারার

পাশাপাশি লীলানাটকের উদ্ভব ঘটেছে চৈতন্যদেবের কালে। কাজেই লীলানাটক থেকে যাত্রার উদ্ভব হওয়াই যৌক্তিক। কার্যত লীলানাটকের চরিত্রমূলক উপস্থাপনা পরবর্তীকালে যাত্রা নামে অভিহিত হয়। এ সঙ্গে অবশ্য নাটগীতে আঙ্গিকেরও যোগ আছে। সাবিরিদ খান ও শ্রীধরের 'বিদ্যাসুন্দরে' সূত্রধার (এবং দোহার) ব্যতীত পাত্রপাত্রীর অভিনয় আছে।

যাত্রার উপস্থাপনারীতিতে 'নাটগীতে'র প্রভাবও বিদ্যমান।

ইতোপূর্বে আমরা একথা বলেছি যে, শোভাযাত্রা উপলক্ষে নৃত্যগীত এবং লীলানাটকের অভিনয় ক্রমে 'যাত্রা' নামে অভিহিত হয়। কিন্তু 'যাত্রা' লীলানাটকের স্থলাভিষিক্ত হয় নি। বরং যাত্রার বিশিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ নাট্যমূলক আঙ্গিক লাভের নেপথ্যে রয়েছে প্রধানত লীলানাট্যের নানামুখি আঙ্গিক ও পরিবেশনারীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব। যাত্রার পাশাপাশি লীলানাটক এখনও স্বীয় অস্তিত্ব পূর্ণাঙ্গরূপেই বজায় রেখে চলেছে।

মধ্যযুগে লীলানাট্যের বিচিত্রতর আঙ্গিকের কথা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এ স্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সেকালে জলে-স্থলে, গ্রাম-বর্ত্মজুড়ে, বিষয়ানুগ পরিবেশ অনুসারে, ভ্রাম্যমাণ নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে (ডঙ্কনাট্য), চৌকোণ খোলামঞ্চে (চৈতন্যদেব অভিনীত ও নির্দেশিত) পরিবেশিত নাট্য লীলানাট্যেরই নানা ভাগ মাত্র। মূলে ঐ সকল বিচিত্র নাট্যপন্থা লীলানাট্যেরই দ্বৈতাদ্বৈতরূপ।

বিভিন্ন সূত্রে প্রমাণ করা যায় যে, লীলানাটরূপে অভিনীত 'কালিয়দমন' অবলম্বনে অষ্টাদশ শতকের অন্তে স্বতন্ত্রভাবে যাত্রার প্রকাশ। এর অর্থ কৃষ্ণ-বিষয়ক আখ্যান অবলম্বন করেই অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে যাত্রার আরম্ভ। শুরুতে 'কালিয়দমনে'র জনপ্রিয়তার কারণে 'যাত্রা' ও 'কালিয়দমন' সমার্থক হয়ে উঠে।[৩১] এ থেকে দেখা যায়, 'যাত্রা' কথাটা 'নাটক' অর্থে সেকালে অনিবার্য হয়ে উঠে নি।

যাত্রার সঙ্গে লীলানাটকের পার্থক্য এই যে, যাত্রা ধর্মীয় কাহিনী ব্যতিরেকেও ক্রমে ক্রমে বিচিত্র আখ্যান অবলম্বনপূর্বক যুগোপোযোগী রূপ ধারণ করতে সক্ষম হয়। 'কৃষ্ণযাত্রা' আসলে কৃষ্ণলীলা নাটক। লীলানাটক পূর্ণাঙ্গ কৃত্য ও ধর্মীয় আখ্যান অবলম্বনে পূর্বক স্বীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখে। চৈতন্যদেবের জীবন অবলম্বনে রচিত নাটক লীলা ও যাত্রার একট মিশ্ররূপ হিসেবে কল্পনা করা যায়। কারণ, এর মধ্যে ধর্মবোধের একটা প্রবল তাড়না আছে। এর অন্য নাম 'নিমাই সন্ন্যাস'। পক্ষান্তরে, আখ্যানের কারণেই লীলানাটকের সঙ্গে যাত্রার একটা বিচ্ছেদ ঘটল,

চণ্ডীর আখ্যান সংবলিত কাহিনী অবলম্বিত হওয়াতে। এই পার্থক্য সূচির হয়ে উঠল বিদ্যাসুন্দরের মতো আদি-রসাত্মক কাহিনী যখন যাত্রায় গৃহীত হলো তখন থেকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণ-বিষয়ক যাত্রা 'কালিয়দমনে'র সাজসজ্জা ও পরিবেশনরীতি সম্পর্কে প্রদত্ত বিবরণ দৃষ্টে দেখা যায়, এতে দান, মান, মাথুর, অক্রূর সংবাদ, উদ্ধবসংবাদ, সুবলসংবাদ প্রভৃতি আখ্যান গৃহীত হয়েছিল। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ছিল, খোল, করতাল, বেহালা। অভিনেতাদের সাজসজ্জার উপকরণ ছিল যৎসামান্য, 'কৃষ্ণের পীতধড়া ও চূড়া এবং যশোমতী, বৃন্দাদি-সখী ও গোপ বালকগণের পরিধেয় একটি রঙ্গিন কাপড়ের ঘেরাটোপ (কতকটা চোগার মতো); এর সামনের দুই পার্শ্বে পেশওয়াজের ন্যায় জরির পাড় বসানো' হতো।[৩২]

কৃষ্ণের এই বেশ একালে প্রচলিত লীলানাটকেও দেখা যায়।

বিশেষজ্ঞের মতে 'পূর্ব্বকার যাত্রার দলে' রামাভিনয়ের কালে' উঠানের এক কোণে' সীতাকে বসিয়ে রেখে পালা শুরু হতো। 'কৃষ্ণযাত্রার মানভঙ্গ পালায়'ও রাধাকে অনুরূপভাবে রেখে 'কৃষ্ণ-বৃন্দা-সংবাদ উঠানের মধ্যে বা অপর একপার্শ্বে সমাধা' করা হতো। সীতা বা রাধার উপবেশন স্থল 'ফুল ও লতা পাতায়' সাজানো হতো। এ ছাড়া নাট্যে 'একটি স্বতন্ত্রভাবে দুর্গাপূজার' ব্যবস্থাও ছিল।[৩৩]

অবশ্য যাত্রা পরিবেশনের এই বিবরণের যথার্থতা সম্পর্কে কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করছেন।[৩৪]

রামাভিনয়ের যে বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে তা নিত্যানন্দের কিশোরলীলার অনুরূপ। সুতরাং তা লীলানাট্য—কাজেই এ বিবরণেও যাত্রার পরিবেশনরীতির প্রকৃত পরিচয় লভ্য নয়।

আমাদের মতে চৌকোণ খোলামঞ্চে যাত্রার পূর্ণরূপ ও রীতি অনুসন্ধানযোগ্য। নাট্যপরিবেশ সাজিয়ে অভিনয় লীলানাটকের প্রধান লক্ষণ। যাত্রাপালারূপে গৃহীত একটি গানের অংশবিশেষ নিম্নরূপ—

ঃ এখন আর কেমন কর্‌য়া বলিবে তোরা রাধা কলঙ্কিনী।। ধুয়া।।
জটিলা কুটিলা মান হইয়া গেল হত
তাহা মুই কবো কত
অবিরত বলিতে লজ্জা পায়
পরখে সতীর গুণ হইল বিদিত
নারীর চরিত্র যত

অভিভূত শুনিয়া সবাই
ঘরে ঘরে করে কানাকানি।
এই কলঙ্কভঞ্জনের কথা শুনি নারদ মুনি।। ধুয়া।।
বাসুদেব সঙ্গে করিয়া আসিল অবনি।। পরধুয়া।।
অগ্রবনে থাকি মুনি বাসুকে পাঠান
কোথায় আছেন কৃষ্ণ আনহ সন্ধান
দেখা হলে মোর কথা কবা তুমি এই করি যোড়পাণি।।
বাসু কহে কোন্ কৃষ্ণ কিবা রূপ ধরে
জাতিকুল কহ তার থাকে কার ঘরে
জনমিয়া দেখি নাই তারে বল কেমন কর্‌য়া চিনি।।
মুনি কহে নীলকান্ত জিনি রূপ তার
আভির জাতীর মধ্যে আছেন এবার
বৃন্দাবনে বাস তার ঘরে যার মাতা নন্দরাণী।
বাসু কহে কোন মুখে যাব মহাশয়
মুনি কহে নন্দগ্রাম ঐ দেখা যায়
পাথেয় পয়সা দিলেন তাহারে বাসু চলিল তখনি।[৩৪]

যাত্রারূপে উল্লেখিত হলেও মূলত এ হলো ঢপসঙ্গীত। এর সঙ্গেও যাত্রার সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় না।

অষ্টাদশ শতকের যাত্রায় সঙ্গীত অপরিহার্য ছিল, সঙ্গে থাকতো দোহার। দোহারের কাজ ছিল, পালার ধুয়া অংশগুলি সমস্বরে গাওয়া। এ ছাড়া পাত্রপাত্রীর সংলাপের অংশবিশেষও দোহারগণ গাইত—এরূপ অনুমান এ কালের লীলানাটক দৃষ্টে করা যায়।

এবার 'যাত্রা'র পূর্বরূপ হিসেবে উল্লিখিত 'নিমাই সন্ন্যাস পালা'র একটি অংশ গ্রন্থদৃষ্টে উদ্ধৃত হল—

ঃ কথা-মধ্যাহ্নকালে শচীর দ্বারে ভারতী এসে উপস্থিত হয়ে বলতিছেন,—শচী মা ভিক্ষাং দেহি। শচী মা কেশব ভারতীর গলা শুনে বল্‌তিছেন কি সর্বনাশ, হারে নিমাই অতিথিকে বলগে যা, ঠাকুর আপনি অন্যত্র গমন করুন।

তা শুনে নিমাই কি বল্‌তিছেন? নিমাই বল্‌তিছেন,—একি বল্‌লে মা, গিরস্থর ধর্মই অতিথ সৎকার করা। যদি ঘরে কিছু নাও থাকে ভিক্ষে করে এনেও অতিথ সেবা করতি হয়। এসময় কি অতিথ বিমুখ হয়ে ফিরে যাবে ?

তখন শচীমাতা বল্‌তিছেন ঃ—হ্যাঁরে নিমাই, গিরস্থর কাজ অতিথ সেবা করা তা আমি জানি। কিন্তু বাপ, বহুদিন হয় এমন সময় একজন অতিথ উপস্থিত হলো, আমি যত্ন করে সেবা করলাম আর সেইদিনই আমার প্রাণাধিক পুত্র বিশ্বরূপকে হারালাম। তাইতি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, আর কোনো দিন অতিথ সেবা করব না।

নিমাই বল্‌তিছেন,-এমন সময় যদি অতিথ ফিরে যায় তাহ্‌লি আমার অমঙ্গল হবে। শচী মা বললেন—বাবা যদি তোর অমঙ্গলই হয় তবে অতিথকে পাদ্য অর্ঘ্য দে। আর ঠাকুরকে বল তিনি গঙ্গাছ্যান করে আসুন। বাপ, কিন্তু একটা কথা।

নিমাই বল্‌তিছেন, কি কথা মা?

শচী—তুই অতিথির সঙ্গে কোনো কথা কতি পার্‌বিনে।

তা শুনে নিমাই বল্‌তিছেন, —মা আমি সত্য বলছি, অতিথিরি সঙ্গে কোনো কথা কব না। এই বলে বলছেন, ঠাকুর আপনি গঙ্গাছ্যান করে আসুন। ভারতী গঙ্গাছ্যানে গেলেন। ভারতী গঙ্গাছ্যান করতিছেন, নিমাই পশ্চাতে দাঁড়ায়ে যোড় হাতে বল্‌তিছেন, গুরুদেব প্রণামামি। তখন ভারতী চক্ষু খুলে দেখতি পেয়েছেন—

পদ ঃ অমনি ঢেলে দিল,
কর্ণমূলে ঢেলে দিল,
নিমাই কাঁদিতে লাগিলে,
কৃষ্ণকোথা আছ বলে কাঁদিতে লাগিল।
কোথা প্রাণসখা বলে কাঁদিতে লাগিল।
আজ ভেসে যায়,
নিমার সোনার অঙ্গ ভেসে যায়,
নদের ধূলা ভিজিয়ে আজি প্রেমের বন্যা বয়ে যায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে সোনার অঙ্গ ভেসে যায়।

কথা—কেশব ভারতী শচীর ঘরে ভোজন করে নিজগ্রামে গমন করলেন। পরদিন প্রাতে নদেবাসী ব্রাহ্মণগণ নদীর ঘাটে সন্ধ্যে আহ্নিক করতিছেন, তখন প্রভু আমার প্রেমে উন্মাদ হ'য়ে কি করতি লাগলেন।

পদ ঃ ভাবাবেশে গৌরহরি লম্ফ দিয়ে পড়ে।
পদোথিত জলে গিয়ে ব্রাহ্মণ অঙ্গে পড়ে।।

কথা—তাঁরা তখন বলাবলি করতি লাগলেন, হ্যাঁদে ছোড়াডা কিড়া? ওর কি হিতাহিত জ্ঞান নেই? আর একজন বল্তিছেন, ও না জগন্নাথ মিশ্রর ছাওয়াল? এ লক্ষ্মীছাড়া নদে ছাড়া না হলে নিস্তার নেই।

পদ ঃ আমার কোনোও দোষ নাই,
ব্রাহ্মণ বলে লক্ষ্মীছাড়া আমার কোনোও দোষ নাই,
আজ ত ছাড়তে হবে
আজ ত লক্ষ্মী ছাড়তে হবে,
নৈলে ব্রাহ্মণ-বাক্য লঙ্ঘন হবে,
আজ ত লক্ষ্মী ছাড়তে হবে।

কথা—এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া সখীদের সঙ্গে খেলা কর্তিছিলেন, যখন ব্রাহ্মণদের অভিসম্পাত হয়েছে, তখন সহচরীদের ধরে কেঁদে কেঁদে বলতিছেন,—

পদ ঃ সখি কেন প্রাণ কেঁদে ওঠে গো,
প্রাণ-কান্তের লাগি প্রাণ কেঁদে ওঠে গো,
দক্ষিণে যেন ভুজঙ্গে দেখি গো,
ভুজঙ্গে (ভুজ অঙ্গ?) নাচিছে,
কি জানি কি হবে আমার ভুজঙ্গে নাচিছে।'[৩৫]....

এ পালাটি অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বের নয়। এমনকি পালার ভাষাভঙ্গি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু এর সঙ্গে যাত্রার কোনোরূপ সম্পর্ক নির্ণয় দুঃসাধ্য। গান-কথা মিলিয়ে শ্রীবিশ্বম্ভরের যে জীবন-কথা এতে বিবৃত হয়েছে তা নিতান্ত গায়েনকেন্দ্রিক পালা। এর অন্তর্গত বর্ণনারীতি ও গীতাত্মক-পদসংস্থান অষ্টাদশ শতকের পদাবলী কীর্তনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। দাঁড়-রীতিতে পরিবেশিত এই পদাবলী কীর্তন নিঃসন্দেহে নাট্যমূলক, কিন্তু তা পাঁচালি ব্যতিত অন্যকিছু নয়।

যাত্রার গদ্যাংশ তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি হতো। বিষয় অনুসারে এতে সাধারণ গান ছাড়া কীর্তন প্রভৃতি সংযুক্ত হতো। উনিশ শতকে কৃষ্ণকমল গোস্বামী কীর্তনাঙ্গের গানই যাত্রায় পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রহণ করেন। অষ্টাদশ শতকের শেষে, রামপ্রসাদী সুর, চণ্ডী প্রভৃতি যাত্রায় প্রবেশ করেছিল—এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়।

অষ্টাদশ শতকে কিভাবে আসরে যাত্রা শুরু হতো তার বিবরণ পাওয়া যায়। এতে শুরুতে থাকত 'গৌরচন্দ্রিকা', পালার নাম বা আখ্যানের ইঙ্গিত। এরপর 'বাসুদেব' অর্থাৎ ব্যাসদেবের আবির্ভাব ঘটত হাস্যরসের অবতারণার নিমিত্তে। এরপর থাকত বালকদল পরিবেশিত ঝুমুর, এতেও পালার পরিচয় থাকত। ঝুমুরের শেষে দোহারদের সঙ্গীত বিষয়ক নিপুণতা প্রদর্শন—এ অংশ শেষ হলে উপস্থিত হতো 'দূতী' অর্থাৎ 'বৃন্দা'। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দূতীর পরিবর্তে প্রবেশ করত নারদ। এরপর বিভিন্ন চরিত্রের নাচ-গান ও সংলাপ।[৩৬]

শুরুতে খোলকরতালে আসর মুখরিত করা হতো এখনকার কনসার্টের মতোই। একে 'ধুমল' বা 'ধম্বৈল' বলা হয়।

যাত্রায় বাঙলা নাট্যমূলকরীতির সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটেছে, একথা অবশ্য স্বীকার্য। একে কেন্দ্র করেই বাঙলা বর্ণনাত্মক নাট্যরীতির একটি বিশেষ ধারা চরিত্রমূলক-অভিনয় বিকশিত হয়েছে। এর কাহিনীতে কোনো নাটকীয়তা নেই। দৃশ্য রচনার পরিবর্তে এখানেও আছে দৃশ্য রচনার সঙ্কেত সৃষ্টি। বাস্তব জগতের উপাদানগুলো ধরা যাক নদী, নৌকা, বন-উপবন অতি সহজেই সেখানে ইঙ্গিতার্থক হয়ে উঠে।

যাত্রায় মৃত্যু একটি চলমান আর্তনাদের উচ্চারণেই সীমাবদ্ধ।

অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্য থিয়েটারে দর্শকদের সামনে সকল দৃশ্যমূলক বিষয়গুলি নিখুঁতভাবে উপস্থাপনার প্রয়াস ছিল সাধারণ লক্ষণ। সেক্ষেত্রে যাত্রা ইঙ্গিতধর্মী অভিনয়ে বস্তুজগতকে মঞ্চ থেকে দূরে রেখেছে। এ অবশ্য সকল শ্রেণীর বাঙলা নাটকের সহজ পন্থা। দর্শকের কল্পনা শক্তিকে জাগ্রত করার ব্যাপারে ইঙ্গিতধর্মী অভিনয়ের বিকল্প নেই তা একালে পাশ্চাত্যের নাট্যতত্ত্ববিদগণও স্বীকার করেন।

যাত্রার নাট্যভাষা, গান অথবা গদ্য, বাংলা নাটকের অন্য সকল ধারার মতোই 'লিরিক্যাল'। যাত্রায় যেকালে গদ্যের প্রাধান্য সূচিত হলো, সেকালেও এর গদ্য সহজাত গীতলতাকেই গ্রহণ করল। গানে যা সুর, কথায় যেন তারই রেশ।

যাত্রা মধ্যযুগীয় বাঙলা নাট্যরীতির সর্বশেষ ধারারূপেই বিবেচ্য। জনরুচির নানা বিচিত্র ধারাকে আত্মসাৎ করে আজও তা চলমান নাট্যরীতি।

৫

'ঢপকীর্তন' বা 'ঢপ' অষ্টাদশ শতকের অন্তে কলকাতা ও তদসংলগ্ন অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ রীতি উনিশ শতকে 'নূতন ঝুমুর' নামেও পরিচিত হয়। ঢপের বিষয়ও রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা। মধুসূদন কান (১২২০-৭৫) 'ঢপ' কীর্তনের শ্রেষ্ঠ গায়ক। তিনি এ শ্রেণীর গানকে নতুনকালের ভাবমাধুর্য দান করেন।[৩৭]

ঢপে কাহিনী আছে, পাত্রপাত্রীর উল্লেখও আছে। কাজেই এর মধ্যে নাট্যরসের অভাব নেই। সঙ্গীতমূলক নৃত্যাভিনয়ের সঙ্গে থাকত কথকতা। এককালে ঢপ কীর্তনে নারী গায়েনরাই প্রাধান্য বিস্তার করে।

ঢপ কীর্তন মধ্যযুগের বাঙলা নাট্যরীতির অংশ। এর নাট্যমূলক উপস্থাপনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ উদ্ধৃতি করছি—

ঃ.....আর একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তন বাঙলার প্রায় সকল অঞ্চলেই প্রসিদ্ধ ছিল। প্রথমে একজন কীর্তনীয়াকে দেখিলাম ঢপ গানের ভঙ্গিতে রাইউন্মাদিনী কৃষ্ণলীলা গান করিতেছেন; তাঁহার সঙ্গে খোল করতাল ব্যতীত আর কোনও সাজ-সরঞ্জাম নাই। দেখিলাম তিনি নাচিয়া নাচিয়া কৃষ্ণদর্শনে পাগলিনী রাধিকাকে পথে বারবার যেন বাধা দিতেছেন—এই ভঙ্গিতে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর প্রসিদ্ধ গান গাহিতেছেন—

ঃ ধীরে ধীরে চল গজগামিনী।
তুই অমনি করে যাস্‌নে যাস্‌নে গো ধনী।।
তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পাবি,
না জানি কোন্ গহন বনে প্রাণ হারাবি—ইত্যাদি।

কয়েক বৎসর পরে দ্বিতীয়বার আবার যখন সেই একই অধিকারীর গান শুনিলাম, দেখিলাম আর সবই পূর্বের ন্যায় আছে, শুধু ছোট্ট একটি ছেলেকে রাধা সাজাইয়া লইয়াছেন, তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া বাধা দিবার ভঙ্গিতে গান করিতেছে। তৃতীয়বারে আবার দেখিলাম রাধার সঙ্গে দুই একটি সখীও জুটিয়াছে অধিকারী

নিজেও গান গাহিতেছেন, রাধা ও সখীরাও কিছু কিছু গান গাহিতেছে। মাঝে মাঝে সামান্য কিছু কিছু সংলাপও দেখা দিয়াছে। কয়েক বৎসর পরেই জানিলাম উপরি-উক্ত অধিকারী বড় কৃষ্ণযাত্রার দল করিয়াছেন।[৩৮]

ঢপ কীর্তনের পরিবেশনরীতি মধ্যযুগের বাঙলা নাট্যরীতিরই বিশিষ্ট ধারা। উপরন্তু এই বিবরণে ঢপের সঙ্গে লীলানাট্য প্রভাবিত যাত্রার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও প্রমাণিত হচ্ছে।

জারি মধ্যযুগের বিশিষ্ট নাট্যরীতি হিসেবে বিবেচ্য। কারবালার শোকাবহ কাহিনী অবলম্বনে জারির কৃত্যমূলক ধারা ষোড়শ শতকেই শুরু হয়েছিল। দৌলত উজির বাহরাম খান একালে ইমাম-বিষয়ক কাব্য রচনা করেন। এরপর কবি মুহম্মদ খানের মক্তুল হোসেন (রচনাকাল ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ তারিখ)। এ কাব্য বৃহদায়তনের। গ্রন্থদৃষ্টে ইমাম হোসেনের শাহাদাত বরণের একটি অংশ উদ্ধৃত হলো—

ঃ স্বর্গমত্য পাতালে উঠিল হাহাকার
কাদন্ত ফিরিস্তা সব গগন মাঝার।
বিলাপন্ত যতেক গন্ধর্ব বিদ্যাধর
আর্শকুর্সি লওহ আদি কাঁপে থরথর।
অষ্টস্বর্গবাসী যত করন্ত বিলাপ।
এ সপ্ত আকাশ হৈল লোহিত বরণ
কম্পমান সূর্য দেখি হোসেন নিধন।
ক্ষীণ হইল নিশাপতি আমিরের শোকে
মঙ্গল অরুণ বন রক্ত মাখি মুখে।
বুধে বুদ্ধি হারাইল গুরু এড়ে জ্ঞান
শুনি কালা বস্ত্র পিন্ধে পাই অপমান।
জোহরা নক্ষত্র কান্দে তেজি নাট গীত
ফাতেমা জোহরা কান্দে শোকে বিষাদিত।[৩৯]

এখানেও নাটগীতের উল্লেখ আছে।

গরীবুল্লার জঙ্গনামায় ইমাম হোসেনের শাহাদাত বরণের চিত্র মর্মস্পর্শী—

ঃ যখন বসিল কুফর ছাতির উপরে।
ছের জুদা কৈল যদি ইমামের তরে।।

আরস কোরস লওহ্ কলম সহিতে।
বেহেস্ত দোজখ আদি লাগিল কাঁদিতে।।
আসমান জমিন আদি পাহাড় বাগান।
কাঁপিয়া অস্থির হইল কারবালা ময়দান।।
আফতাব মাহ্তাব তারা কালা হইয়া গেল।
জানওয়ার হরিণ পাখি কাঁদিতে লাগিল।।
বালক মায়ের দুধ না খায় শোকেতে।
নাওম্মেদ রহে সবে এমাম জুদায়েতে।।[৪০]

জোনাব আলী রচিত আদি ও আসল 'সহিদে কারবালা' বটতলার পুথি। সংগৃহীত পুথির আদ্যন্ত খণ্ডিত। এ কাব্য থেকে 'হযরত মছলেমের মক্কা হইতে কুফা জাইবার বয়ান' অধ্যায়ের কিছু অংশ উদ্ধৃত হলো—

ঃ রওয়াতে রাবি লোক করেছে বয়ান।
জখন ভেজিল খত জত কুফিয়ান।।
বয়তুল্লার লোক জন মছলত করিয়া।
মছলেমের তরে আগে দিলেন ভেজিয়া।।
আকিলের ফরজন্দ মছলেম নামদার।...[৪১]

এ কাব্য মিশ্র ভাষারীতির। বাংলাদেশের লোকজীবনে এ ভাষার প্রভাব নেই বললেই চলে।

কারবালার শোকাবহ ঘটনার লোকনাট্য বা গীতরূপ—কাব্যাকারে রচিত হবার পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল, এরূপ অনুমানে বাধা নেই। অবশ্য বাঙলায় শিয়া সম্প্রদায়ের মহররমের শোভাযাত্রা ও কৃত্যের সঙ্গে বাঙলা 'জারি'র সম্পর্ক আছে।

সচরাচর মহররম মাসে গ্রামাঞ্চলে শোভাযাত্রা সহকারে 'জারি' পরিবেশিত হয়। এই শোভাযাত্রায় থাকে, পুরুষ ও মেয়েবেশধারীগণের যুগলনৃত্য। এছাড়া শোভাযাত্রা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, নদী তীর, বিদ্যালয়ের মাঠ বা সুবিধাজনক স্থানে কিছুক্ষণের জন্য থেমে, লাঠিখেলা, তলোয়ারবাজি প্রদর্শন করে। সন্ধ্যায় মূল অনুষ্ঠান। এতে পনের থেকে বিশজন তরুণ বালক অথবা যুবক, সাদা বর্ণের গেঞ্জি ও পাজামা পরিধানপূর্বক কপালে ও কোমরে শালু কাপড়ের পট্টি বেঁধে নৃত্য প্রদর্শন করে।

মূল গায়েন এ সময়ে মঞ্চের এক কোণে দাঁড়িয়ে বা বসে, যন্ত্রসঙ্গীতের বিশেষত ঢোলের তালে তালে গীত পরিবেশন করে। এই নৃত্য সম্পূর্ণত পৌরুষদীপ্ত। সচরাচর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশোর্ধ বয়সের লোকদের দলে রাখা হয় না, কারণ এই জারির নৃত্যে অমিত শক্তির প্রয়োজন হয়।

গায়েনের গীতের সঙ্গে সঙ্গে দোহার নৃত্যকগণ ধুয়া অংশ গান করে। এই নৃত্যে, নদী, ফুল, গাছের পাতা প্রভৃতি অপূর্ব সুন্দর Composition দৃষ্ট হয়। শূন্যে লম্ফ এই নৃত্যের বিশেষ আকর্ষণ। এই লম্ফকে 'মনিপুরী' বা চীনে প্রচলিত 'অপেরা' বা 'ব্যালে নৃত্যে'র সঙ্গে তুলনা করা চলে। বস্তুত জারি নৃত্যের ভঙ্গি, মুদ্রা ও দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন বস্তুর প্রতিরূপ তৈরির প্রয়াস সমগ্র বাঙলা নাট্যরীতিতে অভিনব সম্পদরূপে বিবেচ্য।

বাংলাদেশের ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে জারির দুটি ভাগ আছে যথা—'বিষাদ-জারি' ও 'চুটকী-জারি'। 'বিষাদ-জারি'র বিষয় কারবালার কাহিনী। 'চুটকী-জারি'র বিষয়, সমসাময়িক ঘটনা ও রঙ্গকৌতুক। দু'ক্ষেত্রেই নৃত্য আছে। দু'ধরনের বিষয়ে একই ধরনের লম্ফমূলক নৃত্য থাকলেও সচরাচর বৃত্তাকারেই লালরুমাল সহকারে জারিগান পরিবেশিত হয়। প্রচলিত জারিগানের একটি নমুনা এখানে উদ্ধৃত হলো—

ঃ আমি বন্দনা করি ফাতেমার চরণ হে
ফাতেমার চরণ।
আমি পরথমে বন্দনা করি পূবের ভানুশর
একদিকে উদয়গো ভানুর চৌদিকে পাশর।
উত্তরে বন্দনা করি কৈলাস শিখর,
যেখানে খেলাইতো আলী মালামের পাথর।
পশ্চিমে বন্দনা করি সব্বতীর্থ স্থান,
যে দিগে জানায়গো সেলাম হিন্দু মুসলমান।
আমি দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীর নদী সাগর,
যেখানে বাণিজ্য যাইতো চান্দ সদাগর।
চৌকোণা পিরথিমী বানালাম মন করিলাম থির,
সুন্দরবন সহিত বানালাম গাজী জিন্দাপীর।
আমি অধমে ডাকি করিয়া স্মরণ

মাগো দেহ্ দরিশন।
ফাতেমী তোর নাম করিয়া পার হব অকুল দরিয়া,
রাঙা চরণ দুটি করিয়া বন্দন মাগো দেহ্ দরিশন।
শুনগো ফাতেমা মাতা
পশুপঙ্খি তরুলতা
শুনিয়া কারবালার কথা
করিছে রোদন
মাগো দেহ্ দরিশন।
নীল দরিয়া হৈল উতালা
কান্দিয়া উড়ে নদীনালা,
কারবালায় দাড়াইঞা কান্দে
পন্থেরি পবন
মাগো দেহ্ দরিশন।
দেহ্ দরিশন, আমি অধমে ডাকি
করিয়া স্মরণ মাগো
দেহ্ দরিশন।
হায়, হায়রে হাছন হইলো উদাসী
ই-উদাসী হইলো হাছান
জয়নাবের লাগিয়া গো
হায়, হায়, হায়রে হাছান হইলো উদাসী।
পাগল হইলো হাছান মেঞা জয়নাবের লাগিয়া,
সেই না বিবি তার ঘরে কে দিবো আনিয়া।
যে আনিতো পারে বিবি জাগির করবো দান,
ফরাশে বয়ূন দিয়া বাড়াইবে মান।
ধন দিবে, মান দিবে হাত্তী ঘোড়া,
ঢাল তলুয়ার দিবে, দিবে জামা জোড়া।[৪২]

বাংলাদেশে প্রচলিত আর এক ধরনের নাট্যাভিনয় 'ঘাটু' নামে পরিচিত। 'ঘাটু' ঢপ শ্রেণীর, বর্তমানে তা দ্বি-চরিত্র বিশিষ্ট। এ গানে একজন কৃষ্ণ অন্যজন রাধার সাজ গ্রহণ করে। ঘাটু গানে প্রায় সর্বক্ষেত্রে একাদশ থেকে ত্রয়োদশ কিংবা তারও

কম বয়সের বালক রাধা সাজে। মূল গায়েন এবং দোহার ভূমিসমতল বৃত্তমঞ্চে অর্ধবৃত্তাকারে উপবেশন করে। 'ঘাটু' পূর্ণাঙ্গরূপে আদিরসাত্মক নাট্য। বর্তমানে এ ধরনের গান লুপ্ত প্রায়।

পশ্চিমবঙ্গে ঝুমুর দলবদ্ধ নৃত্য-সঙ্গীতাভিনয়। এছাড়া সে অঞ্চলে 'বোলান গান'ও প্রচলিত আছে। 'বোলান' নাটগীত শ্রেণীর লোকনাট্য।

বাংলাদেশ ও পশ্চিমঙ্গের আলকাপের রীতি ভিন্ন। বাংলাদেশে আলকাপ, পূর্ণাঙ্গ নাট্যপালা রূপেই প্রচলিত রয়েছে। এদেশে সচরাচর আখ্যানের সঙ্গে 'আলকাপ' কথাটা যুক্ত হয়, যেমন- 'কাঠুরিয়ার আলকাপ'। পশ্চিমবঙ্গে এ হচ্ছে 'পাঁচমিশালী নৃত্যগীত'। বীরভূম-মুর্শিদাবাদে এর প্রচলন রয়েছে। বীরভূমে আলকাপ 'ছ্যাচড়া' নামেও পরিচিত। সেখানে 'সঙ-মাস্টার'কে 'কোপ্যা' বলে। আলকাপ মূলত রঙ্গতামাশামূলক নাটক। 'অন্নদামঙ্গলে' শিবের ভিক্ষা যাত্রায় 'কাপ' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়—

ঃ 'কেহ বলে ঐ এল শিব বুড়া কাপ'
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।[৪৩]

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' 'কাপ'এর বিস্তারিত উল্লেখ লভ্য।

বাংলাদেশেও 'কাইপ্যা'র অর্থ রঙ্গ-কৌতুককারী। রাজশাহীর সীমান্ত অঞ্চলে সচরাচর ভূমি-সমতল বৃত্তমঞ্চে আলকাপের অভিনয় হয়। দর্শকরা গোল হয়ে বসে—মাঝের ফাঁকা অংশটুকুতে অভিনেতা, 'সরকার, খেমটাওয়ালী' ও বাদ্যযন্ত্রীরা বসে।[৪৪] এ স্থান থেকে উঠে গিয়েই নাটকের পাত্রপাত্রীরা অভিনয় করে। আবার অভিনয় শেষ হলে দোহার-দলে বসে পড়ে। কখনও কখনও আলকাপের অভিনয়ে মঞ্চ থেকে কিছুটা দূরে কাপড়ের ঘের দেয়া হয়, সেখান থেকে খেমটাওয়ালী বা কলাকুশলীরা রঙ্গস্থলে আসা যাওয়া করে।[৪৫]

আলকাপের অভিনয়ে রূপসজ্জার ব্যবহারও দেওখা যায়। এতে ছেলেরাই মেয়েদের সাজপোশাক পরে। এ প্রসঙ্গে রাজশাহী অঞ্চলে প্রচলিত একটি আলকাপ নাটকের কিছু অংশ উদ্ধৃত হল—

(এক দরিদ্র কাঠুরিয়া, সে তিনদিন ধরে অসুস্থ, ঘরে খাবার নেই)।

স্ত্রী ঃ ওগো শুনছো।

কাঠুরিয়াঃ (আসরে বসিয়া থাকিয়া) কি হৈলো, ডাকাডাকি কেনে করছিস?

স্ত্রী : ওগো আইজ তিনদিন থাইক্যা কিছুই খাইতে পাই নি। ক্ষুধায় আমার পরান হিয়্যা গেছে। অনাহারে আমি যে আর থাকতে পারছি না, স্বামী।

কাঠুরিয়াঃ আইজ তিনদিন থেকে আমি অসুস্থ। বনে যায়্যা কাট কাইট্যা আনা আমার ক্ষমতায় নাই। থাকলে কি তোকে কুনুদিন অনাহারে থুতুব।

স্ত্রী : স্বামী, আমি যে আর থাকতে পারছি না। ঘরে কিছুই নেই, আমি যুদি এ্যাখন খেতে না পাই তাহিলে আর বাঁচবো না।

স্ত্রীর গান

ওগো স্বামী, ক্ষুধার জ্বালাই
মরিগো প্রাণে কি।।
আজ তিনদিন হৈলো আরে
অনাহারে গ্যালো।
স্বামী অন্ন বিনে
কি ওগো ক্ষুধার জালাই
মরিগো প্রাণে কি।।

স্বামীঃ গান

কি ওগো প্রিয়ে।।
তোমার শোকে ঝরে দুনয়ন।
বিধাতারি লিখন রে
একি লিখেছিলে।
কত সইব জ্বালাতন
কি ওগো প্রিয়ে
তোমার শোকে ঝরে দুনয়ন।।

আমি আমার স্ত্রীর চোখে পানি দেখ্যা আর থাকতে পারছি ন্যা। কপালে যা থাকে জঙ্গলে যায়্যা কাট কাইট্যা হাটে ঘাটে বিক্রি কৈর‍্যা চাইল ডাইল কিন্যা আনবো।

(কাঠুরিয়া কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরিয়া)

কাট কাইট্যা যা দাম পাইয়্যাছি তাই দিয়া এই চাইল আনুন। (স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া) এই থাকলো তোর চাইল-ডাইল। সিদ্ধ-আধাসিদ্ধ যা হয় শীঘ্র কৈর‍্যা রান্ধ্যা তৈয়ার কর। মুখ আন্ধারী হৈতে আর বেশী দেরী নাই।

স্ত্রী : আচ্ছা, একটুকুন দেরী কোরবোনা। রান্ধ্যা হৈলে দু'জনা মিল্যা খাওয়া দাওয়া কইর‍্যা নিন্দা যাবো।

(কাঠুরিয়া ও তার স্ত্রী বসিয়া পড়িলো)

(দেশের রাজার শিকারে যাওয়ার জন্য কোটালের সঙ্গে আলোচনা)

রাজা : কোটাল, কোটাল।

কোটাল : রাজা, কেন ডাকিতেছেন?

রাজা : আইজ বহুদিন হইতে আমার শিক্যারে যাবার বাসনা হৈয়্যাছে।

কোটাল : শিকারে যাবেন? সেতো খুবি ভালো কথা। তাহিলে বর্শা বন্ধুক লিয়্যা হাতি ঘোড়া সাজাতে কইবো কি?

রাজা : লোকজন, লয়-লস্কর, হাতি-ঘোড়া কিছু সৌতে লিবো না। খালি সৌতে যাইতে হৈবে তোকে।

কোটাল : রাজা মশাই কবে শিকারে বাহির হৈবেন?

রাজা :

গান

ওগো কোটাল শোন না
শিক্যারে যাব্যার হৈয়্যাছে বাসনা
অতি শীঘ্রই ফিরবো
কোটাল দেরী বেশী কোরবো না।
শিক্যারে যাব্যার হৈয়্যাছে বাসনা।।

কোটাল : চলেন রাজা, যখন আপনার শিক্যারে যাব্যার এ্যাতো বাসনা হৈয়্যাছে তখন চলেন, এখনি হাঁটা দি।

রাজা : বেশ, চল।

(উভয়ে এদিক ওদিক কিছুক্ষণ পদচারণা করিয়া)

রাজা ঃ কোটাল, গোটা দিনতো বনে বনে ঘুর‍্যা ঘুর‍্যা কাটিয়্যা দিনু। এখন এই জঙ্গলে রাত্রিবাস করবো কুনঠে?

কোটালঃ তাইতো রাজা, রাত্রিবাসের জন্য তো একটা আশ্রয় দেখা দরকার। রাইত খানটা তো কুনু রকমে কাটাইতে হৈবে।

রাজা ঃ ঐ যে জঙ্গলে দূরে একটা আলো দেখা যাইচে, ঐখ্যানে চল না য্যায়া দেখি। ঐ খ্যানে নিশ্চয় কুনু লোকের বাস আছে। ....[৪৬]

নাটকটি আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এর মধ্যে খেমটাওয়ালির নাচ ও রঙ্গকৌতুক যুক্ত হয়ে পরিবেশনার ব্যাপ্তিকাল বেড়ে উঠার কথা। এতে বাঙলা নাটকের চিরাচরিত অভিনয়পন্থাও পূর্ণরূপে বিদ্যমান। সমস্ত ঘটনার বিশ্বাসযোগ্যতা একটি মাত্র বাক্যে, খানিক পদচারণায়, নৃত্যে-গানে রচিত হয়েছে এ নাটকে। অবশ্য কালের বিচারে আলকাপের বক্ষ্যমাণ রূপ অষ্টাদশ শতকের পরবর্তীকালের—এরূপ অনুমানই সঙ্গত।

মধ্যযুগের ধারায় বাংলাদেশে কিছু নাট্যমূলক কসরত বা খেলাধুলা দৃষ্ট হয়। এর মধ্যে লাঠিখেলা, তলোয়ারবাজি অন্যতম। বোল, চাল, নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে এ দুটি খেলা নাট্যমূলক উপস্থাপনারই নামান্তর। এ ধরনের খেলায় অংশগ্রহণকারীরা পক্ষ প্রতিপক্ষকে কৃত্রিমভাবে আক্রমণ করে থাকে।
একে 'কসরতমূলক নাট্য' রূপেও অভিহিত করা যায়।

মধ্যযুগে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অর্থাৎ 'লঘু-নৃ-গোষ্ঠী'সমূহের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল। 'কাঞ্চনকন্যা'য় তমশাগাজীর বাণিজ্য প্রসঙ্গে লঘু-নৃ-গোষ্ঠীর পরিচয় আছে, চট্টগ্রামে প্রচলিত 'হাতীখেদা'র গানে মারমা সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। হাজং সম্প্রদায়ের রাজা বীরসিংহ ও দেওয়ান ঈসাখাঁকে নিয়ে পূর্ববঙ্গ-গীতিকা রচিত হয়েছে।

বাংলাদেশে এসকল নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাট্যরীতির প্রচলন রয়েছে। গারোদের 'ওয়ানগাললা' অনুষ্ঠানে বাঁশের ঘোড়া সাজিয়ে সচরাচর কার্তিক-অগ্রহায়ণে নৃত্যগীতের উৎসব হয়। 'ওয়ান' অর্থ পূজা, 'গাললা'- 'দেবতার তুষ্টির

জন্য উৎসর্গ'। 'ওয়ান গাললা'র মূল দেবতা 'সালজং' অর্থাৎ সূর্যদেবতা।[৪৭] এই উৎসবের তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে নৃত্যগীত পরিবেশিত হয়। 'ওয়ানগাললা' দলবদ্ধ নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান। গারো (মূলে 'মান্দি') নৃগোষ্ঠীর মধ্যে নাট্য ও নৃত্যগীতাভিনয়ের অজস্র আঙ্গিক ও রীতি প্রচলিত রয়েছে। এক 'ওয়ানগাললা' অনুষ্ঠানেই প্রায় 'পঁয়তাল্লিশ থেকে ছাপ্পান্ন প্রকার নৃত্যের প্রচলন রয়েছে'। এ স্থলে ঐ সকল নৃত্যের কিছু নাম সঙ্কলিত হলো- ১. গ্রংদক্'আ (শিঙা বাজানোর নৃত্য) ২. দক্রুসু'আ (ঘুঘুর লড়াই অনুকৃতিমূলক) ৩. দুরাত্তারাত্তা (শষ্য সংগ্রহের অনুকৃতিমূলক) ৪. অপিংরাত্তা (জমির আগাছা পরিষ্কারের অনুকৃতি) ৫. আজেমা রু'আ (আজেমা নৃত্য) ৬. রুমেআমা (কোমরে সন্তান নিয়ে অবিবাহিত তরুণ-তরুণীর সন্তান পালনের অনুকৃতিমূলক নৃত্য) ৭. দামা জাজকা (ঢোল নৃত্য) ৮. মাৎমালা জেং অন্না (মোষকে ঘাস খাওয়ানোর অনুকৃতিমূলক) ৯. আম্ব্রে'তং মুজেকা (আম্রতক বৃক্ষ থেকে ফল সংগ্রহের অনুকৃতিমূলক) ১০. নমিল্ দোমিসু আলা ('তরুণী কর্তৃক মুরগীর পালক বিতরণ সম্পর্কিত নৃত্য') ১১. নমিল্ পান্থে সাল্লি দিং আ (তরুণ-তরুণীর প্রণয় সঞ্চার এবং পরস্পরকে আবিষ্টকরণমূলক) ১২. নমিল্ কাম্‌রাংদন্ নুয়ে রিংআ ('তরুণী কর্তৃক গোপনে ধূমপানে'র অনুকরণমূলক) ১৩. সালাম কা'আ (নৃত্যভঙ্গিতে দর্শকদের অভিবাদন) ১৪. বারা সুগালা (কাপড় কাচার অভিনয়) ১৫. দোসিক মেগারো চা আ (টিয়া পাখির যব-শীষ ভক্ষণ) ১৬. দামা জং আ (ঢোল সাজিয়ে নৃত্য) ১৭. সিপাই আবিত রুআ (সিপাহী কর্তৃক ড্রাম বাদন) ১৮. নমিল্ খাম্বি থুআ (তরুণী কর্তৃক শারীরিক বৃদ্ধির মাপসূচক) ১৯. চাম্বিল মেসা আ (চম্বল ফল সংগ্রহের অনুকরণমূলক) ২০. আসাক মিখপ চা আ (বানরের ভঙ্গিতে ভুট্টা ভক্ষণ নৃত্য)-ইত্যাদি।[৪৮] এ নৃগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত একটি ক্ষুদ্রকায় নাট্যমূলক গীতি উদ্ধৃত হলো—

মিয়া ঃ রেবা রেবা নমুল
দিক্ দিক্সা আসংনা।
রংফা থালো দান্দানে
গল্প কা কৃনা।।

মিচ্ছিক ঃ নাংজা নাংজা জারা পান্থিখো।
গিসিক্ খাতং চিপ্‌মান্ জক্
গিপ্‌পিন পান্থিখো।।

মিয়া ঃ ইন্দিওদে মাইনাসা
জা'রিক্কা দাক্ মাইয়া।
কাদি ম্বিদা দা কেসা
নিয়া দাক্ মাইয়া।।

মিচ্ছিক ঃ কা দিংজা জা রিক্জা
জারা পান্থিখো।
ইন্দিগিতা থলাই না
কারা চা জামা ।।

বাংলা অনুবাদ

ছেলে ঃ কন্যাগো আইস আমার সাথে
মনের কথা কইবাম তোমায়
(বইস্যা) শানে বান্দাইল ঘাটে।

মেয়ে ঃ বেক্কল মাইনষের নাই প্রয়োজন
শোন আমার কথা,
মন দিয়াছি প্রাণ সপেছি
আছে প্রাণসখা।

ছেলে ঃ মুচকি মুচকি হাস কন্যা
ফিইর‍্যা ফিইর‍্যা চাও
আমার পাছে ধাওয়া কইর‍্যা
কিসের মজা পাও?

মেয়ে ঃ মিছা কথা কহ পুরুষ
লজ্জা সরম নাই
তোমার মত বোকার সনে
কোন কথা নাই।[৪৯]

বাংলাদেশে চাকমাদের মধ্যে উপজাতীয় নৃত্যগীত ও নাটকাদি প্রচলিত আছে। চাকমাদের নব বৈশাখী উৎসব 'বিজু'। এ ছাড়া এই নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে কথকতা

কিসসাও প্রচলিত আছে—চাকমাদের একটি রূপকথায় লক্ষ্মীপ্যাঁচা কি করে দেবীর আশীর্বাদ লাভ করল সে কাহিনী আছে।

বাংলাদেশের অন্তর্গত বর্মাসীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী মারমা সম্প্রদায়ের মধ্যে 'পাঙ্খু' ও 'জ্যা' নামে দু'ধরনের নাট্যরীতি প্রচলিত। এই দু'ধরনের নাটকই কৃত্যমূলক। এর মধ্যে পাঙ্খু নাট্যরীতিতে শ্রমণ, প্রব্রজ্যা বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে 'মনরিমাংৎসুমুই'র পালা গীত হয়। সচরাচর কুড়ি থেকে পঁচিশজন নারী-পুরুষ পরপর দু'রাত ধরে সুবিশাল এবং মহাকাব্যোপম এই আখ্যান গীত-নৃত্য-সংলাপ ও শারীরিক কসরত-এর মাধ্যমে পরিবেশন করে থাকে। 'পাঙ্খু' শব্দের অর্থ 'কীট', 'পিঁপড়া বা মাকড়শা'। পিঁপড়াদের সারিবদ্ধ চলন ও মাকড়শার বয়নের সুস্পষ্ট প্রভাব পাঙ্খুনৃত্যে দৃষ্ট হয়।[৫০] এ থেকে এ-নৃত্যের প্রাচীনত্ব অনুধাবন করা যায়। 'মনরিমাংৎসুমুই-এর অর্থ 'রাজকন্যা মনরি'। এই নৃত্যগীতাভিনয়ের আখ্যান নিম্নরূপ—

ঃ স্বর্গরাজা দোমরা অর্থাৎ ডোমারায়ের সাতটি কন্যা। সাতটি কন্যা দেখতে একই রকম। তারা একদিন মর্তলোকের সংবাদ পেয়ে সেখানকার হ্রদে অবগাহনের নিমিত্তে চঞ্চল হয়ে উঠে। সপ্তকন্যা সমবেতভাবে মর্তে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করে পিতার কাছে। পিতা স্বপ্নে দেখেন কনিষ্ঠা কন্যার দুঃখজনক পরিণাম। তিনি এজন্য সবাইকে বারণ করেন কিন্তু কন্যাদের ব্যাকুল আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। তাই শেষে ওদের মর্তলোকে যাবার অনুমতি দেন তিনি। সপ্তকন্যা পৃথিবীর হ্রদে ডুবসাঁতারের আনন্দে প্রতি সন্ধ্যায় উড়ে আসে। কিন্তু একদিন এক শিকারী, নাগরাজ থেকে পাওয়া বিষের জালে আটকে ফেলে এক পরী কন্যাকে। সে কনিষ্ঠা বোন, নাম রাজকুমারী মনরি অর্থাৎ 'মনরিমাংৎসুমুই'। শিকারী ধৃত মনরির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় সে দেশের রাজপুত্র অর্থাৎ মারমা রাজকুমার সাথানুর। সাথানুর সঙ্গে প্রথমবারের মতো বিবাহ হয় মনরির।

ইতোমধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে যুদ্ধ লাগে মারমা রাজ্যের। সাথানু চলে যায় যুদ্ধক্ষেত্রে। এদিকে ব্রাহ্মণরা রাজপুরীতে মনরির আগমনে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য দেখে গভীর এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। রাজা একদিন এক স্বপ্নের অর্থ জিজ্ঞাসা করলে ব্রাহ্মণরা সে স্বপ্ন খণ্ডনের বিধান দেয় এমত—'সাথানুর কল্যাণের জন্য মনরিকে

মন্দিরে বলি দিতে হবে'। মনরি এক শিশুপুত্রের জননী হয়েছে। এমতাবস্থায় প্রাণ রক্ষার্থে পুত্রকে ফেলে মনরি পুনরায় পিতার স্বর্গলোকে উড়ে চলে যায়। যাবার সময় শুধু রেখে যায় গহীন অরণ্যে এক সন্ন্যাসীর কাছে একটি অঙ্গুরী।

সাথানু যুদ্ধজয় শেষে ফিরে এসে মনরিকে পায় না। উন্মত্ত বেদনায় সে গৃহত্যাগী হয়। নানারাজ্য ঘুরে দেখা পায় সেই সন্ন্যাসীর। সন্ন্যাসী স্বর্গে যাবার উপায়গুলো বলে দেন সাথানুকে, সঙ্গে দেন মনরির রেখে যাওয়া অঙ্গুরী।

বহু কষ্টে স্বর্গে যায় সাথানু। শক্তি ও বুদ্ধির পরীক্ষা দিয়ে সে জিতে নেয় মনরিকে। স্বর্গলোকে পুনরায় বিবাহ হয় মনরি-সাথানুর। বিবাহ শেষে ডোমারায়, বাকি ছ'কন্যা মিলে প্রাসাদশুদ্ধ জামাতা ও মনরিকে রেখে আসেন মর্তলোকে।

পৃথিবীতে তখন প্রায় শতবর্ষ কেটে গেছে। মনরির রেখে যাওয়া সেই শিশুপুত্র এখন বৃদ্ধ। কিন্তু বুদ্ধের কৃপায় লুপ্ত পূর্বকাল ফিরে আসে সুখকর বর্তমানে। শিকারী টের পায় পূর্বজন্মে সে ছিল সাথানু-মনরির দাস। এবং সাথানু-মনরি— পালার শুরুতেই বলা হয় যে তারা ছিল প্রথম জন্মে এক জোড়া কপোত-কপোতী। গহীন অরণ্যে দাবানলে তাদের সন্তান পুড়ে গেলে শোকে দু'জনে আত্মহতি দেয়।[৫১]

সচরাচর আঙ্গিনায়, উৎসব কেন্দ্রে বা আমবাগানে এই আখ্যান পরিবেশন করা হয়। 'মনরিমাংৎসুমুই'র আখ্যান বাঁধা-মঞ্চে বা ভূমি-সমতলে অভিনীত হয়। মঞ্চের একদিকে দোহার ও বাদ্যযন্ত্রীগণ অন্যদিকে কাপড়ের ঘেরে কলাকুশলীরা অবস্থান করে। প্রবেশ প্রস্থান মেনে চলা হয়। কলাকুশলীদের মধ্যে পুরুষেরা পাৎলুন ও গাঢ়নীল বা অন্য কোনো রঙের জামা পরে, মেয়েদের পরনে থাকে ঐতিহ্যবাহী 'থাবি-আঙ্গি'। মেয়েদের হাতে একটি করে লাল রুমাল, নৃত্যমধ্যে সেই রুমাল সঞ্চালনের মাধ্যমে কখনও অবগাহন, কখনওবা আকাশে ওড়া দেখানো হয়। সাধারণত ওড়নার মধ্যে রুমালটি ফেলে দিলে তা হয়ে উঠে মনরির শিশুপুত্র। সাথানুর সঙ্গে যুদ্ধে 'বোলু' বা 'বুলু' জীবজন্তুর মুখোশ পরিধান করে।

'মনরিমাংৎসুমুই'র আখ্যান দৃষ্টে বলা যায় বৌদ্ধধর্ম প্রসারের কালে এ কাহিনীর উদ্ভব। ব্রাহ্মণদের ষড়যন্ত্র, মনরির স্বর্গে পলায়ন প্রভৃতি ঘটনা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংঘর্ষের স্মারক। 'মনরিমাংৎসুমুই'র কাহিনী ত্রিলোক-সঞ্চারী, এতে মহাকাব্যের সকল রসই আছে। স্নেহ, প্রেম, দান-ধর্ম, যুদ্ধ ও অলৌকিকতা সব কিছু মিলিয়ে এ আখ্যান নিঃসন্দেহে মহাকাব্য পদবাচ্য।

মারমাদের সমৃদ্ধ নাট্যরীতির আর একটি 'জ্যা' বা 'জ্যাঃ'। সম্ভবত বাঙলা যাত্রা থেকেই এর উদ্ভব। 'জ্যা'তে হরিশ্চন্দ্রের পালাও অভিনীত হয়। হরিশ্চন্দ্রের পালা কৃত্যমূলক। একথা নিশ্চিত যে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বাঙলা থেকেই এ কাহিনী মারমাদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে। এ থেকেও প্রমাণিত হচ্ছে যে, 'ধর্মমঙ্গলে' গৃহীত হবার পূর্বে রাজা 'হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী' স্বতন্ত্ররূপে পরিবেশিত হতো।

এই নৃগোষ্ঠীতে প্রচলিত 'জ্যা আলংনাবাহ্' কৃত্যমূলক সামাজিক নাট্য। 'আলংনাবাহ' পাঁচজন প্রার্থীর কাহিনী। এতে পর্যায়ক্রমে পাঁচটি চরিত্রের কাহিনী মঞ্চে উপস্থাপিত হয়। এরা যথাক্রমে মংসাংখা, ম্যাসাংখা (মংসাংখা'র স্ত্রী), উইরিয়া (মংসাংখা'র বন্ধু), মৌ ছৈ পৌ (মংসাংখা'র ছেলে) এবং থইল্যা।

'আলংনাবাহ'র গল্পটি নিম্নরূপ- মংসাংখা 'আনসাজতেমপা' রাজ্যের রাজপুত্র। তার স্ত্রী ম্যাসাংখা। মংসাংখা ব্যবসা বাণিজ্যে প্রভূত অর্থোপার্জন করেছে। দরিদ্রের দুঃখে সদা কাতর এই রাজপুত্র। তা বন্ধু উইরিয়া বিত্তশালী কৃষক। একদা অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্ব হারিয়ে উইরিয়া বন্ধু মংসাংখার শরণাপন্ন হলে মংসাংখা তাকে অর্থসম্পদ দিয়ে সহায়তা করে। মংসাংখা শর্ত দেয়, বিপদের দিনে উইরিয়া তাকে সাহায্য করবে। উইরিয়া সে-শর্ত মেনে নেয়। মংসাংখা শিশুপুত্র আর স্ত্রীকে গৃহে রেখে একদা সমুদ্রপথে বাণিজ্যে বেরিয়ে পড়ে। তার সঙ্গী থইল্যা। ঝড়ে জাহাজ-ডুবি হলো। থইল্যা ভাসতে ভাসতে নিজের দেশে চলে গেল আর মংসাংখা এলো উইরিয়ার এলাকায়। কৃতঘ্ন উইরিয়া রাজপুত্রকে পাঁচশত ছাগল চরাবার মতো কষ্টকর কাজে নিয়োগ করে।

এদিকে ম্যাসাংখা স্বামীর খোঁজে গৃহত্যাগিনী হয়। দেশে দেশে খোঁজে ম্যাসাংখা স্বামীকে। উপনীত হয় উইরিয়ার অঞ্চলে। উইরিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো তার। দেখামাত্র কামাগ্নিতে জ্বলে উঠলো কৃতঘ্ন উইরিয়ার মন। সে মিথ্যা সংবাদ দিল-তার প্রিয় বন্ধু ম্যাসাংখার মৃত্যু হয়েছে। অতঃপর ম্যাসাংখাকে বিবাহের প্রস্তাব দিল। ম্যাসাংখা ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে উইরিয়া মনে করে যে ম্যাসাংখার শিশুপুত্রের কারণে সে তার প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। সুতরাং উইরিয়া ম্যাসাংখার শিশুপুত্রকে নদীবক্ষে নিক্ষেপ করে। ভাগ্যক্রমে শিশুপুত্র বেঁচে যায়।

উইরিয়া এদিকে জোর করে ম্যাসাংখাকে আপন গৃহে তুলে নেয়। অবৈধ সম্ভোগে সফলকাম হয় সে। উইরিয়া তন্ত্রসিদ্ধ ছিল। মংসাংখার সঙ্গে পূর্বে উইরিয়া প্রদত্ত এই শাপ ছিল যে মংসাংখা যখনি আত্মপরিচয় দেবে, তার মুখ থেকে

অগ্নিনির্গমিত হয়ে মৃত্যু ঘটবে তার। ইতোমধ্যে মংসাংখার পুত্র মৌ ছৈ পৌ দৈব নির্বন্ধনে রাজা হলো। নিঃস্ব মংসাংখা সেই রাজার প্রশ্নের উত্তরে নিজের পরিচয় দেয়। সঙ্গে সঙ্গে শাপ-নির্দিষ্ট ভবিতব্য অনুসারে অগ্নির উদ্গারে মৃত্যু ঘটে মংসাংখার।

উইরিয়া গৃহ থেকে পালিয়ে যায় ম্যাসাংখা থইল্যার সঙ্গে। পথে দেখতে পায় স্বামীর মৃতদেহ। যথানিয়মে স্ত্রী সৎকার করে স্বামী মংসাংখার। পুনর্জন্মের জন্যে মংসাংখা স্বপ্নে স্ত্রীকে বলে বৌদ্ধ-মন্দির, সরাইখানা এবং জনকল্যাণে জলদানের ব্যবস্থা করতে।

নাট্যের শেষে নতুন রাজা মৌ ছৈ পৌ বিশ্বাসঘাতক উইরিয়ার বিচার করল। বিচারে ফাঁসি হলো তার।

'আলংনাবাহ্ জ্যা'র মূল কাহিনী শুরুর আগে তিনটি কৃত্যমূলক অনুষ্ঠান থাকে। এগুলি যথাক্রমে-

১. 'পুইউ' (নাচের বন্দনা অংশ : একজন নৃত্যশিল্পী একটি গামলার মধ্যে ৫টি সুপুরী, ১টি নারিকেল, ৫ পোয়া চাল, ১ ছড়া কলা, ৫টি টাকা, ১ জোড়া মোমবাতি নিয়ে এসে আসরে স্থাপন করে। সম্মিলিত বাদ্যযন্ত্রের তালে সে আসর প্রদক্ষিণ করে করে নাচে। গামলাটা বুকে ধরে নমস্কারের ভঙ্গিতে সে শেষ করে তার আসর বন্দনার নৃত্য)।

২. 'তুইছাদুঙ্গা' (এটিতে প্রেমমূলক নৃত্য ও সঙ্গীত উপস্থাপনা করা হয়। 'তুইছাদুঙ্গা' অর্থাৎ দেখাশোনা। এতে আটজন কিশোরী, প্রয়োজনে ছয় কিংবা বারোজন নৃত্যশিল্পীও অংশগ্রহণ করে থাকে। এখানেও সবার মঙ্গল কামনা করা হয়। নৃত্যপরা মেয়েদের পরনে থাকে লাল রঙের 'থামি' (Thami), গায়ে সাদা 'আঙ্গি' (Angi')- মারমা মেয়েদের ব্যবহৃত ব্লাউজ, কোমরে কুচি। মুখে জরি মাখানো, খোঁপায় নানা রঙের ফুল এবং হাতে রুমাল ও পায়ে মোজা পরিহিতা মেয়েরা বাদ্যযন্ত্রের তালের সাথে মিলিয়ে নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করে)।

৩. 'লেছামায়ুইং' ('লে' চাষবাসের জমি। এতদসংক্রান্ত নৃত্যকে বলা হয় 'লেছামায়ুইং'। একে 'জুম-নৃত্য'ও বলা যায়। থামি এবং বিদন আঙ্গি- এক ধরনের ঝালর কাটা ব্লাউজ— পরিহিতা চারজন তরুণী হাতে একখণ্ড রুমাল

নিয়ে নৃত্য করে। তাদের নৃত্যের মুদ্রায় প্রদর্শিত হয় শস্য বোনা ও ফসল কাটার বিভিন্ন ভঙ্গি। এই নৃত্যাংশে জীবিকা নির্বাহের কৃত্যসমূহ বিধৃত হয়)।

তিনপর্ব নৃত্যগীত (পুইউ, তুইছাদুঙ্গা ও লেছামায়ুইং) শেষে শুরু হয় 'আলংনাবাহ'র মূল কাহিনী।[৫২]

'আলংনাবাহ'র আঙ্গিক বাঙলা লীলানাট্য ও যাত্রার মিশ্র প্রভাবপুষ্ট, বৌদ্ধ শিল্পরীতির ধারায় বিবেচ্য।

সমকালে নৃগোষ্ঠসমূহের একান্ত পরিচয়বাহী নাটককে 'নৃগোষ্ঠী-নাট্য' বা 'জাতিগত থিয়েটার' (ETHNIC THEATRE) এবং সে ধারায় উক্ত থিয়েটারের-আধুনিক রূপান্তরকে 'নব্য-জাতিগত থিয়েটার', 'নব্য-নৃগোষ্ঠী নাট্য' (NEO-ETHNIC THEATRE) প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়।

টীকা

১. শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, প্রথম খণ্ড, ১৯৭১।

২. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খণ্ডে (১ম আনন্দ সংস্করণ-১লা বৈশাখ ১৩৯৮) পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক ১৩২২ সালে সংগৃহীত 'বাদ্যানীর গানে'র সংক্ষিপ্তরূপ ধৃত হয়েছে। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত, সাইদুর রহমান সম্পাদিত, *লোকসাহিত্য সংকলনে* (প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯১) কিশোরগঞ্জ জেলা থেকে সংগৃহীত 'বাইদ্যানীর গান' দ্রষ্টব্য।

৩. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, *মৈমনসিংহ গীতিকা*, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃঃ /.

৪. মৎপ্রণীত, *হরগজ*, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৯৯, আগস্ট ১৯৯২, কথাপুচ্ছ, (পৃ. ৩)।

৫. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, *মৈমনসিংহ গীতিকা*, সং-১৯৭৩, পৃঃ ৫।

৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০-১১।

৭. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, (২য় খণ্ড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ-১লা বৈশাখ ১৩৯৮, বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেছেন—'উত্তরপূর্ব' ও 'পূর্ববঙ্গে' লোকমুখবাহিত অল্পবিস্তর খণ্ডিত অনেকগুলি গাথা 'মৈমনসিংহ গীতিকা' এবং 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' নামে চারখণ্ডে দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়া সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। এগুলি প্রায় সবই চন্দ্রকুমার দে'র সংগ্রহ। চন্দ্রকুমার দে সংগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, গাথাগুলির ভাষায় ছন্দে কলম চালাইয়া সেগুলিকে "ভাল করিয়া সম্পাদন" করিয়াছিলেন। কিন্তু সেকথা তিনি একবারও বলেন নাই। দীনেশবাবু চন্দ্রকুমার দে'র কাছে প্রাপ্ত বস্তু সম্পূর্ণরূপে খাঁটি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেইভাবে ছাপাইয়াছিলেন'। তাঁর মতে 'কোন কোন গাথায় অন্য গল্পের জোড়াতালি দিয়া অথবা অন্য উপায়ে কাহিনীকে পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত করিয়া আধুনিককালোচিত রোমান্টিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা দেখা

যায়। 'মহুয়া' পালাটিতে এই প্রচেষ্টা বেশী স্পষ্ট। মহুয়ার আত্মহত্যা কখনই মূল কাহিনীতে ছিল না'। (পৃঃ ৫০৪)।

৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০৭।

৯. মোহাম্মদ সাইদুর সম্পাদিত, *লোকসাহিত্য সংকলন-৪১*, ফাল্গুন ১৩৯১, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, পৃঃ ১৩১-১৩২।

১০. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১লা বৈশাখ ১৩৯৮, পৃঃ ৫০৯।

১১. মোহাম্মদ সাইদুর সম্পাদিত, *লোকসাহিত্য সংকলন-৪১*, ফাল্গুন ১৩৯১, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, পৃঃ ১৪২-১৪৪।

১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯০।

১৩. শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, প্রথম সংস্করণ ১৯৭১, পৃঃ ৪।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯-৩০।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮-৪৯।

১৬. মৎপ্রণীত, একটি মারমা রূপকথার ভূমিকা, *বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসী ঃ অংশীদারিত্বের নতুন দিগন্ত*, প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৪০০, অক্টোবর ১৯৯৩, পৃঃ ১০।

১৭. শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, ২য় খণ্ড, ১৯৭১, পৃঃ ৬৫।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯০-২৯১।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৪।

২০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৩।

২১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৫।

২২. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, *মৈমনসিংহ গীতিকা*, সং-১৯৭৩, পৃঃ ২২৯।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৩।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২১।

২৫. শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* (২য় খণ্ড) প্রথম সং- ১৯৭১, পৃঃ ৩৮১।

২৬. সত্যেন্দ্রনাথ বসু ভক্তিসিদ্ধান্ত বাচস্পতি, সম্পাদিত, *শ্রীচৈতন্যভাগবত*, দেবসাহিত্য কুটীর ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪২৫।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯৮।

২৮. গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, প্রথম প্রকাশ ১লা অক্টোবর ১৯৭২, পৃঃ ১৭৩-১৭৪।

২৯. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ*, সপ্তম সংস্করণ, মাঘ ১৩৮৩, পৃঃ ১৭৪।

৩০. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, প্রথম আনন্দ সং-১লা বৈশাখ ১৩৯৮, পৃঃ ৫১১।

৩১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সং ১৯৮৫, পৃঃ ৪৬১।

৩২. শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত, *বিশ্বকোষ* (পঞ্চদশ ভাগ), ১৩১১, পৃঃ ৭০৩।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০২।

৩৪. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, প্রথম আনন্দ সং-১লা বৈশাখ ১৩৯৮, পৃঃ ৫১১।

৩৫. বৈদ্যনাথ শীল, *বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা*, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত, দ্বিতীয় সং-১৩৭৭, পৃঃ ৬৮-৬৯।

৩৬. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সং-১৯৮৫, পৃঃ ৪৬৭-৪৬৮।

৩৭. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, প্রথম আনন্দ সং-১লা বৈশাখ ১৩৯৮, পৃঃ ৫১০।

৩৮. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ*, সপ্তম সংস্করণ মাঘ ১৩৮৩, পৃঃ ১৭৩-১৭৪।

৩৯. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৯০, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৫৮৭।

৪০. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, ২য় খণ্ড পরিমার্জিত সং- কার্তিক ১৩৭৪, পৃঃ ২৮৮।

৪১. জোনাব আলী রচিত, *আদি ও আসল সহিদে কারবালা*, বটতলা পুথি, পৃঃ ১৮৫-১৮৬।

৪২. চিত্তরঞ্জন দেব, *বাংলার লোকগীত কথা*, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৬ খৃ. অ. ১৩৯৩, ব. অ. পৃঃ ১৫১-১৫৮।

৪৩. গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, প্রথম প্রকাশ ১লা অক্টোবর-১৯৭২, পৃঃ ৫৫৫।

৪৪. মোহাম্মদ সাইদুর সম্পাদিত, *লোকসাহিত্য সংকলন-৪১*, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৯১, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫, পৃঃ আঠার।

৪৫. (আলকাপের পাত্রপাত্রীদের মঞ্চে আগমন, দোহারদের মধ্যে বসে পড়া প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ ও মঞ্চরীতি আসামের অঙ্কিয়া নাটকের কথা মনে করিয়ে দেয়)।

৪৬. মোহাম্মদ সাইদুর সম্পাদিত, *লোকসাহিত্য সংকলন-৪১*, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯১, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫, পৃঃ ৫-৭।

৪৭. শাবির উদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, *ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রথম প্রকাশ-১৯৭৮, পৃঃ ৫৮৫।

৪৮. লুৎফর রহমান, নৃগোষ্ঠী নাট্য: গারো, মৎ সম্পাদিত থিয়েটার স্টাডিজ, জুন ১৯৯৪ (২য় সংখ্যা), পৃ: ৭৭-৭৮।

৪৯. ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ১৯৭৮, পৃ: ৫৯৫-৫৯৬।

৫০. মৎ রচিত একটি মারমা রূপকথার *ভূমিকা, বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীঃ অংশীদারিত্বের নতুন দিগন্ত*, প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৪০০, অক্টোবর ১৯৯৩।

৫১. মৎপ্রণীত, 'গবেষণাগার নাট্য: একটি মারমা রূপকথা', মৎ সম্পাদিত থিয়েটার স্টাডিজ, জুন ১৯৯৪ (দ্বিতীয় সংখ্যা), পৃঃ ১৭।

৫২. আফসার আহমদ, নৃগোষ্ঠী থিয়েটার: মারমা জ্যা 'আলংনোবাহ', মৎ সম্পাদিত থিয়েটার স্টাডিজ, জুন ১৯৯৪ (২য় সংখ্যা), পৃঃ ৬০।

দশম অধ্যায়

[মধ্যযুগে বাঙলা সীমান্তবর্তী বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার নাটক ও নাট্যরীতি—নেপাল, মিথিলা, উড়িষ্যা ও আসাম অঞ্চলের নাটক—উল্লেখযোগ্য নাটকসমূহ ও পরিবেশনারীতি। মধ্যযুগের বাঙলা নাট্যরীতির সঙ্গে ঐ সকল প্রাদেশিক নাট্যের সম্পর্ক বিচার।]

মধ্যযুগে বাঙলা নাট্যরীতির পূর্ণতর পরিচয় লাভের জন্য সীমান্তবর্তী বিভিন্ন রাজ্য যথা—নেপাল, মিথিলা, উড়িষ্যা ও আসামে প্রচলিত নাট্যধারার অনুসন্ধান প্রয়োজন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাজ্য সংঘাতের ফলে, বাঙলা সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহ কখনওবা একীভূত রাজ্যসীমার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল, কখনও আবার সেগুলো খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্নরূপে নতুন রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণে এসেছিল। এ ছাড়া ইতিহাসের ধারায় দৃষ্ট হয় যে, এতদঞ্চলের জনপদসমূহ নানাকালে অভিন্ন ধর্মদর্শনের প্রভাবে একই সঙ্গে আলোড়িত হয়েছে। ধর্মীয় তীর্থ, উৎসব-পার্বণ ও মেলার সুবিস্তৃত মিলনক্ষেত্রে সেকালের নানা অঞ্চলের মানুষের পারস্পরিক মত বিনিময়ের অবকাশ ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলাকে তাই সম্পূর্ণত অঞ্চলভেদে বিচ্ছিন্ন করে দেখার উপায় নেই।

এ কথা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, বাঙলা সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের ধর্ম-সংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্যের উপর প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাঙালির মনন এবং চিন্তার অমোচ্য প্রভাব পড়েছিল।

প্রাচীন বাঙলার নাথ ধর্ম একসময় সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহে শুধু নয়, সমগ্র ভারতেও প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিল। নেপালে বাঙালি সিদ্ধা মীননাথ নাথ ধর্মের প্রচার করেন। প্রাচীন বাঙলার চর্যাপদ, নেপালেই পাওয়া গেছে। বঙ্গীয়-গম্ভীরার শিব-বিষয়ক নানা কৃত্যও সে রাজ্যে বাহিত হয়েছিল। নেপালের রাজদরবারে অভিনীত 'ভাষা নাটক' বাঙলা-মৈথিলী ভাষায় রচিত। এ ছাড়া কোনো কোনো ভাষা নাটকের রচয়িতাও বাঙালি কবি।

সপ্তম শতকে পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা, মৈমনসিংহ ও মুর্শিদাবাদের কোনো কোনো অঞ্চল কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মার অধীনে ছিল।[১] আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে কামতাপুর আক্রমণপূর্বক সে-রাজ্য বিধ্বস্ত করেন। বাঙালি কবি নারায়ণদেবের 'মনসামঙ্গল', অসমীয় ভাষা ও সাহিত্যের একান্ত সম্পদরূপেই গণ্য হয়। আসামে নারায়ণদেব 'সুকন্নাণী' অর্থাৎ সুকবি নারায়ণী। শঙ্করদেব যেকালে ভাগবত ধর্ম প্রভাবিত হয়ে 'বরগীত' ও লীলানাটক রচনা করেন, তার বহুপূর্ব থেকে কৃষ্ণ-বিষয়ক পাঁচালি ও কৃষ্ণলীলানাট্য বাঙলায় প্রচলিত ছিল। চৈতন্যদেবের সঙ্গে শঙ্করদেবের সাক্ষাৎ ঘটেছিল উড়িষ্যার পুরীতে। (শঙ্করদেব 'রুক্মিণীহরণ নাট' রচনা করেছিলেন এই সাক্ষাতের বহু পরে)।

মিথিলার কবি বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ বাঙলা পদাবলীর ধারায় গৃহীত হয়েছে। স্বয়ং চৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদগীতির রস আস্বাদন করতেন। মিথিলায়ও এককালে নাথধর্ম দৃঢ় ভিত্তি লাভ করেছিল। চতুর্দশ শতকের প্রথমদিকে জ্যোতিরীশ্বর কবি শেখরাচার্যের 'বর্ণরত্নাকরে' আটাত্তর জন সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া যায়।[২] বিদ্যাপতি নাথসিদ্ধা গোরক্ষকে নিয়ে 'গোরক্ষবিজয় নাটক' রচনা করেন।

উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র (সিংহাসন আরোহণের কাল ১৪৯৭ খৃঃ) চৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন। চৈতন্যদেবের শিষ্য উড়িষ্যার কবি সার্বভৌমেন রামানন্দরায় গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত বলে জনশ্রুতি আছে[৩]। রামানন্দরায়ের 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকে 'গীতগোবিন্দে'র প্রভাব বিদ্যমান।

চৈতন্যদেব সুদীর্ঘকাল পুরীতে বাস করেছিলেন— স্বাভাবিকভাবেই উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্ম সম্প্রদায়ে তাঁর ধর্মতত্ত্ব গৃহীত হয়েছিল। মৈথিলী কবি অচ্যুতানন্দের 'কলিযুগগীতা' কাব্যে (গুরুভক্তি ষষ্ঠ ছন্দে) চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গ আছে—

ঃ ওড়িশা দেশরে প্রচর। আজ্ঞা যে নদিয়া ঠাকুর।।
সে আজ্ঞা মনরে সুমরি। গোপাল কুলকু উদ্দরি।।
এণু মুঁ লভিলি জনম। তুম্ভস্কু দেলি দীক্ষাধর্ম।।[৪]

চৈতন্যদেবের নির্দেশেই অচ্যুতানন্দ বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষাদানের কাজ করেন।

সদানন্দ কবি সূর্যব্রহ্ম 'চোরচিন্তামণি' কাব্যে চৈতন্যদেবকে বলেছেন— 'মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্বেশ্বর'।[৫]

উড়িষ্যার কীর্তনীয়া নাটকেও পরবর্তীকালে বৈষ্ণবীয় ভাবধারার ছাপ পড়ে। অবশ্য অসমীয় লীলানাটের উদ্ভবে মিথিলার কীর্তনীয়ার প্রভাব আছে। উড়িষ্যার কবি দ্বারিকাদাস বাঙলা পাঁচালির প্রভাবে 'মনসামঙ্গল' রচনা করেছিলেন।

বাঙালির বিশিষ্ট দার্শনিক অবদান 'সাংখ্যযোগতন্ত্র', 'নাথপন্থা' ও 'অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদী' দর্শন, আদি ও মধ্যযুগে সর্বভারতীয়-মানসে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিল। বাঙালির নিজস্ব দর্শনের ব্যাপক বিস্তারের ফলে, এতদ্দেশে ভিন্ন ভাষার নন্দনতাত্ত্বিক শৃঙ্খলার আনুগত্য স্বীকার করার প্রয়োজন হয় নি। বোধ করি এজন্যে মধ্যযুগে সংস্কৃত নাট্যরীতি কখনও বাঙলা নাটকে অনুসৃত হয় নি। বাঙালিরা আলাদাভাবে সংস্কৃত ভাষাতেই শাস্ত্রশাসিত নাটক রচনা করেছেন, এমন কি নেপালের রাজসভায়ও বাঙালি কবি, সংস্কৃত নাট্য আঙ্গিকের অনুসরণে ও রাজরুচির প্রেক্ষিতে বাঙলা-মৈথিলি ভাষায় নাটক রচনা করেছিলেন। কিন্তু নিজদেশে নিজ ভাষায় রচিত হয়েছে পাঁচালি। স্বভূমিজ শিল্পরীতির ধারায় বাঙলা পাঁচালি, আঙ্গিক ও বিষয়বৈচিত্র্যে শত শত বৎসরব্যাপী বাঙালির নাট্যরস পিপাসাকে আপন খাতে বাহিত করেছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গীয় সংস্কৃতি এ কালের রাষ্ট্র নির্ণীত সীমানায় আবদ্ধ ছিল না। রাজা ও রাজত্বের নানা পরিবর্তনের ধারায় এ সকল অঞ্চল কখনও একত্রিত কখনও বা বিচ্ছিন্নভাবে শাসিত হতো। এই প্রক্রিয়ায় এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক ঐক্যও গড়ে উঠে এ কথা পূর্বে উক্ত হয়েছে। প্রাচীনকালে এ সকল পূর্ব ভারতীয় অঞ্চল 'বৃহদবঙ্গান' রূপে পরিচিত ছিল।[৬] ধর্ম, সংস্কৃতি, শিল্পরীতি, স্থাপত্যকলা প্রভৃতি বহুবিষয়ে আলোচ্য প্রদেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য পরিলক্ষিত। তাই বলা যায় বাঙলাদেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের নাট্যরীতি, বিশিষ্ট হলেও বিচ্ছিন্ন নয়।

চতুর্দশ শতক পর্যন্ত নেপালের রাজদরবারে সংস্কৃত ভাষায় নাটক রচিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখ্য চার অঙ্কে রচিত 'রামাঙ্ক' নাটক। রচয়িতা বালবাগীশ্বর ধর্মগুপ্ত। এ নাটকের রচনাকাল ১৩৬০ খ্রীষ্টাব্দ। ধর্মগুপ্তের আরেকটি নাটক 'রামায়ণনাটক'। জয়স্থিতিমল্লের কালে, চতুর্দশ শতকের অন্তে মৈথিলি নাট্যকার মণিক সংস্কৃত ভাষায় 'ভৈরবানন্দ নাটক' ও 'অভিনবরাঘবানন্দ নাটকম' রচনা করেন। পঞ্চদশ শতকে রাজা জয়রণমল্ল সংস্কৃত ভাষায় 'পাণ্ডব বিজয়' নামে একটি নাটক রচনা করেন।

নাটকটি অসমাপ্ত। এ সকল নাটক সংস্কৃত ভাষায় রচিত হওয়া সত্ত্বেও 'সঙ্গীত নাটক' নামে অভিহিত হয়েছে।[৭]

সপ্তদশ শতকে জগজ্জ্যোতিমল্ল ব্রজবুলিতে পঞ্চাশটি গান রচনা করেন। সেগুলো 'কুঞ্জবিহারী নাটক' ও 'মুদিত কুবলয়াশ্ব' নাটকে সংযুক্ত হয়।[৮] নেপালে সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাটকের পর এল বাঙলা-মৈথিলি নাটক। গোড়াতে এগুলোকে 'নেপালে বাঙ্গালা নাটক' নামে অভিহিত করা হয়। দুটি ভিন্ন ভাষায় রচিত বলে, কেউ কেউ এ ধরনের নাটককে ;ভাষা-নাটক' বলার পক্ষপাতী।[৯] 'মুদিতকুবলয়াশ্ব' প্রভৃতি নাটকে সংলাপাংশ 'ভাষা' বা ভাসা' হিসেবে উক্ত। কিন্তু এ সকল নাটকের ভাষা দুটি নয় তিনটি। কারণ ভাষা-নাটকে বাঙলা-মৈথিলি-ব্রজবুলি ব্যতিরেকেও সংস্কৃত সংলাপ ও শ্লোকের বিশদ ব্যবহার আছে। তা ছাড়া এ সকল নাটকের রচয়িতাগণ কোথাও তাঁদের নাটককে অনুরূপ নামে অভিহিত করেন নি। রচয়িতাগণ সেগুলোকে সর্বত্র 'নাটক' ও 'নৃত্য' রূপেই উল্লেখ করেছেন। 'প্রাচীন বাঙালা-মৈথিলি নাটক' নামটি কালজ্ঞাপক নয়। ভাষা নাটক মূলত সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে রচিত, কাজেই এগুলোকে 'প্রাচীন' না বলে 'মধ্যযুগের-বাঙলা-মৈথিলি' নাটক বলা সমীচীন। নেপালে বাঙালি ও মৈথিলি ব্রাহ্মণদের প্রভাবের কথা সুবিদিত। মল্লবংশীয় রাজাদের পুরোহিত ছিলেন বাঙালি ব্রাহ্মণ। প্রথম হরিসিং ছিলেন বাঙালি গুরুর শিষ্য। সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই নেপালে রাজকবি বা রাজাদের নামের ভণিতাযুক্ত নাটক দেখা যায়। রামভদ্র বিরচিত 'হরিশ্চন্দ্র নৃত্যো'র রচনাকাল ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দ। অন্যান্য ভাষা নাটকের মতো এ নাটকের শ্লোক সংস্কৃত, গীত ও ভাষা বাঙলা-মৈথিলিতে রচিত হয়েছে। নাটকের পাত্রপাত্রীদের মঞ্চে এসে আত্ম পরিচয়দানের রীতি এ ধারার সকল নাটকেই আছে। কিন্তু এ থেকে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের এরূপ অনুমান যে, আদিতে 'হরিশ্চন্দ্র নৃত্যে' এ সকল পাত্রপাত্রী (হরিশ্চন্দ্র, মদনাবতী রোহিদাস আদি) পুতুল রূপে মঞ্চে প্রবশে করত।[১০] বলাবাহুল্য এ অনুমানমাত্র। ভাষা নাটকে সংস্কৃত-শাস্ত্রীয় নাট্য-কৃত্যের ধরন দেখা যায়। বংশমণি ওঝা'র 'মুদিতকুবলয়াশ্ব' নাটকে আছে "প্রথমতঃ পদ্ধতি ক্রমেন নৃত্যারম্ভে রঙ্গভূমি পূজাদি সর্বং কর্তব্যম।।" এরপর তালধরগণের প্রবেশ ও অন্যান্য কৃত্য।

তারপর 'নান্দীগীতং গাতব্যম্'। 'মুদিতকুবলয়াশ্ব' নাটকের নান্দীগীত নিম্নরূপ—

।। রাজ বিজয় ।। এক তারে ।।

ঃ রজত কনক রংগ ঈশ গোরি সংগ

একহি কলেবর বাসে
পূর আসে।।
শির সুরসিধার কুসুমমাল বর
ইন্দু সিংদুর বিন্দু সোহে
মনমোহে।।
কানকুণ্ডল ডোল ফণিমণি নিরমল
হারমাল কিঙ্কিনি বাজে
ভল চ্ছাজে।।
বাঘচ্ছাল রুণ্ডমাল নেতমোতিম হার
পরিরণ ঈ সব রীতি
জগজীতি।।
চণ্ডীচরণচিত শিবক ভগতি যুত
ভূপ জগজোতি এহাভণে
অবধানে।। [১১]

বলাবাহুল্য এ হচ্ছে হরগৌরী বন্দনা। নেপালে শিব 'নৃত্য স্মারক' দশ ভূজধারী 'নৃত্যনাথ' রূপে পূজিত। শিবের অন্যরূপ চতুর্ভূজধারী ভৈরব, গলায় মৃদঙ্গ।[১২] নান্দীগীতের পর 'জমনিকা' সংস্থাপন উপলক্ষে সূত্রধারের নান্দীপাঠ। জমনিকা আসলে জমনিকা-পট্ট। এ পট্ট পুতুল নাচ ও নাট্যাভিনয়ে ব্যবহৃত হয়। নারায়ণদেবের 'মনসামঙ্গলে' বেহুলার নৃত্য পরিবেশন প্রসঙ্গে পট্ট-জমনিকার ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। বেহুলা রঙ্গস্থলে প্রবেশের পূর্বে পট্টবসনে নিজ বেশভূষা আবৃত করে নিয়েছিল। অতঃপর দুপাশে বায়েনাদির বাদ্যভাণ্ড সহকারে মঞ্চে প্রবেশপূর্বক সে আবরণ-পট্ট খসিয়ে নৃত্যারম্ভ করে। আসরে প্রবেশের পূর্বে যাত্রা নাটকেও পাত্রপাত্রীগণ কখনও কখনও গাত্রাবরণ ব্যবহার করে থাকে।

ভাষা নাটক মূলত রাজার যজ্ঞ, ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে অভিনীত হতো—

ঃ সূত্র। হে প্রিয়ে মহারাজকে আজ্ঞা ভেল অচ্ছ, জে আজ হমরা ভগবতীক মহোৎসব থী, তথী দেবযাত্রা প্রসঙ্গে নানা দিগন্ত সঞো অনেক সজ্জন আএল অচ্ছ, সরসনৃত্য ঞেহাএও সবে অনুরক্ত করু।।

নটী ঃ কও রাজাক আজ্ঞা।।

সূত্র ঃ ভক্তপট্টনক রাজা।। [১৩]

উদ্ধৃতাংশে দেখা যায় ভগবতীর মহোৎসবে দেবযাত্রা উপলক্ষে 'মুদিতকুবলয়াশ্ব' নাটক অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকের দর্শক রাজদরবার সংশ্লিষ্ট, উচ্চকোটির।

আরও একটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, ভাষা নাটক নৃত্যরূপেও আখ্যাত। মিলনান্তক নাটক বলেই এ হচ্ছে 'সরসনৃত্য'। নাট্যের শুরুতে আছে রাজ্য ও রাজার গুণ বর্ণনা। এ সঙ্গে 'জগজ্জ্যোতির্ম্মল্লদেবে'র বংশাবলীর বিবরণ পেশ করে সূত্রধার। তারপর নটী ও সূত্রধারের সংলাপ, এতে আছে রাজার স্তুতি ও মূল কাহিনীর সারসংক্ষেপ। রাজা জ্যোতির্মল্লদেবের নিজ রাজ্য লাভে নানা বিপর্যয় ও উত্তরণকে সমান্তরাল করে দেখার প্রয়াস এই পৌরাণিক কাহিনীতে একটি ভিন্ন তাৎপর্যদান করত সন্দেহ নেই—

সূত্র :.... তে দুষ্টে শ্রীজগজ্জ্যোতির্ম্মল্লদেবকে অনেক পীড়া দেল, তদুত্তর, ইষ্ট দেবতা প্রসাদে অপনে মন্ত্রবলে, হুনি, সে সবে রাজ্যলেল, তাহু দুষ্টকা পাপফলে সমূল নাশ ভেল, তদন্তর অনেক রাজ্যভোগ কএ। সংসার অনিত্য জানি, শান্তিরস অবলম্বলাহ, তে হুনকা তাতাধিক কহঈচ্ছি।।

নটী : গেল জে পাওব সে বড় আচর্য।।

সূত্র : হে প্রিয়ে, ঈ কওন আশ্চর্য, ইষ্টদেবতা প্রসাদে কী নহি হোঅএ। সুনহ, গালব ঋষি দেবতাক আরাধনাএ, কুবলয় ঘোড়া খড়গ পাওল, সে লএ, রাজা শত্রুজিতক থাব গএ ওহু দুই বস্তু রাজপুত্র ঋতধ্বজ তহিকাকে দএ, তহি লএ কয় কহু যজ্ঞ কএলহি.......।

অভিনয় ও সাজসজ্জা প্রসঙ্গে 'পাত্র কাচ্ছ' অর্থাৎ 'পাত্রকাচ'-এর উল্লেখ আছে।

: নটী। ঈ উত্তম, অবিলম্বে ই পাত্র কাচ্ছ এ চলু।।[১৪]

সূত্রধার নটীর প্রস্থানের পর শুরু হয় 'প্রথম সম্বন্ধ'। এর পটভূমি স্বর্গ।

এতে আছে, মহাদেব-পার্বতী ও প্রমথগণের কথোপকথন। বন্দনা শ্লোক সংস্কৃতে রচিত, শ্লোক সংখ্যা দুই। এরপর দ্বিতীয় দৃশ্য। দৃশ্য নেপালী ভাষায় 'লূ'। মধ্যযুগের বাঙলা-মৈথিলি নাটকে 'লূ' সর্বত্র উল্লেখিত হতে দেখা যায় না। কোনো কোনো নাটকে গান অর্থে 'মে' বা 'মেপু' দেখা যায়।

'মুদিতকুবলয়াশ্ব' নাটকে মঞ্চের নানা অংশে অভিনয়ের সঙ্কেত লভ্য যেমন 'কোণভাষা', পাঁচালির 'নাচাড়ি'র উল্লেখ আছে দ্বিতীয় সংখ্যক 'লূ' তে—

নচারী ।। কৌশিক।। এ

ঃ জাহি জনকো ধরমহি চীতি
সে মোর সহজ সহোদর মীতি।।
সম্পতি দান ভোগ নাসহি জাএ
অবসর এক প এ ধরম সহাএ।।
নীলকণ্ঠ তোহি কুমতি ন দেহ
তোহর চরণ পএ করব সিনেহ।।
নৃপ জগজোতিমল জুগুতি বুঝাব
ভবক ভগতি বিনু আন ন সোহাব।।১৫

এই পদে ব্রজবুলির প্রভাব সুস্পষ্ট। 'নচারী' থেকে বুঝা যায়, এ পদ নৃত্যের। 'মুদিতকুবলায়শ্ব' নাটকে বাংলা-মৈথিলি গদ্যের নমুনা কিরূপ তা সংলাপ দৃষ্টে উদ্ধৃত হল—

কোণভাষা

গালব ঃ হে চ্ছাত্র, ঈ বস্তু লএ রাজা আরাধনা করু।
শিষ্য ঃ তথী সংদেহ কওন।।

দ্বিতীয় কোণ

শিষ্য ঃ হে আচার্য, সভা দেরি ভেল।
গালব ঃ রাজাক থাএো শুভাশীর্বাদ করব।।
গারব ঃ হে দ্বারী, গালব ঋষি আএলচ্ছথি, রাজা জনাউ।
দ্বারী ঃ সর্বথা।।
দ্বারী । হে দেব, গালব ঋষি দ্বার চ্ছথি।
রাজা । গালব ঋষি তোরাএে আনহ।
দ্বারী । মহারাজা অবশ্য।।
দ্বারী । ঋষি রাজা মহারাজ সএো দর্শন কুরু।
গালব । অবশ্য।।
গালব । আশিস জয় জয় মহামণ্ডোলেশ্বরো ভব।।
রাজা । হে ঋষি রাজ মোর প্রণাম।।
গালব । উওরোত্ত সন্ততি সন্তান বৃদ্ধিরস্তু।।
রাজা । হে ঋষীশ্বর ঈ আসনে বৈসু।।

গালব । অবশ্য।।........[১৬]

এ ভাষা গীতল। গদ্য হয়েও পদ্যের সমীপবর্তী। ভাষা নাটকের সংলাপও অনেক সময় একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে সমাপ্ত। অবশ্য দীর্ঘ বাক্য ও সংলাপের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু তার প্রবণতাও যেন গীতিসুরের দিকে। বাক্য থেকে বাক্যে নানা ভাবের বৈপরীত্য সৃজনের চেয়ে সুরের দিকেই এর ঝোঁক।

কুণ্ডলা রাজপুত্র ঋতধ্বজের কাছে বন্দিনী মদালসা সম্পর্কে বলছে—

ঃ কুণ্ডলা। হে রাজ, গংধবরাজ বিশ্বাবসুক তনয়া, মদালসা নাম, অতি বিচক্ষণা, মন্ত্রিরাজ বিংধ্যবানক বেটী, কুণ্ডলা নাম মোঞে, পুষ্করমালীকে পত্নী, সম্ভাসুরে, সে মারলাহ, তাহি দিন সঞো তীর্থভ্রমণ কএল, মদালসা হমরা অত্যন্ত প্রেম, একদা হমরা দুহু ব্যক্তি, বনবিহার করইচ্ছলাহু, বজ্রকেতুক পুত্র, পাতালকেতু মহাদুষ্ট, তমোময় মায়া কএ কভু হরি লএ অনলক ও পাপিষ্ঠ ঈ বিয়াহ এ উদ্যমলি, তে বিষাদে দোসরা দিন এর মর এ উদ্যমল, ওহিটা সময় আকাশবাণী ভেলী পাতাল কেতু মারি, তেরহদিন ভিতর তোহরা উচিত স্বামী মিলত, জে পাতালকেতু মারত, সে হো এত স্বামী, ইচ্ছ (।) তোহরা ঠাম ভেল, তে সংকা মূর্চ্ছা ভেলইক।।[১৭]

(হে রাজপুত্র, গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর তনয়া, মদালসা নাম, অতি বিচক্ষণা, মন্ত্রী রাজ বিন্ধ্যবাণের কন্যা আমার নাম কুণ্ডলা পুষ্করমালীর পত্নীকে শুম্ভাসুর মারল, সে জন্য কিছুদিন তার সঙ্গে তীর্থভ্রমণ করলাম, মদালসার সঙ্গে আমার গভীর প্রেম, একদিন আমরা দুজন, বনবিহার করছিলাম, বজকেতুর পুত্র পাতাল কেতু মহাদুষ্ট, তমোময় মায়াদ্বারা আমাদের হরণ করে, সে পাপিষ্ট একে বিবাহ করতে উদ্যমী হল, সে দুঃখে অন্যদিন যখন আত্মহত্যায় উদ্যত সে সময়ে আকাশবাণী হল, পাতালকেতুকে হত্যা করে তের দিনের মধ্যে তোমার (মদালসার) যোগ্য স্বামী মিলবে, যে কিনা পাতালকেতুকে মারবে সে হবে তোমার স্বামী, এই যে এখন তোমার কাছে এল, সে শঙ্কায় মূর্চ্ছা গেল।)[১৮]

এ ভাষা শুধু গীতল নয় বর্ণনাত্মকও বটে। এই বর্ণনায় সুর আছে এবং তা গীতনৃত্য, শ্লোক সংবলিত নাটকে অদ্বৈত সুর-প্রবাহের অংশ। মধ্যযুগের বাংলা মৈথিলি ভাষা-নাটকে সংলাপ, গীত ও শ্লোকের অনুবর্তী। সংস্কৃত নাটকে যে আঙ্গিক ও চরিত্রগত অনিবার্যতায় গদ্য সংলাপ প্রত্যক্ষ করি নেপালের 'দরবারী' নাটকে তা দৃষ্ট হয় না। এ সকল নাটক তাই আসলে গীতনাটের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন।

'ভাষা নাটকে' সংলাপ বা 'ভাষা' সচরাচর তিনভাবে এসেছে-এক, গীত বা শ্লোক পূর্ব ভূমিকা হিসাবে, দুই, গীত বা শ্লোকের পর এর ব্যাখ্যার নিমিত্তে, তিন, স্বতন্ত্র পরিবেশ, ও যথার্থ নাট্য ঘটনার প্রয়োজনে। প্রমাণস্বরূপ গদ্য সংলাপের তিনটি দৃষ্টান্ত 'ললিত-কুবলয়াশ্ব' থেকে উদ্ধৃত হল।—

(এক) গীত বা শ্লোকপূর্ব ভূমিকা হিসাবে 'ভাষা' বা গদ্য সংলাপ—

(তাল) আহো ভায়ি মহারাজ পাতালকেতু অপনার কৃপাতে এহি ভূমণ্ডল মধ্যে তালকেতু সমান যোধা মহাপরাক্রমী কোন আচ্ছে কেবল তুমার ভায়ি তমী আচ্ছে।।

(পাতাল) আহো ভায়ি তালকেতু সত্য হো।।

তালকেশিরক্তকেশিউগ্রকেশিয়া ।। আহো মহারাজ হমরো বাণী সুন হো।।

(পাতাল) আহো তালকেশি রক্তকেশি উগ্রকেশি কহ্ হো।।

।। শ্লোক ।।

মহাঘোরবক্রো মহারক্তনেত্রো মহাদংষ্ট্রয়া জিহ্বয়া ক্রুদ্ধমূর্তিঃ।
মহাঅট্টহাসো মহানুর্দ্ধকেশো মহামাংসরক্তপ্রিয়ো রাক্ষসোহহং।।

(দুই) গীত বা শ্লোকের পর এর ব্যাখ্যার নিমিত্তে—

।। পাতালকেতুয়া বচন।।

আহো ভায়ি তালকেতু আমারো এক বাণী সুন হো।।

(তাল) আহো মহারাজ আজ্ঞা হো।।

।। শ্লোক ।।

কষ্টমেতন্ময়া প্রাপ্তং ত্বয়ি বীরে স্থিতেহনুজে।
যদ্যজ্ঞ মুনায়োকুর্বন্দেবানাং প্রীতিহেতবে।।

(পাতাল) অহে ভায়ি তালকেতু সমস্ত ঋষিগণ দেবলোক অমারো প্রতাপতে কংপায়মান আচ্ছে তথাপি অমরা সেবা না করিবে এহি অমার বদ দুখ আচ্ছে।।[১৯]

(তিন) স্বতন্ত্র পরিবেশ ও যথার্থ নাট্যঘটনার প্রয়োজনে—

(তালকেতু-অনুচর) আহা ভায়ি, মহারাজ তালকেতু অসুররাজের আজ্ঞাতে সমস্ত সৈন্য দাকিতে জায়িবো চরো।

(দ্বিতীয় অনুচর) অহা ভায়ি চরো২।।

জব কোণস।।

(তালকেতু-অনুচর) আহো মহারাজ তালকেতু অসুররাজের রাজ্যবিষে জতেক যোদ্ধা বলন্ত সেনা আচ্ছে ততেক শস্ত্রাস্ত্র সংযুক্ত হৈয়া সংগ্রাম করিবার আয়স্ব রে আয়স্ব।।

।। দমামা ভেরি পুয়াব খব কোণ তো বং।।

(অনুচরদ্বয়) তালকেতু অসুররাজের আজ্ঞাতে তুরন্ত করিয়া আয়স্ব রে আয়স্ব, জদি ন আসিবে তার সর্বস্ব নিয়া সাস্তিবে সব লোক আয়স্ব রে আয়স্ব।।

দমাম, থাহবা ববং।। ।।রাক্ষস পনিবব দবল।।

(তালকেতু) আহো রক্তকেশী উগ্রকেশী, অমার ঘ(র) ভি ওর চোর পৈসিয়া থাকিরো সে চোর বাধিয়া কাঁতিয়া সংপূর্ণ করিতে জায়িবো চরো।।

(রক্তকেশী-উগ্রকেশী) আহো মহারাজ বিজৈ হো (২)।।

(তালকেতু) অরে রে পাপষ্ঠ চোর আজু কথা জায়বে।

।। মদালসা ।। অহে প্রাণনাথ এথা অনেক রাক্ষসগণ আসিরো অমার বদ ত্রাস হৈ কী বুদ্ধি কী প্রতিকার করিবে।।

রাজা।। অহে প্রিয়ে তুমী ত্রাস না করো অমার প্রভাবে দোখ যায়ে।[২০]

এতদসত্ত্বেও মধ্যযুগের বাঙলা-মৈথিলি নাট্যে গদ্য সংলাপ মূলত গীত ও শ্লোকাদির সেতুবন্ধ মাত্র। নৃত্য ও সঙ্গীতের কতটুকু প্রাধান্য তা বোঝা যায় এ সকল নাটকে যুক্ত গীতের সংখ্যাধিক্য থেকে। মুদিতকুবলয়াশ্ব নাটকে গানের সংখ্যা একশ উনিশ, বিদ্যাবিলাপে একশ তের, মহাভারতে পাঁচশ দুই।

দ্বিজরাম ভদ্র বিরচিত 'ললিত-কুবলয়াশ্ব-মদালসোপাখ্যান' নাট্যের শুরুতে শিব প্রশস্তিমূলক সংস্কৃত শ্লোক, অতঃপর বাঙলা-ব্রজবুলিতে 'মে' অর্থাৎ গান—

ঃ হর হর তুব কলা বিপরিতি মালা।
নিরকণ্ঠ জটাধারি শিরে তোয়ধারা।।[২১]

গনেশ বন্দনা-সংস্কৃত শ্লোকে। গনেশ বন্দনা উড়িষ্যার 'ওড়িশি' নৃত্যে দেখা যায়। এরপর সূত্রধার ও নটীর সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন শেষে রাজবন্দনা এবং সূত্রধার-নটীর সংলাপ। অতঃপর শ্লোক—

ঃ ঋতধ্বজঃক্ষত্রিয় বাহুবল্য ঃ
মদালসোৎপত্তিকথাসমেতং

শম্ভোশ্চরিত্রং পরমং পবিত্রং
তৌর্যত্রিকেন প্রকটীকরোমি।।[২২]

এ নাটকে বাঙালি সিদ্ধাযোগী 'মৎস্যেন্দ্রনাথ' এর সঙ্গে রাজার তুলনা করা হয়েছে—

ঃ জোগ জুগুতি ঈশ্বর মচ্ছিন্দর রূপ।
বরাভয় আয়ধ সে ত্রিদশকে ভূপ।।[২৩]

অন্যত্র ঃ প্রথমহি মচ্ছিন্দ দরসন জাএ
হমর বিপদ সব তব দূর জাএ।।[২৪]

ভাষা নাটক সঙ্গীত-নৃত্য-নাটক। কাজেই এ নাটকে দোহারের ভূমিকা থাকার সম্ভাবনা নাকচ করা যায় না। একটি দৃশ্যে বরুবা-থরুবাকে গালব ঋষি বলছেন—

ঃ অহে করুবা থরুবা সর্বথা চরো।

গালবাদি ঋষি এই কথা বলে চলে গেলেন-তারপরই আছে গান—

।। ম ।। গৌরী ।। প্র ।।
মন চিন্তা না কর চিন্তা না
হরিপদপংকজ বদং না।।
যে মাগব সে সফল করনা
ভবদুখসাগর সংতরনা ।। ধ্রু ।।[২৫]

উল্লেখিত গানটি কোন চরিত্রের নয়, সূত্র-নটীরও নয়, উপরন্তু এটি একটি ধুয়াপদ। অতএব তা মঞ্চে দোহার কর্তৃক গীত হত, এরূপ ধারণাই সঙ্গত।

অন্যত্রও দোহার বা অনুরূপ দলগীতির আভাস পাওয়া যায়। শিব সভাস্থলে যাবেন সস্ত্রীক। পার্বতী বলল— অহে পরমেশ্বর শ্রী মহাদেব বিজৈ হো—

ঃ এরপর গান

এ ধনি তোহ সনি দ্বসর ন আনে
ভউহ তরংগ জানি অনংগক মানে।।
মরম রাগব শর দুসহ বেদনে।
মন পরিবোধ নহি কওন জতনে।। ধ্রু।।
মধু ভর কমলাহি মধুকর জৈসে
তুব মুখ কমলহি মোর মন তৈসে।। ধ্রু।।

অবসর সুন্দরী ন কর নিবাসে
অসবয় সকল ন সকল বিলাসে।। ধ্রু।।
শঙ্কর তনয় রামভদ্র দ্বিজগাবে
হরিহরচরণ কমল যুগ ভাবে।।[২৬]

এ সংলাপ শিবের কিন্তু পদের ভণিতায় শিব এক সঙ্গে বিষ্ণুশিবের চরণ বন্দনা বা চরণ ভাবনার কথা বলতে পারেন না। অন্যদিকে এখানে একজন নারীর স্তুতি আছে। বলাবাহুল্য শিবের অনুগামিনী হিসেবে দুজনের নাম আছে 'গংগা' ও 'পার্বতী'। অন্যদিকে একটি পদে তিনটি ধুয়া বা দিশা দেখে এ কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, পদটি মূলত দোহারের। চরিত্রাভিনয়ে দোহাররীতি বাঙলা লীলানাট্যে যে আজও বিদ্যমান তা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

মদালসার মৃত্যুর পর হরের প্রীতিলাভপূর্বক তাকে পুনর্জীবন দানের নিমিত্ত কংবলাশ্বতর সরস্বতীর কাছ থেকে বীণা লাভ করে। সরস্বতী নৃত্য-গীত সিদ্ধির বর দিয়ে নাগরাজকে বীণা দান করল—

ঃ ওহে নাগরাজ, ভোরানাথ শ্রীমহাদেব মৃত্যুংজয় মূর্তি জে, নৃত্যগীতবাদ্যতে তৎকারহি প্রসংন হৈবে, নৃত্যগীত বিদ্যাসিদ্বি তুমাকে দিরো লেহো এহী বীণা ধরিয়া নৃত্য করিতে জাবো, হমহি নিজস্থানে জায়িবো।।[২৭]

বীণাগ্রহণপূর্বক কম্বলাশ্বতর 'নটুবায়া' অর্থাৎ নাটুয়ার বেশ ধরে শিবের সম্মুখে নৃত্যগীত শুরু করে—

।। কামোর।। গদ্য।।

ঃ নাদ গান অওর তান থান হৃদ্যমানরে
গদ্য পদ্য অর্থ ভাব তালবদ্ধ জানরে।।
শংখ শুষির কংস বংশ মুরজতন্ত্রী ভেদিএ
হস্তচরণ অঙ্গচারি ফেরি ফেরি নাচিএ।।
অর্থ ধর্ম ভুক্তি মুক্তি এহি সকল সাধিএ
পাপ জীতি পরম নীতি শংভু শরণ পাইএ।।[২৮]

রাগ নামের পাশেই আছে 'গদ্য'। গদ্যের একটা অর্থ 'কথোপকথন'। এখানে 'কথনীয়' অর্থেই গ্রহণ শ্রেয়। 'নাদগান' নৃত্যগীত বা নাটগান। কম্বলাশ্বতর শিবের সম্মুখে নৃত্যগীত পরিবেশন করেছিল। তাতে নাট্য পরিবেশনার নানান প্রসঙ্গও বিবৃত হতে দেখা যায়। 'গদ্যপদ্য অর্থ ভাব' হল তালবদ্ধ সংলাপ অর্থাৎ এ হচ্ছে

নাটগীত। বাদ্যযন্ত্রের নামও লভ্য। এমন কি আঙ্গিকাভিনয়ে ঘুরে ফিরে নৃত্য প্রসঙ্গ উল্লেখিত হতে দেখা যায়।

এরপর গানে গানে শিবের স্তুতি ও বাণী। শিবের সম্মুখে নাট্যগীত-নৃত্যের পর স্বস্তিবচনই বাণী। শিবের সভায় নৃত্যগীতের মাধ্যমে মৃতকে পুনরুজ্জীবন দানের বিষয়টি মনসামঙ্গলে আছে। অবশ্য এস্থলে নাগরাজ শুধুমাত্র পরোপকারার্থেই নাটগীত করেছিল এবং তা পুরাণ সম্মত। এ শ্রেণীর কোনো কোনো নাটকে পাত্রপাত্রীরা সংস্কৃত ভাষায় নিজেদের পরিচয় দেয় তবে মধ্যযুগের নেপালী-নাট্যে পাত্রপাত্রীগণকর্তৃক মঞ্চে প্রবেশপূর্বক স্বীয় পরিচয়দান, একটি সাধারণ রীতিরূপে অনুসৃত হতে দেখা যায়।

নেপালের দরবারী নাটক সচরাচর দিনের বেলাতেই অভিনীত হত বলে অনুমান করা হয়েছে। কোনো কোনো দরবারী নাটকের অঙ্কশেষে জীবন, জগত, শরীর ও সংসার বিষয়ক নীতিকথা আছে। এগুলো সজ্জন দর্শকদের কথা মনে রেখেই রচিত। এ সকল নাটকে নেওয়ারী ভাষায় দুর্বোধ্য নাট্য নির্দেশনা-সঙ্কেত আছে।

নেপালে রচিত তিনটি নাটক, 'বিদ্যাবিলাপ' 'মহাভারত' ও 'মাধবানল-কামকন্দলা' বাঙালি নাট্যকারের লেখা বলে অনুমিত হয়েছে। এ সকল নাটকের ভাষা পুরানো ধরনের হলেও, বিশেষজ্ঞের মতে তা কবি কৃষ্ণরামদাস, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের ভাষার কাছাকাছি।[২৯]

কাশীনাথ কৃত 'বিদ্যাবিলাপ' নাটকের রচনাকাল ৮৪০ সংবৎ অর্থাৎ ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দ। নাটকটি ছয় দিবস ও ছয় অঙ্কে বিভক্ত। সে হিসাবে 'বিদ্যাবিলাপের' অঙ্ক সংখ্যা ও দিবস সমার্থক।

প্রথম অঙ্কের উপস্থাপনারীতি থেকে এ নাটকের গড়ন অনুধাবন করা যায়।

শুরুতে নৃত্যনাথকে নমস্কার, সংস্কৃত শ্লোকে বন্দনা, তারপর নান্দিমাল—

ঃ জয় জয় শংকর দেব নটেশর
রজ শির সুরসুরিধার
চাঁদ ললাট শোভিত অচ্ছ
নিরমল উরবর ফণিপতিহার।।[৩০]

তারপর সূত্র-প্রবেশ, সূত্রও শিববন্দনা করে—

ঃ তীনি নয়ন হর অনুপম বেশ।
দরশনে দুর হোঅ জয়ত কলেশ।।
রজত-ধবল তনু উর ফণিহার।
বসন কয়লভ বাসলিচ্ছাল।।
ছারে ছপাবল অপুনক দেহ।
তেজি রজতাচল পিতৃভবন গেহ।।
ভূপতীন্দ্র কহ অপুরুব বাণী।
পুরহ মনোরথ সহিত ভবানী।।৩১

গানের পর 'পুষ্পাংজলি শ্লোক' নৃত্যপর শঙ্কর ও গৌরীর প্রশস্তি। প্রশস্তি আসলে দিশা—

ঃ নাচয় শংকর গৌরী অরধাংগা ২।। ধ্রু
বিভূতি-ভূষিত-তনু নরশিরহার
শিরহি বিরাজিত গাঙ্গসুধার।।

এ সূত্রের না নটীর নিবেদন—তা উল্লেখিত হয়নি। (নটীর 'নিস্‌সার' বা প্রস্থান আছে, 'পৈসার' অর্থাৎ প্রবেশ নেই।) অতঃপর রাজপ্রশস্তি 'রাজ বর্ণনা' এবং ' দেশ বর্ণনা'। দেশ বর্ণনার পর সূত্রনটী নিস্‌সার-এরপর আছে—

চলোরে ২ কালামা

অর্থ স্পষ্ট নয়, তবে মনে হয় এ প্রস্থানের বচন। কিন্তু 'নিস্‌সারে'র পরই আছে নাট্যারম্ভের গান, এ গানেও দিশা বা ধ্রুবপদ আছে—

ঃ চলুরে চলুরে প্রিয়া অপনে বিচারু হিয়া।। ধ্রু।।
নিদেশ কয়ল নৃপে ভূপতীন্দ্ররাজে
বিদ্যাকুমার ভয় নাচব সুসাজরে।।

এ গান সূত্রনটীর নয়, উপরন্তু তাদের প্রস্থানের পর, গুণসাগরদির প্রবেশপূর্বে গীত। কাজেই এই গানও দোহারের হওয়া যুক্তিসঙ্গত। গুনসাগর নিজেই নিজের পরিচয় গান করে—

ঃ সাগরতুলগুণ গুণক নিধান।
বিদিতভুবনতর কেও নহিআন।।

কলাবতি প্রিয়াসংগে করব প্রবেশ।
অনুপম অচ্ছ মোর, রত্নাপুরি দেশ
নৃপঙ্গভূপতিন্দ্রমল্ল কয়ল বখান।
নীতবিনয়গুণ এহেভূপ জান।।

গানশেষে গুণসাগরাদির প্রস্থান এবং তৎপর গুণসাগরের মুখেই আরও একটি গান—

ঃ আনন্দে জায়ব চলু কলাবতী।। ধ্রু।।
অপন নগরি রহি করব সমাজ
মিলব সুজনগণ ওহে মোর কাজ।।

এ উক্তি গুণসাগরের। কিন্তু 'নিস্‌সারে'র পর কেন? এরপর যজ্ঞানুষ্ঠানের গান-মাত্র দুটি চরণ—

ঃ যাগ করব হাম ঘৃত মধু আনি
পরসনি হোএতি এখনে ভবানি।।[৩২]

তৎক্ষণাৎ 'চণ্ডিকা প্রত্যক্ষ'। অর্থাৎ চণ্ডিকার আগমন। স্পষ্টতই এর মধ্যে আরও নানাবিধ যজ্ঞক্রিয়া ও আনুষঙ্গিক বিষয় ছিল যা উল্লেখিত হয়নি। চণ্ডিকার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি সম্পর্কে বলা যায়, মঞ্চে চণ্ডিকারূপিণীর আর্বিভাব-কার্য 'জমনিকা পট্টের' উম্মোচন দ্বারা সাধিত হয়েছিল।

চণ্ডীর অন্তর্ধান ঘটল, এবার বীরসিংহরাজাদির প্রবেশ। ঠিক একই আঙ্গিকে আত্মপরিচয়দান ও প্রস্থানের পর নিজ নগরে গমনের সংকল্প বিষয়ে একটি গান। দু' ক্ষেত্রে এ ধরনের গান চরিত্রগত বলে ধরে নেয়াই যুক্তিসঙ্গত। এরপর পত্নীর প্রতি কামাকুল গুণসাগরের উক্তি—

ঃ সুনু আবে সুবদনি বাণী
মনে অবধারি।। ধ্রু
কামব্যাকুল মানস মোরা।
বদন সুধাকর দেখিঅ তোরা।।

উত্তরে 'কলাবতি' বলে—

ঃ ভাবন জানো মোয় ক্ষমাহ পরাণ।। ধ্রু।।
কুলবধু হমে নহি চতুরায়ি।
তুঅ গুণমহিমা বরণি ন জায়ি।।

ভুপতীন্দ্র মল্ল ঈ রস ভান।
নহ সন সুন্দর নহিজগ আন।।৩৩

প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি এখানেই।

প্রথম অঙ্কে নান্দীসহ শ্লোক ও গীতের সংখ্যা ষোল। একদিবসের নাট্যাভিনয় প্রদর্শনের জন্য শুধুমাত্র নাট্য নির্দিষ্ট এসকল শ্লোক বা গীত যথেষ্ট নয়। কারণ তার পরিবেশনগত সময়কাল খুবই সংক্ষিপ্ত হবার কথা। এরূপও দেখা যায় যে, চরিত্র মঞ্চে প্রবেশপূর্বক একটিমাত্র গীত পরিবেশন করেই চলে যাচ্ছে। গীতের পৌনপুনিক আবর্তন মঞ্চে পাত্রপাত্রীর অবস্থানকে প্রলম্বিত করত সন্দেহ নেই। কিন্তু এই গীতের আগে ও পরে নিঃসন্দেহে তাৎক্ষণিকভাবে তৈরী সংলাপ ও উপস্থিতমত নাট্যক্রিয়া যুক্ত হত। একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। তৃতীয় অঙ্কে বিদ্যাদি অর্থাৎ বিদ্যা ও সখীগণ মঞ্চে প্রবেশপূর্বক বলে—

ঃ চলুরে খেলি খেলি উপবন সজনী।। ধ্রু।।
তত্য় করব গয় কেলি বিলাস।
দূর জায়ত তাঁহা মনক উদাস।।

তারপর-বিদ্যোক্তি।

এরপর উক্তির পরিবর্তে আছে—

ঃ জলক্রীড়া-বনক্রীড়া

এই নাট্যক্রিয়ার উল্লেখের পরই বিদ্যোক্তি বা বিদ্যার গান—

ঃ সাজনি সরোবরে খেলায়ব রংগে।। ধ্রু।।
মত্তমরাল, বিহার কয়ল জল,
দেখয়িতে ভেল উলাস।
চারু চকই চকবা দুহু তীরহি
করয় কেলি বিলাস।।
জাহি জুহি ফুল সিতরুচি বিকশিত
তোড়ব সব মিলি আজ।
বিশ্বলক্ষ্মিমিপ্রিয় ভূপতীন্দ্র নৃপ
গাবয় রণজিত রাজ।।

গানের পূর্বে জলক্রীড়া—বনক্রীড়ার নাট্যাংশে নিশ্চয় তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি সংলাপ ছিল। সে অংশটুকু লিপিবদ্ধ হয়নি।

আরও একটি বিষয় দেখা যায়, ক্রীড়ার পরে যে-গান, তা নৃত্যের। এ গান মঞ্চস্থিত চরিত্রের সঙ্গে দোহার সহযোগেই গীত হত। এ পরিবেশন-কৌশলও বটে। নৃত্যের মত একটি কঠিন কাজের সঙ্গে রাগভিত্তিক গান পরিবেশন নর্তকী বা অভিনেত্রীর পক্ষে সহজ নয় বলে গানের ধ্রুবপদাংশ দোহার কর্তৃক গীত হত। বাঙলা লীলা প্রভৃতি নাট্যে একালেও এ রীতির প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। এই দৃশ্যে রাক্ষসীর নৃত্যও একইভাবে নিষ্পন্ন হত—

ঃ ঘোরদশন রাক্ষসী, পৈসার।।
পহড়িয়া।। প।।
ঘোর কানন মাঝ জোহ বজায়।
পেট ভরব দুহু বনচর খায়।।
ঘোরদশন রাক্ষসীন অহল যায়।।
মল্লারি।। রঘু।।
ঘোরমুখি সিকার করব মাঝে।। ধ্রু।।
মুদঘোস মৃগ খগ, শূকর মারি কহু,
খায়ব তোহ হম সংগে।
ঘোর বিপিন রহি, উদর পুরীত কয়,
খেলায়ব দুহু মিলি রংগে।।[৩৪]

এ ধরনের অংশগুলোতে মুখোশের ব্যবহার ছিল, এমত ধারণা অসঙ্গত নয়।

কৃষ্ণদেব কৃত 'মহাভারত্' নাটকের অঙ্ক সংখ্যা তেইশ। প্রতি অঙ্কের শুরুতে দিবসক্রম উল্লেখিত, সুতরাং এ নাটক তেইশদিন ধরে অভিনীত হত।

নেপালের 'মহাভারত' নাটকে মধ্যযুগের বাঙলা-মৈথিলি নাট্য-আঙ্গিকের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটেছে বলে মনে করা যায়। মঞ্চায়নের ব্যাপ্তি, মূল কাহিনীর শাখা প্রশাখা ও অজস্র চরিত্রের সমাবেশ প্রভৃতি বিষয় বিচারপূর্বক এ নাটক 'মঞ্চমহাকাব্য' রূপে গৃহীত হতে পারে।

প্রথমে নান্দী শ্লোক, নৃত্যনাথ শিবের প্রশস্তি। এরপর বাঙলায় 'নান্দিমাল' বা 'নান্দিমাল্লব'। এর ধ্রুবাংশ নিম্নরূপ—

ঃ গৌরী-শোভিত তনু ফণিপতি হারে
শশধর-শেখর সুরগণ সারে।।
জয় গিরিজাপতি ঈশ নটেশ।। ধ্রু।।

এরপর আছে—

ঃ শির শোহ নিরমল গঙ্গতরঙ্গে।
নয়ন-অনল-রব দহল অনঙ্গে।।
ত্রিভুবন শরণ প্রথম ভব সংগে।
রজত কুমুদ সম সুন্দর অংগে।।[৩৫]ইত্যাদি

এরপর 'সূত্র প্রবেশ'। সুতরাং পূর্ববর্তী শ্লোক ও নান্দী অংশ দোহার কর্তৃক গীত হত। অতঃপর 'পুষ্পাংজলি শ্লোক' 'পুষ্পাংজলি তান' ও 'সংগীত'। সঙ্গীতে শুধু নৃত্যের বোল আছে সুতরাং তা নৃত্য—

ঃ তাথৈ্য তাতাথৈ জগজগতা তাত ভৃগ থৈ
তাথৈ তাথৈ ততত থৈথৈ থৈথৈ তত তথৈ তা,
ভৃগ থৈ, তথৈ ভৃগতথৈ থৈ
তথৈ তথৈত ভগভথৈ।
ততকৃত ধিম্, তগৃতা, দৃগিতা, তাকৃতা
ততকৃতা, দদ, গিন গিন গিনথো।[৩৬] ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে' গানের অন্তে নৃত্য-সঙ্কেত রূপে মৃদঙ্গের বোল এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

এরপর রাজ বর্ণনা, দেশ বর্ণনা, তদন্তে সূত্রের প্রস্থান। উল্লেখ্য যে, কৃষ্ণদেবের 'মহাভারতে' প্রবেশ অর্থে 'পৈসার' ও প্রস্থান অর্থে 'নিস্‌সার' আছে।

এরপর 'ধৃতরাষ্ট্রাদি সর্ব্বে প্রবেশ' পরিচয়দান ও প্রস্থান, তদন্তে 'পাণ্ডুকুন্তিমাদ্রী'র প্রস্থান। প্রস্থানের পরও দেখা যায় 'পাণ্ডুক্তি' এরপর কুন্তী ও মাদ্রীর উক্তি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রস্থানের পরই পাত্রপাত্রী পুনরায় মঞ্চে প্রবেশ করত।

'নিস্‌সারের' পরই আছে 'বনবিহার'। মাদ্রীকে কামপীড়িত পাণ্ডুর প্রণয় নিবেদন করে—

ঃ প্রিয় তোহে দেয় অধরমধু পান।। ধ্রু।। ইত্যাদি

এরপর কুন্তীমাদ্র্যুক্তি—

ঃ কি কহব তুঅ গুণধাম, নাগর।। ধ্রু।।
তুঅ তুলনা নহি কেও জগ আন।
সুপুরুষ পরম সুজান পরাণ।।
তনুরুচি জীনল সুন্দর কামে।
ভূপতীন্দ্র কহ অতি-অভিরামে।।[৩৭]

'মহাভারত' গীতিরসাশ্রিত নাটক। এর সঙ্গে ধ্রুপদী মহাকাব্যের অতল-গম্ভীর যুদ্ধ-নিনাদিত আবহের কোন তুলনা চলে না।

'মহাভারতে'র নানা লোকনাট্যরূপ সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত। উত্তর ভারতে 'মহাভারতে'র লোককথা গায়েন বা 'পাণ্ডবানি' প্রভৃতি গীতি-নৃত্যমূলক রীতিতে অভিনীত হয়। দাক্ষিণাত্যে 'কথাকলি' 'মহাভারতে'র নৃত্যাভিনয়মূলক উপস্থাপনা। কাজেই লোকজ রীতিতে 'মহাভারতে'র নানা আখ্যান গীত-নৃত্য ও কথার আকারে পরিবেশিত হবার দৃষ্টান্ত প্রায় সমগ্র ভারতেই আছে।

কৃষ্ণদেবের 'মহাভারতে' লোকজ উপাদান নানা চরিত্রের আচার-আচরণ থেকে দৃষ্ট হয়। স্বয়ং কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—

ঃ অর্জুন ত্বরিতে চলহ করব সংগ্রাম আজ।। ধ্রু।।
গাণ্ডিব ধনুরব সুনি কহুআবে।
নৃপগণ করত প্রস্রাবে।।[৩৮]

এ নাটকে 'শ্রীমদ্ভাগবতে' বর্ণিত অর্জুন কর্তৃক কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের প্রসঙ্গ-মাত্র লভ্য। গীতায় বর্ণিত যোগাদির কোনো উল্লেখ নেই। এখানে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলে—

ঃ দেখহ ধনংজয় বিশ্বরূপ আজ।। ধ্রু।।
রবি-শশি-বিধি-হর মোর সরূপ।
বহু বিন আনন অনুরূপ।।[৩৯]

(ধনঞ্জয় তুমি বিশ্বরূপ দেখ।। রবিশশি-ব্রহ্মা-শিব (সকলেই) আমার স্বরূপ। (আমার) বহুবিধ আনন ও অপূর্ব দর্শনরূপ।।)[৪০]

এরপর নেওয়ারী ভাষায় অভিনয় বিবরণ আছে—

ঃ বিশ্বরূপ উমেনং থুং পিং।।

সম্ভবত কৃষ্ণরূপী অভিনেতা মঞ্চে মুখোশ পরিধানপূর্বক এ সময়ে নৃত্য করতেন।

গণেশকৃত 'রামচরিত্র' তিন খণ্ডে বিভক্ত। শেষ খণ্ড অসমাপ্ত বলেই মনে হয়। কারণ এর অন্তে 'মহাভারত-নাটকে'র মত রাজ-প্রশস্তি নেই। 'রামচরিত্রে' বিষ্ণু ও দশরথাদির মঞ্চ প্রবেশ প্রসঙ্গে 'নটভবন' অর্থাৎ রঙ্গালয় (নটন ভবন অবে, দিলেন প্রবেশ।।) ও 'রঙ্গভূমি' (রঙ্গভূমি, দশরথ দিলেন প্রবেশ।।) এর উল্লেখ আছে। এ ছাড়া সেকালে প্রচলিত 'রঙ্গভবন' 'নট্যুক্তি,' 'নটনযুধাম,' 'রংগ' (রঙ্গভূমি অর্থে), নাটক রীতি (জানেন নাটকরীতি অনেক নিধান।।) প্রভৃতি নাট্যপরিভাষার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ধনপতিকৃত 'মাধবানল-কামকন্দলা'র পরিবেশনা 'বিদ্যাবিলাপে'র মতই। এ নাটকের গড়ন ও পরিবেশনারীতি সম্পর্কে নতুন কিছু বলার নেই।

বাংলায় প্রচলিত গোপীচন্দ্র ও ময়নামতির কাহিনী অবলম্বনে নেপালে 'গোপীচন্দ্র-নাটক' রচিত হয়। একই নাটকের দুটি পুথি পাওয়া গেছে। একটি ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দ ও অন্যটি ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে লেখা। এ নাটকের পাত্রপাত্রীর নামও 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে'র অনুরূপ, যেমন- উদুনা, পদুমা, ময়নামতি, গোপীচন্দ্র প্রমুখ।

'নেপালে ভাষা-নাটক' প্রবন্ধ দৃষ্টে এ নাটকের সংলাপ উদ্ধৃত হল—

ঃ কোটোয়াল বলেছেন,-"বঙ্গদেশের অধিপতি মহারাজা গোপীচন্দ্র তার কোটবার কলিঙ্গা নাম অমী আছে।

ভাগিখোর। ভাল কহিলেন। অহে খেতু মহাপাত্র কলিঙ্গা কোটবার আমার এক বচন অবধান করো।

খেতু। সর্ব্বথা।

ভা। সমস্ত লোক বধিয়া দাড়িয়া লুটিয়া আনিয়া এমন কর্ম্ম করিয়া সুখভোগ করিয়া থাকিলো আমার সমান ভাগীখোর নাম না আছে।

খে। সত্য কহিলেন। অহে কলিঙ্গ কোটবার তুমার হমার রাজা গোপীচন্দ্র আছে তার দর্শন করিতে জায়বো চলো"।।[৪১]

নেপালের রাজদরবারে অভিনীত সকল নাটকের প্রারম্ভে নান্দী, সূত্রধার, নটী, রাজপ্রশস্তি, রাজ্য বর্ণনা ও অন্তে স্বস্তিবচন আছে। সংস্কৃত নাটকের এ প্রভাবটুকু বাদ দিলে এ সকল নাটক মূলত গীতি-নৃত্যাশ্রয়ী অর্থাৎ নাটগীত শ্রেণীর। 'ললিতকুবলয়াশ্ব', 'মুদিতকুবলয়াশ্ব', 'গোপীচন্দ্র' নাটকে গদ্য সংলাপের যে পূর্বনির্ধারিত রূপ রচয়িতা দ্বারা নির্দিষ্ট হতে দেখি পরবর্তী কালে তা পরিত্যক্ত হয়। এর কারণও অনুমান করা যায়, মধ্যযুগের বাঙলা-মৈথিলি নাটকে গদ্য মূলত নৃত্যগীতের অনুষঙ্গ হিসাবেই এসেছে, সেজন্যে শিল্পরীতির অনিবার্যতায় তার প্রতিষ্ঠা হয়নি। এ সকল নাটকের গদ্য, পূর্বেই বলা হয়েছে, গীতল এবং গীতিমুখী। এ গদ্য গীত-নৃত্যের ফাঁকে ফাঁকে তাৎক্ষণিকভাবেও তৈরি করা সম্ভব। তাই দেখা যায়, 'বিদ্যাবিলাপ', 'মহাভারত', 'রামচরিত', 'মাধবানল-কামকন্দলা' প্রভৃতি নাটকে স্থায়ী অর্থাৎ পূর্বনির্ধারিত গদ্য সংলাপ রচনার রীতি পরিত্যক্ত হয়েছে।

নেপালের দরবারী নাটকের প্রধান প্রবণতাই ছিল নাট-গান। কাজেই কিছু নাটকে গদ্য-সংলাপ থাকলেও তা নৃত্যগীতের বর্ণনা ও সৌন্দর্যের তুলনায় ম্লান রূপেই প্রতিভাত হয়। ঠিক এ কারণে নেপালের বাঙলা-মৈথিলি নাটকে গীতনাটের ধারাটাই শেষ পর্যন্ত একান্ত নাট্য আঙ্গিকরূপে বিদ্যমান থাকল। বলা যায় বাঙলা নাটকের প্রভাবে তা সরে এল সংস্কৃত নাটকের ধারা থেকে।

আরো বিশদভাবে বলা যায়-বাঙলা- মৈথিলি নাটকের এই আঙ্গিক বাঙলা নাটগীত ও লীলানাট্যের প্রভাবজাত। নেপালের রাজদরবারের নাটকের প্রাণধর্মে লোকরুচির প্রভাব আদ্যন্ত বিদ্যমান ছিল। কেবল আদি ও অন্তে খানিকটা সংস্কৃত নাটকের যে প্রভাব দেখি, তা উপরচাপানো, রাজদরবারের রুচির কারণে। মূলত এ হচ্ছে লীলানাট্যধারার নিকটবর্তী রীতি, যাত্রার পূর্ব সঙ্কেত। সে জন্য সংস্কৃত নাট্যরীতির আপাতঃবন্ধনের ভেতরও এতে গীত-নাটের প্রবাহ অক্ষুণ্ন ছিল। প্রণয়োপাখ্যানের ধারায় (সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) আমরা দেখেছি যে, বাঙলা- মৈথিলি

নাটকের ছাঁচটা বাঙলা নাটগীতের ধারায় ষোড়শ শতকে তৈরি হয়েছিল। নেপালের দরবারী নাটক তাই বাঙলা-নাটগীত দ্বারা অনুপ্রাণিত এরূপ ধারণা যুক্তিসিদ্ধ।

মৈথিলি নাট্যধারায় 'কীর্তনীয়া' নাটকের উদ্ভব চতুর্দশ শতক থেকে। মিথিলায় সংস্কৃত নাট্যরীতি পূর্বেই প্রচলিত ছিল, 'কীর্তনীয়া' তা থেকে ভিন্ন। উড়িষ্যার নৃত্যগীতের ধারায় এ শ্রেণীর নাটের উদ্ভব। বিদ্যাপতির 'গোরক্ষবিজয়নাটক' কীর্তনীয়া নাট্যের প্রথম নিদর্শন।

উমাপতি উপাধ্যায়ের নাটক 'পারিজাতহরণ'। এ নাটকের আদি ও অন্তে 'নাট্যশাস্ত্রে'র অনুগামিতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এর প্রাণধর্মে বাঙলা নাট্যরীতির প্রভাব রয়েছে। উমাপতি তাঁর নাটককে' নবপারিজাতমঙ্গলমভিনয়' বলে উল্লেখ করেছেন।[৪২] এর সঙ্গে জয়দেবের উক্তির মিল আছে। সামোদ-দামোদর খণ্ডের পঁচিশ সংখ্যক শ্লোকে আছে—

ঃ শ্রীজয়দেব কবেরিদং কুরুত মুদম।
মঙ্গলমুজ্জ্বলম গীতম।

সংস্কৃত নাটকের মত 'পারিজাতহরণে' বিদূষক আছে। এ নাটকের আঙ্গিক ও পরিবেশনারীতি বাঙলা-মৈথিলি নাটকের মতই। তবে কীর্তনীয়া নাটকে চরিত্র সংখ্যা অল্প। সূত্রধর, নটী, নায়ক-নায়িকা ব্যতীত আছে সখী, বিদূষক ও নারদ। কীর্তনীয়া নাটক মূলত গীত-নৃত্যাশ্রয়ী। নির্দিষ্ট কোন দেব-দেবীর বন্দনার পরিবর্তে এক এক কীর্তনীয়া নাটকে এক এক দেবদেবীর বন্দনা পাওয়া যায়। লক্ষণীয় যে নেপালের বাঙলা-মৈথিলি নাটকে শিব বা অর্ধনারীশ্বর শিবের বন্দনা সর্বত্র লভ্য।

'পারিজাতহরণ' নাটকের প্রথমে আছে 'মঙ্গলাচরণ', এর বিষয় 'মহিষাসুর-মর্দিনী' এবং মধুকৈটভ-মর্দিনী'র স্তুতি। এরপর নান্দী—সংস্কৃত ভাষায় যথারীতি সূত্রধার কর্তৃক নটীকে আহ্বান। নাটকের অন্তে স্বস্তিবচন।বাঙলা-মৈথিলি নাটকের মত 'পারিজাতহরণে' পাত্রপাত্রী প্রবেশক্রমে আত্মপরিচয়দান করে। কীর্তনীয়া 'গীতিধর্মী নাটক' রূপেও আখ্যাত হয়েছে।[৪৩]

মিথিলার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কীর্তনীয়া নাটক 'আনন্দবিজয় (রামদাস ঝা)', 'নলচরিত নাটক (গোবিন্দ)' রুক্মিণীহরণ (রমাপতি উপাধ্যায়)', 'গৌরীস্বয়ম্বর (লালকবি)', 'শ্রীকৃষ্ণকেলিমালা (নন্দীপতি)' প্রভৃতি।

মধ্যযুগে ওড়িয়া ভাষায় কোন নাটকের লেখ্যরূপ দৃষ্ট হয় না। প্রধানত মৌখিক রীতিতে যাত্রা, চম্পু ও লীলা এই ত্রিবিধ নাট্যরীতি সে অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। উড়িষ্যায় পঞ্চদশ শতকেও নাট্যরূপে যাত্রার সাক্ষাত পাওয়া যায় না। প্রধানত 'লীলা' এবং হাস্যরসাত্মক 'সুয়াঙ্গ' অবলম্বনে উড়িষ্যায় যাত্রার নাট্য আঙ্গিক গঠিত হয়। সে দেশের লীলানাট্য যে বাঙলা লীলানাট্যের প্রভাবজাত, সন্দেহ নেই।

উড়িষ্যার প্রাচীন লোকনাট্যের মধ্যে রয়েছে 'গোটা পুআ নাট'-অর্থাৎ এক 'পোয়া' বা বালকের নাচ। এ ছাড়া 'কেলা-কেলুনী নাট', 'ধোপাধোপানী নাট'ও পরবর্তী কালে দেখা যায়। বলাবাহুল্য সুয়াঙ্গ পরবর্তী যুগের নাট্যরীতি।[88] উনিশ শতকে বাঙলা যাত্রায় মেথর-মেথরাণী প্রভৃতি আদি রসাত্মক ভাঁড়ামির প্রচলন ছিল। এর সঙ্গে সুয়াঙ্গের নৈকট্য আছে।

উড়িষ্যার কবি সার্বভৌমেন রামানন্দ রায়ের 'জগন্নাথবল্লভনাটক' চৈতন্যদেবের ভক্তিধর্ম প্রভাবজাত। নাটকটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত কৃষ্ণলীলা। এ নাটক যে লীলানাট্যের অনুপ্রেরণায় রচিত তা কবির উক্তি থেকে অনুধাবন করা যায়—

ঃ মধুরিপুপদলীলাশালি-তত্তদ্‌গুণান্যং
সহৃদয়-হৃদয়ানাং কামমামোদহেতুম্‌।[8৫]

এতে জয়দেবের বাচনভঙ্গির প্রভাব সুস্পষ্ট।

অন্তে ভরতবাক্যে কবি তাঁর নাটককে 'গোপাললীলা' ও 'লীলামৃত' নামে অভিহিত করেছেন—

ঃ শ্রদ্ধাবদ্ধমতির্মম প্রতিদিনং গোপাল লীলাস্যয়
সংসেবত রহস্যমেতদতুলং লীলামৃতং লোলধা।[8৬]

'জগন্নাথবল্লভ নাটকে'র অঙ্ক সংখ্যা পাঁচ। সংস্কৃত নাটকের মত এতে প্রথমে দেব বন্দনা, রাজবন্দনা ও নান্দী। নান্দ্যন্তে সূত্রধার ও নটী সংশ্লিষ্ট রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রশস্তি এবং নাটকের মূল ভাব ব্যক্ত করে।

এর একপর্যায়ে নেপথ্য থেকে মূল নাটকের দৃশ্য বিবরণ গীত হয়। সূত্রধার এ গানের পর প্রস্থান করে, অতঃপর আছে কৃষ্ণের প্রবেশ।

এ নাটকের যে- যে স্থলে রামানন্দরায় প্রকৃতি বা শৃঙ্গার বিষয়ে বর্ণনার অবতারণা করেছেন, সে-সকল স্থলে 'গীতগোবিন্দের' ভাষার নিকট-অনুরণন অনুভূত হয়—

ঃ মৃদুল-মলয়জ-পবন-তরলিত-চিকুর-পরিগত-কলাপকর।
সাচি-তরলিত নয়ন-মন্মথ শঙ্কু-সঙ্কুল-চিত্তসুন্দরী
জন-জনিত কৌতুমকম্।।
মনসিজ কেলি নন্দিত-মানসম।
ভজতু মধুরিপুমিন্দুসুন্দর বল্লরীমুখ লালসম্।। ধ্রু।।[৪৭]

অন্যত্র—

বিদলিত-সরসিজ-দলয়ে শয়নে
বারিত সকল সখীজন নয়নে।।
বশতি মনো সম সত্বর বচনে
পূরয় কামমিমং শশিবদনে।। ধ্রু।।
অভিনব-বিশ-কিসলয়য়ে বলয়ে
মলয়জরস-পরিষেবিত-নিলয়ে।।
সুখয়তু রুদ্র গজাধিপ-চিত্তম।।
রামানন্দ রায় কবি ভণিতম।।[৪৮]

শুধু জয়দেব নয়, এতে সমকালীন বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতার অনুসৃতিও বিদ্যমান। পদসমূহে ধুয়ার পৌনপুনিক ব্যবহার থেকে দেখা যায় এ নাটকে দোহার ছিল। 'জগন্নাথবল্লভ নাটকে' সূত্রনটী ব্যতিরেকে সংস্কৃত নাটকের মত দূতী, বিদূষক প্রভৃতি চরিত্র আছে। তা সত্ত্বেও বলা যায় সংস্কৃত নাটকের প্রাণধর্ম এতে রক্ষিত হয়নি। শ্লোক-পদ-গীতের সংখ্যাধিক্যের কারণে, শেষ পর্যন্ত 'সঙ্গীত নাটক' রূপেই 'জগন্নাথবল্লভ' বিচার্য। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' জগন্নাথবল্লভ নাটক' 'নাটক-গীত' রূপে উল্লেখিত হয়েছে। 'জগন্নাথবল্লভে'র পরিস্থিতি ব্যাখ্যায় বা ঘটনার অগ্রগতিতে সংলাপের চেয়ে শ্লোক ও গীতের ভূমিকাই মুখ্য। উপরন্তু এতে কথোপকথনের ব্যাপ্তি নাতিদীর্ঘ, প্রায়শই সংলাপের বিষয়, শ্লোক বা গীতে পরিণতি লাভ করে। আবার বহুস্থলে এও দেখা যায়, শ্লোক বা গীতাকারে যা বলা হল সংলাপে তারই রেশ বয়ে চলেছে। এর উল্টোটাও আছে—সংলাপের মূল ভাবটি কখনও কখনও গীতে-পদে ব্যক্ত হয়েছে। এদিক থেকে পরবর্তী কালে রচিত

বাঙলা- মৈথিলি নাটকের সঙ্গে রামানন্দরায়ের নাট্যকৌশলের সাদৃশ্য দেখা যায়। এ হচ্ছে ক্ষুদ্রয়াতন 'সঙ্গীতনাটক'।

'জগন্নাথবল্লভ' নাটক চৈতন্যদেবের প্রিয় গ্রন্থ ছিল। তিনি রামানন্দরায়ের এই 'নাটক-গীতি'র পাঠ শ্রবণ করতেন পুরীতে, তাঁর গম্ভীরার প্রকোষ্ঠে। সুতরাং এ নাটক 'পাঠ্য-নাটক' হিসাবেও সেকালে গৃহীত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের প্রশস্তি না থাকায় মনে করা হয় যে, রামানন্দ এ নাটক চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বেই রচনা করেছিলেন।

'জগন্নাথবল্লভ' নাটক রাজা প্রতাপরুদ্রের 'পৃষ্ঠপোষকতায়' বহুবার অভিনীত হয়েছিল।[৪৯] স্বয়ং নাট্যকার এ নাটকের নির্দেশক ছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র অন্ত্যলীলা 'পঞ্চম পরিচ্ছেদে' সেবক মুখে দুই তরুণী সেবাদাসীকে রামানন্দরায় কর্তৃক লাস্যাভিনয় শিক্ষাদান প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে-

ঃ দুই দেবকন্যা হয় পরম সুন্দরী।
নৃত্য-গীতে নিপুণতা বয়সে কিশোরী।।
তাহা দোঁহা লঞা বায় নিভৃতে উদ্যানে।
নিজ নাটক-গীতের গান শিখায় নর্তনে।।

নিজের 'নাটক-গীত' এখানে 'জগন্নাথবল্লভ নাটক'। এ নাট্যাভিনয়ে গীতের সঙ্গে নৃত্য ছিল উদ্ধৃত পদদৃষ্টে তারও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' আছে—

ঃ তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইল।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল।।

রামানন্দরায় 'গীতের গূঢ় অর্থ' অভিনয় শিক্ষা দিয়েছেন এবং তা নাট্য-শাস্ত্রসম্মত—

ঃ সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়ী ভাবের লক্ষণ।
মুখ নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন।।
ভাব প্রকটন লাস্য রায় যে শিক্ষায়।
জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট দেখায়।

দেখা যাচ্ছে জগন্নাথ অর্থাৎ কৃষ্ণের সম্মুখেই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এই দুই সেবাদাসী নৃত্যাভিনয় করেছিল। তাতে এমত ধারণা করা যায় যে, এর মধ্যে একজন রাধা

অন্যজন সহচরী মদনিকার ভূমিকায় 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকে অভিনয় করত। 'জগন্নাথবল্লভ নাটক' ক্ষুদ্রায়তন সঙ্গীত নাটক' হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে।[৫০]

পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, জগন্নাথবল্লভ' নাটকের বহিরঙ্গ সংস্কৃত নাট্যরীতি দ্বারা প্রভাবিত হলেও এর অন্তরধর্মের যোগ বাঙলা নাট্যরীতি—আরও বিশদভাবে বলতে গেলে, বাঙালি কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র সঙ্গে।

দ্বাদশ শতকে আসামে 'গোপীচন্দর গীত' ও 'মীনাবতীর গীত' প্রচলিত ছিল। একালে 'জনাগাভরুর গীত'ও রচিত হয়েছিল। এর কাহিনী হচ্ছে গরুবাট রাজ্যের রাজকুমারীর সঙ্গে রাজকুমার গোপীচন্দ্রের সখী কলিমনের প্রেমকাহিনী।[৫১] খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে অসমীয় ভাষায় 'রামায়ণে'র অনুবাদ করেন মাধবকন্দলী। 'রামায়ণে'র নানা কাহিনী নৃত্য-গীত ও ব্যাখ্যা সহকারে সেকালে পরিবেশিত হত। মধ্যযুগের গোড়াতে শাক্ত সমাজে 'চণ্ডীর গীত' প্রচলিত হয়। বাংলাদেশের ধর্ম ঠাকুর আসামে 'ত্রিনাথ' রূপে পূজিত। ত্রিনাথ হচ্ছেন বৌদ্ধ 'ত্রিরত্ন'। কিন্তু সে অঞ্চলে তিনি হিন্দুদের দ্বারাও পূজিত। ত্রিনাথকে নিয়ে 'ত্রিনাথর গীত' রচিত হয়েছিল।[৫২] চতুর্দশ শতকের পরে বৌদ্ধ 'হারিতী দেবী' আসামে বসন্ত মহামারী নিবারণকারিণী দেবী 'আইনামে' রূপান্তরিত হন।[৫৩] মনসামঙ্গলের গীত আসামে 'মারৈগীত'। এ শ্রেণীর গীত ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। বাঙালি কবি নারায়ণদেব আসামে 'সুকন্নানী' নামে পরিচিত এবং মারৈপূজায় তাঁর গীত গাওয়া হয়। কৃত্যমূলক নৃত্য-গীত ছাড়াও প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার প্রভাবে আসামে প্রণয়গীতির প্রচলন হয়। মধ্যযুগে আসামে 'কুলকোওঁরর গীত' 'মণিকোওঁরর গীত' ও কাছাড় অঞ্চলে' 'মদনকোওঁরের গীত' প্রচলিত ছিল। এ সকল গীত চতুর্দশ শতক থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়কালে রচিত বলে মনে করা হয়। এ ছাড়া 'হালোয়াগীত' 'নাওখেলোরা গীত', 'গরখীয়া গীত', 'লরানিচুকোরা গীত', এতদঞ্চলে আদিকাল থেকে প্রচলিত আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৪]

আসামে রুক্মিণীহরণ বিষয়ক গীত 'আইন গীত' নামে পরিচিত। এ গীতের রচয়িতা 'পীতাম্বর দ্বিজ'। 'মহখোদোয়া গীত' নামে অন্য একপ্রকার গীতের প্রচলন আছে, অঘ্রাণমাসের পূর্ণিমায় তা পরিবেশিত হয়। সিলেট অঞ্চলে অনুরূপ গান 'সারি' নামে পরিচিত।[৫৫] সংবাদ পরিবেশনের জন্য উড়িষ্যার রামহরিবর্মদেবের বাঙালি মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট 'ভাটরগীত' বা 'ভাটের গীত' প্রচলন করেন। এ ছাড়া

আসামে গীত-নৃত্য-নাটের আধারে 'ধামালি গীত' 'জারিগীত', 'ঢপ কীর্তন', 'ঢপযাত্রা', 'গাজীর গীত', 'মণিপুরী রাস', 'খুবাই-ঈশাই', 'মারৈ গীত' পরিবেশিত হয়। ধামালি গীতের পরিবেশিনারীতি বাংলাদেশ ও আসামে অভিন্ন। মূলত এ গীত সিলেট থেকে কাছাড় অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। কারণ আসামের ধামালিও গীত-তাল-নৃত্যের সমন্বিত রূপ-

ঃ ছিলট কাছার অঞ্চলত তিরুতা সকলে বিয়া, পূজা আদি উৎসবর সময়ত দলবান্ধি চক্রাকারত ঘুরি ঘুরি হাত চাপরি বজাই গীত গায়। ধামালি এটা তাল, ছিলট কাছারর ধামালি গীতর তালো ধামালি।

'জারিগীত' একান্তভাবেই মুসলমানদের কৃত্যমূলক নাট্যগীত। বাংলাদেশে বিশেষত মৈমনসিংহ অঞ্চল থেকেই জারি আসামে বিস্তার লাভ করে। এর পরিবেশনারীতি সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আসামে জারিগানের উপস্থাপনা শোভাযাত্রামূলক। বাংলাদেশে জারি শোভাযাত্রা ব্যতিরেকেও আসরকেন্দ্রিক নৃত্যগীত রূপে পরিবেশিত হয়। আসামে—'ওজাই পদ গাই আরু পালিবিলাকে (অর্থাৎ দোহার দল) পিচে পিচে গাই আরু লগে লগে বুক চাপরিয়াই।'[৫৬]

আসামে 'ভাওনা' বা ভাবনা গানের ধারায় 'ঢপকীর্তন' নাট্যমূলক রীতি। এতে অভিনেতা-সকল সাজসজ্জা গ্রহণপূর্বক পদগানের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি সহকারে নৃত্য-পরিবেশন করে। 'ওজা' বা প্রধান গায়েন, সূত্রধার রূপে গানের ব্যাখ্যা করে দর্শকদের কাহিনীর খেই ধরিয়ে দেন। আসামের ঢপ যাত্রাও মৈমনসিংহে প্রচলিত গীতিভিনয়ের অনুসৃতি। সচরাচর গীতে অংশগ্রহণকারীরা সাজগোজ ছাড়াই এই প্রেমকাহিনীমূলক-গীতিকা অভিনয় করে। একজন প্রধান গায়েন নৃত্যগীতের মাধ্যমে ভাব এবং রস সৃষ্টি করেন। অসমীয় গীতিকার প্রধান অভিনেতা বা গায়েন 'চরকার' (সরকার) নামে পরিচিত। আসামের গোয়ালপাড়া জেলার মানকাচর, কালাপানী অঞ্চলে 'ঢপ যাত্রা'র প্রচলন দৃষ্ট হয়।

গাজীর গান আসামে 'গাজীর গীত' নামে পরিচিত। এ হচ্ছে রাজকুমার-রাজকুমারীর প্রেম ও 'ভৌতিক কাহিনী'র গীতাভিনয় (গাজীর গান সম্পর্কে পূর্বেকৃত আলোচনা দৃষ্টব্য) আসামে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল যেমন সিলেট কাছাড় জৈন্তা অঞ্চলে 'গাজীর গীত' প্রচলিত আছে। আসামের 'গাজীর গীতে' 'ওজা' গাজী রূপেই গান পরিবেশন করে।

'মণিপুরী রাস' মূলত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়াখ্যান অবলম্বনে পরিবেশিত হয়। এতে সূত্রধার' নাচে তাথৈ তাথৈ' বোল ধরে এবং তা শুনে কৃষ্ণ নৃত্যারম্ভ করেন। এ নাট্যে একজন বা দুজন মেয়ে আসরের এককোণে বসে কাহিনীমূলক গীত পরিবেশন করে। তাদের গানের সঙ্গে সঙ্গে 'ভাওরীয়াই' বা অভিনেতার 'ভাব' প্রদর্শন শুরু হয়। কৃষ্ণ বিষয়ক লোকনাট্যের ধারায় অন্যবিধ রীতি 'খুবাই-ঈশাই'। এতে গায়করা দু'দলে বিভক্ত হয়ে একদল অক্রূর ও অন্যদল গোপিনীর ভূমিকা গ্রহণ করে। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরা নিয়ে যাবে, গোপিনীবেশী গায়করা তার বিরুদ্ধাচরণ করে।[৫৭] এতদ্ব্যতীত আসামের 'বিহুনাচ' ও 'বিহুগীত' নৃত্যগীতমূলক পরিবেশনা। ফসল বোনার সময় ছেলে-বুড়ো পুরুষ-নারী সবাই মিলে উর্বরতা বৃদ্ধির কামনায় আদিরসাত্মক নৃত্যগীত করে। এতে জমির ফসল বাড়বে, এই আদিম বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা যায়।

মণিপুরী 'লাইহারোবা' নৃত্য নারীদের যৌন-উদ্দীপনমূলক অনুষ্ঠান। এতে বর্ষণ ও বজ্রের দেবতা সন্তুষ্ট হন বলে বিশ্বাস। এ ছাড়া শস্যে পোকামাকড়ের উপদ্রব হলে অথবা অনাবৃষ্টিতে 'লাইহারোবা' নৃত্য পরিবেশিত হয়।

দ্বাদশ শতকে রচিত কামরূপের 'কালিকাপুরাণে' আছে যে 'উগ্রচণ্ডী' বিসর্জন দিয়ে 'দেবধনীগণ' 'ভগ-লিঙ্গ বাচক' অশ্লীল শব্দ প্রয়োগে নৃত্যগীতপূর্বক একত্রে গ্রাম প্রদক্ষিণ করত। 'কুমারী', 'বেশ্যা', 'নর্তকী-গণকে' 'দেবধনী' বলা হয়। সারা বছরের শুভ-অশুভ মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয়ের দায়িত্ব তাদের। আসামে কৃষিজীবীদের বিশ্বাস পোকামাকড় আক্রান্ত শস্যক্ষেত্রে নগ্ন-স্ত্রীলোক প্রদক্ষিণ করলে পোকামাকড় অন্তর্হিত হয়।

মন্দিরে নিবেদিত কিশোরী সেবাদাসী 'নাট্যশাস্ত্র' অনুযায়ী নৃত্য করত। আসামের মন্দিরে 'সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর' কিশোরী 'দেবধনী' হিসাবে গৃহীত হত।[৫৮]

আসামে 'মারৈ গীতে'র উপস্থাপনা এদেশে প্রচলিত গাজীর গানের মত। এতে সহকারী হিসাবে একজন সঙ্গী (এদেশে সচরাচর বায়েন) ওঝার সঙ্গে উক্তি-প্রত্যুক্তি বা বাদানুবাদ করে। এই সহকারী বা সঙ্গী বাঙলায় 'ঠেটা' নামে পরিচিত।

'পটচিত্র' বা 'চিত্রনাট' আসামে 'চিহ্ন-যাত্রা' হিসাবে পরিচিত। পঞ্চদশ শতকে শঙ্করদেব একজন পশ্চিমা সন্ন্যাসীর সহায়তায় হিঙ্গুল, হরিতাল প্রভৃতি রং দিয়ে সপ্তস্বর্গের 'এখন পট' অর্থাৎ একখানা পট অঙ্কন করেছিলেন।[৫৯] এ থেকে কেউ কেউ মনে করেন যে, শঙ্করদেব 'চিহ্ন যাত্রা' নামে চিত্রনাটের আঙ্গিকে একখানি

নাটকও রচনা করেন। কিন্তু তার সন্ধান পাওয়া যায় না। রামচরণ ঠাকুরের 'শঙ্করচরিতে' আছে—

ঃ এহি মতে পটে যবে নাট লিখিলন্ত।

এ থেকে চিত্রনাটকে 'পটনাট'ও বলা যায়।

চিত্রনাট হচ্ছে, কাপড়ে বা কাগজে আঁকা চিত্রের সঞ্চালন বা আবর্তনের মাধ্যমে চিত্র প্রদর্শন এবং গায়েন কর্তৃক নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে সেগুলোর পারম্পর্যময় ব্যাখ্যা দান। সমগ্র কাহিনীর খণ্ডাংশ অবলম্বনপূর্বক তা পরিবেশিত হয়। শঙ্করদেব নিজে এই 'পটনাটে' অভিনয় করেছিলেন—

ঃ পটর যে অংশত অনন্তশায়ী বিষ্ণুর চিত্র আছিল, সেই অংশত শঙ্করদেবে নিজে বিষ্ণু সাজি বহিছিল, গরুড়র মুখা পিন্ধি সর্ব্বজয় গরুড় সাজি উপস্থিত হঁওতে শঙ্করদেবে জাপমারি তার পিঠিত উঠিছিল।

এমন ভাবেরে কোনোবাই ব্রহ্মার মুখা পিন্ধি, কোনোবাই শিবর মুখা পিন্ধি বৈকুণ্ঠের দেবতা সকলর ভাও দেখুবাই ছিল। পিচত দেখ গ'ল লক্ষ্মী ভাও দেখুওবা হোবা নাই, তেতিয়া 'শঙ্করে বোলন্ত ভাই শুনহ বচন। স্ত্রী কাচোক চাই আনা লোক ছয়জন'। তেতিয়া লরালরিকৈ সর্ব্বজয়ে গরুড় মুখা এরি তিরুতার সাজ পিন্ধি লক্ষ্মী সাজিলে, তার পিচত বলরাম, শ্রীরামগুরু, কম্বলধরা, রঘুপতি রজকর পুত্র চিদা, মথুরার পুত্র হরিধনকো তিরুতার সাজ পিন্ধাই লক্ষ্মী সাজোবা হল।[৬০]

'চিহ্নযাত্রা' অর্থাৎ চিত্রনাটে শঙ্করদেবের এই অভিনয়ের সঙ্গে চৈতন্যদেবের মুরারিগুপ্তের স্কন্ধে আরোহণের ঘটনাটি হুবহু মিলে যায়। চৈতন্যদেব 'গরুড় গরুড়' বলে আহবান জানালেন, 'গুপ্তদেহে' তখন 'বৈনতেয়-ভাব' এল। তিনি বললেন 'মুঞি সে গরুড় মহাভাগ'—

ঃ প্রভু বোলে বেটা তুঞি মোহর বাহন।
হয় হয় হয় গুপ্ত বলয়ে বচন।
গুপ্ত স্কন্ধে চড়ে প্রভু মিশ্রের নন্দন।।
জয় জয় ধ্বনি হৈল শ্রীবাস ভবন।।

শঙ্করদেবের 'পটনাটের' বিবরণ থেকে দেখা যায়, এতে মুখোশ ব্যবহৃত হত। এই নাটের বিষয় ছিল স্বর্গদেবতাদের ভাবভঙ্গিমা প্রদর্শন। উপরন্তু পুরুষরা 'স্ত্রী কাচে' নারীবেশ গ্রহণ করত চিহ্নযাত্রায়।

শঙ্করদেব রচিত চিহ্নযাত্রা 'চিহ্নী-যাত্রা' নামেও পরিচিত। এই অনুষ্ঠানে 'মহতা' অর্থাৎ নানা রঙের সঙ্গে গন্ধকাদি সুচারুভাবে পেষণপূর্বক প্রস্তুত মশাল জ্বালানো হত। এতে রাতকে দিনের মত উজ্জ্বল দেখাতো বলে জনশ্রুতি আছে। শঙ্করদেবের চিহ্ন-যাত্রার অভিনয় দৃষ্টে বলা যায় এর কোনো লেখ্যরূপ না থাকারই কথা।

'ভাবনা' বা 'ভাওনা' দেবভক্তিমূলক নাট্যাভিনয়। এর অর্থ 'ধ্যান'। তবে 'বিকট অঙ্গভঙ্গি' বা সাধারণ অভিনয় অর্থেও শঙ্করদেবের 'রুক্মিণীহরণে' এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। আসামের অন্যান্য উক্তি বা কৃত্যমূলক নাটক 'ভাওনা' হলেও মূলত পৌরাণিক কৃষ্ণলীলা বিষয়ক অভিনয়ই 'ভাওনা'। এতে কৃষ্ণবেশী অভিনেতা, একজন সাধারণ-অভিনেতা মাত্র নন। তিনি পূজ্য কৃষ্ণরূপেই আসরে গৃহীত হন। আসরে কৃষ্ণের প্রবেশের সাথে সাথে তাই সকলে তাঁর উদ্দেশ্যে আভূমি মস্তকন্যাস করে।

আসামে বৈষ্ণব ভক্তিবাদের নবতর প্রবাহে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নাট্যের উদ্ভব ঘটে। রাম, বিষ্ণুর অংশ হিসাবে অভিন্ন রামকৃষ্ণে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে কৃষ্ণলীলার ধারায় নাট্যে রামলীলা প্রসঙ্গও লভ্য। এ শ্রেণীর নাট্যের মুখ্য উদগাতা 'মহাপুরুষ শঙ্করদেব'। তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে আছে- 'কালিয়দমন নাট' (আনুমানিক ১৫১৮ খ্রীঃ) 'পত্নীপ্রসাদ' (আনুমানিক ১৫২১ খ্রীঃ) 'রাসক্রীড়া' বা 'কেলিগোপাল নাট' (১৫৪০ খ্রীঃ)[৬১], 'রুক্মিণীহরণ' (আনুমানিক ১৫৬০ খ্রীঃ)[৬২] 'পারিজাতহরণ' ও 'রামবিজয়'।

শঙ্করদেবের শিষ্য মাধবদেবও কৃষ্ণের বাল্যলীলা বিষয়ক ভাগবতপুরাণের কাহিনী অবলম্বনে 'চোরধরা', 'পিম্পরাগুচুভা', 'কোটরাখেলোভা', 'ভূষণ-হোরাভা', 'ভূমিলুটিভা' প্রভৃতি লীলানাট রচনা করেন। এ ধারায় গোপালদেব রচিত 'জন্মযাত্রা-নাট' ও পুরুষোত্তম ঠাকুর রচিত 'কংসবধ'ও উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে শঙ্করদেবের এসকল নাটক 'অঙ্কিয়া-নাট' রূপে আখ্যাত হয়েছে।

কারো কারো মতে সংস্কৃত অঙ্ক থেকে 'অঙ্কিয়া' কথাটার উদ্ভব।[৬৩] 'অঙ্ক' এই শব্দের সঙ্গে 'ইয়ার আছে এই অর্থে' 'ঈয়া' প্রত্যয় যোগে 'অঙ্কীয়া'। কিন্তু আঙ্গিকগত বিচারে দেখা যায়, অঙ্কিয়া সংস্কৃত এক অঙ্কবিশিষ্ট রূপক বা উপরূপকের মত নয়। কাজেই সংস্কৃত নাটকের মত 'সূত্রধার' এবং স্বস্তিবচন রূপে অন্তে 'ভটিমা' থাকলেও অসমীয় অঙ্কিয়ার উদ্ভব সংস্কৃত নাটক থেকে হয়নি। অবশ্য

এখানে মনে রাখা দরকার যে, প্রাচীনকালে কামরূপে সংস্কৃত নাটকের চর্চা ছিল। কাজেই এতদঞ্চলে 'অঙ্ক' শব্দটি অজানিত থাকার কথা নয়।

এরূপ মতও দৃষ্ট হয় যে—পুরাণের নানা উপাখ্যান থেকে একটি মাত্র কাহিনী গৃহীত হয়েছে বলে 'এক অঙ্ক' অর্থে অঙ্কিয়া কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে। এমত ধারণার মধ্যে এই শ্রেণীর লীলানাট্যের খানিকটা আঙ্গিকগত পরিচয় আছে বটে কিন্তু সে জন্য কেন এই শ্রেণীর লীলানাট 'অঙ্কিয়া' নামে আখ্যাত হবে তার কোন যুক্তি নেই।

শঙ্করদেবের পরবর্তীকালে দ্বিজ রামানন্দের 'গুরু চরিত্র', রামচরণ ঠাকুরের 'শঙ্কর চরিত' ও পূর্ণানন্দের 'গোপালদেবের চরিত্র' পুথিতে নাটক অর্থে 'অঙ্ক' কথাটা উল্লেখিত হয়েছে।[৬৪]

রামচরণ ঠাকুর শঙ্করদেবের চিহ্ন-যাত্রার বিবরণ প্রসঙ্গে বলেছেন—

ঃ বৈকুণ্ঠ নগর পটতে লেখিয়া
অঙ্ক করিলেন্ত তার।।
ধেমালির ঘোষা প্রথমে লেখিলা
দ্বিতীয় শ্লোক রচিলা।
সূত্র ভট্টীমাক গীততে করিলা
চিন সব বিভাগিলা।।
গীত সূত্রনাট সমস্তে করিয়া
যেবে সাঙ্গ করিলন্ত।
ভুঞাসবে রভা ঘর সাজি যেবে
শঙ্করত জনাইলন্ত।।[৬৫]

এখানে 'অঙ্ক' অভিনয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্ধৃতাংশে 'নাট' কথাটা নৃত্য ও নাটক অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। 'অঙ্ক' নাটক অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। 'গুরু-চরিত্রে' আছে—

ঃ রামর বিবাহ কথা সীতা স্বয়ম্বর।
অঙ্কক লিখিলা তৈত শ্রীমন্ত শঙ্কর।।

পূর্ণানন্দ 'গোপালদেবের চরিত্রে' অভিনয় অর্থেই 'অঙ্ক' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন—

ঃ বাপ অঙ্ক করায়োক সবহি দেখুক।[৬৬]

কাজেই অঙ্ক থেকে অঙ্কিয়া শব্দের উদ্ভব এতে কোন সন্দেহ নেই।

'সূত্রে'র ভকত ও ভাবরীয়াগণ ব্রজবুলিতে রচিত নাটক মাত্রকেই 'অঙ্কীয়া-নাট' নামে অভিহিত করে।৬৭

'অঙ্ক' বাঙলা 'নাট'এর মতই নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাঙলায় 'নাট' বলতে নৃত্য, নাটক ও অভিনয়কে বুঝায়। 'অঙ্কিয়ার' ক্ষেত্রেও দেখা যায় শব্দটি নাটক ও অভিনয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই 'অঙ্কিয়া' কথাটি নাটক ও অভিনেতা প্রভৃতি অর্থে গ্রহণযোগ্য। অঙ্কিয়ার সঙ্গে নাট যুক্ত হবার ফলে তা নাটক এবং নৃত্যেরও সমার্থক। 'তুংখুঙ্গীয়া বুরঞ্জী'তে (সূর্যভূঞা-১৭৭ পৃঃ) আছে—

ঃ ১৭২৭ শঙ্কর ফাল্গুন মাসের ১৮ যাওঁতে রঁ আজ্ঞারে বারেঘরীয়া মহন্তে দোলঘরয়া চৌবার কোষত চারিদিনীয়াকৈ 'রুক্মিণীহরণ' ভাওনা করিলে- অঙ্কর মতে। ৬৮

এখানে 'অঙ্কর মতে'র অর্থ 'পৌরাণিক কাহিনীর অনুসারে' ধরে নেয়া যুক্তিসঙ্গত।

প্রসঙ্গত বলা যায় চৈতন্যদেবের অঙ্কের বিধানে নৃত্যও সংস্কৃত 'অঙ্ক' নয় অভিনয় অর্থে গ্রহণযোগ্য। কাজেই 'অঙ্কিয়া নাট', 'অভিনয়' ও 'অভিনেয় নাটক' ও কাহিনী অর্থে গ্রহণই যুক্তিযুক্ত।

উল্লেখ্য যে, শঙ্করদেব তাঁর নাটককে কোথাও 'অঙ্কিয়া' বলে উল্লেখ করেনি। অন্যদিকে, 'কালিয়দমন' ও 'রুক্মিণীহরণ' নাটক দৃষ্টে বলা যায়, পরবর্তীকালে অঙ্কীয়া নামে অভিহিত হলেও এগুলো মূলত লীলানাটক।

শঙ্করদেব রচিত লীলানাট্যের অঙ্গ পাঁচটি। যথা-(ক) নান্দী-শ্লোক বা শ্লোক (খ) ভটিমা (গ) গদ্য সংলাপ বা গদ্যে উক্তি প্রত্যুক্তি (ঘ) গীত (ঙ) পয়ার।

'কালিয়দমন-নাট'দৃষ্টে উল্লেখিত অঙ্গসমূহের পরিচয় দেয়া হল—

(ক) নান্দী শ্লোক হচ্ছে, সূত্রধারের নৃত্য সহকারে প্রবেশ। এতে আছে কৃষ্ণের প্রশস্তি—

ঃ মেঘশ্যামলমূর্তিমায়ত মহাবাহুং মহোবসস্থল
মারক্তায়ত কঞ্জলোচনযুগং পীতাম্বর সুন্দরম-ইত্যাদি

সূত্রধর এই শ্লোক সমুদ্রা পরিবেশন করে। তারপর সূত্রধারের সামাজিকগণ অর্থাৎ দর্শক সম্বোধন—

ঃ ভো ভো সামাজিকাঃসুয়ং শৃণুধ্বং শ্রদ্ধয়াধুনা।
কৃষ্ণস্য কালিয়দমন যাত্রাঁ বার্ত্তাং নিবোধত।।[৬৯]

(খ) ভটিমা—'কালিয়দমনে'র আদি ও অন্তে ভটিমা আছে। ভটিমা হল প্রস্তাবনা। এতে থাকে উদ্দিষ্ট নায়কের প্রশংসা।

ঃ সূত্রধার—

ঃ জয় জয় যদুকুল কমল প্রকাশক
নাশক কংসক প্রাণ।
জয় জয় জগতক ভকতক ভীতি
নিতি করত নিরাজানি।।
জয় জগ নায়ক মুকুতি দায়ক
সায়ক শারঙ্গ ধারি।
দুষ্ট অরিষ্টক মুষ্টিক মোরল
ভাঙ্গল ধনুক মুরারি।।[৭০] ইত্যাদি।

'কালিয়দমনে' প্রারম্ভিক ভটিমা সুদীর্ঘ। এ হচ্ছে সূত্রধারের গান। ভটিমায় প্রতিটি কথার ভাব ও রস মুদ্রা সহকারে ফুটিয়ে তুলতে হয়। দীর্ঘ ভটিমায় চারটি পদের অন্তে এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হলে এক বা দুই পদের অন্তে সূত্রধার একবার করে নাচে। নাটকের অন্তে ভটিমা হচ্ছে 'মুক্তিমঙ্গল'। এতে প্রবেশক-ভটিমার মত কৃষ্ণস্তুতি আছে—

ঃ দৈবকী উদরে বেকত যোহি দেবা
কয়লি ভকতক ত্রাণ।
অঘবকধেনুক কেশি সবংশক
কংসক ধ্বংসল প্রাণ।।
বিরিন্দা বিপিন বিহার বিশারদ
শারদচন্দ্র সমান।
সোহি জগতগুরু তেরি সতত কুরু
মুকুতি মঙ্গল বিধান।। ইত্যাদি।[৭১]

'মুক্তিমঙ্গল' স্বস্তিবচন বা 'ভরতবাক্য' রূপে গৃহীত হতে বাধা নেই, সংস্কৃত নাটকের সূত্রে 'অঙ্কিয়া-লীলানাট্যে' তা দেশ কালের রুচি অনুসারে রূপান্তরিত হয়েছে স্বীকার করা যায়। কিন্তু শঙ্করদেবের নাটে 'অন্ত্যভটিমা' শুধু 'ভরতবাক্যে'র

ধারায় বিচার্য নয়। সংস্কৃত নাটকে স্বস্তিবচন 'নাট্যশাস্ত্রে'র সুনির্দিষ্ট ধ্রুপদী শৃঙ্খলার অংশ রূপেই বিবেচ্য। কিন্তু কৃত্যমূলক বা ধর্মভাবাপন্ন কাব্য বা নাট্যে তা বিষয়গত, এবং তা না থাকলে এর কৃত্য অসম্পূর্ণ থাকে। অঙ্কিয়া-লীলানাটের শেষে তাই নৃত্যগীতে উদ্দিষ্ট দেবতার প্রশস্তি বর্ণনার মাধ্যমে ভক্তের নাট্যনিবেদনের উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণতা দান করা হয়।

(গ) গদ্য সংলাপ বা গদ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তি—'অঙ্কিয়া' নামে পরিচিত এসকল লীলানাট্যে গদ্য সংলাপ স্বতঃস্ফূর্ত নয়। 'কালিয়দমনে'ও একটানা দীর্ঘক্ষণ সংলাপ দেখা যায় না। 'ভাষা-নাটকে'র মত এ রীতির নাটকেও সংলাপের ভূমিকা প্রধান নয়—

ঃ গোপ বালক—হে স্বামী। উহি বিষপানী পিয়ে প্রাণে মরল হামি, তোহারি প্রসাদে পুনর্ব্বার উপজলোঁ। তোহারি চরণ সেবাক মহিমা কি কহিব স্বামী।

শ্রীকৃষ্ণ—(সবাক আলিঙ্গি আশ্বাস কয়ল) আহে সখিসব। অঃ! তোরা সবে কৌতুকে দেখহ উহি-কালিন্দিক জল স্বস্থ করব।[৭২]

এ দুটি সংলাপের পূর্বে ও পরে আছে সূত্রধারের উক্তি।

(ঘ) গীত—'কথা' ও শ্লোকে ব্যক্ত বচনই 'গীত'। 'কালিয়দমন নাটে'র গীতাদিতে 'ধ্রুবা' বা ধুয়া আছে। এ থেকে ধারণা করা যায়, সূত্রধারের উক্তির পর এ ধরনের গীত 'পালি' বা দোহার কর্তৃক উপস্থাপিত হত—

ঃ গীত

রাগ-সিন্ধুরা-একতাল

ধ্রুং-

আওত এ কানু সুরভি চরাই
রঞ্জিত ধেনুরেণু, বেণু বাজাই,

পদ-

শিরে শিখণ্ডক গণ্ড কুণ্ডল জেলাবে।
উরে হেমহার মণি মঞ্জীর জুয়াবে।।
বালকে বেঢ়ি খেলি খেলাইতে যায়।
কহতু শঙ্কর গতি গোবিন্দ পায়।[৭৩]

ভাষা থেকে বুঝা যায় যে এ গীত সমবেত বালকদের।

(ঙ) পয়ার—'অঙ্কীয়া নাটে' পয়ার সচরাচর প্রশংসা বা 'স্তুতি'। পয়ার ছন্দে 'বিলাপ'ও বুঝানো হয়।[৭৪] 'কালিয়দমন নাটে' শ্রীকৃষ্ণের একটি উক্তি পয়ারে বিবৃত—

ঃ হা হা কি ভৈল আজু গোপ শিশুগণে।
গোবৎস বাচুরি সবে তেজিলা জীবনে।।
জানিলোঁ মরিলা উহি বিষপানী খাই।
কৈক যাই কি করিব কি ভৈল বিলাই।।
কাক লৈয়া যাইবো আজি বাচক চরাই।
নন্দর ব্রজত মই কি কহিব যাই।।
শরীর নসহে শোকে তেজিরো পরাণ।
গোসাঁই বঞ্চিলা আজি নাহি পরিত্রাণ।।[৭৫]

'কালিয়দমন নাটে' কোথাও 'অঙ্কীয়া নাট' কথাটা দৃষ্ট হয় না। প্রথম দৃশ্যে সামাজিক সম্বোধনে আছে 'কৃষ্ণস্য কালিয়দমন যাত্রা বার্ত্তাং নিবেধিত'। অর্থাৎ নাটকটি কালিয়দমন উপলক্ষে অকুস্থলে কৃষ্ণের 'যাত্রা' বা 'গমন' বিষয়ক। কৃষ্ণের কালিয়দমনকে ভটিমায় 'নাটক' বলা হয়েছে—

ঃ সোহি কৃষ্ণক উহি নাটক
উৎপাটক পাতক মূল।[৭৬]

অন্যদিকে এ নাটক 'কালিয়দমন লীলা যাত্রা' রূপেও আখ্যাত-

'য়েচন কালিয়দমন লীলা যাত্রা কৌতুকে করব, তাহে সাবধানে দেখহ শুনহ'।[৭৭]

এ মূলে লীলা, এখানে 'যাত্রা কথাটা আদৌ নাটক অর্থে নয়, কৃষ্ণের গমন অর্থেই প্রযুক্ত।

'কালিয়দমন' লীলা নাট্যের রচনাকাল ১৫১৮ খৃষ্টাব্দ বলে অনুমিত। সেক্ষেত্রে 'চৈতন্যভাগবত' দৃষ্টে বলা যায় যে, লীলা নাটকের উদ্ভব বাংলাদেশে এর পূর্বেই ঘটেছিল। শঙ্করদেব বৃন্দাবন ভ্রমণকালে রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধবে'র অভিনয় দেখেছিলেন এবং তাঁর রচিত লীলানাটসমূহ রচনার মূলে উক্ত নাটক দুটির প্রভাব থাকতে পারে।

'কালিয়দমন নাটে'র 'কথা' বা উক্তি-প্রত্যুক্তি সর্বত্রই গীতল, বলাবাহুল্য। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্ত্যমিল সম্পন্ন গদ্যও দৃষ্ট হয়, যেমন—

ঃ যশোদা-হা প্রাণ পুতাই-শোকে প্রাণ-যাই-কি ভৈল বিলাই-কহির দারুণ সর্প আসি ভৈল কাল। কত তপসাঁইলো তোকপুত্র পাইলোঁ হাততে হারাইলোঁ। কোনে আসি মোক মাতিবেক আই বুলি,—কাক ধূলা জারি বুকে লইবো তুলি-পুত্রপুত্র বুলি। জীবন ন যাই, কিয়নো-মই অভাগী এ। গৃহগোধন সাঞ্জো কি কারণ-সবে অকারণ এ। সুচান্দ বদন পুতাই নাহিমোর ঘরে। ব্রজের জীবন কমল নয়ন-গৃহ সুহায়ণএ। প্রভাবে কাহাকে জাগাইবো পুতাই বলি। কোনে স্তন খাইব—কোনে বংশী বাজাইব—কোনে ব্রজে আইব-এ। পুতাইর লগতে মরোঁ হ্রদে জাম্প দিয়া।[৭৮]

গদ্যের এই রীতি বাংলা 'কথানাট্য' ও 'গাজীর গানে' গদ্যে কাহিনী বর্ণনার বহুস্থলে দৃষ্ট হয়।

অঙ্কিয়া নাটকে সূত্রধার, 'হাস্তর' বা 'গাজীর গানের' মতই কাহিনীর ব্যাখ্যা করেন। 'কালিয়দমন' বা 'রুক্মিণীহরণ নাটে' সূত্রধার যে অপরিহার্যতায় বিবেচ্য তার সঙ্গে শুধু তুলনা চলে বাঙলা পাঁচালি-গায়েনের। সূত্রধারের অবিরাম উপস্থিতির ফলে অঙ্কীয়ার নাট্যদৃশ্যে ক্রিয়া প্রায়শই গৌণ হয়ে পড়ে। 'কালিয়দমনে'র প্রথমাংশের গড়ন কিরূপ তা নীচে দেখান হল—

সূত্রধারের প্রবেশ ও নৃত্য
(সম্ভবত দোহার বায়েন কর্তৃক পরিবেশিত তালে),
এরপর সূত্রধারের শ্লোক
(মুদ্রা সহকারে),
সূত্রধার কর্তৃক দর্শক সম্বোধন,
সূত্রধারের ভটিমা।

ভটিমার পর সঙ্গীর প্রবেশ, সঙ্গীকে (আকাশে কর্ণং দত্ত্বা সূত্র পুছত) সূত্রের জিজ্ঞাসা 'আহে সঙ্গী কোন বাদ্য বাজত'। সঙ্গী উত্তর দিল 'আঃ দেব দুন্দুভি বাজত। সে শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক সব সহিতে এথা মিলল মিলল' এবং এরপরই সঙ্গী নিষ্ক্রান্ত হল। তারপর সূত্রধারের সংস্কৃত শ্লোক, বালকৃষ্ণের বেণু বাজাতে বাজাতে সাথী বালকদের নিয়ে মঞ্চে প্রবেশের বিবরণ অতঃপর সামাজিক সম্বোধন, এরপর গীত, সম্ভবত সমবেত বালক ও দোহারদের। এতদন্তে কালিয়-হ্রদের 'পানী' পানে বালকদের মৃত্যু, কিন্তু তাদের মৃত্যু বা জলপানের কোন দৃশ্য রচিত হয় না।

সূত্রধার স্বয়ং একটি বিবরণে তা উপস্থাপিত করেন। বিবরণের মধ্যেই আবার সূত্রধারের শ্লোক, শ্লোকের বিষয় মৃত সাথীদের দেখে ভক্তবৎসল কৃষ্ণের খেদোক্তি। এই শ্লোকেরই আবার প্রায়নুবাদ অসমীয়ায়। এখানে সূত্রধারই বলে দিচ্ছে-হা! হা! মোর ভকতক ঐচন অবস্থা ভৈল বুলি সে ভকতবৎসল শ্রীকৃষ্ণ বহুত খেদ কয়ল তা দেখহ'। এরপর পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের খেদ। খেদান্তে আছে সূত্রধারের শ্লোক (অনেকটা যেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মাধবসঙ্গীত প্রভৃতি কাব্যের মত), তদন্তে শ্লোকের ব্যাখ্যা এবং সাথে সাথে কৃষ্ণের প্রসাদে গোপবালকের জীবন লাভের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, এ সঙ্গে আছে সূত্রধারের ব্যাখ্যা তৎপর গোপবালক ও শ্রীকৃষ্ণের সংলাপ—সূত্রধারের শ্লোক এবং একই শ্লোকের ব্যাখ্যাসহ সূত্রধার কর্তৃক কৃষ্ণের হ্রদে ঝাঁপ দেয়ার প্রস্তুতি বর্ণনা—

ঃ দুরন্তবীর্য্য প্রতাপী প্রচণ্ড কালিসর্পক দমিয়া দূর করিতে প্রবন্ধ-কয়কহোঁ পীতবস্ত্র কটিত মেহ্রাবল। কদম্ববৃক্ষে চড়িকহোঁ বিষময় কালিয় হ্রদত জাম্প কয়ল। সে অনন্ত বীর্য্যর প্রচণ্ড প্রতাপে হ্রদক উর্ম্মি উথলি আন্দোল মিলল। শ্রীকৃষ্ণ পরম কৌতুকে জলমাজে যৈচন কেলি কয়ল, তা দেখহ শুনহ। নিরন্তরে হরি বোল হরি।

এরপরেই গীত। এই গীত যে 'পালি বিলাকে'র দ্বারা গীত হত তাতে সন্দেহ নেই—

রাগ কানারা

ঃ তাল পরিতাল।

ধ্রুং- কালিন্দি জলমহ খেলে যদুরায়া।
বালকে বেঢ়িয়া বংশী বজায়া।
যৈচে নাচে কানু চরণ চলায়া।।
পদ-নীলতনু তথি পীত পিচোরা।
নবঘন জিনি যৈচে বিজুরি উজোরা।।
কৌস্তুভকণ্ঠে কোটি নবসুর।
কুণ্ডল জলমল জলকে কেয়ূর।।
জলমাঝে দুহবাহু আস্ফালি।
ক্রীড়া করত বীর বনমালী।।
উর্ম্মি উথলি হ্রদ করু রোল।
কৃষ্ণক কিঙ্করে শঙ্করে বোল।।[৭৯]

গীতে দিশা ও পদ এ নাটকের সর্বত্রই সুনির্দিষ্ট। সূত্রধার ও চরিত্র দুক্ষেত্রেই গীতে, দোহারের সহায়তা ছিল; এরূপ ধারণা অসঙ্গত নয়।

'কালিয়দমন লীলা' নাট্যের আঙ্গিকে নিঃসন্দেহে সংস্কৃত নাটকের বহিরঙ্গের মিল আছে। এ মিল কামরূপী-সংস্কৃত নাটকের উত্তরাধিকারের ধারায় কতটুকু তা নির্ণয় করা কঠিন, তবে এই লীলানাটকের উপর বাঙলা লীলানাট্যে প্রভাব সুনিশ্চিত। এ ছাড়া বাঙালি কবি জয়দেব ও মৈথিলি কবি বিদ্যাপতির প্রভাবও শঙ্করদেবের রচনায় আছে। গীত ও শ্লোকে সে চিহ্ন অমোচ্যরূপেই বিদ্যমান।

এ ধরনের লীলানাটে সূত্রধারের ভূমিকা পাঁচালি গায়েনের মতই অপরিহার্য একথা পূর্বে বলা হয়েছে। সে সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে, অসমীয় লীলানাটের আঙ্গিকে নিশ্চিতভাবেই পুতুল নাচের আঙ্গিক ও 'চিহ্নযাত্রার' অনুসৃতি আছে। 'ভাবনা' নাটের অভিনয়ে নৃত্যের পূর্ণ প্রাধান্য বিদ্যমান। পুরো নাটে নৃত্যাভিনয়ের বৃহৎ অংশ সূত্রধারের। একে বলে 'সূত্রধার নাচ'। এ ছাড়া কৃষ্ণ ও গোপীদের নৃত্য ভিন্ন ভিন্ন এবং সেগুলো যথাক্রমে 'কৃষ্ণনাচ' ও 'গোপীনাচ' নামে পরিচিত। এছাড়া অঙ্কীয়া-লীলানাটে আরও নানাশ্রেণীর নৃত্য দেখা যায়, যেমন- 'রাস নাচ', 'নতুবা নাচ' ও 'চালি নাচ'। বিশেষজ্ঞের মতে এ সকল নৃত্যের মূলে আছে শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রভাব।[৮০]

শঙ্করদেবের 'রুক্মিণীহরণ'-এর রচনাকাল ১৫৬০ খৃষ্টাব্দ বলে অনুমিত হয়েছে। এই নাটক সমকালে খুবই আদৃত হয়েছিল-এমনকি উনিশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত আসামের অন্যতম জনপ্রিয় নাটক হিসাবে রুক্মিণীহরণ নাটের মঞ্চায়নের সংবাদ পাওয়া যায়।[৮১]

রুক্মিণীহরণও অসমীয় লীলানাট। এতে নাট্যোল্লেখিত পাত্রপাত্রী তালিকা ও পরিচয় নিম্নরূপ—

ভাওরীয়া সকলর নাম অর্থাৎ অভিনেতা অভিনেত্রীদের নাম : মুনিহ (পুরুষ)—

ঃ ভীষ্মক- কুণ্ডিরণ রাজা, রুক্মী-ভীষ্মক রজার কোৱঁর আরু রুক্মিণীর ককায়েক, শিশুপাল-চেদিরাজ্য রজা, শ্রীকৃষ্ণ-দ্বারকার যাদব, বেদনিধি কুণ্ডিনব পুরোহিত বামুন, রুক্মিণীর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তআউর লগরীয়া হরিদাস-দ্বারকার গমনীয়া ভাই, ব্রহ্মা, নারদ, দ্বারি, রজা সকল, জ্ঞাতি সকল বিয়া চাবলৈ অহা লোক সকল।

(তিরোতা বা স্ত্রী চরিত্র)

ঃ রুক্মিণী- ভীষ্মক রজার কন্যা, শশীপ্রভা ভীষ্মক রজার পাটমাদৈ, মদন মঞ্জরী আরু লীলবতী-রুক্মিণীর সখী, দৈবকী, আয়তী সকল, রুক্মিণীর দাসীবোর।

বাঙলা-মৈথিলি নাটকের মতই অসমীয় লীলানাটে পাত্রপাত্রীর সংখ্যা অনেক।

এখানে স্মরণ করা যায়, চৈতন্যদেবও রুক্মিণীহরণের আখ্যান অভিনয় করেছিলেন এবং তা শঙ্করদেবের 'রুক্মিণীহরণ নাটে'র বহুপূর্বে। চৈতন্যদেব তখনও যুবকমাত্র, সন্ন্যাস গ্রহণ করেননি। সে নাটকেও পাত্রপাত্রীর সংখ্যা কম ছিল না।

শঙ্করদেবের 'রুক্মিণীহরণ নাটে'র গড়ন 'কালিয়দমনে'র অনুরূপ। তবে এতে 'ভটিমা'র সংখ্যা বেশী। আদি অন্ত ব্যতিরেকেও এতে ভিক্ষুক মুখে কৃষ্ণস্তুতি (ভটিমা) আছে।

নাটকে চরিত্রমুখে সংলাপ 'কথা' হিসাবে আদ্যন্ত উল্লেখিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, 'কথা' বাঙলা পাঁচালি কাব্যের (জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, মানিকদত্তের পুথি চণ্ডীমঙ্গল দ্রষ্টব্য) বিশিষ্ট আঙ্গিকগত পরিভাষা। অঙ্কিয়া নাট্যে ব্যবহৃত পয়ার বাঙলা পাঁচালি কাব্যের ছন্দ-নির্দেশে লভ্য।

রুক্মিণীহরণের সংলাপ পরিণত। এ নাটকের কাহিনী বিন্যাসও খানিকটা নাটকীয় গতি সম্পন্ন। নাট্যে প্রেম, ভাবুকতা, যুদ্ধ প্রভৃতি প্রসঙ্গ সে কালের দর্শকচিত্তকে আন্দোলিত করত সন্দেহ নেই।

এতে হাস্যরসও আছে। রুক্মিণীর 'নবীন রূপ যৌবন' দেখে রাজাদের প্রতিক্রিয়া এ নাটকে খুব সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হতে দেখা যায়—

সূত্র—তদন্তর রুক্মিণীক নবীন রূপ যৌবন পেখিয়ে যত রাজা সব কামবাণে মূর্চ্ছিত হয়া আসন হন্তে ঢলি ঢলি করল। বিহ্বলভাবে কেহো করযুরি বলল। ... (এরপর সূত্রধার নিজেই নির্দেশ দেয়) 'রাজা সব বোল' (এ ভাষা পুতুল নাচের সূত্রধারের পক্ষেই সঙ্গত)। তখন রাজাসকল বলে—

ঃ রাজাসব-(কথা) হে প্রাণেশ্বর, কামসাগরে নিস্তার করহ।

সূত্র-কেহো আঙ্গলী মুখে লৈয়া বোলে

(অর্থাৎ সূত্রধারের বচনের পরেই সমবেত রাজাদের সংলাপ)—

রাজাসব-(কথা) হে প্রাণ প্রিয়ে মদনে মর্দ্দয়, হামাক হাস্য-নিরীক্ষণ করহ।

(এরপর পুনরায় সূত্রধারের সংলাপ)—

সূত্র-কেহো দন্তে তৃণ কামুরি বোলল। ভোজরাজ বোল।

(এবার ভোজ রাজার উক্তি)—

ভোজরাজা- (কথা) হে রাজকুমারী তোহাক নিমিত্ত কাম বাণ কুটি প্রাণ চুতি যাই। চরণক দাস ভেলো হাতে পরশি হামাক জিয়াউ। সব মহাদৈক দাসী করি দেওঁ।

(এরপরই পুনরায় সূত্রধার বলে)—

সূত্রধারের বিবরণ থেকে দেখা যায় কামার্ত রাজাগণ নানারূপ বিকট অঙ্গভঙ্গি সহকারে রুক্মিণীর সামনে হাবভাব প্রদর্শন করেছিল—

সূত্র-কামমত্ত হৈয়া ইত্যাদি নানা বিভৎস ভাওনা কর রাজাসব দেখি সখিসবে কাহেক ঠেঙ্গিনা দেই, কাহেক গোরে মারি ভর্ত্তসয়, তথাপি রাজাসব কামাতুর হয়া কুমারীক কাতর কাতর কয় থিক।[৮২]

সখীগণ এই 'বিভৎস' কামাতুর রাজাদের নাজেহাল করেছিল। রুক্মিণীকে অবশেষে রাজসভা থেকে হরণ করলেন কৃষ্ণ। রুক্মিণী স্বামী হিসাবে বরণ করল কৃষ্ণকে। এ সময়ে কৃষ্ণের লীলায় সকল রাজা অচৈতন্য হয়ে রইল। তারপর চেতন ফিরে দেখল রুক্মিণীকে কৃষ্ণ ইতোমধ্যে হরণ করেছেন। ক্ষুব্ধ শিশুপাল চীৎকার করে বলে- আঃ হামার জীবন ধিক ধিক। হামো বিদ্যমানে হামার বিবাহক কন্যা যাদব নিয়া যাই।

এরপর শিশুপালের যুদ্ধ ঘোষণা, সঙ্গে ব্যর্থকাম রাজাসকল। এই যুদ্ধ ধুয়া ও পদের ছন্দে প্রদর্শিত হত—

পয়ার-কামরা-পরিতাল

ধুয়া- কোপে নৃপ সব কামোরে বাহু।
চান্দক যচ খেদি যাই রাহু।।

পদ- হাতে শর ধনু ধরি সব ধাবে।
কম্পিত মেদিনী এ পদ ঘাবে।
বাহু দর্পিয়ে করয় টঙ্কার।
বোলয় ডাকি ডাকি অহঙ্কার।।
রে রে যাদব পারয় গাড়ি।
ছোড় ছোড় অব রুক্মিণী নারী।।
আব কতি যাস পাবলো লাগ।
কোপে গরজয় যৈচন বাঘ।।

রহ রহ বুনি পারে ঘণে রাব।
কহ শঙ্কর গতি গোবিন্দ পাব।।

এ যুদ্ধের গান। ভাষা মিশ্র। এ হচ্ছে সূত্রধারের সঙ্গী 'গায়েন-বায়েন' দোহারের। গানের সুরে তালে যুদ্ধের 'ভাও' প্রদর্শন।

রুক্মিণীর বিলাপও এ নাটকে হৃদয়স্পর্শী। যুদ্ধে উদ্বেলিত রাজন্যবর্গের 'আটোপ টঙ্কার' শুনে ভীতা রুক্মিণী সমস্ত কিছুর জন্যে নিজেকে দায়ী করে—

রুক্মিণী- (কথা) হা দৈব, অভাগী রুক্মিণীক কপাল কি ভেল, বিঘিনিক উপরি বিঘিনি মিলল। ওহি পাপী রাজা সব বহুত, স্বামীক সঙ্গে সহায় কেহোঁ নাহি, হামাক কোন গতি হয় ইহা নাহি জানি। হা হা সোণাক পুতলি শ্রীকৃষ্ণ স্বামীক হামো পাপিনী কৈচে আনল। যেনো হামো কাচক চাহিতে মাণিক হরায়।[৮৩]

এই গদ্য নিঃসন্দেহে শিল্পগুণের বিচারে উৎকৃষ্ট। এতে একটি সুরের রেশ আছে, এ ভাষা গীতল।

উল্লেখ্য যে, অঙ্কীয়া-লীলানাট যে 'যাত্রা' নাটক নয় তার প্রমাণ, 'রুক্মিণীহরণে'র কোথাও 'যাত্রা' কথাটা উল্লেখিত হয়নি। কৃষ্ণের কালিয়হ্রদে গমন অর্থেই 'কালিয়দমন নাটে' 'যাত্রা' ব্যবহৃত হয়েছিল।

'রুক্মিণীহরণ' শুধু নাটক নয়, 'নৃত্য' রূপেও আখ্যাত। নাটকের প্রথম ভটিমার পর সূত্রধার বলে—

'সভামধ্যে রুক্মিণীহরণ বিহার নৃত্য পরম কৌতুকে করব'[৮৪]—অর্থাৎ নাটকটি রুক্মিণীহরণ নৃত্যও বটে।

এ নাটককে 'কৃষ্ণচরিত্র'ও বলা হয়েছে—

ঃ কৃষ্ণচরিত্র অতি সার
রুক্মিণীহরণ বিহার।।[৮৫]

এই বৈষ্ণবভাবাপন্ন লীলানাট্যসমূহে সর্বত্রই সূত্রধার দর্শকের প্রতি 'হরিবোল' উচ্চারণের নির্দেশ দেয়। এর ফলে ভক্ত দর্শকদের সাথে নাটকের সরাসরি সংযোগ ঘটত।

এ প্রসঙ্গে চৈতন্যদেব অভিনীত নাটকের কথা স্মর্তব্য। সে নাটকেও দর্শকরা নাম প্রভৃতি সঙ্কীর্তন করেছিল। স্বয়ং বিশ্বম্ভর মাতৃভাবে দর্শকদের স্তন্যদান করেছিলেন—এ কথা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

শস্যবপন, তিথি, পার্বণ, সামাজিক-বিনোদন প্রভৃতি উপলক্ষে অসমীয় অঙ্কীয়া লীলানাটের অভিনয় হত। এ সকল নাটকের অভিনয়স্থল 'নামঘর'। এ হচ্ছে গ্রামের বারোয়ারী মিলনস্থল। এতে দিনে যৌথ বিচার, সালিশ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়, রাতের বেলা বসে নাটকের আসর। 'নামঘরে'র 'দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ ফুট', এর চাল শন বা পাতায় ছাওয়া। এরই মধ্যে একটি অংশ 'মণিকূট' অর্থাৎ ক্ষুদ্রায়তন ঘর থাকত। সেখানে কাঠের আসনে দেবতার মূর্তি বা ধর্মগ্রন্থ রাখার নিয়ম। নামঘরের দুটি অংশ, একটি পুরোহিত অন্যটি অভিনেতাদের জন্য নির্দিষ্ট। আসা যাওয়ার কাছের স্থান হল 'রঙ্গমণ্ডপ'। এ ধরনের আসরে দর্শকরা মাটিতে মাদুর বা চাটাই পেতে বসে। নির্দিষ্ট কিছু স্থান গ্রামের উঁচুদরের ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। আসামে সাজ ঘরকে 'চোঘর' (ছদ্মঘর) বলা হয়। রঙ্গস্থলও ভূমিসমতলে নির্ধারিত। এই রঙ্গভূমি অভিনেতা-গায়েন-বায়েনাদি উপবেশন করে। রঙ্গভূমি থেকে 'চো-ঘরে'র আসা যাওয়ার পথে ঘিরে এক টুকরা 'সাদা পর্দা বা আড় কাপড়' ঝোলানো থাকে। সূত্রধার নাম ধরে আহ্বান করলে এক একজন প্রথমবারের মত সেই কাপড়ের আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করে এবং তারপর থেকে উক্ত অভিনেতা মঞ্চে গায়েন বায়েনদের সাথে বসে থাকে। যদি আবার সূত্রধার আহ্বান করে তবে সেখান থেকে উঠেই সে অভিনয়ার্থে মঞ্চে আসে। উল্লেখ্য যে নামঘরের তিনভাগের দুভাগ দর্শক ও একভাগ মঞ্চের জন্য নির্দিষ্ট। বিশেষজ্ঞের মতে 'নামঘর' ভরত নাট্যশাস্ত্রোক্ত 'বিকৃষ্ট' ধরনের নাট্যমণ্ডপ।[৮৬]

আসামে 'খনিকার' বলে এক শ্রেণীর কারুজীবী আছে যারা বংশ পরম্পরায় ভাবনা অর্থাৎ অঙ্কীয়া-লীলানাটে ব্যবহার্য অস্ত্রাদি, মুখোশ তৈরি করে এবং নামঘরে অভিনেতব্য নাটের 'আবিয়া' ও 'মহতা' নামক মশাল জ্বালায়।[৮৭]

সূত্রধারের পোশাক হল 'ঘুরি' (কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা শ্বেতবর্ণের পোশাক), 'ফাটাউ' (কব্জি, বাহু পর্যন্ত লম্বা জামা অথবা হাত কাটা গেঞ্জি ধরনের) 'পাগ' (পাগড়ি)। সূত্রধারের মাথায় পাগড়ি পরার রীতি বাঙলা লীলানাট্যেও দেখা যায়। এতে দোহারদের পরণে থাকে সাধারণ পোশাক।

চৈতন্যদেবের নাট্যাভিনয়ে সূত্রধার হরিদাসের বেশ বর্ণনায় আছে 'মহাপাগ শিরে শোভে ধটি পরিধান।'

'ভাবনা' শ্রেণীর নাট্যে বিশেষত অঙ্কিয়ায় পুরুষ অভিনেতারা হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরত, গায়ে ছোট মাপের 'বক্ষোবাস'। হরিদাসের বেশভূষায়ও 'ধটি' বা ধুতির উল্লেখ দেখা যায়। অঙ্কীয়া লীলানাটে মেয়েদের পোশাকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- 'ব্রিহা' বা বক্ষোবাস এবং 'শাল' বা চাদর।

এসকল নাটে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পোশাকের ঔজ্জ্বল্য, রঙ ও 'কারুকার্য' পদমর্যাদা অনুসারে নির্ধারিত হত।

অঙ্কিয়ার রূপসজ্জায় মুখ ও অঙ্গে প্রয়োজনানুযায়ী 'হিঙ্গুল ও হরিতাল' মিশ্রণে তৈরী রং চরিত্রের পরিচয়জ্ঞাপক ছিল। কৃষ্ণের জন্য নীল ও কালো রঙের মিশ্রণে প্রস্তুত শ্যামল রং, ব্রাহ্মণদের জন্য লাল, অসুর ও প্রেতাদির জন্য কালো রং ব্যবহৃত হত।

এ সকল নাটকে মুখোশের ব্যবহারও ছিল বিচিত্র ধরনের। মন্দ চরিত্রের জন্য ভয়ঙ্কর মুখোশ-যেমন 'রাবণ' বা 'কুম্ভকর্ণ'। পশুপাখীদের ক্ষেত্রে অনুরূপ গাত্রাবরণসহ মুখোশ, যেমন-গরুড়, কালিয়হ্রদের নাগ, বানর, জটায়ূপক্ষী, ভাঁড়াদির নিমিত্তে থাকত 'মাথা ও মুখ ঢাকা দেওয়া' মুখোশ।

অসমীয় চিহ্নযাত্রায় মুখোশের ব্যবহার-প্রসঙ্গ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। বাঙলা রামলীলা-নাটে দশমুণ্ড রাবণের মুখোশ ব্যবহৃত হয়। আসামে রাবণ চরিত্রের ক্ষেত্রেও অনুরূপ মুখোশের প্রচলন আছে, তাতে শত হস্ত যুক্ত হয়। কালিয়দমনে ব্যবহৃত হয় সাপের মুখোশ। এই মুখোশ দেখতে 'জীবন্ত' সাপের মত।[৮৮] মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' ইন্দ্রের নর্তক মালাধর কালিয়ের মুখোশ পরে কালিয়দমন-নাটে অভিনয় করেছিল বলে উল্লেখিত হয়েছে।

অসমীয় লীলানাট সারারাত্রিব্যাপী অভিনীত হত। 'ভাবনা'-নাট নিজস্ব দেশকালের প্রেক্ষাপটেই বিকশিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। অবশ্য অঙ্কিয়া-লীলানাটে শঙ্করদেবের ব্যক্তি প্রতিভার অবদান অনেকখানি। এ শ্রেণীর নাটের একটি সুনির্দিষ্ট আঙ্গিক ও পরিবেশনরীতি গড়ে উঠেছিল তাঁর হাতে। সংস্কৃত নাট্যরীতির সঙ্গে অসমীয় লোক-নাট্যরীতি ও পুতুল নাচের মিশ্রণে অঙ্কিয়ার যে নাট্য আঙ্গিক তৈরি হল তা আসামেরই নিজস্ব সম্পদরূপে বিবেচ্য।

বাঙলার সীমান্তবর্তী প্রদেশসমূহের নাট্যরীতি সম্পর্কে একটি কথাই বলা যায় যে, ঐ সকল প্রাদেশিক নাট্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংস্কৃত নাট্য আঙ্গিক দ্বারা

প্রভাবিত হয়েছিল। নেপাল, ত্রিহুত, উড়িষ্যা ও আসামে এই প্রভাবের কারণেই মূলত সংলাপ ও চরিত্রভিত্তিক নাটকের বিশেষ বিশেষ ধারা গড়ে উঠেছিল। তবে সকল প্রাদেশিক নাটকেই স্ব স্ব অঞ্চলের নানা নাট্য উপাদান মিশ্রিত হবার ফলে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক গড়ে ওঠে। বস্তুত চরিত্রাভিনয়ের ধারায় প্রাদেশিক নাটকের আত্মপ্রকাশ ঘটলেও দেখা যায় ঐসকল নাটকের মূল উপাদান নৃত্য-গীত। এ কারণে মধ্যযুগের ভাষা, কীর্তনীয়া, অঙ্কিয়া প্রভৃতি নাট্যধারা নাটগীতের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। অঙ্কিয়া নাটকের বহিরঙ্গ কিছুটা সংস্কৃত নাট্য আঙ্গিক প্রভাবিত হলেও তা মূলত অসমীয় লোকনাট্যেরই রূপান্তর। এর সঙ্গে এ শ্রেণীর অসমীয় লীলানাটে মিশ্রিত হয়েছে সে অঞ্চলের নৃত্যগীতের ধারা। বাঙলা পাঁচালিরীতির নাট্যাভিনয়ে প্রাপ্ত কিছু পরিভাষা অসমীয় নাট্যে লভ্য। অন্যদিকে ভাষা নাটকে সংস্কৃত নাট্যরীতির খানিকটা ছায়াপাত ঘটলেও শেষপর্যন্ত সেখানে নাটগীতের প্রভাবে গদ্য-সংলাপ পরিত্যক্ত হতে দেখা যায়। 'বিদ্যাবিলাপ' 'মহাভারত', 'মাধবানল-কামকন্দলা' প্রভৃতি নাটকে গদ্যে কোন সংলাপ দেখা যায় না। এর ফলে ভাষা নাটকও রূপান্তরিত হল নৃত্য-গীত-নাটের আঙ্গিকে।

মধ্যযুগের প্রাদেশিক নাট্যরীতির উপর সংস্কৃত নাট্যরীতির খানিকটা প্রভাব আছে একথা সত্য কিন্তু সে প্রভাব অবিমিশ্র নয়। বাঙালি কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' মধ্যযুগের সকল প্রাদেশিক নাটকের অন্তরধর্মকে প্রভাবিত করেছিল, এ কথা সত্য। অন্যদিকে মৈথিলি কবি বিদ্যাপতির প্রভাবও বাঙলা-মৈথিলি নাটকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

আগেই বলা হয়েছে বাঙলার অন্তত দু'টি ধর্ম-দর্শন নাথধর্ম ও অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ এ সকল প্রাদেশিক ভাষা সাহিত্যের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিল। সে কারণে এ সব অঞ্চলের নাটকের বিষয় ও দার্শনিক ক্ষেত্রে এই দুই ধর্ম-দর্শনের প্রভাব অনিবার্যরূপেই আত্মপ্রকাশ করে।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের আর্বিভাব, বাঙালির শিল্পচেতনায় যে নবতর আলোক-সম্পাত করে তার রেশ পরবর্তী দু'শ বছর ধরে অগৌণরূপেই বাহিত হয়েছে। অনেকটা সে-কারণেও আমাদের শিল্প চেতনায় সামগ্রিকভাবে, কোনো বিশেষ অঞ্চলের শিল্পরীতি জরুরী বলে বিবেচিত হয়নি।

অন্যদিকে শিল্পগত চেতনার সীমাবদ্ধতার কথাও প্রাদেশিক নাটকের ধারার ক্ষেত্রে স্বীকার করতে হয়। নেপাল, মিথিলা, উড়িষ্যা, আসামের নাটকের বিষয়বস্তু

অধিকাংশ ক্ষেত্রে পৌরাণিক এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় চেতনায় অভিষিক্ত। পক্ষান্তরে চতুর্দশ শতক থেকেই বাঙলা পাঁচালি পরিবেশনায় এল ধর্মনিরপেক্ষ মুক্তমানবরসের পালা।

ইরান, ইরাক, আরব, মিশর, তুরস্ক প্রভৃতি অঞ্চলের প্রেমকাহিনীসমূহ গেয়কাব্যের আকারে বাঙলা ভাষায় রূপান্তরিত হবার ফলে, ধর্মরসসিক্ত বাঙলা পাঁচালি-পালার উপর মানবতান্ত্রিকতার নতুন আলোক-সম্পাত হল। এ কারণেও মধ্যযুগে অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্য অপেক্ষা বাঙলা সাহিত্য প্রাগ্রসর ও পূর্ণতর রূপ লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পঞ্চদশ শতকে আসামে পৌরাণিক চিহ্নযাত্রায় দেবদেবীর যে লীলা বিধৃত হতে দেখি তারও পূর্বে এদেশে 'ইউসুফ-জোলেখার' কামটঙ্গী সংক্রান্ত 'পটনাটে'র প্রচলন ছিল। এ ছিল নিছক আদিরসাত্মক মানবীয় প্রেমের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শিল্পরূপ।

অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্য-ধারায় বাঙালি কবিদের সঙ্গে তুলনাযোগ্য কালজয়ী কবি প্রতিভার অভাব পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যাপতি ও শঙ্করদেব ব্যতীত প্রাদেশিক ভাষায় অন্যকোনো ক্ষমতাধর কবির আবির্ভাব ঘটতে দেখা যায় না।

বাঙলা পাঁচালিকাব্য-উপস্থাপনা, হাবভাব প্রদর্শন, রসনিষ্পত্তি-কৌশল, সর্বোপরি পরিবেশনার রীতি বিচারে বাঙলা নাট্য-ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপেই বিবেচ্য। পাঁচালির নাট্যধর্মী উপস্থাপনার কারণেই বস্তুত পক্ষে আমাদের সাহিত্যে কবিরা কখনই সূত্রধার-নটী-সখী-বিদূষক অধ্যুষিত সংস্কৃত নাটকের রীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। উপরন্তু প্রাদেশিক নাট্যধারায় শঙ্করদেব ব্যতীত অন্য কারো নাটক প্রকৃত অর্থে শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছে এমন দাবী করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কাশীনাথ কৃত 'বিদ্যাবিলাপ' (১৭২০ খৃঃ)-এর সঙ্গে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে'র তুলনা করলে দেখা যায়, পূর্বোক্ত নাটক অর্ধোস্ফুট বাঙলা-মৈথিলি শিল্পরীতির ছায়ামাত্র—একটা বিশেষকালে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট নাট্যরীতি। অথচ শতশত বছরে বিচিত্র ধারায় বিকশিত পাঁচালির চূড়ান্তরূপ ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে' বিদ্যমান। ভাষা নাটকের 'রামায়ণ'-আর কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ'-পাঁচালির তুলনা করলে দেখা যায় কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' সমগ্র জাতির মর্মস্থলের সামগ্রী, পক্ষান্তরে নেপালের 'রামচরিত নাটক' রাজদরবারের রুচি ও প্রথার মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। বৃহৎ জনগণের সঙ্গে এর যোগ ছিল না।

দ্বিজ শ্রীধর ও সাবিরিদ খাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' গীতনাটের আঙ্গিক বিবেচনা করলে দেখা যায় ষোড়শ শতকেই বাঙলা-মৈথিলি নাটকের পূর্ব-সঙ্কেত, এর খানিকটা আঙ্গিকগত ছাঁচ এঁদের রচনায় বিদ্যমান। কিন্তু পাঁচালি ধারার প্রবল প্রবাহে বাঙলায় এই প্রয়াস পরবর্তীকালে কোন ধারাবাহিকতা অর্জন করতে সমর্থ হয়নি।

মধ্যযুগে বাঙলা চরিত্রাভিনয়ের ধারায় যে সকল নাট্য আঙ্গিক গড়ে উঠে ছিল, সেগুলো প্রায় সবই মৌখিক রীতিতে। ভাষা, কীর্তনীয়া ও অঙ্কিয়া নাটকের লিখিত রূপ আছে। কিন্তু প্রাদেশিক ভাষায় রচিত উল্লেখিত ধারার নাটকসমূহের কাল নির্ণয়পূর্বক দেখা যায় যে, বাঙলা লীলানাট্যের উদ্ভব ঘটেছিল এসকল নাটকের অনেক আগে। ঐ সকল প্রাদেশিক নাটকে এই লীলানাট্যের আঙ্গিক ও পরিবেশন রীতির প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। মধ্যযুগে প্রাদেশিক নাটকের বিভিন্ন শ্লোকে-পদে ও গীতে কবির ভণিতা সর্বত্র দৃষ্ট হয়। পদমধ্যে ভণিতা দানের রীতি প্রাচীন বাঙালী কবিদের নিজস্ব উদ্ভাবনা। এই রীতি সর্বভারত এমনকি ইরানেও অনুসৃত হয়েছিল। বাঙলা-মৈথিলি নাটকে বাঙালির অবদান মৈথিলি কবিদের সমান সমান।

মধ্যযুগের পূর্ববঙ্গীয় গীতিকাসমূহ, ধর্মতান্ত্রিক কৃত্যের প্রভাবমুক্ত এক অভিনব শিল্পরীতি হিসাবে গড়ে উঠে। এ সকল গীতিকা আঙ্গিক ও কাহিনী পরিবেশনের ধারায় নিঃসন্দেহে নাট্যমূলক। কিন্তু একই কালে প্রাদেশিক শিল্প সাহিত্যের ধারায় বাঙলা গীতিকার অনুরূপ মুক্তজীবনরসের কোন নাট্য বা 'নাট্যগীতিকা' দৃষ্ট হয় না। আসামের গীতিকা, মূলত পূর্ববঙ্গীয় গীতিকার প্রভাবজাত। 'কাজলরেখা', 'কাঞ্চনমালা', 'মহুয়া', 'দেওয়ানা মদিনা', 'চন্দ্রাবতী', 'মলুয়া' প্রভৃতি গীতিকায় মানব জীবনের যে সংগ্রামক্ষুব্ধ রূপ, নর-নারীর অশ্রুবেদনার যে অবিনশ্বর স্বাক্ষর তা সীমান্তবর্তী অন্য কোন ভাষার নাট্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

বাঙলা লোকনাট্যের ধারাও বিচিত্র। প্রাচীনকাল ও সমগ্র মধ্যযুগে বাঙলা লোকনাট্য নানা ধারায় বিকশিত হয়েছিল। অন্য প্রাদেশিক অঞ্চলের কোন লোকনাট্য দ্বারা সরাসরি এ ধারাগুলো প্রভাবিত হয়েছিল এমন কোন প্রমাণ এযাবৎ পাওয়া যায়নি। বরং বাঙালিদের অভিবাসন ও অন্যান্য কারণে এ অঞ্চলের লোকনাট্য ধারা বিভিন্ন প্রদেশেও বাহিত হয়েছিল। বাঙলা লোকনাট্যের নানা রূপ যেমন, 'বেউলা-লখিন্দারের'র পালা, 'গাজীর গীত', 'ধামালি' প্রভৃতি আসামেও প্রচলিত।

মধ্যযুগের বাঙলা নাট্যরীতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভের পথে তাই দেশ ও কালের নাট্যরূপের সন্ধান অপরিহার্য।

টীকা

১. শ্রীরাজমোহন নাথ (বি. ই. তত্ত্বভূষণ) সম্পাদিত, *কালিয়-দমননাট* (শ্রী শ্রীশঙ্করদেব বিরচিত। প্রথম সংস্করণ-১৮৬৭ শক-১৯৪৫ ইং, পৃঃ ২০।
২. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা,* ১ম খণ্ড, ১৯৭৫, পৃঃ ১৮।
৩. শ্রী গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত, *জগন্নাথ বল্লভ নাটকম,* রামানন্দ রায় কবি সার্বভৌমেন বিরচিতম, প্রকাশকাল-১৪ই এপ্রিল ১৯৯২, পৃঃ অ।
৪. প্রিয়রঞ্জন সেন, *ওড়িয়া সাহিত্য,* ১৩৫৮ শ্রাবণ, পৃঃ ২৩।
৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭।
৬. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ* (প্রথম খণ্ড) দে'জ পুনর্মুদ্রণ-১৩৯৯ মাঘ, জানুঃ ১৯৯৩, পৃঃ ।৮/
৭. সুকুমার সেন, *নট নাট্য নাটক,* দ্বিতীয় মুদ্রণ, ভাদ্র '৯১ পৃঃ ৬৯।
৮. বিজিত কুমার দত্ত, *প্রাচীন বাঙ্গালা-মৈথিলী নাটক,* প্রথম প্রকাশ-রথযাত্রা-১৩৮৭, ১৪ই জুলাই ১৯৮০, পৃঃ তেত্রিশ।
৯. শ্রী প্রবোধচন্দ্র বাগচী, *নেপালে ভাষা-নাটক,* সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৩৬, পৃঃ ১৭০।
১০. সুকুমার সেন, *নট-নাট্য-নাটক,* দ্বিতীয় মুদ্রণ, ভাদ্র '৯১, পৃঃ ৬৯।
১১. বিজিত কুমার দত্ত, *প্রাচীন বাঙ্গালা-মৈথিলী নাটক,* প্রথম প্রকাশ-রথযাত্রা-১৩৮৭, ১৪ই জুলাই ১৯৮০, পৃঃ ১০৩।
১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ একশ পঁয়ত্রিশ।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৫।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৮-১০৯।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১১।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৬।
১৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৭-১৩৮।
১৮. মৎকৃত রূপান্তর।
১৯. বিজিত কুমার দত্ত, *প্রাচীন বাঙ্গালা-মৈথিলি নাটক,* প্রথম প্রকাশ-রথযাত্রা-১৩৮৭, ১৪ই জুলাই ১৯৮০, পৃঃ ১৪-১৫।
২০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭-৪৮।
২১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।
২২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।
২৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।
২৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।
২৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।
২৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮১।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬।

২৯. শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, *নেপালে বাঙ্গালা নাটক*, ১৩২৪, পৃঃ ✓.

৩০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩-৪।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১-১৩।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬-৩৭।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৫-১১৬।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৫।

৪০. মৎকৃত ভাষান্তর।

৪১. শ্রী প্রবোধচন্দ্র বাগচী, *নেপালে ভাষা নাটক*, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৩৬, পৃঃ ১৭৬।

৪২. বিজিত কুমার দত্ত, *প্রাচীন বাঙ্গালা-মৈথিলী নাটক*, প্রথম প্রকাশ-রথযাত্রা-১৩৮৭, ১৪ই জুলাই ১৯৮০, পৃঃ সাতান্ন।

৪৩. সুরেশ চন্দ্র মৈত্র, *বাংলা নাটকের বিবর্তন*, প্রথম প্রকাশ ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ৪১।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪।

৪৫. শ্রী গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত, *রামানন্দরায় কবি সার্বভৌমেন বিরচিতম জগন্নাথবল্লভ নাটকম*, প্রকাশকাল ১৪ই এপ্রিল ১৯৯২, পৃঃ ৩।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১।

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ধ।

৫০. "It invests the play with a delightful operatic atmosphere. and justifies the description that it is a small samgita Nataka-". Vaishnava Faith and Movement-Dr. S. K. dey. 2nd edn. Calcutta. 1961 P.P. 577-580. প্রাগুক্ত, পৃঃ ফ।

৫১. শ্রী রাজমোহন নাথ (বি. ই. তত্ত্বভূষণ) সম্পাদিত, *কালিয়দমননাট* (শ্রী শ্রীশঙ্করদেব বিরচিত) প্রথম সং-১৮৬৭ শক-১৯৪৫ ইং, পৃঃ ২৩।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪।

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬।

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪-৫৫।

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২-৫।

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৯-৩৪০।

৬০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১-৪২।

৬১. সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত, বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া রচিত, *অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস*, Sahitya Akademi, New Delhi, 1985, পৃঃ ৩৫।

৬২. শ্রীরাজমোহন নাথ বি.ই. তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত, *কালিয়-দমননাট* (শ্রী শ্রীশঙ্করদেব বিরচিত) প্রথম সং-১৮৬৭ শক-১৯৪৫ ইং. পৃঃ ৯৩।

৬৩. সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত, বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া রচিত, অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস, Sahitya Akademi, New Delhi, 1985, পৃ: ৩৭।

৬৪. শ্রীরাজমোহন নাথ (বি.ই. তত্ত্বভূষণ)-সম্পাদিত-কালিয়-দমননাট (শ্রী শ্রীশঙ্করদেব বিরচিত) প্রথম সং-১৮৬৭ শক-১৯৪৫ ইং, পৃ : ৪৮।

৬৫. শ্রী অম্বিকানাথ বরা, এম. এ'র দ্বারা সম্পাদিত, মহাপুরুষ শ্রী শ্রীশঙ্করদেবের রচিত *রুক্মিণীহরণ নাট*, শক-১৮৫৪, ফেব্রুয়ারী ১৯৩২, পৃঃ ২১-২২।

৬৬. শ্রী রাজমোহন নাথ (বি. ই. তত্ত্বভূষণ। সম্পাদিত, *কালিয়-দমননাট* (শ্রী শ্রীশঙ্করদেব বিরচিত) প্রথম সংস্করণ-১৮৬৭ শক-১৯৪৫ ইং, পৃঃ ৪৮।

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯।

৬৮. প্রাগুক্ত (ও পরিশিষ্ট), পৃঃ (২)

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৬।

৭০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৭।

৭১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭১।

৭২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৩।

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪১।

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০।

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪২।

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৮।

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪০।

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫২।

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৪।

৮০. সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত, বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া রচিত, *অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস*, Sahitya Akademi, New Delhi, 1985, পৃঃ ৪০।

৮১. Rukminiharan is repercsentative of the class of dramas Written for and played of on the Assamese stage from Sixteenth Century upto the beginning of the last century. We find no mention of any Assamese Drama written or played before those of Sankardev. শ্রী অম্বিকানাথ বরা, (এম. এ.)র দ্বারা সম্পাদিত, মহাপুরুষ শ্রী শ্রীশঙ্করদেব রচিত, *রুক্মিণীহরণ নাট*, শক ১৮৫৪, ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ page 11. উদ্ধৃত মন্তব্য থেকে দেখা যায় যে, ষোড়শ শতকের পূর্বে আসামে লিখিত অথবা অভিনীত নাটকের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

৮২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২।

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪-৪৫।

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।

৮৫. *রুক্মিণীহরণ নাটের* শেষ ভটিমায় শঙ্করদেব তাঁর নাটককে 'কৃষ্ণনাট' 'হরিলীলা' প্রভৃতি নামেও আখ্যায়িত করেছেন—

যোহি বিষহ্রদ বাহু আস্ফালি।
করত কৌতুক নৃত্য কালি নিকালি।।
গোকুল রাখি বহ্নি করু পান।
সোহি করতু নিত্য মুকুতি বিধান।।
শ্রীরামরায়া ভকতি সুজান।
করাওত কৃষ্ণ নাট নিরমাণ।।
কৃষ্ণ কিঙ্কর ওহি শঙ্কর ভাণ।।
শুন শুন সাধু সভাসদ লোই।
মুরুখক দোষ ধরবি নাহি মোই।।
হৃদি মাধব মতি যোহি মোহি দিলা।
সোহি অনুরূপে করল হরিলীলা।।
যাহের যাইতে ইচ্ছা বৈকুণ্ঠ বাট।
শুনা সাবধান কয়ো কৃষ্ণক নাট।।

প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩। ['লীলা' ও 'নাট' এখানেও অভিন্নার্থে প্রযুক্ত]

৮৬. সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত, বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া রচিত, *অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস*, Sahitya Akademi, New Delhi, 1985, পৃঃ ৪১-৪২।

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩।

৮৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫।

পরিশিষ্ট

বেহুলা লখিন্দারের হাস্তর

১৯৮৫ সালে গ্রাম থিয়েটারের 'লোকনাট্য গবেষণা প্রকল্পে'র অধীনে সম্পূর্ণ পালাটি মানিকগঞ্জের তালুকনগর থিয়েটারের সভাপতি সাত্তার গায়েনের কাছ থেকে মৎ কর্তৃক সংগৃহীত হয়। পালাটি সম্পূর্ণভাবে মৌখিক রীতির—অর্থাৎ এর কোনো লেখ্যরূপ নেই। এ পালার সংক্ষিপ্তরূপ নিচে দেওয়া হলো—

বন্দনা ঃ প্রথমে বন্দনা করি আল্লাজির চরণ
তারপরে বন্দনা করি রাসুলের চরণ
ওকি হারে।।

শিব প্রতিদিন ব্রাহ্মণ নগরে গিয়ে 'দেবীগণকে সঙ্গে কইরে' নাচগান করতেন। এই ছিল তার খেলা। একদিন শিব পথে যেতে যেতে দেখতে পান একটি পদ্ম। সেই পদ্ম শুঁকতে গিয়েই হাঁচি দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে জন্ম হল পদ্ম বা মনসার। সে নাক থেকে বেরিয়ে মাত্র বলল 'আব্বাজান আপনি কোথায় চলেছেন'। সবাই শিবের সঙ্গে সুন্দরী কন্যা দেখে তাকে গঞ্জনা করল—

ঃ বিপদে পড়িয়া ঠাকুর জুরিল কান্দন।
নয়নেরও জলে কন্যা হইল আর একজন।।

এই কন্যার নাম নেতা। শিব দু'কন্যাকে লোহার ঝাঁপিতে লুকিয়ে রাখল বাংলা ঘরে। কিন্তু 'ঠাকরাণী' টের পেয়ে ইঁদুরকে আহবান করে 'হে ইঁদুর এই লোহার ঝাঁপি কি কেটে দিতে পার?' তখন ইঁদুর বলে 'মা আমাদের যে দন্ত আছে তা দিয়ে ঝাঁপি কাটা যাইবে না'। দেবীর বরে হীরার দাঁত হলো ইঁদুরের। তা দিয়ে ঝাঁপি কাটতেই পদ্ম ও নেতা বেরিয়ে 'মা' 'মা' বলে সম্বোধন করল ঠাকুরাণী (চণ্ডী)-কে। তখন—'যুদি এই কথা বলতে পারে তখন কি ঠাকরাণী দেরী করে? উরুৎ কইরা উঠে কিল গুরুৎ কইরা মারে, রাইত দুপুরের কালে যেমন গারলে (গাড়লে) চিরাকুটে। হেই রকম কিলাইবার শুরু করছে।'

বিতাড়িত ভগ্নীদ্বয় 'নুইছানি নগরে' যায়। মনসা পূজালোভী, সে চাঁদসদাগরের কাছ থেকে পূজা চায়। কিন্তু অনাহারে ক্ষুধার্ত সে, কি করবে!

—৩০

বেণের ছেলে ঃ শোনেন শোনেন সওদাগরণী বলিযে আপনারে।
ছিপের মূল্য বাইশ ভরি সোনা
আইনা দেন আমারে ও কি না রে।।

বেউলা সে পুকুরে গোসল করতে এল। বেজায় ঝগড়া হলো দুজনের মধ্যে। সে ঝগড়া লখিন্দারের রূপের প্রশংসার কারণে—

বেউলা ঃ এতদিনে উঠেরে সূর্য পুবেরও গগনে।
আইজ কেনে দেখিরে সূর্য পুষ্কন্নীর পারে
ও কি নারে।।

এই বিদ্রূপে ক্রুদ্ধ হলো বাণিজ-কুমার—

লখিন্দার ঃ এত দিন উঠেরে চন্দ্র পশ্চিম গগনে।
আইজ কেনে দেখিরে চন্দ্র পুষ্কন্নীর ঘাটে
ওকি নারে।।

চাঁদসদাগর অনেক দেখে শুনে তার পূর্ব-সম্পর্কিত বেহাই বেশর বেণের সপ্তম কন্যা বেউলার সঙ্গে কঠিন শর্তে বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে (উল্লেখ্য যে এ কাহিনীতে আছে, বেশর বেণের ছয় কন্যার সঙ্গেই চাঁদসদাগরের ছয় পুত্রের বিয়ে হয়)। লখিন্দার বিয়ের আগেই বাণিজ্য করতে যায়—একটা উপকূলীয় দ্বীপ কিনে সেখানে বাজার বসায়। নেতা বুড়ির বেশে বেউলাকে এই বাজারে আসতে প্ররোচিত করে। বেউলা সাজগোজ করে সে-বাজারে এল, রূপকাতর লখিন্দার তার পিছন নিল। তারপরে দু'জনের বাদ-প্রতিবাদ—

বেউলা ঃ তুমিতো রাজার নন্দন আমি ডোমের ঝি
তোমার সনে কইলে কথা আমার হবে কি?

লখিন্দার ঃ কোন শহরে বাড়ি কোন শহরে ঘর।
কি নাম তোমার মাতাপিতা কি নামটি তোমার।

ও কি নারে।।

বেউলা ঃ চম্পকনগর বাড়ি চম্পকনগর ঘর।
পিতার নামটি বেশর বাইনা আমি বেউলাসতী।
ও কি নারে।।

গায়েনের ভাষায়—

ঃ আষাঢ় মাইসা দিন, বৃষ্টি বাদলা দিন জল বাইঝা (জমে বা আটকে) আছে ফুল বাগানের ভিতর দিয়ে। দুই বইনে কী কার্য করছে?

প্রধান দোহার ঃ কি কার্য করছে?

গায়েন ঃ সেই ফুল বাগানের ভিতর দিয়া ঘুরতাছে আর ব্যাঙ ধইরা ধইরা খাইতাছে, চাঁদ সদাগর নিজ চক্ষে দেখে সেই দৃশ্য। তারপর যখন পূজা চাইল মনসা, সে ঘৃণাভরে বলল—'যাহা দিয়া ভজি আমি শিব-দূর্গামনি, আর আইজ সেই হস্তে ভজিব আমি ব্যাঙ খাউনা (ব্যাঙ খাওয়া) কানী'। পদ্ম গেল ঝালোমালো'র গৃহে। তাদের আয় উন্নতি মনসার বরে। সনকা লুকিয়ে এসে সে বাড়িতে পূজা দেয় পদ্মর। চাঁদ বাণিজ্যে গেল ছয় পুত্রকে নিয়ে। নেতা পদ্মর পরামর্শে ঝড় তুলল 'কালিদয়' সাগরে—

ঃ ঘুমুত কইরা পশ্চিম আকাশে ডাক দিয়া এছাই ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল—

উরগুরি গুরগুরি মেঘ সাইজা আইল বার মেঘ
তের মেঘে করলো অন্ধকারি রে
আমার মন তরঙ্গে।।
আগা পাছায় লগি ছান্দে গলাগলি ধইরা কান্দে
এক মরণে ছয়জন হৈল রাড়ী রে
আমার মন তরঙ্গে।।

ছয়পুত্রের মৃত্যু হলো। মনসার ক্রোধের শিকার হলো চাঁদসদাগর। নগ্ন, নিঃসঙ্গ চাঁদসদাগর ক্ষুধার্ত হয়ে ভীমরুলের বাসাকে কাঁঠাল মনে করে খেতে গিয়ে হূল খেল। ব্যথা বেদনায় জ্বর এল তার, সে কঁকাতে কঁকাতে চলল নিজের বাড়ি। এদিকে নেতা ব্রাহ্মণীর রূপ ধরে বাড়িতে গিয়ে বলল যে, 'আইজ তোমার বাড়িতে কঁকাইন্যা ডাকাইত আইসপার সম্ভাবনা আছে'। যথারীতি চাঁদসদাগর উলঙ্গ ও অসুস্থ হয়ে রাত দুপুরে গৃহে এলে সবাই 'ডাকাইত' ভেবে তাকে লাঞ্ছনা করলো। ছয়পুত্রের মৃত্যুর পর জন্ম হলো লখিন্দারের। সে বড় হলো। বাবা মাকে বলল তার জন্য একটা পুকুর খনন করতে। তাই করা হলো। লখিন্দার মাকে বলল, সে পুকুরে মাছ ধরবে তাই ছিপের প্রয়োজন। মা গেল বেণের কাছে—

সনকা ঃ শোন শোন বাইণার ছেলে বলি যে তোমারে।
আমার লখিন্দার বাইবে বড়শি
ছিপ গইড়া দে আমারে।।

বেউলাসতী তখন বলছে—

কোন শহরে বাড়ি তোমার কোন শহরে ঘর।
কি নাম তোমার মাতাপিতা কি নামটি তোমার।
ও কি নারে।।

লখিন্দার ঃ উজানিনগরে বাড়ি নুইছানীনগরে ঘর।
পিতার নামটি চান্দুবাইণা আমি লখিন্দার।
ও কি নারে।।

ঃ উজানিনগরে বাড়ি নুইছানিনগরে ঘর পিতার নাম চান্দুবাইণা আমার নাম লখিন্দার। হে বেউলাসতী, তোমার সাথে আমার আরও দুই একটি কথা আছে। বেউলাসতী বলছে—দেখ যুবক তুমি যদি ভাল চাও, তাহলে তুমি আমার পিছন ছাইড়া দেও। লখিন্দার বলছে—

ঃ তুমি গুপী আমি পতি এক সুতায় গাঁথা।
এক শয্যায় শুয়ে আমরা বলব রসের কথা।।

বেউলাসতী বলছে—

ঃ অমন কর কেনেরে অমন কেনে কর।
পরের রমণী দেইখ্যা জ্বইলা পুইরা মর।।
কোন শহরে বাড়ি তোমার কোন শহরে ঘর।
কি নাম তোমার মাতাপিতা কি নামটি তোমার।।
সহিতে না পার নাগর সহিতে না পার।
গলেতে কলসী বাইন্দা জলে ডুইবা মর।।

লখিন্দার ঃ কোথা পাব হাড়ি কলসী কোথায় পাব রশি।
তুমি হও মোর প্রেম সাগর আমি ডুইবা মরি।।

বেউলাসতী বলছে—

ঃ কেমন তোমার মাতাপিতা কেমন তোমার হিয়া।
এত বড় হইয়াছ নাগর না কইরাছ বিয়া।।

বেউলাসতী বলছে দেখরে, যুবক তো একেবারে মতিছিন্ন হইয়া গেছে কি করি উপায়। তখন বেউলাসতী বুদ্ধি যুগায়। বুদ্ধি যুগায়ে বলছে—

ঃ ওদিক চায়া দেখলো দাসী ওদিক চাইয়া দেখ।
সোনার পুতুল গাছে ঝুলে ভাল কইরা দেখ।

ও কি ও দাসিরে।।
পশ্চিমে সাজিল মেঘ দাসী চায়া দেখ।
সোনার পুতুল গাছে ঝুলে ভাল কইরা দেখ।
ও কি ও দাসিরে।।
উত্তরে সাজিল মেঘ দাসী চায়া দেখ।
সোনার পুতুল গাছে ঝুলে দাসী চাইয়া দেখ।
ও কি ও দাসিরে।।
পূবেতে ছান্দিল মেঘ দাসী চায়া দেখ।
সোনার পুতুল গাছে ঝুলে দাসী চায়া দেখ
ও কি ও দাসিরে।।

তারপর বিবাহযাত্রা, বিবাহ অনুষ্ঠান, কামার্ত পুরুতের বেউলার উপর আসক্তি ও বিষাক্ত দর্পণ-দর্শন। এই দর্পণে বিষমুখী নেতার মুখাবয়ব দেখে বিষক্রিয়ায় লখিন্দার ঢলে পড়ে।

বেহুলা মুহূর্তে চলে যায় মনসার কাছে—'জিয়ানো পাঙ্খা' এনে বাতাস করে মৃত লখিন্দারকে, লখিন্দার সুস্থ হয়। এদিকে চাঁদসদাগর সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কায় লোহার বাসর ঘর তৈরি করে কিন্তু তাতে মনসার নির্দেশে কামার সকলের অজান্তে রেখে দেয় একটি ছিদ্র। যথারীতি বেউলা লখিন্দারের বাসর ঘর নির্মিত হলো।

মনসা ইতোমধ্যে খবর দেয় তার সর্প-পুত্রদের। 'ধোনাই-মোনাই' দুইজনের মধ্যে 'ধোনাই' আটকা পড়ল মাছ খেতে গিয়ে, মোনাই ছুটলো কালিদহের উপর দিয়ে—

ঃ এদিকে 'মোনাই' কালিদহের সাগরের দিকে গরজাইতে গরজাইতে যাইবার শুরু করছে। কালিদহের সাগরের মাঝ দিয়া যখন গরজাইতে গরজাইতে যায় তখন 'উইঝাই নাগিনী' বলে হায়রে হায়, আমার উপর দিয়ে যদি একটি পশু-পক্ষী উইড়া যায় তাহলে আমার নাকের নিঃশ্বাসে পেটের ভিতর চইলা যায়। মোনাই যাইয়া উইঝাই নাগিনীর সামনে গিয়া কইবার শুরু করছে—

ঃ যাইতে হবে মায়েরও দরবারে।
উইঝানি নামে ঘর নামে চান্দুসওদাগর।।
যাইতে হবে লোহার বাসর ঘরেরে।
যাইতে হবে মায়ের দরবারে।।

তখন নাগিনী বলছে—দেখ আমার মায়ের কি বরাদ্দ। বাঁজা মায়ে কোন দিনই বেটার দরদ জানে না। কেমন হুকুম কইরা বইছে বাড়িতে বইসা বইসা। আমি হইলাম আশি গাও লম্বা আর ষাইট গাও বেড়ে, আমি সেই লোহার বাসর ঘরে কেমন কইরা ঢুকবো। মায়ের আদেশ পালন করতেই হবে। 'উইঝাই নাগিনী' ধোনাইকে সংগে করে মায়ের আদেশ পালন করতে আসতাছে। ঐ যে পথের মাঝখানে ধোনাই মৎস্য খাইবার যাইয়া মারা গেছে, তখন তাকে কি দিয়া জিলাবে? দেখে একটা গবরের নাদার ভিতর কিঞ্চিত বিষ দেখা যায়। তখন ঐ কিঞ্চিত বিষ দিয়ে ধোনাইকে তাজা করে মায়ের দরবারে হাজির হয়। তখন বলছে 'মা আমাকে কি জন্য আদেশ করেছেন'?

মনসা ঃ হে উইঝাই নাগিনী, তোমাকে এই জন্য ডেকেছি, চাঁদসওদাগরের পুত্র লখিন্দার আইজ বাসর ঘরে কালরাত পোহাইতাছে, তুমি সেই লখিন্দারকে দংশন কইরা দিবা। উইঝাই নাগিনী বলছে—মা আমি হইলাম আশি গাও লম্বা আর ষাইট গাও বেড়ে—আমি সেই ঘরে কেমন কইরা প্রবেশ করব?

মনসা ঃ আচ্ছা তোমারে যদি সেই ঘরে প্রবেশ করার ব্যবস্থা কইরা দিবার পারি তাহলে তুমি পারবানি?

উইঝাই ঃ তাহলে পারি।

ঃ যত নাগিনী ছিল সবাইকে হুকুম দিল—তোমরা এককাজ কর। তোমরা উইঝাই নাগিনীকে এমন 'ডলা ডলিবা' যে সূঁইয়ের ছিদ্র দিয়া সাতবার আনবা আর নিবা। এই কথা যদি বলতে পারে নাগিনীরা কি আর দেরী করে। যার যার মতন ডলন কাঠি দিয়া ডইলবার শুরু করছে। ডলতে ডলতে সূঁই-ছিদ্র দিয়ে সাতবার আনছে আর নিছে।

মনসা ঃ আচ্ছা উইঝাই তুমি এখন যাইতে পারবা লোহার বাসর ঘরে?

উইঝাইঃ হ্যাঁ মা আমি এখন চেষ্টা কইরা দেখবার পারি।

লোহার বাসর ঘরে ক্ষুধার উদ্রেক হল লখাইর। ভাত রাঁধতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল বেউলা। একটা কারণ তৈরি করে দংশন করল 'উইঝাই নাগ'। বিষ ' চেল্লা' মেরে উঠল শিরে, বেউলা চিৎকার করে উঠে—

ঃ আটতুরি উইঠা বিষ করে রিমি ঝিমি রে।
ও কি জাগ জাগরে।।

হরিষায় রাগ সারাইনার ঝি।
অইনা আমার এত প্রমাদ হইলোরে।।
বুকতুরি উইঠা বিষ করে রিমি ঝিমি রে।
ও কি জাগ জাগরে।।
বুকতুরি উইঠা বিষ করে রিমি ঝিমি রে।
ও কি জাগ জাগরে।।

সনকা বেউলার কাঁদন শুনে বুঝতে পারে, সে পুত্র হারা হলো আরও একবার—

সনকা ঃ ওরে গুনিগুনি স্বরে কান্দোন শুনি
লোহার বাসর ঘরে।
কি ধন হারাইছে ও তোর কি ধন নিছে চোরে।।

বেউলা ঃ গুনগুন স্বরে কান্দি হারে লোহার বাসর ঘরে।
আমার কপালে সিঁথার সিন্দুর লইয়া গেছে চোরে।।

তারপর লখিন্দারের শব নিয়ে বেউলার গাঙে ভাসার পালা। পথে পথে নানা বিপদ। এক গাঙের কূলে 'চিরিঙ্গাগুদা' বড়শি ফেলে বসে আছে। সে আত্মপরিচয় দেয় গানে গানে—

ঃ সকল গুদা বায়রে বড়শি খালে আর বিলে।
আমি গুদা বাইরে বড়শি গোসাঁই নদীর কূলে।।

বেউলাকে দেখামাত্র প্রেমার্ত গুদা বলে—

ঃ কোন শহরে থাক কন্যা কোন শহরে ঘর।
কি নাম তোমার মাতাপিতা কি নামটি তোমার
ও কি ও কন্যারে।।

বেউলা ঃ উজানিনগরে বাড়ি আমার নুইছানিনগরে ঘর।
পিতার নামটি বেশরবাইনা আমি বেউলাসতী
ও কি ও গুদারে।

গুদা ঃ হে বেউলা সতী তুমি মরা স্বামী নিয়া চলছ, ঐ মরা স্বামী নদীতে ফেলে দিয়ে তুমি আমার সাথে চল। অতি সুখ-শান্তিতে তুমি থাকবে—

ঃ খাওয়ার বড় সুখ বেউলা খাওয়ার বড় সুখ
তোমার জন্য রাইখ্যা থুইছি বার বছর‍্যা খুদ।

ও কি ও বেইলারে।।
শোয়ার বড় সুখ বেউলা শোয়ার বড় সুখ
ঘরে শুইয়া দেখবা তুমি চন্দ্র-সূর্যের মুখ।
ও কি ও বেইলারে।।
তেলের বড় সুখ বেউলা তেলের বড় সুখ
তোমার জন্য রাইখা থুইছি চুরুইঙ্গাগুদার মুত।
ও কি ও বেইলারে।।

চিরিঙ্গাগুদাকে কৌশলে ফাঁকি দিয়ে বেউলা ভাসতে ভাসতে চলল। এল কাকাতুয়া, সে তার স্বামীর মৃতদেহ খেতে চায়, পারে না। বেউলা আঁচল ছিঁড়ে কাগজ, হাতের আঙ্গুল কেটে রক্ত-কালি দিয়ে পত্র লেখে পিতাকে। পথে নেতা ভুলাতে চায়— বেউলা অনাহারে, তাকে কিছু খাইয়ে দিতে পারলে লখিন্দার আর পুনরুজ্জীবন লাভ করবে না। এ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। কিন্তু এবার ঝড় উঠায় নেতা। লখিন্দারের শব যায় হারিয়ে। বেউলা পাতাল দিয়ে আকাশ পুরে আসে নেতাই ধুপিনীর ঘাটে। সে কাপড় কাচার দায়িত্ব নেয়, মাসী সম্বন্ধ পাতে তার সঙ্গে—

বেউলা ঃ সকল ধুপা ধোয়রে কাপড় গঙ্গা বরণ জলে।
আমি ধুপা ধুইরে কাপড় দুগ্ধ বরণ জলে।।

নেতাই খুদজাউ রান্না করে। যথা সময়ে বেউলা আসে। দেখে নেতাইর ঘরে সমুদ্র নদীতে হত নানা মানুষের শুঁটকি। সেখানে লখিন্দার আর মৃত ছ'ভাইয়ের বিশুষ্ক শরীর। বেউলা উপবাস ভাঙেনা কারণ তাহলে তার স্বামী প্রাণ পাবে না ফিরে। সে খাওয়ার ভান করে। শেষে নেতাই শিবের কাপড় নিয়ে গেল স্বর্গে, বেউলা পিছন পিছন গেল তার।

শিব যখন ধৌত-কাপড়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলল—

ঃ হারে, এমন সুন্দরভাবে যে ধুপুনী কাপড় কাচছে তার যেন সিঁথায় সিন্দুর বজায় থাকে। অমনি বেউলা ঠাকুরের পায়ের উপর উপুর হইয়া পড়ে।

বেউলা ঃ গুরুদেব আমার সিথাঁর সিঁদুর শেষ করেছে আপনার কন্যা পদ্মদেবী।

তারপর নানা ঘটনান্তে লখিন্দার বেঁচে উঠল, সঙ্গে বেউলার ছয় ভাসুর। মহাদেব বেউলাকে বলেঃ হে বেউলা তোমার শ্বশুরকে বলবা আমি মনসার পূজা দিয়ে স্বামী ও ছয় ভাসুরকে জিলাইছি আপনি দয়া করে মনসার পূজা দিবেন। যদি না দেয় তখন কি কাজ করবা, যে প্রকারেই হোক মনসার পূজা আদায় করে দিবা। আমি

তোমার স্বামী ও ছয় ভাসুরকে জিলিয়ে দিচ্ছি। তখন মহাদেব ঠাকুর জিয়ন পাঙ্খা দিয়ে, বাউ দিয়ে সবাইকে জিলিয়ে দিলেন। ছয় ভাসুর ও স্বামী নিয়ে বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিছে। লখিন্দার ছয় মাস যাবত অনাহারী। বেউলাসতী নিজ হাতে পাক করে সবাইকে খেতে দেয় কিন্তু ছয় ভাসুর বলছেঃ হে বেউলা তুমি অসতী নারী। তোমার হাতে আমরা খেতে পারি না। বেউলা সতী কিনা অসতী তার প্রমাণ করে দেখতে হবে। তখন তারা আগুন জ্বালায়, বেউলাকে আগুনের ভিতর ফেলে দেয় কিন্তু বেউলার একটা কেশও আগুনে পুড়ে না —শুধু যে সূতা দিয়ে চুরুঙ্গাগুদারে উদ্ধার করছেন সেই সূতা একটু ঘামছে। ছয় ভাসুর বলছে হে বেউলাসতী, তুমি সতী নও অসতী! তোমার হাতের খানা খাওয়া যাবে না। তখন বেউলা উপায় না পেয়ে চুড়ি-বয়লা সাজিয়ে গ্রামের দিকে রওয়ানা হইলো আর ডেকে ডেকে বলছে—

ঃ ঝাঁকি মালা ঝুমঝুম মালা কে কে নিবে আয়লো।
সূঁই সূতা আলকলতা হাঙ্গর মাছের বয়লা লো।।
আমারও দোকানে যত রূপে আর বলিব কত।
আয়না আছে চিরুনী আছে আর মাথার ফিতালো।।

ডাকতে ডাকতে যখন চাঁদসদাগরের বাড়ি যাইয়া পৌছায় তখন চাঁদসদগরের ছয় বউ বাড়ি আছে। তারা বলছে—হে বাইদানী আমাদের বাড়িতে আস আমরা চুড়ি-বয়লা নিব।

যখন চাঁদসদাগরের বাড়ি যাইয়া উঠে তখন ছয় বউ বলছে—হারে এই বেদেনীর রূপ আমার ছোট বোনের রূপ, এই বেদিনী যেন আমার বাবার দেশে না যায় তা হলে ওকে দেখে যে আমার বাপ মা পাগল হয়ে যাবে। চুড়ি খরিদ করে যখন কড়ি দেয় তখন বেউলা বলছে—আমি কড়ির কাঙ্গাল না, আজ ছয় মাস যাবত আমার ভাসুর ও স্বামী অনাহারে আছে—তোমাদের পাকে যদি কিছু থাকে আমাকে দেও। তখন চাঁদসদাগরের বাড়িতে খাইদাই শেষ। পাকে ভাত নাই। কিছু 'এঁচড়া' ভাত ছিল তাই বেদেনীর হাতে দিছে। সেই ভাত নিয়ে সবাইকে দেয়। তখন সবাই মিলে খায়। আর মাঝিরা ধীরে ধীরে নৌকা বাইবার শুরু করছে। তারা খায় আর মনে মনে কয়, এমন সুসাধের ভাত অনেক আগে আমার মায়ের হাতে খেয়েছিলাম।

এদিকে নৌকা গিয়ে চাঁদসদাগরের বাড়ী যাইয়া ভিড়ল। নৌকা থাইকা নাইমা বেউলাসতী বলছে-শ্বশুর ঠাকুর আমরা সবাই বাড়ী ফিরা আইছি। সবাই একত্র হইয়া আমোদ-ফুর্তি কইরবার শুরু করে দিল। তখন বেউলা বলছে-শ্বশুরঠাকুর

আমি মনসার পূজা দিব বলে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি আপনাকেও মনসাদেবীর পূজা দিতে হবে।

চাঁদসদাগর বলছে—হারে সারামজাদী, যে হস্তে ভজিব আমি শিব দুর্গামনি আর সেই হস্তে ভজিব আমি ব্যাঙ-খাওনা কানী। কখনো হতে পারে না।

তখন কি কার্য করে? মনসাকে বলছে—আমার শ্বশুর যখন পূজার আয়োজন করে—পূজা দিতে যায় তখন পিছন থেকে কাছা খুলে দিবা, কাছা-আঁটার জন্য সে যখন ডান হাত আগাইয়া দিবে, তখন তুমি বাম হাত থেকে পূজা আদায় করে নিবে। এই কথা যদি শুনতে পারে মনসা কি আর দেরী করে! যখন চাঁদসদাগর পূজার সামগ্রী নিয়ে যায় তখন মনসা পিছন থেকে কাছা ধরে দেয় টান। কাছা যখন খুলে গেছে চাঁদসদাগর ডান হাত দিয়ে কাছা ধরছে তখনি মনসা বাম হাতের পূজার সামগ্রী থাপা'দা নিয়ে দেয় দৌড়। মনসা জোরপূর্বক পূজা আদায় করে নেয়। মনসাদেবীর পূজা আদায় হইয়া গেল। চাঁদসদাগর তার সাত পুত্র ও বউ নিয়ে সদাগরণীকে নিয়ে সুখ শান্তিতে গেরস্থালী করবার শুরু করল। আমার কিস্‌সা শেষ হইয়া গেল—

ঃ যাও কিস্‌সা বনে
আবার ডাকিব যখন আসিবে আবার মনে।

দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ কাহিনীর অন্তর্গত রসে হাস্য ও কারুণ্য একীভূত। হাস্তর রীতিতে পরিবেশিত এ গল্পে কোন রূপ কৃত্য-চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না।

মনসার এই কাহিনীতে বেহুলার নৃত্য প্রসঙ্গ নেই। যদি একই সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত লোককথায় স্বর্গসভায় বেহুলার নৃত্য প্রসঙ্গ না পাওয়া যায় তবে মনসামঙ্গলের কাহিনীর বিবর্তনের একটি বিশেষ ইঙ্গিত এ থেকে লভ্য হতে পারে। সেক্ষেত্রে এরূপ প্রমাণিত হতে পারে, যে-কালে মনসাকথা কবিদের হাতে কাব্যরূপ লাভ করছিল—লোক-কথায় পরিবেশিত কাহিনীটি তারও আগের।

কাপড় কেচে শিবের বর লাভের প্রসঙ্গে বলা যায়, 'ধোপার পাটে', কাঞ্চনকন্যা কাপড় কেচেই রাজকুমারের প্রণয় লাভ করেছিল। কাজেই শুদ্ধভাবে কাপড় কাচার সঙ্গে জীবনের শুভ সংসর্গ লাভের কথা অন্যত্রও আছে।

উল্লেখ্য, এ পালায় সমগ্র অভিনয়ে, স্থানে স্থানে প্রধান গায়েন বা বায়েন সচরাচর মূল গায়েন-অভিনেতার কথার রশ্মি ধরে প্রশ্ন করেঃ কি কার্য করেছে? গায়েন তখন তার উত্তর দেয়। এর ফলে সমগ্র পরিবেশনায়, রূপকথা বা গল্পকথা পরিবেশনের আস্বাদ সৃষ্টি হয়।

পরিশিষ্ট-২

গাজীর গান ঃ জামাল কামালের পালা

'গাজীর গানে'র বিভিন্ন উপকথামূলক পালাগুলো, পুথি আকারে কখনও মুদ্রিত হয়নি। এই পালাসমূহ আজও মৌখিকরীতিতে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পরিবেশিত হয়ে আসছে। মানিকগঞ্জ জেলার জামশা অঞ্চলে প্রচলিত প্রখ্যাত গায়েন মরহুম হাকিম আলী'র পরিবেশনা থেকে সংগৃহীত এরূপ একটি পালা 'জামাল-কামালের পালা'। গায়েনের ভাষাসহ এ পালার সংক্ষিপ্ত রূপ নিচে উদ্ধৃত হল—

ঃ প্রথমে, আল্লা রসুল ও পীর বন্দনা। এরপর পিতামাতা, ওস্তাদ, সবার উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন। গায়েনের আত্মোপলব্ধি, সংসার আবর্তে স্রষ্টার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্মৃতি বর্ণনা এর নাম 'মনোশিক্ষা'।

।। পালার কাহিনী সংক্ষেপ ।।

'জাল্লাল' শহরের বাদশাহ শানে সেকান্দার ছিলেন নিঃসন্তান। পুত্র কামনায় অধীর হয়ে তাঁর স্ত্রী একদিন বলল ঃ প্রাণনাথ, এমন ভাগ্য আমার হলোনা এই ভবে যে কেউ শুধাবে আমাকে 'মা' বলে। প্রাণনাথ আমি আপনার কাছে বলি, হইলাম না জগতে কোন সন্তানের জননী।

শুনে বাদশা তখন বলছে ঃ বিবি সেটা তোমার-আমার ইচ্ছা না। যিনি সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি চান। তার নাম লইয়া তুমি কর ক্রন্দন।

তখন বাদশার স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে আল্লার সমীপে নিবেদন করল—

ধুয়া ঃ একটি বেটা দেগো আল্লাহ একটি বেটা দে।
ওরে কামাই খাইবার সাধ নাই মরলে মাটি দিবে কে।।

এই প্রার্থনায় আল্লাহ শুনলেন। শুনে জিব্রাইলকে বললেন—

ঃ আয় জিব্রাইল, শানে সেকান্দার বাদশাকে আমি যখন দুনিয়ায় পাঠাইলাম, ধনরত্ন পুত্র সন্তান সব আমি ওর জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলাম। লোভিত হইয়া সে বাদশাহী তখন, নিয়া চাহিল পুত্র সন্তান, কিছু নাহি আমার তরে (কাছে) কামনা করিবার। জিব্রাইল, আমার নাম হল বাঞ্ছা কল্পতরু। জীবে আমাকে বলে পূর্ণময়ী— কেন? জীবের আশা আমি পূর্ণ, করলে করতে পারি সেই জন্য। চাহিয়াছে একটি পুত্র, নিশ্চয় সে বাদশার ঘরে দিব আমি একটি পুত্র।

আল্লাহর কৃপায় বাদশার স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার হল। এখানে গায়েন বলে—

ঃ আচ্ছা তা হলে কি একরাত্রে মার্তৃগর্ভে একটি সন্তান সৃষ্টি হয়।

ঠেটা ঃ তা গায়েন সাব, কোন কোন দিনে কি গঠিত হইতাছে।

গায়েন ঃ সোমবারেতে তিনটি, মঙ্গলবারেতে নাভি, বুধবারেতে বত্রিশ নাড়ী, বসাইছে সারি সারি। বিষ্যুদবারে দিছে আল্লা মুখেরই গঠন, শুক্রবারে দান করেছে আল্লা চক্ষু নিরাঞ্জন। শনিবারেতে----রবিবারেতে মাথা, এই সাত দিবসে জনম হইল, জন্মের নাই আর কথা। তাহলে সাতদিনে শিশুর দেহ গঠন হয়, দশমাস দশদিন মাতৃগর্ভে রয়। কিভাবে রয়—

ঠেটা ঃ কি ভাবে রয়?

গায়েন ও প্রথম মাসের কালেতে উত্তম রহে নীর।

দোহার ঃ দুইঅনা মাসের কালেতে একাম শরীর।।
তিননা মাসের কালেতে রক্তমাংস ঘোলা।
চাইর না মাসের কালেতে হাড়ে মাংসে জোড়া।।

বেগমের গর্ভ সঞ্চারের আনন্দে বাদশা আল্লাহকে ভুলে গেল। ক্রুদ্ধ আল্লাহ তাই বলছেন—

ঃ বাদশার নন্দন, আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে স্বামী-স্ত্রী দুইও জন। আমার নাম মুখে কেহ নিল না। এমন দশা ঘটাইয়া দিব তোমাদের কপালেতে, জন্মিবে পুত্র কিন্তু কোলে নিবার সাধ্য দিব না কাহাকে।

আল্লাহর ইশারায় সিকান্দার বাদশা ও তার স্ত্রী পাশা খেলতে বসলেন। পাশা খেলতে গেলে এক শিয়াল ছানা দেখে দু'জনের মধ্যে বাজি হলো, ছানাটি কুকুরের না শিয়ালের। বাদশা বললেন কুকুর ছানা, বিবি বলল শিয়াল ছানা। উজিরের ষড়যন্ত্রে প্রমাণিত হল যে সেটা কুকুরের ছানা। বাজি অনুসারে স্ত্রী কাঙালিনীর হল বনবাস। বাদশা নিজে গিয়ে পৌছে দিলেন স্ত্রীকে অগম্য অরণ্যে। উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় এক বাঘের সাক্ষাৎ পেল কাঙালিনী—

ঃ বাঘে তখন কাঙালিনীকে বলছে 'ওহে কাঙালিনী, আমি যে বনের পশু একটা বাঘ।আমাকে কি চিন তুমি?

ঃ হ্যাঁ বাঘরে, তোকে আমি চিনি।

ঃ বাঘে মানুষ খায়, শুনেছ কোথায়।

ঃ হ্যাঁ নিশ্চয় বাঘে মানুষ খায়।

ঃ তুমি-তুমি আমার পানে ছুটে আস, তোমার প্রাণের ভয় নাই।

কাঙালিনী তখন বাঘকে বলে—

ঃ বাঘ আমি তোর কাছে প্রাণ দিতে এসেছি তাই তুমি শীঘ্র আমাকে ধরে খাও। আমার মনে যত দুঃখ আছে, সব দুঃখ তুমি দুর করে দাও।

এরপর সন্তান সম্ভবা কাঙালিনীকে দেখে বাঘ নিজের দুটি সন্তান হারানোর বেদনা ব্যক্ত করল। সে কাঙালিনীকে নিয়ে গেল তার আবাসস্থলে। যথা সময়ে কাঙালিনীর সন্তান প্রসব করল। এ সময়ে খোদা ও জিব্রাইলের পুনরায় কথোপকথন—

ঃ দেখ তুমি চাহিয়া, আমি কিভাবে দেই কাঙালিনীকে এখান থেকে সরাইয়া।

কাঙালিনী এ সময়ে বাঘের কথামত নবজাত শিশুকে বুকের দুধ দিতে যাচ্ছিল, আল্লাহর ইশারায় সে এবার থমকে দাঁড়ায়—

ঃ ওরে বাঘ, ছেলে কোলে নিব আগে আর তার কাছে যাইতে পারব না আমি। আম্যাদের শাস্ত্রের নিয়মনীতি আছে, রুধির পরিস্কার না করে যাইতে পারবনা ছেলের কাছে। তাহলে তুমি আমার কথা লেও, কোথায় আছে নদীনালা সাগর সে রাস্তা তুমি আমায় দেখায়ে দেও। নদীর জলে করিয়া বসন পরিস্কার, ছেলে কোলে লইব কাছে আসিয়া তোমার। বাঘে বলছে, বিপদে ফেলেছ তুমি এখন আমারে, নদীনালা-সাগর সহজ কথা নয়, আছে বহুদূরে। দক্ষিণ দিকে গিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া, গিয়াছে কাঙালিনী সমুদ্রতীরে চলিয়া। ছিল তখন ফাল্গুন চৈত্রমাস, ছেড়েছে দক্ষিণা বাতাস। সাগরে উঠেছে ঢেউ, নদীর তীরে নাই কেউ। (---?) সাগরের তীরে হেঁটে হেঁটে, বিবি তাই দেখে। আকাশেতে হল বেলা দ্বিতীয় প্রহর, বাঘে বলে কাঙালিনী এখন পর্যন্ত নিলে না তোমার ছেলের খবর। এমন যে সুন্দর ছেলে ছিল, কানতে কানতে চেহারা কালো হইয়া গেল। এই ছেলে মরে যাবে দুগ্ধ বিনে। যদি দুগ্ধ বিনে ছেলে মারা যায়, তখনতো কাঙালিনী ঠেকাবে আমায়। আমি তোমার দোষী হইব না। রইল তোমার ছেলে পড়ে, আমি চললাম এই বন ছেড়ে। আকাশেতে হইল বেলা দুইপ্রহর। ছেলের গায়ে রোদ লেগে ছেলে অস্থির। মা মা বলে ছেলে কেন্দে অস্থির। আল্লাহর কাছে জিব্রাইল বলছে, ছেলে মইরে যাবে। আল্লা বলছে তুমি তামাশা দেখ—তবে বনের যত পাখি ছিল, আল্লাহ্ পাক তখন সব পাখিকে হুকুম করলো ঃ পাখিগণ বাসার মায়া ত্যাগ করে, যার যার সন্তানের মায়া

পরিত্যাগ করে বাঘের বাসায় ছেলে কানছে—শীঘ্র তাকে ছায়া কর গগনতুল্য হইয়া। যত পাখি বনে ছিল সব পাখি বাসা পরিত্যাগ করিয়া বাঘের বাসার বহু উপরে, পাখে পাখে হেলান দিয়া তখন ছেলেকে ছায়া করিয়া রাখিল।

ঠেটা ঃ কি কি পাখি গায়েন সাব?

গায়েন ঃ (গান) আল্লা সৃষ্টি করছে পাখি কত রঙ বিরঙে
পাখি উড়িয়া বেড়ায়রে।।

এরপর অজস্র পাখির নাম বলে গায়েন নেচে নেচে।

শুরু হয় কাহিনীর দ্বিতীয় পর্ব। নিজাম নামে এক সওদাগর মিষ্টি পানির খোঁজে এসে ছেলেটিকে একাকী দেখতে পেয়ে তুলে নেয়। কাঙালিনী হঠাৎ সমুদ্রতীরের বনে বানরের বুকে আঁকড়ে ধরা শিশু দেখে পরিহাস করল কাঙালিনীকে, উল্টো বানর তাকে তার সদ্যোজাত শিশুকে বিস্মৃত হবার জন্য তিরস্কার করে। সম্বিত ফিরে পেয়ে কাঙালিনী ছুটে যায় বনে। না শিশু নেই। সে তখন বিলাপ করে—

গায়েন ঃ (গান) এই যে খালি বাসা কাঙালিনী যখন দেখতে পাইল।
ও
দোহার ঃ হা পুত্র হা পুত্র বলি তখন কান্দিতে লাগিল।।

এদিকে নিজাম সওদাগর গৃহে প্রত্যাবর্তন করার পর, তাঁর স্ত্রী কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেটিকে প্রতিপালন করতে অস্বীকার করল। নিজাম অগত্যা বাড়ীর পাশে 'ছোতন' দাই-এর হাতে তুলে দিল অনামা শিশুটিকে। সওদাগরের আরেক পুত্র, তার নাম 'কামাল। কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেটার নাম রাখা হল 'জামাল'। দুজন এক সঙ্গে সহোদর ভাই হিসাবে বড় হল। জামাল খুব মনোযোগী ছাত্র—'বত্রিশশাস্ত্র' শিখে ফেলল সে অল্পদিনেই। কামাল বদমেজাজী নিষ্ঠুর, পড়াশুনায় ভাল করল না। কামালের মা তাকে পালকপুত্র জামালের বিরুদ্ধে দিনে দিনে ঈর্ষান্বিত করে তুলে। তারা প্রাপ্তবয়স্ক হলে একদিন 'বিনাকড়ির বাণিজ্যে' যাত্রা করল। বিনাকড়ি হলেও কামালকে গোপনে তার মা অর্থ দিলেন। কামালের বাণিজ্য বহরে ভালো ভালো নৌকা আর জামালের জন্য যত পুরানো আর ভাঙা নৌকা।

গায়েন ঃ ----আর জামালের মাঝি-মাল্লা ওরই পিতার কালের যত বুইড়া পুইরাণ মাঝি-মাল্লা ছিল সেই সমস্ত মাঝি-মাল্লা সংগ্রহ করলো, আড়াভাঙ্গা চেল্লাখাওয়া মানুষ। মানুষ আড়-খাওয়া থাকে না?

ঠেটা ঃ থাকেনা গায়েন সাব।

গায়েন ঃ আচ্ছা তাইলে তুমি আড়গিলা (হাড়গিলা) মানুষ কাকে বল?

ঠেটা ঃ আড়গিলা মানুষ চিনেন না গায়েন সাব।

গায়েন ঃ মন গিড়া (?) তুমি কাকে বল।----

তারপর যথারীতি বাণিজ্য গেল জামাল ও কামাল। কিন্তু—

ঃ যাত্রা কইরা যাচ্ছে কামাল
আরে বিধি হইল বাম।
ওরে যাত্রা কালে ভুইলা গেল আল্লা নবীর নাম।
ও হায় আল্লা নবীর নাম।।
ওই দশা মন তোমার হবে
ও হায় যম কিরে তোর ছাড়ে।।
ঐ দশা মন তোমার হবে
শেষে পড়বিরে ফেরে।।

কামাল, জামালের 'সাতরোজ' আগে যাত্রা করল। কিন্তু 'শনির দশায়' কামাল যথারীতি মাল্লাদের উপর শুরু করল নিষ্ঠুরতা—

নৌকা নিয়া কামাল সওদাগর তখন রওয়ানা হইল। মাঝি-মাল্লা সকলকে তখন বলে দিল—ওরে মাঝি-মাল্লারা রওয়ানা আমি করছি ধর্মদেশে 'বিনাকড়ির' বাণিজ্যেতে বলি তোমাদের ঠাই, একটি কথা মনে রাইখ সদাই! কি কথা? যে, সমস্ত দিন নৌকা বাইবা অতি জোরে—সন্ধ্যা হলে একেকজন থাকবা শুয়ে ছটাক চাইলের ভাত খেয়ে, পর রাত্রি ঘুমাইয়া, নৌকা ছাইড়া দিয়া, সন্ধ্যা হইলে ছটাক চাইলের ভাত একজন পাবা। এই কথা শুনিয়া মাঝি-মাল্লা তাদের প্রাণ গেল উড়িয়া। কারো সাথে কারো কথা রক্ষা নাই হয়, কিলাকিলি হুলাহুলি দৌড়াদৌড়ি করতাছে সবাই।

ঠেটা ঃ তাগরে আইজ বাণিজ্যের হাদ দিব মিটাইয়া, নিব এই চোটে--।

জামাল যাত্রাক্রমে 'ছোতন দাই', কামালের জননী সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিনাকড়ির বাণিজ্যে গেল। যাবার আগে ছোতন দাই গাজীপীরের আসন সাজল তারপর সেই—

ঃ পীরের আসন নিয়াছে, ধীরে ধীরে গাজীর আসন সাজাইয়াছে। গাজীর আসন সাজাইয়া হৃদয়ের চোখেতে গাজীকে ধরিয়াছে। কাছে আনিয়া কি করছে

তখন? জামালের হাত পীরের হাতে করছে অর্পণ 'বাবা ফকির দেওয়ান, মাতৃহারা পিতৃহারা শিশু তোমার হস্তে আজ আমি করিলাম অর্পণ। কালুরে লইয়া সাথে, সদা সর্বক্ষণ থাইক্য তুমি জামালের নৌকাতে।

দাই আর্শীবাদ করে বলল—

গায়েন
ও
দোহার ঃ যাও যাও যাওরে নীলমণি
তোমার কার্য যেন হয় ফতে।
ওরে তোমাকে সুপিলাম আমার
আল্লা নবীর হাতে।।---

এরপর জামালের যাত্রা উপলক্ষে পাখিদের বর্ণনা। ঠেটা ও গায়েনের দীর্ঘক্ষণ ধরে উক্তি-প্রত্যুক্তি—

গায়েন ঃ জামালের নৌকার গর্জন শুনিয়া নদীর ধারে যে বন ছিল বনে যত পশু পাখি ছিল, সব চলছে তারা বন ছাইড়া পলাইয়া।

ঠেটা ঃ ও নায়েন (ঠেটা গায়েনকে 'নায়েন' বলে উল্লেখ করল) সাব, কি কি পশুপাখি বন ছাইড়া পালাইয়া গেল।

গায়েন ঃ তাও বলতে হবে, না? গরু গাধা শৃগাল।

ঠেটা ঃ ও গায়েন সাব এই যে কইলেন এর মধ্যে কোনটা উড়তে পারে না?

গায়েন ঃ না এর মধ্যে কেউ উড়তে পারে না। এর নাম হইল পশু।

ঠেটা ঃ পারে একটা উড়বার জন্য হ।

গায়েন ঃ কোনটা উড়তে পারে?

ঠেটা ঃ বুদবুইদা পাখি।

গায়েন ঃ বুদবুইদা তুমি কাকে বলে বল।

ঠেটা ঃ খাটাশকে।

গায়েন ঃ কোথায় দেখলা খাটাশ উড়তাছে?

ঠেটা ঃ ও গায়েন সাব ও তো সেদিন সারাইলা দেখাইলাম খাটাশ উড়বার লাগছে।

গায়েন ঃ কি ভাবে উড়বার লাগছে, কিভাবে বা!

ঠেটা ঃ উড়বার লাগছে গায়েন সাব। সন্ধ্যা বেলা দেখি কি ঐ শালার খাটাশ করছে কি এ বাড়ীর চর্তুদিক দিয়া আস্তে আস্তে ঘুইরা বেড়াইতাছে।

গায়েন ঃ সন্ধ্যা বেলা।

ঠেটা ঃ হ সন্ধ্যা বেলা।

গায়েন ঃ আচ্ছা।

ঠেটা ঃ শালাটা ঘুইরা খারাইয়া করল কি ঘর ছেমাই এক মুরগী ধইরা পাটক্ষেতে মেলাদিল, চেরচেরাইয়া উইড়া।

গায়েন ঃ বুঝছি তোমার ভুল, যখন এই খাটাশ মুরগী লইয়া যাইতেছিল সম্ভব মুরগীর পাখার ছাট নাগছিল।

ঠেটা ঃ হ।

গায়েন ঃ তুমি মনে ভাবলা খাটাশটাই বুঝি মুরগী লইয়া উইড়া যাইতেছিল।

ঠেটা ঃ ও গায়েন সাব। তাইলে মুরগী খাটাশের উপরে আছিল।

গায়েন ঃ হ, আহ্লাদ কইরা খাটাশ মুরগীকে পৃষ্ঠে করিয়া নিতে ছিল।

ঠেটা ঃ আর নিতে পারে দুএকবার—আহ্লাদের চোটে।

গায়েন ঃ চুপ। খাটাশ মুরগী আপোস নাই।

ঠেটা ঃ আরে যখন ধরে গায়েন সাব তহন ধরে 'ও' মুরগী আপোস অইয়া উঠছে।

গায়েন ঃ যার পাখা আছে সেই উড়তে পারে তারে বলে পাখি।

ঠেটা ঃ আচ্ছা তাইলে কোন কোন পাখি উড়তে পারে বলেন।

গায়েন ঃ তাও বলতে হবে।

ঠেটা ঃ হ, হ,

গায়েন ঃ আচ্ছা।

ঠেটা ঃ তারপর উইড়া চলল গুইসাপ এক পাখি।

গায়েন ঃ আমি বললাম এইগুলা পাখি। আর তুমি বল—গুইসাগ 'পাখি'।

ঠেটা ঃ পাখি।

গায়েন ঃ তোমার এই পাখি উড়তে পারে?

ঠেটা ঃ খুব উড়বার পারে গায়েন সাব।

গায়েন ঃ কোথায় দেখলা তুমি গুইসাপ উড়তে।

ঠেটা ঃ কলাকোপা দেইখ্যা আইছিলাম একবারে।

গায়েন : উড়বার লাগছে!

ঠেটা : হ।

গায়েন : কি ভাবে উড়বার লাগছে।

ঠেটা : আরে কিভাবে বা উড়বার লাগছে গায়েন সাব। ... দেখলাম কি একটা বাড়ির পাশে আছে একটা মাইঠাল।

গায়েন : বেশ।

ঠেটা : আর ঐ মাইঠালের পাশে আছে একটা কলার ছোপ।

গায়েন : কলার ছোপ, আচ্ছা।

ঠেটা : আর ঐ মাইঠালে আছে ফুটং পানি।

গায়েন : বিষ পানি।

ঠেটা : ঐ শালার গুইসাপ করছে কি অতবড় ঐ কলার গাছে আমচি-ঘামচি পাইড়া ওঠে।

গায়েন : আচ্ছা ওঠল।

ঠেটা : উইঠা করবার লাগছে কি উইড়া উইড়া গবর গবর—ঐ মাইঠালে পড়ল।

গায়েন : ও মাইঠালে পড়বার সময় গবর উইড়া পড়তাছে।

ঠেটা : উইড়া উইড়া পড়তাছে।

গায়েন : আচ্ছা ওর কোন পাখা-পয়ব।

ঠেটা : ওর তো কোন পাখা-পয়ব দেখলাম না গায়েন সাব।

গায়েন : তবে।

ঠেটা : এই এতটুকু একটা নেজ আছে। ঐ দিয়া-

গায়েন : তাই হল তোমার পাজি (পাখিকে কৌতুক করে পাজি বলছে)

ঠেটা : পাজি।

গায়েন : ও পাজি না পাখি না ও গুইসাপ, কখনও উড়তে পারে না। পাখিগুলাই উড়তে পারে।

ঠেটা : আচ্ছা গায়েন সাব এত ছোট ছোট কয়েকটা পাখির নাম কইলেন। আরও কত বড় বড় পাখি রয়ে গেল।

গায়েন : আরও বড় বড় পাখি রয়ে গেল?

ঠেটা : হ।

গায়েন : আমি তো বাল্যশিক্ষায় এর চেয়ে বড় পাখি আর দেখি নাই।

ঠেটা ঃ আরে বাদ দেন গায়েন সাব বাল্যশিক্ষা।

গায়েন ঃ অ্যাঁ।

ঠেটা ঃ শিশুশিক্ষার মধ্যে দেখছি যে এরচেয়ে কত বড় বড় পাখি উপুর হইয়া পইড়া খামচি দিয়া পইড়া রইছে।

গায়েন ঃ বাল্যশিক্ষা পাইলাম না আর তুমি শিশুশিক্ষায় দেখলা?

ঠেটা ঃ দেখলাম তো।

গায়েন ঃ ও তাইলে আরও শুনবার ইচ্ছা?

ঠেটা ঃ হ-হ।

গায়েন ঃ আচ্ছা শোন।

গান ঃ ওরে সংসারেতে যত পাখি
পয়দা করেছেন আল্লাহ--হাদী
হোমা পাখি সবারও সর্দার
ওরে হোমা পাখি.......।।

কামাল আগে আগে গেলেও জামালের নৌকার বহর কামালের সঙ্গে একত্রিত হল। জামাল গাজীর নামে সিরনি দিল নদীর তীরে। সারাদিন সিরনি দেবার পর নৌকায় আর কোন খাবারই রইল না। এমন সময় গাজী কালুকে বললেন—

ঃ তোমার যত ভক্তজনা, সকলের চেয়ে আমার চেনা, বলি তোমার ঠাঁই, কত দ্বারে আম যাব না কইল ভাই। কোন ভক্তের দ্বারে যাবা না। তুমি কিভাবে আমার ভক্তগণকে চিনলা। কালু তখন বলতেছে, তোমার প্রথম ভক্ত চাপাইনগরে ছিরু সর্দার নাম তার। একদিবসে গিয়েছিলাম তার দ্বারে। চারটা খাইবার জন্য চাইয়াছিলাম। ভাই পাহাড় পরিমানে খাজনা আইসা ধরছিল মোর ঘাড়ে। খাবার চাওয়ায় কি আমার ঘটে হইয়াছিল। ঘাড় ধইরা দিয়াছিল তাড়াইয়া। ভাই আইজও যদি মনে পড়ে ঘাড়টা ফিরাইতে পারি না। মনে হয় যেন সেই ব্যথাটা রয়েছে মোর ঘাড়ে আটকাইয়া। এই হল তোমার প্রথম ভক্ত, তোমার দ্বিতীয় ভক্ত হইল 'ময়মন আরা' নাম তার। একদিবসে গিয়াছিলাম তার দ্বারে। তখন তোমার ছিল সুদিন আমার ছিল কুদিন।

গাজী পরীক্ষা করতে গেলেন জামালের কাছে।

জামালের আতিথেয়তায় তুষ্ট হয়ে তাকে দিলেন এক 'কুদরতী-তীর'। একদা সর্বত্রগামী এই কুদরতী তীর নিয়ে এল রাক্ষসের দেশ থেকে তিনটি 'লালের-

চপর'। গাজীর দয়ায় জামাল পেল কুদরতী-তীর। দু' ভাই দুদিকে গেল, কামাল গেল যে দিকে উত্তম বাণিজ্য হয়, আর জামালকে সে পাঠাল রাক্ষসের দেশে রক্তবর্ণ নদীর স্রোতে। জামাল উপস্থিত হল রাক্ষসের রাজ্যে। সেখানে রাক্ষস-কন্যার সন্তান প্রসবের ঔষধ হিসাবে সে কুদরতী তীর দিয়ে হরিণ শিকার করে হরিণের 'পোশ' দিল। রাক্ষস কন্যার বার বছরের গর্ভ মুক্ত হল। বিনিময়ে জামাল পেল ধনরত্ন। ওদিকে কামাল শনির দশায় পড়ে এক দেশের রাজকন্যার গলার হার চুরির অপরাধে বন্দী হল।

জামাল উদ্ধার করল তাকে। নিঃস্ব কামাল রাতে হত্যা করতে উদ্যত হল জামালকে। পরে পাশাখেলার গুটি 'লালের চপর' থেকে তিনটি মাণিক্য দিয়ে রেহাই পেল জামাল। কামাল ফিরে গেল গৃহে, সঙ্গে জামাল। জামাল তার লাভের অংশ নিয়মমত সবার মধ্যে বিতরণ করল, কামাল 'লালের চপর' দিল পিতাকে। পিতা তা নিয়ে গেল সিকান্দার বাদশার কাছে বিক্রী করতে। বাদশার উজির বলল 'লালের চোপরে'র সঙ্গে মুক্তাগাঁথা ছক লাগে সুতরাং এই মূল্যবান 'কোট' ছাড়া 'চপর' অর্থহীন। কাজেই বিপদে পড়ল কামাল- সে ত জোর করে এই মূল্যবান মাণিক্য নিয়েছে জামালের কাছ থেকে, কিন্তু তা কোথা থেকে এল জানা নাই তার। ক্ষিপ্ত হয়ে কামালকে ধরে আনার আদেশ দিলেন বাদশা—

ঃ কামাল তুমি জান না, ঠকামি আর বাপ-বেটার খাটবেনা। যদি ষোলগুটি মুক্তাগাঁথা কোট না দাও তাহলে শোন শনির দান এই পিতা-পুত্র সহযোগে কাটিব গর্দান। বাদশার হুকুম পাইয়া, কামাল তখন বলছে জোড় হাত কইরা—

ঃ বাদশা বলি আপনার ঠাঁই, নালের (লালের) চপর আনছে আমার ছোট ভাই।

নিজাম সওদাগর বললো ঃ কামাল কি বললে, 'লালের চপর' জামাল আনছে তুই বেটা আনলি কি।

জামাল এল। পূর্বের প্রতিজ্ঞা মত সে বলবেনা যে প্রকৃতপক্ষে 'লালের চপরে'র মালিক কে। জামাল তখন মনে মনে খানিক চিন্তা করে বলল যে, ছয়মাস সময় পেলে সে 'ষোলগুটি মুক্তাগাঁথা কোট' এনে দিতে পারবে। সে তাই আবার সফরে যাবার জন্য তৈরি হল। কামালের অনুনয় বিনয়ের পর সে তাকে সঙ্গে নিতে রাজি হল। জামাল কুদরতী-তীর ছুঁড়ে যে বন থেকে 'লালের চপর' পেয়েছিল, সেই বনে গেল। এর নাম 'ঘোর-কাজলী বন'। জামাল সেখানে সোনার খাটের পরিবর্তে

দেখতে পেল একটা সুড়ুঙ্গ। সেই সুড়ুঙ্গ বেয়ে সে নামল পাতালপুরীর শহরে। কামালের হাতে দিল সঙ্কেতসূচক দড়ি।

ঃ সেথায় মানুষাদি নাই, খুঁজিয়া পাইলনা কোন ঠাঁই। খুঁজিতে খুঁজিতে, উপনীত হইল একটা রাজমন্দিরেতে। রাজমন্দিরেতে গিয়া পশ্চিম দিকে নেগাও করিয়া চায়, একটি কন্যা রহিয়াছে শুইয়া তাও মরা দেখা যায়।

রাক্ষসপুরীতে ঘুমন্ত রাজকন্যাকে জাগাল জামাল। তার নাম 'লালমতি'। সে জানতে পারে রাজকন্যার কাছে আছে সেই দুষ্প্রাপ্য পাশা খেলার ছক। দর্শনমাত্র জামালের প্রেমে পড়ল রাজকন্যা।

ঃ হ্যাঁ শাহজাদা ষোলগুটি মুক্তা গাঁথার কোট আমার কাছে আছে। এখনি লইয়া যাও, দেশে গিয়া জান বাঁচাও। রাক্ষস যদি এসে দেখতে পায় তাহলে তুমি আর যাইতে পারবা না। রাক্ষসে তোমারে পালে। হ্যাঁ রাক্ষসে আমারে পালে।

জামাল পাতালনগরী থেকে 'সিয়াসফেদ ফল' সংগ্রহ করে। এ ফলের দৈবক্ষমতা আছে। 'সিয়াফল' শুঁকতেই কুষ্ঠ হল আবার সফেদ ফল শুঁকতেই সে হল সুস্থ। জামাল রাক্ষস বধ করল। দুজনে মালা বদল করে পাতাল পুরীতেই হল স্বামী-স্ত্রী।

এবার ঠেটার রসিকতা-গায়েনের সঙ্গে, স্ত্রী কিভাবে স্বামীকে বাবা ডাকে সে কথা উল্লেখ করে—

ঠেটা ঃ আর এই যে গায়েন সাব স্বামী-স্ত্রীকে কখনও বাপ-বউও বলা যায়, নাকি, যায়ই তো?

গায়েন ঃ আচ্ছা তা হলে কিভাবে বলা যায়।

ঠেটা ঃ আমারেই কন লাগবো? আচ্ছা গায়েন সাব কই একটু শোনেন। একটা কথা হইল কি গায়েন সাব, ডাইনে বাঁয়ে দেখাইলাম না।

গায়েন ঃ কেন ভয় আছে নাকি।

ঠেটা ঃ আরে নিজেরা নিজেরা কই একটু একটু।

গায়েন ঃ আচ্ছা কও।

ঠেটা ঃ তা হলে, আচ্ছা গায়েন সাব আপনি দেশে বিদেশে গাজীর গান করতাছেন। দরপত্র নিয়ে গেলেন বিদেশে গান করবার জন্য। যাইয়া কয়েকদিন পর খুব কামাইয়া কুমাইয়া আসলেন-

গায়েন ঃ কামাই উপার্জন করলাম। ....।

সেই টাকা নিয়ে গায়েন শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে ধরা যাক শ্বশুরকে টাকা দিল, পাঁচ টাকা। সস্তার দিন ছিল বলে বিরাট এক 'নথ' বানিয়ে দিল শ্বশুর। এত বড় নথ যে বউ ভেতরে গেলেও 'নথ' পড়ে থাকে ডুলির বাইরে।

ঠেটা ঃ দিশা দারা না পাইয়া, দুই ভাই (অর্থাৎ গায়েন ও তার ভাই) দুইটা কাড়াইল বাঁশ নিলেন।

ঠেটা ঃ কাড়াইল বাঁশ লইয়া কি করলেন গায়েন সাব; এই যে হালার চুনকিওয়ালা নথ' হালছে গালছে (হেলছে দুলছে) বাইজা পড়ার লাগল। দুই ভাই কাড়াল দিয়া (নথ) উপড়াইয়াই ফালাইল। এই ভাবে যখন আপনার রমণীকে (কখনও কখনও ঠেটা ইচ্ছা করে বলে, মামানীকে) নিয়ে গেলেন বাড়িতে। আপনার মা করলেন কি তাড়াতাড়ি বউকে নামাইয়া নিয়া গেলেন, (কিন্তু) ঐ যে শালার 'চুনকিওয়ালা নথ', ঐডা আর ঘরে গেল না, বাইরে রইল, হে দরজার সামনে বাইজা পড়ল আরকি!

গায়েন ঃ আচ্ছা তারপর—

ঠেটা ঃ দেখেন বউতো ঘরে, নথ থাকল বাইরে। পাড়াপড়শিরা বউ দেখতে আসতাছে, আইসা দেখে বউতো ঘরে, নথ আর ঘরে যায় নাই। নথ দেইখা তারা বলতাছে এই কথা—আচ্ছা বউ এত বড় 'নথ' বানাইয়া দিল কেরা? তখন আপনার রমণী বলতাছে 'নথ' বানাইয়া দিব কেরায়, বানাইয়া দিছে আমার বাবায়। আচ্ছা গায়েন সাব টাকা পয়সাগুলা সবেইতো আপনার। এ জায়গায় সম্পর্কটা কি হইল?

এরপর গায়েনের বলার পালা- জামাল এবং লালমতি রশি ধরে উঠতে গিয়ে দেখে যে ভুলে 'সিয়াসফেদ' ফল দুটি আনা হয়নি। জামাল ফল আনতে যায়। লালমতি দড়ি শক্ত কিনা নাড়া দিতে গেলে কামাল সঙ্কেত পেয়ে দ্রুত টেনে তুলে আনে। দেখে অপরূপ এক রাজকন্যা। সঙ্গে বহুপ্রার্থিত 'ষোলগুটি মুক্তগাঁথা' ছক! কামাল এ সুযোগ ছাড়ার পাত্র নয়। সে লালমতি কন্যা ও ছক নিয়ে, সুড়ুঙ্গের মুখে পাথর চাপা দিয়ে চলে গেল। রাজদরবারে গিয়ে যথারীতি সেই ছক জমা দিল। লালমতিকে চাইল সে বিয়ে করতে, সবাইকে বলল 'ঘোর কাজলী' বনে রাক্ষসরা খেয়ে ফেলেছে জামালকে।

বহু কষ্টে জামাল মুক্ত হল। এদিকে লালমতি বায়না ধরে, দেওতলার কিস্সা যে তাকে শোনাতে পারবে সে তাকেই বিয়ে করবে। কামাল বুঝতে পারল, এ হচ্ছে রাজকন্যার চালাকি কারণ, দেওতলার কিস্সা একমাত্র জামালই জানে। সে তাই, নদী পথে প্রহরা বসাল—জামালকে পেলে হত্যা করবে সে।

জামাল কুষ্ঠরোগীর ছদ্মবেশে দেওতলার কিস্সা বলতে এল। কেউ চিনলনা তাকে চিনল শুধু লালমতি। ছদ্মবেশী জামাল বলল যে একশর্তে দেওতলার কিস্সা বলবে—

ঃ আমার কিস্সা শুনতে হলে লোক আনতে হবে চারজনা মুরুব্বি হিসাবে ঘরেতে। কোথা পাব? হ্যাঁ আমি দেব বলে। সানাইল শহরে থাকে সিকান্দার বাদশা আর শুন দিয়া মন, তার গৃহে আছে উজির তার প্রয়োজন। আর বলি আমি তোমার ঠাঁই, তোমার বাড়ির দক্ষিণধার আছে না---তার গৃহে আছে এক কাঙালিনী, তারে আনতে হবে এখনি। এই চারটা লোক যদি আমি পাই তাহলে কিস্সাটা বলতে পারব। কামাল তুমি জাননা, এই চারটা লোক না হলে আমার কিস্সা বলা হবে না। কামাল একথা শুনি না করল দেরী, বাদশার কাছে গেল তাড়াতাড়ি। আদি অন্ত সব বৃত্তান্ত, সবই বাদশার কাছে খুলে বলল। বাদশা তখন উজিরকে লইয়া কামালের সাথে রওয়ানা হইল। বাদশা কামালের গৃহে গিয়া উজিরকে পাঠাইল দাইকে আনার জন্য।

ধীরে ধীরে সব ঘটনা বলল জামাল। পরিচয় উদঘাটিত হল কাঙালিনীর, সে তার মা। সিকান্দার চিনতে পারল জামালকে। লালমতি ভাবল তার ভুলেই আজ এত বড় দুর্গতি। জামাল তাকে নিষেধ করেছিল পাতালনগরে নেমে আসা দড়ি আগেভাগে ঝাঁকি না দিতে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলে—

ঃ প্রাণনাথ কথা কওনা কেনেরে।
আরে প্রাণ আমার আনচান করে।।
ও এক মাসে দুই মাসে গুণে বার মাস হইলরে
আরে ও প্রাণনাথ-
ও এতদিনে কোথায় ছিলে সেইনা কথা বলরে।।
আমি রাক্ষসের কন্যা প্রাণনাথ মনে অহংকার রে।
ও সেই জন্যেতে কওনা কথা বন্ধু কপাল মন্দ হইলারে।।
ও আকাশেতে উঠে চন্দ্র সঙ্গে লইয়া তারারে।

ও যেবা নারীর নাইকো পতি সে জেন্দা থাকতে মরারে।।
ও প্রাণনাথ কথা কওনা কেনে রে।.......

সকল ঘটনা প্রকাশিত হলে বাদশা ঘোষণা করেন কামালের মৃত্যুদণ্ড।

মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত কামাল দয়া ভিক্ষা করল জামালের কাছে। জামাল ক্ষমা করে দিল—

ঃ কামাল যখন কানতে ছিল, তখন জামালের মনে দয়া হল। বাদশার নিকট তখন গিয়া বলছে বাপজান, যারে বলেছি গুণের ভাই, ভাই মইরা গেলে আমি পাব কোন ঠাঁই। কামালের হাতের 'বান' তখন জামাল খুইলা দেয়, দেখিয়া দেশের লোকে ধন্যবাদ দেয়।---

এই ভাবে যার মতন হইল মিলন, আমাদের কিস্‌সাও নিল অবসান।

এরপর গায়েনকর্তৃক সকলের কল্যাণ কামনা করে সমবেত গান ও দর্শকমণ্ডলীকে চাহিদামত চামরের স্পর্শ দান।

জামাল-কামালের পালা, কিস্‌সা নামেও অভিহিত হয়। এধরনের আরও দু'একটি উপকথামূলক পালা গাজীর গানের অন্তর্গত, যেমন, 'হিরমিজ-কিরমিজের পালা'। অবশ্য তা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়নি। 'গাজীর বিবাহ' পালা আসলে গাজী-কালু-চম্পাবতীর কাহিনী। এর পরিবেশনায় আসরের সামনে সোয়াসের চাল ও সোয়ারতি সোনা রাখতে হয়। এছাড়া গাজীর গানের মূল অথবা উপকথামূলক সকল কাহিনীতেই গাজীর অতিলৌকিক ক্ষমতার প্রতীক একটি 'আসা' বা আ'শা' থাকে। 'আসা'টি লৌহদণ্ড, এর অগ্রভাগে বালচন্দ্রাকৃতির একটি লৌহপাত সংযুক্ত। তাতে সর্ষেরতেল মাখা হয়। আসরে তা পুঁতে রাখে গায়েন। একটি থালায় সোয়াসের চাল, চালের উপর মানতকারীদের টাকা পয়সা রাখার নিয়ম। চালের উপর থাকে 'চামর' বা চমর'। চামরের আরোগ্যদানের ক্ষমতা আছে বলে দর্শক-শ্রোতার বিশ্বাস।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

অভিরামদাস বিরচিত গোবিন্দবিজয়, ডক্টর পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৬৯।

অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধায় অনূদিত, বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া রচিত, সাহিত্য আকাদেমি, নতুন দিল্লী, ১৯৮৫।

আদি ও আসল সহিদে কারবালা, জোনাব আলী রচিত, বটতলার পুথি।

আদ্যের গম্ভীরা, হরিদাস পালিত, ১ম সং-মাঘ ১৩২০।

আব্দুল হাকিম রচনাবলী, ডঃ রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত, প্রকাশকাল জুলাই ১৯৮৯।

আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৮।

আলাওল পদ্মাবতী, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, ১ম সং-১৯৬৮ ইং।

আসল গাজির পুথি, আব্দুর রহিম কৃত, বটতলা সংস্করণ।

উজ্জ্বলনীলমণি (রূপগোস্বামীকৃত) শ্রী হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, মাঘীপূর্ণিমা ১৩৭২বাং।

উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য, শিশির মজুমদার, ২য় সং-১৯৯০।

উনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালীকার ও বাংলা সাহিত্য, নিরঞ্জন চক্রবর্তী, কলিকাতা, মহাজাতি-১৩৭১ বাং।

ওমরখৈয়াম, মেঘদূত গীতগোবিন্দ, প্রণব বাহুবলীন্দ্র (গ্রন্থনা ও গদ্য ভাষান্তর) প্রথম সংস্করণ ১৩৯১ বাং।

ওড়িয়া সাহিত্য, প্রিয়রঞ্জন সেন, ১৩৫৮।

কথাসরিৎসাগর, সোমদেব ভট্ট, অনুবাদ হীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস, ১৯৮৪।

কবি কঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গল (ধনপতি উপাখ্যান), শ্রীবিজন বিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ১৯৬৬।

কবি কৃষ্ণরামদাসের গ্রন্থাবলী, শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮।

কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, কাব্যতীর্থ ও ডক্টর শ্রী আশুতোষ দাস কর্তৃক সম্পাদিত, ১৯৬০।

কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত (এম. এ.) সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২।

কবি ভবানন্দের হরিবংশ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্য গ্রন্থমালা-২), শ্রীসতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত, সন-১৩৩৯।

কবি সঞ্জয় বিরচিত মহাভারত, মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত, ১৯৬৯।

কাশীদাসী মহাভারত, শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, সং-১৯৭৮।

কৃত্তিবাস রচিত সম্পূর্ণ রামায়ণ, শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, ১৯৮৯।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৮৩।

কোরেশী মাগন চন্দ্রাবতী, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৭৪।

গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদিত, কবি শুকুর মাহমুদ বিরচিত, বাংলা একাডেমী ১৯৭৪।

গোবিন্দ মঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস, ঈশানচন্দ্র বসু সম্পাদিত, ২য় সং-১৩১৭।

ঘনরাম বিরচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, শ্রীপীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২।

চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন সম্পাদিত, ১ম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮২।

চাকা, সেলিম আল দীন, প্রথম প্রকাশ-১লা ফাল্গুন ১৩৯৭, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯১।

জগন্নাথবল্লভ নাটকম, রামানন্দরায় কবি সার্বভৌমেন বিরচিতম, শ্রীগৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত, প্রকাশকাল ১৪ই এপ্রিল ১৯৯২।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, বিমান বিহারী এবং সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এশিয়াটিক সোসাইটি-১৯৭১।

তিনটি মঞ্চ-নাটক, সেলিম আল দীন, প্রথম প্রকাশ-মাঘ ১৩৯২।

দাশরথি ও তাহার পাঁচালি, ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, প্রথম প্রকাশ-১৩৬৭।

দোনাগাজী বিরচিত সয়ফুল্লমুলুক-বদিউজ্জামাল, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, ১ম প্রকাশ-মাঘ ১৩৮১।

দৌলত উজির বাহরাম বিরচিত, লাইলী মজনু, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, দ্বিতীয় প্রকাশ অগ্রহায়ণ-১৩৭৩।

দ্বারিকা দাসের মনসামঙ্গল, শ্রীবিষ্ণুপদ পাণ্ডা সম্পাদিত, ১ম প্রকাশ ২৩শে জানুয়ারী ১৯৮০।

দ্বিজরামদেব অভয়ামঙ্গল, আশুতোষদাস এম. ডি. ফিল সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৭।

নন্দিকেশ্বর অভিনয় দর্পণ, সেলিম আল দীন অনূদিত, কথা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ-১লা ডিসেম্বর ১৯৮৯।

নট নাট্য নাটক, সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ চৈত্র-'৭২, দ্বিতীয় মুদ্রণ ভাদ্র-'৯১।

নেপালে বাঙ্গালা নাটক, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, প্রকাশ-১৩২৪।

পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, সুকবি নারায়ণদেব ও পণ্ডিত জানকীনাথ সম্পাদিত, ৬ষ্ঠ সংস্করণ-১৩৯১।

পদ্মাবতী, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রথম সং-ভাদ্র ১৩৫৬।

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (চতুর্থ খণ্ড), বিনয় ঘোষ ১৯৮৬।

পরশুরাম রায়ের মাধবসঙ্গীত, অমিতাভ চৌধুরী সম্পাদিত, বিশ্বভারতী ১৩৭১।

পালযুগের চিত্রকলা, সরসীকুমার সরস্বতী, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৭৮।

আহমদ শরীফ সম্পাদিত, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত, *পুথি পরিচিতি,* প্রথম সং-ঢা. বি. ১৯৫৮।

পূজা পার্বণের কথা, পল্লব সেনগুপ্ত, ১১ই আগষ্ট ১৯৮৪।

প্রাক আধুনিক বঙ্গসংস্কৃতি, মুরারি ঘোষ, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৮৩।

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), ক্ষিতিশচন্দ্র মৌলিক, ১ম সং-১৯৭১।

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৭ম খণ্ড), ক্ষিতিশচন্দ্র মৌলিক, ১ম সং-১৯৭৫।

প্রাচীন বাঙ্গালা- মৈথিলী নাটক, বিজিতকুমার দত্ত, ১ম প্রকাশ ১৪ই জুলাই ১৯৮০।
প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, দ্বিতীয় সং-১৩৮২।
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), দীনেশচন্দ্র সেন, সম্পাদনা ঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আগস্ট ১৯৮৬।
বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৭২।
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), সুকুমার সেন ১৯৯১।
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড), সুকুমার সেন, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ।
বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া, (সাহিত্যরত্ন); ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশকাল ১৯৯০।
বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খণ্ড) আহমদ শরীফ, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮।
বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (২য় খণ্ড), আহমদ শরীফ, সং-১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৩।
বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস, হিতেশরঞ্জন সান্যাল, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯।
বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) নীহাররঞ্জন রায়, অগ্রহায়ণ ১৩৮২।
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, রামগতি ন্যায়রত্ন, নতুন সং-১৯৯১।
বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, মন্মথমোহন বসু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৯।
বাংলা নাটকের বিবর্তন, সুরেশচন্দ্র মৈত্র, ১৯৭৩।
বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র, অহীন্দ্র চৌধুরী ১৯৫৭।
বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীঃ অংশীদারিত্বের নতুন দিগন্ত, প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৪০০ সাল।
বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৭৫।
বাংলা সাহিত্যের কথা (প্রথম খণ্ড), ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, আশ্বিন-১৩৮২।
বাংলা সাহিত্যের নবযুগ, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, সপ্তম সংস্করণ, মাঘ-১৩৮৩।
বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা, ডক্টর গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, ১ম প্রকাশ ১লা অক্টোবর ১৯৭২।
বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার, শ্রীকামিনীকুমার রায়, প্রথম প্রকাশ-কার্তিক ১৩৮৪, নভেম্বর ১৯৮০।
বাংলাদেশের নির্বাচিত নাটক, রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৯৫।
বাংলার লোকসাহিত্য (৩য় খণ্ড গীতনৃত্য), শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য-১৯৬৫।
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থ সং-১৯৮২।
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪র্থ খণ্ড), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় সং-১৯৮৫।
বাংলা সাহিত্যের কথা (২য় খণ্ড) মধ্যযুগ), ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সং-কার্তিক ১৩৭৪।
বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা, অধ্যাপক বৈদ্যনাথ শীল, দ্বিতীয় সং- জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭।
বাংলা লৌকিক দেবতা, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ১ম সং-জুন ১৯৮৭।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়, সুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৭০।

বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, ডঃ আশা দাস, ১৯৬৯।

বিশ্বকোষ, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, একাদশ ও পঞ্চদশ ভাগ।

বিষ্ণুপুরাণ, ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী (সম্পাদিত) প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ ১৩৯৪।

বৃন্দাবনদাস বিরচিত 'চৈতন্যভাগবত', সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য আকাদেমি ১৯৯১।

বৃন্দাবনদাস বিরচিত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, কাঞ্চন বসু সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর-১৯৮৩।

বৃহৎ বঙ্গ (১ম খণ্ড), দীনেশচন্দ্র সেন, সং-১৯৯৩।

বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ, সুকুমার সেন, প্রথম সং-১৯৭০।

ব্যবহারিক শব্দকোষ (প্রথম খণ্ড), কাজী আবদুল ওদুদ এম. এ. দ্বিতীয় সং-ভাদ্র ১৩৬৭।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ (প্রথম খণ্ড), ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ-১৯৯২।

ভরত নাট্যশাস্ত্র (১ম খণ্ড), সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ-১৪ই মার্চ ১৯৮০।

ভরত নাট্যশাস্ত্র (২য় খণ্ড), সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ-১৫ই মার্চ-১৯৮২।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য (২য় খণ্ড), সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ-১৯৬৯।

ভারতচন্দ্র, শ্রীমদনমোহন গোস্বামী সম্পাদিত, সাহিত্য আকাদেমী-১৯৬১।

ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক, সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৩৮১ বাং।

মঙ্গল চণ্ডীর গীত, শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৬৫।

মনসামঙ্গল, শ্রীবিজন বিহারী ভট্টাচার্য সংকলিত ও সম্পাদিত, সাহিত্য আকাদেমী-১৯৬১।

ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, শাবির উদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ-১৯৭৮।

ময়ূরভট্ট ধর্মমঙ্গল, অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রাদেব সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ -১৩৮১।

মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল, ডঃ সুনীল কুমার ওঝা, সং-১৩৮৪।

মানিকরাম গাঙ্গুলি বিরচিত ধর্মমঙ্গল, শ্রীবিজিতকুমার দত্ত ও সানন্দা দত্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬০।

মুহম্মদ কবীর বিরচিত মধুমালতী, আহমদ শরীফ সম্পাদিত।

মৈমনসিংহ গীতিকা (১ম খণ্ড), শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন রায় বাহাদুর বি. এ. ডিলিট সম্পাদিত, ১৯৭৩।

রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, অনিল বরণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৯৬৯।

রামেশ্বরের শিব সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ণ, শ্রীযোগীপাল হালদার সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৫৭।

রুক্মিণীহরণ নাট, শ্রীঅম্বিকানাথ বরা, এম. এ'র দ্বারা সম্পাদিত, মহাপুরুষ শ্রী শ্রীশঙ্করদেবের রচিত, শক-১৮৫৪, ফেব্রুয়ারী ১৯৩২।

রূপরামের ধর্ম্মঙ্গল (১ম খণ্ড) শ্রীসুকুমার সেন ও শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, সাহিত্য সভা বর্দ্ধমান ১৩৫১।

লোকনাট্য, মোহাম্মদ সাইদুর সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন-১৩৯১।

লোক সাহিত্য, আশরাফ সিদ্দিকী, দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৮০।

লোক সাহিত্য সংকলন-৪১ (লোকনাট্য), মোহাম্মদ সাইদুর সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫।

লোচনদাসের শ্রী শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত, গৌরাব্দ ৪৪৪।

শা'বারিদ খান গ্রন্থাবলী, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ-১৩৭৩ বাং।

শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত, ইউসুফ-জোলেখা, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, ১৯৮৪ ইং।

শূন্যপুরাণ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, (সম্পাদিত) বসুমতি সাহিত্য মন্দির ১৩৩৬।

শংকর কবিচন্দ্রের মহাভারত, চিত্রাদেব সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ-১৩৮৯।

শ্রীকবিবল্লভ বিরচিত সত্যনারায়ণের পুথি, শ্রীযুক্ত মুন্সী আব্দুল করিম সম্পাদিত, প্রকাশ-১৩২২।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, ৯ম সং-১৩৮০।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় (মালাধর বসু গুণরাজ খান), নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ সম্পাদিত, ১৩৫২ বাং।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, শ্রীমাধবাচার্য্য, শ্রীনটুবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলিকাতা-১৩১০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, সং-১৩৪২।

শ্রীমদ্ভগবতগীতা, স্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত, অষ্টম সংস্করণ।

শ্রী শ্রীপদ্মপুরাণ বাইশ কবি মনসা, প্রকাশক শ্রীঅমূল্য রতন শর্মা, ৩০ নং ফকিরচাঁদ চক্রবর্তীর লেন, কলিকাতা।

শ্রী শ্রীশঙ্করদেব বিরচিত, কালিয়দমননাট, শ্রীরাজমোহন নাথ বি. ই তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত, প্রথম সং-১৮৬৭ শক-১৯৪৫ ইং।

সতীময়না ও লোর-চন্দ্রাণী, মযহারুল ইসলাম, মুহম্মদ আব্দুল হাফিজ সম্পাদিত, ১৯৬৯ইং।

সত্যপীরের পুথি, মদন কামদেবের পালা, সায়ের মুনশী ওয়াজেদ আলী সাহেব, প্রকাশ-১৩৫৬।

সাহিত্য দর্পণ, বিশ্বনাথ কবিরাজ অধ্যাপক বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় অনূদিত, ১৩৮৬

সেখ শুভোদয়া, স্বর্গীয় পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত সম্পাদিত, প্রথম সং-আশ্বিন ১৩৭৩।

সৈয়দ হামযা বিরচিত মধুমালতী, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ-১৩৮০।

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস এম. এ. চতুর্থ সং- ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪।

হরগজ, সেলিম আল দীন, গ্রন্থিক প্রকাশনা-১৯৯২।

হাত হদাই, সেলিম আল দীন, নির্দেশনা-নাসির উদ্দিন ইউসুফ, প্রযোজনা-ঢাকা থিয়েটার, ১৯৯১।

সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকা ঃ

থিয়েটার স্টাডিজ (১ম সংখ্যা), ১৯৯২-'৯৩, মু. মঈনউদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার-ঢাকা।

থিয়েটার স্টাডিজ (২য় সংখ্যা) জুন, ১৯৯৪, সেলিম আল দীন সম্পাদিত নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ভাষা ও সাহিত্য পত্র (একাদশ সংখ্যা) ১৩৯০, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

বঙ্গদর্শন, ১২৮৯।

সাহিত্য পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।

বাংলা একাডেমী, পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯।

থিয়েটার স্টাডিজ সেলিম আল দীন সম্পাদিত ৩য় সংখ্যা ১৯৯৫ নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থপঞ্জি ঃ

The Mirror of Gesture, Being the Abhinaya Darpana of Nandikeswara, Ananda Comarswamy and Gopala Kristnayya Duggirala, 1917.

The Theatre Introduction, Oscar G. Brockett, Indiana University, Third Edition, 1974.

Buddhist Mystic Songs, Muhammad Shahidullah, Bengali Academy, Revised and Enlarged edition 1966.

The Mahbharata, Jean-Claude Carriere, Translated by Peter Brook-1987.

The Sanskrit Drama in its Origin : Development Theory and Practice, A. Berriedala Keith, D. C. L. D. litt, Oxford, U. Press-1954.

The Story of the Seven Princesses, Nizami, Translated from the Persian and edited by Dr. R GELPKE English Version by Elsie and George Hill 1976, Bruno Cassire (Publisher) Ltd.

The Empty Space, Peter Brook, First Published 1968.

নির্ঘণ্ট

গ

ঘ

প

c

ষ

স